বিপ্লবীর কথা

সম্পাদনা
শেখ রফিক

ব্রিটিশের শাসন-শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতনের নাগপাশ থেকে উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার জন্য যে রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রাম ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তিমূলে যারা রয়েছেন সেরকম একশজন বিপ্লবীর জীবন কথা রয়েছে এই গ্রন্থে। সেই সংগ্রামী লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় জন্ম নিয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। আজকের তরুণসমাজ যারা নিজেদের ভবিষ্যত ও শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ-তাদের জন্যই এই গ্রন্থ।

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৮৬৭৫-৩২-৮



শেখ রফিক

জন্ম: ১ মার্চ ১৯৮২, স্বরূপকাঠির বিষ্ণুকাঠি গ্রামে।
মা: মমতাজ বেগম, বাবা: নূরুল ইসলাম।
বিএসএস (সম্মান) ও এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান),
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের দর্শন
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শিক রাজনীতির
সাথে যুক্ত রয়েছেন।
দৈনিক সংবাদ ও সাপ্তাহিক একতা'য়
অনিয়মিতভাবে লিখছেন।
সম্পাদক: বিপ্লবীদের কথা (মাসিক পত্রিকা),
www.biplobiderkotha.com
পরিচালক: বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা।

প্রচ্ছদ : মেহেদী বাপ্পু মিতা

শত বিপ্লবীর কথা

সম্পাদনা

শেখ রফিক

শত বিপ্লবীর কথা

প্রকাশক
প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

প্রকাশনা
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা
২৫৩-৫৪ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
বি-১৬, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫।
সেল: ০১৭২৬-১২৩৫৫০
www.biplobiderkotha.com
rafiqcpb@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
২৩ এপ্রিল ২০১২
দ্বিতীয় প্রকাশ
২৫ মার্চ ২০১৪

প্রচ্ছদ
মেহেদী বানু মিতা

অলংকরণ
মিফতাহুর রহমান চৌধুরী

মূদ্রণ
চিত্রকল্প
১৭৯/৩ ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-8675-32-8

মূল্য
সাতশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

পরিবেশক
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তিভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

বিনোদবিহারী চৌধুরী
কমরেড জসিমউদ্দিন মণ্ডল
কমরেড কামাক্ষ্যা রায় চৌধুরী
দার্শনিক সরদার ফজলুল করিম
প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
ও
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যারা দৃঢ় প্রত্যয়ী

ভূমিকা

'শত বিপ্লবীর কথা' বইটি শেখ রফিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে। একথা ঠিক যে, বিপ্লবীদের জীবন-সংগ্রাম নিয়ে লেখালেখি নানা স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কোনো কোনো বিপ্লবী তাদের আত্মকথামূলক রচনাও রেখে গেছেন, যা বাংলার বিপ্লবী ইতিহাস চর্চার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবু দীর্ঘদিন পরে হলেও বাংলার শত বিপ্লবীর জীবন-সংগ্রাম এক মলাটের ভিতর প্রকাশের ঘটনা নিশ্চয়ই সাধুবাদের দাবি রাখে। এজন্য শেখ রফিককে ধন্যবাদ জানাই।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস চর্চার ধারা এখনো পর্যন্ত প্রধানতঃ দু'টি ধারাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। একটি একেবারেই ইঙ্গ-মার্কিন তথা পশ্চিমা ইতিহাস চর্চার ধারা বজায় রেখেছে। যেখানে ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের ক্রিয়াকলাপের গুণ-কীর্তন করাই হচ্ছে ইতিহাস চর্চার মূল লক্ষ্য। অপরটি বিকশিত হয়েছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের হাত ধরে। যেখানে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্মাণই মূল দায়। এ দুটি ধারা একরৈখিক, কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরিপূরক। এসব ধারায় আমজনতার রাজনৈতিক চেতনা ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি কখনোই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। লক্ষণীয় হলো, এই দুই ধারার ইতিহাস চর্চাতেই বিপ্লবীরা প্রায় অপাংক্তেয় অথবা অতি তুচ্ছ উপাদান হিসেবে একেবারে প্রান্তস্থিত বলে গণ্য। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। অবিভক্ত ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের (বিশেষ করে যারা 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' এর মতো দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন) পশ্চিমা ইতিহাসবিদরা সবসময়ই 'টেররিস্ট' বা 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করেন। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদরাও নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের কারণে এই অভিধাটিকেই চালু ও ব্যবহার করে থাকেন। এটি মোটেও সত্য ইতিহাসকে প্রতিফলিত করে না।

বিপ্লবীদের জীবন-সংগ্রাম শ্রেণীগত স্বার্থের কারণেই আলাদা; ফলে সেই ইতিহাস চর্চার ধারাও ভিন্ন। 'শত বিপ্লবীর কথা' বইটি সেই প্রচলিত ইতিহাস চর্চার বাইরে ভিন্ন এক ইতিহাসকে আমাদের সামনে উন্মোচন করে দিবে। যা ইতিহাসের বিকৃতিগুলোকে রোধ করতে সাহায্য করবে।

কিন্তু একটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ওতোপ্রতোভাবে সম্পৃক্ত। কারণ সাম্রাজ্যবাদ ও

বিজাতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামই হলো 'জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম'। বাঙালির সেই মুক্তি সংগ্রাম চলেছে ব্রিটিশ আমল থেকেই। সেই সংগ্রামে অহিংসপন্থী, সশস্ত্র বিপ্লবপন্থী, সংস্কারবাদী, বিপ্লববাদী, বিবর্তনবাদী, আপসকামী, কট্টরপন্থী নানা প্রবণতার ব্যক্তি ও শক্তি অবদান রেখেছেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ এই সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিল বাঙালি জাতি। সুভাষ বোস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, তিতুমীর, নুরলদীন, হাজী শরিয়তুল্লাহ, শের-ই-বাংলা ফজলুল হক, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাই লাল, সূর্য সেন, বাঘা যতীন, মাতঙ্গিনী হাজরা, বিনয়, বাদল, দীনেশ, প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, ইলা মিত্র, শান্তি, সুনীতিরা ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন, জেল খেটেছেন, আহত হয়েছেন, অকাতরে স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নানাভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াই করেছেন। এদের একটি বড় অংশ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এক সময় মার্কসবাদী দর্শন ও সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এদের পন্থা হয়তো ভিন্ন ছিলো, কিন্তু লক্ষ্য ছিল একটাই– মুক্তির সংগ্রাম অগ্রসর করা। এদেরকে বাংলাদেশের 'মুক্তিযোদ্ধা' হিসেবে বিবেচনা না করাটি হবে চরম ইতিহাস বিকৃতি।

ব্রিটিশবিরোধী মুক্তি সংগ্রাম থেকে বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে বিভক্ত করে ইতিহাস নির্মাণের চেষ্টা করাটা আসলে ইতিহাসের উপর একটি গুরুতর ভ্রান্তি ও বিকৃতি চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস।

আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ছিল শতাব্দিকালেরও বেশি সময় ধরে প্রবাহমান বিপ্লবীদের মুক্তি সংগ্রামেরই একটি মাইল ফলক। এটা ছিলো সুদীর্ঘ এই মুক্তি আন্দোলনের শীর্ষ অধ্যায়। সেই মুক্তির সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি। ফলে এসব বিপ্লবীদের জীবন-সংগ্রামের প্রাসঙ্গিকতাও শেষ হবার নয়। আমাদের বারবার ফিরে যেয়ে রসদ সঞ্চয় করতে হবে সেইসব বিপ্লবীদের কাছ থেকে, তাদের জীবন-সংগ্রাম থেকে মুক্তির মন্ত্রকে আরো শাণিত করে তোলার প্রয়োজনে। তারা অমর, অক্ষয়। শত বিপ্লবীকে লাল সালাম।

'শত বিপ্লবীর কথা' বইটি নব প্রজন্মসহ সর্বমহল কর্তৃক পঠিত হলে তাতে যে একটি বড় কাজ হবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
৮ এপ্রিল ২০১২

প্রকাশকের কথা

'শত বিপ্লবীর কথা' বইটিতে ১০০ জন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীর জীবনী রয়েছে। যারা ছিলেন দেশপ্রেমিক ও মানব দরদী। এদের মধ্যে সবাই কমিউনিস্ট ছিলেন না বা কমিউনিস্ট হওয়ার সুযোগও পাননি। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এই উপমহাদেশে কমিউনিস্ট মতাদর্শ বিস্তার লাভ করে। তার পূর্বে অনেক বিপ্লবী জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। তারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শোষণ মুক্ত সমাজের চিন্তা-ভাবনার সংস্পর্শে আসতে পারেন নি, সে জন্য তাদের মধ্যে দেশপ্রেম ও মানবতাজনিত মহত্ত্ব কম ছিল বিষয়টি এমন নয়। সেই সমস্ত বিপ্লবীরা, শুধু সাম্য-স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেই থেমে থাকেন নি, ঘর ছেড়ে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে পথে বের হয়ে এসে স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, অনেকেই জীবন উৎসর্গ করেছেন।

অন্যদিকে ত্রিশের দশক থেকে অধিকাংশ বিপ্লবীই সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সংস্পর্শে এসে রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ শুরু করেন। ব্রিটিশ বিতাড়িত হলেই কি শাসন-শোষণের যাঁতাকল বন্ধ হবে? বা ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করে যাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হবে তারা কি শোষণ-নির্যাতন করবে না? এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তারা সেদিন বিপ্লববাদী পথ থেকে শোষিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন গরীব-দুঃখী, মেহনতি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের লড়াই-সংগ্রাম।

আমরাও প্রাক-যৌবনে এসমস্ত মহৎ ব্যক্তিদেরকে শ্রদ্ধার আসনে ধারণ করেছিলাম, এখনো করছি। এদের দেখানো পথ লক্ষ্য করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

১০০ জন বিপ্লবীর জীবনী নিয়ে শেখ রফিক যে 'শত বিপ্লবীর কথা' বইটি সম্পাদনা করছেন এটা নিঃসন্দেহে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে আমি মনে করি। কেন না স্বাধীনতা, অধিকার, শোষণমুক্তির সংগ্রামের যে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং সেই ইতিহাসের নায়কদেরকে তরুণ সমাজের সামনে তুলে এনে দিতে তিনি যে শ্রম দিচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। আমি তাই তার এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বইটির প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছি।

প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
৫ এপ্রিল ২০১২

সম্পাদনার গল্প

বেশ মনে আছে, ১৯৯৮ সাল, তখন আমি স্বরূপকাঠী সরকারী কলেজে আই. এ ফাইনাল পরীক্ষার্থী। 'ডিসেম্বর ১৪' সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলাম। এটি ছিল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের প্রকাশনা। ১৯৯৩ সালের পূর্বে স্বরূপকাঠীতে ছাত্র ইউনিয়ন ছিল কলেজের সবচেয়ে বড় সংগঠন। আমি ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত হয়েছিলাম ১৯৯৫ সালে, শহীদ স্মৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনাকালে। সামসুল আলম মাষ্টার (মামা) আমাকে ছাত্র ইউনিয়নের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর কলেজ জীবনে বিপ্লবী কবির ভাইয়ের কাছে রাজনীতির 'অ আ ক খ' শিখি।

প্রতিদিন কলেজ শেষে আমরা কয়েকজন– জাহিদ ভাই, মামুন ভাই, সুজা ভাই, মাসুদ ভাই, মহসিন, রিয়াদ, আনিস, ওয়ালিদ, আমি ও সুমন পাইকসহ আরো অনেকে লঞ্চ টার্মিনালের উত্তর দিকে বিসিক-এ গিয়ে বসতাম। আড্ডা দিতাম, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হতো, মাঝে মাঝে পাঠচক্রও হতো। বিকেল বেলা কবির ভাই আসতেন। তারপর আমরা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের দেশে চলে যেতাম। ওখানে থাকতেন স্বপন ভাই ও তার এক বড় বোন। আমরা তার বাসায় প্রাই দিনই খেতাম। তারা ছিলেন নাছোড় বান্ধা, না খাইয়ে একদিনও ছাড়তেন না।

এছাড়াও আমরা স্বরূপ থিয়েটারের সাথে যুক্ত ছিলাম। ওই থিয়েটারের মূল ব্যক্তিটি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় নাট্যকার শহিদ ভাই। স্বরূপ থিয়েটারের অফিস ছিল ইন্দুরহাট, সদর রোডের কালীবাড়ি মন্দিরের কাছে। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা থিয়েটার অফিসে গণসঙ্গীতের আসর বসতো। এখানে অতুল প্রসাদ, মুকুন্দদাস, ভূপেন হাজারীকা, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের গান হতো। আমরা সবাই মিলে সে গান গাইতাম। মুকুন্দদাসের 'ভয় কি মরণে', 'থাকে যদি ডোবাখানা, জন্মিবে কচুরীপানা' 'সকল কাজের মিলবে সময়, আগে দুটি ভাতের জোগাড় কর' এই গানগুলো সবচেয়ে বেশী ভাল লাগতো। গান শেষে বাড়ি চলে যেতাম। পথে যেতে যেতে এই গানগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করতাম।

২০০০ সালের শেষের দিকে আমি ঢাকায় চলে আসি। এখানে এসেও ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত থাকি। ২০০১ সালে জগন্নাথ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ভর্তি হই। পড়াশুনা আর ছাত্র রাজনীতি চলতে থাকলো। এ সময় আমি সাপ্তাহিক একতায় লেখালেখি শুরু করি। এভাবে চললো ৫ বছর। ততদিনে মূলত: ছাত্র ইউনিয়ন ও একতা'ই আমাকে লেখক হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তখন আমি দৈনিক সংবাদে মাঝে মাঝে সাহিত্য, রাজনীতি ও শিক্ষা বিষয়ে পোস্ট লিখছি।

২০০৬ সালটি ছিল রাজনৈতিক অরাজকতায় পরিপূর্ণ। ওই বছর প্রায়ই হরতাল-ধর্মঘট-অবরোধ লেগে থাকতো। একবার আওয়ামী লীগ অনির্দিষ্টকালের জন্য

হরতাল-ধর্মঘট ডেকেছিল। রাজনৈতিক পাড়া হিসেবে খ্যাত পল্টন-মুক্তাঙ্গনের রাস্তায় তখন জনসমুদ্র। কোথাও বক্তৃতাবাজী হচ্ছে, কোথাও সরকার পদত্যাগের মিছিল আবার কোথাও গণসঙ্গীত চলছে। ওই সময় মুকুন্দদাসের কয়েকটি গান প্রায় দিনই শুনতাম। ঢাকা এসে বহুবার উদীচীর অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনেছি। সবকিছু মিলিয়ে মুকুন্দদাসকে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। শুরু করি তাঁকে অধ্যয়ন। অধ্যয়ন শেষে হিসেব করে দেখলাম তাঁকে জানা খুব প্রয়োজন, বিশেষ করে আমরা যারা নতুন সমাজ নির্মাণের জন্য কাজ করছি, তাদের তো অবশ্যই। দুই বছর পর মুকুন্দদাস রচনাসমগ্র বইটি বের করি এবং নতুন সমাজনির্মাণের তরুণ, যুব, প্রবীণদের হাতে তুলে দেই।

এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল কমরেড আইয়ুব আলী মাস্টার, কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, কমরেড এ কে আজাদ ও কমরেড হুমায়ুন কবিরকে। কবির ভাইকে মুকুন্দদাসের রচনাসমগ্র বইটি দেওয়ার পর তিনি আমাকে বলেছিলেন, এটা ভাল কাজ। তারপর নানাকথা। ঢাকাতে আসার আগে আমাকে 'দ্বীপান্তরের বন্দী' নামে একটা বই দিলেন আর বললেন এটা তোমার কাজে লাগবে। লঞ্চে আসতে আসতে বইটির প্রায় অর্ধেক পড়ে ফেলি। জানলাম এক অজানা বাস্তব কাহিনী। ব্রিটিশবিরোধী কিংবদন্তীদের জীবনের গল্প। বইটি পড়া শেষ করে বুঝলাম আমি বা আমরা যারা তরুণ, যারা এই পঁচাগলা সমাজটাকে পরিবর্তন করতে চাই তারা তাদের পূর্বসূরীদের ইতিহাস জানি না; জানি না আমাদের যা কিছু গৌরব করার তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে! তাই নিজের অজ্ঞতা ও অন্ধকার সামান্য একটু দূর করার জন্য পরের বছর বিপ্লবী নলিনীদাস রচনাসমগ্র সম্পাদনা করলাম।

২০০৯ সালের ২৮ অক্টোবরে ছাত্র রাজনীতি থেকে বিদায় নিলাম। রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে একটি মাসিক পত্রিকা বের করা উদ্যোগ নেই। পত্রিকাটির নাম দিই 'বিপ্লবীদের কথা'। মুকুন্দদাস, নলিনীদাস রচনাসমগ্র রচনা করা ও কিংবদন্তী বিপ্লবীদের জীবনী পড়া এবং বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকা ইত্যাদি কাজের ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতিতে এই উদ্যোগ। আরেকটা বিশেষ কারণ এর সাথে জড়িত, আর তা হলো: কলেজ জীবন থেকেই বিপ্লবী হওয়ার এবং বিপ্লব করার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু সেই স্বপ্নটা ছাত্র রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বেই ভেঙ্গে যায়। তখন আমার সামনে যে সমস্ত বিপ্লবী মডেল ছিল, তারা অতীতের বিপ্লবী মানুষগুলো থেকে এতটাই বিপরীত যে, তাদেরকে আর মডেল হিসেবে চেতনায় ঠাঁই দিতে পারলাম না, অবশ্য দু'একজনকে বাদ দিয়ে। তখন প্রচণ্ড হতাশ হলাম। নিজের এই হতাশা কাটাতে এবং আমার মত হতাশাগ্রস্ত তরুণদের হতাশা দূর করতে 'বিপ্লবীদের কথা' পত্রিকাটির জন্ম। বিপ্লবীদেরকে তরুণ প্রজন্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই বুলেটিন আকারে 'বিপ্লবীদের কথা' মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি।

প্রথম থেকেই এই পত্রিকার মূল লক্ষ্য ছিল বাঙলা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে সমকালীন বিপ্লবীদের জীবনী এবং তাদের আদর্শের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং সেই সাথে এই অঞ্চলের বিপ্লবী রাজনীতির

একটা টাইমলাইন তৈরি করা। একটি 'সমাজ বিপ্লব ও বিপ্লবী গবেষণা কেন্দ্র' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিপ্লবীদের একটি এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করার। আমি ও পারভেজ আলম সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তৈরী করি www.biplobiderkotha.com ওয়েবসাইটটি (২০১০ সালের শুরুতে)। সমাজ বিপ্লবীদের জীবনী, কর্মযজ্ঞ, আদর্শ আর সাড়াজাগানো সব লড়াই-সংগ্রামের অনলাইন অর্কাইভ গড়ে তুলতে নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিপ্লবীদেরকথাডটকম।

তারপর ২০১১ সালের দিকে বিপ্লবীদের কথা'র পাঠকদের অনুরোধে বিপ্লবীদের জীবনী নিয়ে একটা বই করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এই কাজের শুরুর দিকে চিন্তা করেছিলাম ব্রিটিশবিরোধী সকল বিপ্লবীদের জীবনী নিয়ে একটা বই করার কথা। কিন্তু কাজে নেমে দেখলাম তাতে আরো দশ বছর সময়ের দরকার। পরে সিদ্ধান্ত নিলাম প্রতি বছর একটা করে বই করার মতো জীবনী সংগ্রহ করা সম্ভব। তাই এই বছর ১০০ বিপ্লবীর জীবনী নিয়ে 'শত বিপ্লবীর কথা' বইটি প্রকাশ করছি। এই বইয়ের প্রথম দিকের একান্ন জন বিপ্লবীর জীবনী আমার সম্পাদনা করা। এই জীবনীগুলো শুরুতে সংক্ষিপ্ত আকারে বিপ্লবীদেরকথা ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে একটু বিস্তারিতভাবে গুণীজন ওয়েবে প্রকাশিত হয়। আর বাকী জীবনীগুলো বিভিন্ন বই ও লেখকের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই লেখাগুলোর বানানরীতি ওই সমস্ত বই অনুসারে রাখা হয়েছে।

প্রকাশক শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ না নিলে হয়তো এই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। এজন্য আমি ও বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা প্রকাশকের কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এছাড়াও বইটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যারা বানান ঠিক করেছেন, নেলসন, মীর মোশাররফ হোসেন, অভিনু কিবরিয়া ইসলাম, মিফতাহুর রহমান চৌধুরী, রাশেদুন্নবী সবুজ, মাহাবুব হাসান, কামরুস সালাম সংসদ ও মুজাহিদুল ইসলাম উইনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সতর্কতা সত্বেও এই বইতে তথ্যগত এবং মুদ্রণজনিত কোন অসঙ্গতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। সচেতন পাঠক কোন ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

শেখ রফিক
৫ এপ্রিল ২০১২
মিরপুর, ঢাকা

সূচি

বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনার বইসমূহ

অগ্নিযুগের বিপ্লবী জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ–২০১১
জিতেন ঘোষ স্মরণসংখ্যা (২০১২)
ছোটদের বাঘা যতীন (২০১৩)
বিপ্লবী বাঘা যতীন (২০১৩)
ক্ষুদিরামের জবানবন্দি (২০১৩)
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা (২০১৩)
বিপ্লবী হুগো শ্যাভেজ (২০১৩)
জেলখানার ডাইরি (২০১৩)
মনোরমা বসু মাসিমা (২০১৩)
খাপড়াওয়ার্ড: উপমহাদেশের প্রথম জেল হত্যাকাণ্ড (২০১৩)
বিনয় বাদল দীনেশ (২০১৩)
বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন (২০১৩)
ইলা মিত্রের জবানবন্দী (২০১৩)
কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ (২০১৩)
বন্দী জীবন (২০১৩)
বিপ্লবী যতীন দাস (২০১৩)
প্রীতিলতার আত্মকথা (২০১৩)
ফাঁসীর আশীর্বাদ (২০১৩)
ভগৎ সিং-এর জবানবন্দি (২০১৩)
কবিতা প্রবন্ধ ও চিঠি– চে (২০১৩)
মোহিনী মিল ও শ্রমিক আন্দোলন (২০১৩)
কমরেড রতন সেন রচনা সংগ্রহ (২০১৩)
বিপ্লবী নেলসন ম্যান্ডেলা (২০১৩)
জাতীয় সম্পদ ও অন্যান্য (২০১৩)
নেতা থেকে নেতাজি (২০১৩)
ছোটদের বিনয় বসু (২০১৩)
শত নারী বিপ্লবী (২০১৪)
সূর্য সেনের সংলাপ (২০১৪)

মঙ্গল পাণ্ডে



পলাশী। একটি মাঠের নাম। মস্ত বড় সে মাঠ। আঁকাবাঁকা গঙ্গার তীরে অবস্থিত। এই মাঠের তিন দিক জুড়ে দেড় হাজার বিঘা জমির উপর রয়েছে এক বিশাল আমবাগান। এর পূর্ব নাম ছিল লক্ষবাগ। ওইখানে একসময় লক্ষ লক্ষ আমগাছ ছিল। সেই কারণে কালক্রমে এর নাম হয়ে দাঁড়ায় আম্রকানন। অর্থাৎ পলাশীর আম্রকানন। যেখানে বসে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আবহমান বাংলার স্বাধীনতাকে কেড়ে নেয়া হয়েছিল ১৭৫৭ সালে।

শুরু হল ইংরেজ শাসন। শাসন না বলে, বলা উচিত– শোষণ, ত্রাস, নিপীড়ন ও নির্যাতন। চলতে থাকে বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ। এভাবে পুরো দুই শতাব্দী।

বাংলার মানুষকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে শোষণ করার জন্য ইংরেজরা নানাধরনের পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে থাকে। এজন্য ইংরেজরা প্রথমে তাদের একটি দালাল গোষ্ঠী তৈরি করে নেয়। এরা ছিল বেশির ভাগই সুবিধাবাদী। দালালদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দিয়ে গোটা ভারতবাসীকে শাসন-শোষণ করার ভিত্তি পাকাপোক্ত করে নেয় ইংরেজ। তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বপন করে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ভেঙ্গে দেয়। ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে, কেরানী বানানোর জন্য শিক্ষানীতিসহ বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়ন করতে থাকে।

বাংলার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য ইংরেজ তার স্বার্থের অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করে। যে কারণে এক পর্যায়ে কৃষকরা ধান, পাট ও সবজির পরিবর্তে নীলচাষ করতে বাধ্য হয়। কোনো কৃষক নীলচাষ করতে অবাধ্য হলে তার স্ত্রী-কন্যাকে ধরে নিয়ে নিপীড়ন, নির্যাতন ও ধর্ষণ করে মৃত্যু মুখে ছেড়ে দিত। আর যার স্ত্রী-কন্যা থাকতো না, তাকে অথবা তার ছেলেকে ধরে হাতের আঙ্গুল কেঁটে দিত। এ রকম শত শত পাশবিক, লোমহর্ষক, নৃশংস, জঘন্য কর্মকাণ্ড ইংরেজরা নিরীহ বাঙালির উপর চালিয়েছে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন, রাষ্ট্রভাষা ফারসির বদলে ইংরেজি চালু, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, আন্দামান দ্বীপে লর্ড মেয়োকে হত্যার পর মুসলমান উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পদচ্যুতি, নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে মুসলমানদের সামরিক বাহিনীর চাকুরিতে ঢোকার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ আরোপ এবং ভূমি ও রাজস্ব খাতে, বিচার ব্যবস্থায়, আইন পেশায় ও সেনাবাহিনীতে বৈধ আয়ের সুযোগ হারিয়ে একদা বিত্তবান এই মুসলিম সম্প্রদায় রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে যায়। শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ই নয়, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কিছু পদক্ষেপের কারণে বাংলার স্বনির্ভর পল্লী সমাজের কাঠামোতেও ভাঙ্গন শুরু হয়।

বাঙালিরা যে বিগত একশ বছরে কোনো প্রতিবাদ করেনি, বিষয়টি এমন নয়। অসংখ্য করেছে। তার মধ্যে সন্ন্যাস বিদ্রোহ, পিণ্ডারী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। তবে এ সমস্ত বিদ্রোহের প্রতিবাদ প্রতিরোধ ছিল অসংগঠিত, গণভিত্তি সম্পন্ন নয়। কিন্তু তাই বলে এর প্রভাব ও গুরুত্ব কম তা নয়, বরং এর ধারাবাহিকতায় এসেছে সিপাহী বিদ্রোহ।

দিনটি ছিল ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ। রোববার অপরাহ্ন। দু'জন ভারতীয় সৈনিকের মধ্যে ফিসফিস করে কথা হচ্ছে–

সর্বনাশের আর দেরী নেই, সৈন্যভর্তি অনেকগুলো যুদ্ধ জাহাজ কলকাতা বন্দরে এসে পৌঁছে। তারা সব এখানে এসে আমাদের স্থান অধিকার করে নিবে।

কে বললো এই কথা?

সকলে জানে, আর তুমি জান না? আমরা সময় থাকতে যদি কিছু না করি, তাহলে আমাদের দুর্দশার আর সীমা থাকবে না।

তাহলে?

এই তো সুযোগ! আজ রোববার। শেতাঙ্গ অফিসাররা বিশ্রাম নিচ্ছে..

মুখে মুখে এই সংবাদ ছড়িয়ে গেল সৈনিকদের মাঝে। কিন্তু কে দেখাবে পথ?

এগিয়ে এলো এক অগ্নিতরুণ। নাম তার মঙ্গল পাণ্ডে।

ব্যারাকপুরের প্যারেড ময়দানে অসময়ে মানুষদের ভিড় বাড়ছে। ৩৪ নম্বর ইনফ্যানট্রির সিপাহীরা আজ দলে দলে জটলা বাধছে। চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে চার দিকে। সিপাহীদের মধ্যে কেউ এসেছে খালি হাতে, কেউ এসেছে বন্দুক নিয়ে। সৈনিকদের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে। আজ রচিত হবে এক মহান ইতিহাস। মঙ্গল পাণ্ডে সমস্ত সৈনিকদের প্যারেড গ্রাউন্ডে ডেকে বলেন, 'উঠ! ভারতবাসী জাগো! হিসেব নিকেশের দিন এলো। একশ বছরের নির্যাতনে জর্জরিত মুমূর্ষু মা মুক্তির বেদনায় কাঁদছে।'

প্যারেড লাইন থেকে পঞ্চাশ কিংবা ষাট হাত দূরে মঙ্গল পাণ্ডে। বন্দুক কাঁধে নিয়ে টহল দিচ্ছেন। সবাই তার দিকে তাকিয়ে কানাকানি করছে। লোকটা কি পাগল হল! কিসের জন্যে তার পাগলামি? সে আজ কি করতে যাচ্ছে। এর ফলাফল বা পরিণাম কি হবে, তা জানে না। সবাই শুধু গভীর আগ্রহে তার দিকে তাকাচ্ছে। ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ। ধীর-স্থির প্রকৃতির। নিজের স্বভাবের গুণে সকলের কাছে দারুণ জনপ্রিয় পাণ্ডেকে কে না চেনে? সেই প্রতিদিনের পরিচিত মঙ্গল পাণ্ডে কি আজ এক নতুন মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছেন। এ যেন পাণ্ডের এক নতুন ছবি। কে জানে, তাকে কোন দেবতা ভর করেছে। উদ্ধত চিবুক আকাশের দিক তুলে, গুলিভরা বন্দুক হাতে সামনে পিছনে পায়চারি করছে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার। কি অদ্ভুত এই উন্মাদনা! কি এর নাম! মূর্খ সেপাই কি তা জানে! এর নাম দেশপ্রেম। মাতৃভূমি রক্ষার উন্মাদনা।

'বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো ভাইসব। ফিরিঙ্গির পায়ের তলায় আর কতদিন পড়ে থাকবে! ওরা আমাদের সোনার দেশ লুটেপুটে খাচ্ছে, আর আমরা না খেয়ে মরছি। ওরা আমাদের ধর্মের উপর হাত দিয়েছে, আমাদের জাতিভ্রষ্ট করছে। ভাইসব ফিরিঙ্গিদের মারো, একটা একটা করে সব ব্যাটাকে মারো; ফিরিঙ্গিদের খতম করে দেশকে স্বাধীন কর।'

'কাপুরুষ! ভীরু মেষশাবক! দাঁড়িয়ে দেখছ কি? এখনো দাঁড়িয়ে আছো নির্বাক অচল কাঠের পুতুলের মত? লজ্জা কি নেই তোমাদের, ভুলে গেছো কি রানী ঝিন্দনের নির্বাসন? পাঞ্জাবের

দাসত্ব? শ্রীমন্তের প্রতি নানা সাহেবের অবিচার? ভেলোরের রক্তপাত? রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের অশ্রুমোচন? অযোধ্যার অপমান? প্রতাপের রক্ত! শিবাজীর রক্ত! ভোলেনি ভারত– ভোলেনি সে কথা। ওঠো, জাগো! জাগো হে বীর! ঋণ শোধের দিন আজ, সঙ্গীন উঁচিয়ে ব্যারাকপুর সেনানিবাসের সামনে পায়চারিরত অবস্থায় ভারতীয় সিপাহীদের উদ্দেশ্য করে এ কথাগুলো বলছেন মঙ্গল পাণ্ডে।'

এসো ইংরেজ! ক্ষমতা থাকে তো সামনে এসো। অস্থির পদে মঙ্গল পাণ্ডে সেনানিবাসের সামনে ঘুরে বেড়ায়। বাকী সব সৈন্যরা স্তম্ভিত। অদূরে দেখা গেল একজন ইংরেজ অফিসার। মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক গর্জে উঠলো.. গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পালিয়ে গেল অফিসার। একজন ইংরেজ দালাল হাবিলদার ছুটে গেল এ্যাডজুনেন্ট সাহেব লে. বর্গে'র কাছে সংবাদ দিতেঃ সর্বনাশ হয়েছে স্যার। শীঘ্র চলুন, মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

পাণ্ডেকে শায়েস্তা করার জন্য মুহূর্তের মধ্যে যোদ্ধাবেশে অশ্বারোহণে লে. বর্গে সেনানিবাসে এসে উপস্থিত হল। কোথায়? কোথায় সে বিদ্রোহী সেপাই পাণ্ডে?

কিন্তু পাণ্ডে স্থির ও অবিচল। বন্দুকের নল লেফটেন্যান্টের দিকে সোজা তাক করে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে পাণ্ডে। লেফটেন্যান্টের ঘোড়াটি সরাসরি পাণ্ডের গায়ের উপর চড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার লাগামা এগুচ্ছে।

মঙ্গল পাণ্ডের বন্দুক আবারো গর্জে উঠলো, পাণ্ডে গুলি চালালো।

ঘোড়াটি মাঠে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু ওই গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। লেফটেন্যান্ট বর্গে সঙ্গে রাখা তলোয়ার বের করে পাণ্ডের দিকে এগিয়ে আসলো। পাণ্ডেও একটু এগিয়ে গিয়ে তলোয়ার দিয়ে লেফটেন্যান্ট বর্গেকে আঘাত করতে লাগলো। অবশেষে লেফটেন্যান্ট বর্গে পাণ্ডের তলোয়ারে কাটা পড়ে।

লেফটেন্যান্টের পরে পাণ্ডেকে শায়েস্তা করার জন্য এসেছিল সার্জেন্ট। সার্জেন্টও পাণ্ডের তলোয়ারের কাছে ধরাশায়ী হল। তারপর আসল পল্টু। সে ইংরেজদের দালাল সৈন্য। সে মঙ্গল পাণ্ডেকে পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। নিজেকে মুক্ত করল পাণ্ডে। একপর্যায়ে পল্টুও রক্ষা পেলনা পাণ্ডের ধারালো তরবারির কাছে। সবাই উত্তেজিত। সিপাহীদের মনে উল্লাস ধ্বনি বেজে উঠে।

মঙ্গল পাণ্ডের জন্ম ১৮২৭ সালের ১৯ জুলাই। উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলায় নাগওয়া গ্রামে। অনেকের মতে তার জন্ম হয়েছিল ফৈজাবাদ জেলার সুরহুর গ্রামে। একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে। দিবাকর পাণ্ডের ঘরে। পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পড়াশুনা শেষ করে মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৮৪৯ সালে তিনি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিতে সেপাই পদে চাকুরি নেন।

ভারতীয় সিপাহীরা যখন কর্মরত থাকতো, তখন কোনো ইংরেজ সিপাহী বা অফিসার দেখলেই অস্ত্র উত্তোলন করে সম্মান দেখানোর রীতি ছিল। কিন্তু ভারতীয় সিপাহী বা অফিসারকে ইংরেজ সিপাহীরা সম্মান দেখাতো না, বরং বিমাতাসুলভ আচরণ করতো। ভারতীয় সিপাহীরা যদি কোনো স্থানে কোনো কারণে মারা যেত, তাহলে ওই পরিবারের কোনো খোঁজ-খবর ইংরেজ বাহাদুররা নিতেন না। অবশেষে ওই পরিবারটি নিঃস্ব হয়ে যেত। আর ইংরেজ সিপাহীদের ক্ষেত্রে ছিল অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধা।

অন্যদিকে ভারতীয় সিপাহীদের বেতন মোটেও পর্যাপ্ত ছিল না। পদাতিক বাহিনীর একজন সিপাহী মাসে বেতন পেতো ৭ রুপি। দাবি করা হয়, মাইনে কম হলেও তারা সচ্ছল ছিল। কারণ, তাদের প্রয়োজন ছিল অল্প, জীবনযাত্রার মানও ছিল অনুন্নত। একজন অবসরপ্রাপ্ত

অফিসারের মতে, ভারতের মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩,১৫,৫২০ জন। এদের পেছনে খরচ হত ৯৮,০২,৮৩৪ পাউন্ড। এর মধ্যে ৫১,৩১৫ জন ইউরোপীয় সৈন্য এবং অফিসারের পছনে খরচ হতো ৫৬,৬৮,১১০ পাউন্ড। ইউরোপীয় সৈন্যদের তেমন কোন কাজ করতে হতো না। তাদের থাকা, খাওয়া, মাইনে তোলা সম্পর্কে দেশীয় সিপাহীরা কিছুই জানতো না। এই বৈষম্য ও বৈপরীত্য সিপাহীদের মনে কতটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

ইংরেজ ১৮৫৩ সালে তৈরি করেছিল ৫৫৭ ক্যালিবার এনফিল্ড (পি/৫৩) রাইফেল। এই রাইফেল ভারতীয় সিপাহীদের হাতে তুলে দেয় ব্রিটিশ সরকার। রাইফেলগুলোর কার্তুজ গরু ও শুকরের চর্বি দিয়ে তৈরি হতো। সৈন্যরা তাদের রাইফেলের কার্তুজ লোড করার সময় তা দাঁত দিয়ে খুলে লাগাতে হতো। গরু ও শুকরের চর্বি মুখে দেয়া হিন্দু-মুসলিম সৈন্যদের জন্য অধার্মিক ও গর্হিত কাজ। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সিপাহীরা (ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য) নতুন কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল। ভারতীয় সৈন্যদের চাপের মুখে নতুন কার্তুজ প্রতিস্থাপন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ব্রিটিশ। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি না রেখে ব্রিটিশ ৫৫৭ ক্যালিবার এনফিল্ড (পি/৫৩) রাইফেল ব্যাবহারে বাধ্য করে।

এই আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেয়ার জন্য ব্রিটিশ শোষকগোষ্ঠীকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। সম্মুখীন হতে হয়েছিল সিপাহী বিপ্লবের। আর এই বিপ্লবের শুরুটা করেছিল মঙ্গল পাণ্ডে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগ্রামের সূচনা ইতিহাসের নক্ষত্র হল মঙ্গল পাণ্ডে।

ব্যারাকপুর। কলকাতার একটি অঞ্চল। ব্যারাকপুরের পঞ্চম ব্যাটিলয়নের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্য ছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে। ১৮৫৭ সাল। ইংরেজকে সরাসরি প্রতিরোধের বছর। যাকে আমরা বলি সিপাহী বিদ্রোহ বা যুদ্ধ অথবা বিপ্লব। বামপন্থীরা একে সিপাহী বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেন। কেউ কেউ মহাবিদ্রোহ বলে থাকেন। যা-ই হোক মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭-কে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ হিসেবে গণ্য করা হয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা একে সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন। ইংরেজ সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ভারতীয় সিপাহীরা ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে মূল ভূমিকা পালন করেন। ইংরেজ সরকার এই বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করলেও এর মাধ্যমে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। কত লাঞ্ছনা! কত অত্যাচার! কত অশ্রুমোচন! কত নির্যাতন! দীর্ঘ একশত বছর পর অনন্তকাল সমুদ্রের বুকে একটা সাইক্লোন! এটাকে আবেগের সাথে পলাশীর প্রতিশোধও বলে থাকেন অনেকে। কিছু দিনের জন্য হলেও মাকে শান্ত করে দিল এই সাইক্লোন। মায়ের সন্তানরা সজীব হয়ে উঠল। ফিরে পেল আস্থা-দৃঢ়তা ও মনোবল। সাহসী উদ্যমে নেমে পড়লো দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য। Your English tyrants are few in number, murder them! ধ্বংস কর অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গদের। বজ্রগর্ভ এই সঙ্কেত পৌঁছে গেল জনে জনে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে। এমন করে ভারতের সর্বত্র।

পাণ্ডের তলোয়ারের কাছে ধরাশয়ী হওয়ার পর শেষ বিকেলে বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে সেনাপতি হিয়ার্সে চলে আসল সেনা ক্যাম্পে। ততক্ষণে মঙ্গল পাণ্ডে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারপরও তিনি ব্রিটিশদের হাতে মরবেন না বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হঠাৎ পাণ্ডের পিস্তল গর্জে ওঠে। অভিমানী সৈনিক! আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে। নিজের মাথায় ঠেকিয়ে দেয় পিস্তল। গুলি ফসকে গেল। ধোঁয়া, বারুদ ও অগ্নিশিখার মধ্যে আহত রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়লো। ধরে ফেলল পাণ্ডেকে। তার চিকিৎসা করল ব্রিটিশ। উদ্দেশ্য সুস্থ করে নির্মম শাস্তি দেয়া।

৬ এপ্রিল সেপাই মঙ্গল পাণ্ডের বিচার। বিচারের নামে প্রহসন মাত্র। দণ্ডাদেশ ফাঁসি। মঙ্গল পাণ্ডে তখনো অসুস্থ। হাসপালে শুয়ে আছে। ক্ষত স্থানগুলো ফুলে ওঠেছে। বাঁচার আশা নেই বললেই চলে।

৮ এপ্রিল সকাল বেলা। অসুস্থ মুমূর্ষু সৈনিক মঙ্গল পাণ্ডেকে বারাকপুরে সমস্ত সৈনিকদের সামনে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দণ্ডাদেশ কার্যকর করে ইংরেজ। ওই দিন ঈশ্বর পাণ্ডেকেও ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। কারণ তিনি মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেফতার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

'১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ছিল, বিদেশি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াবারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস। ভারতীয় জনগণের ক্ষোভ দমকা হাওয়ার মতো বয়ে যায় দেশের উপর দিয়ে। কোন বিদ্রোহের প্রতি সাধারণভাবে সার্বজনীন সমর্থন থাকে না। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ লোকের সহানুভূতি ছিল বলেই কমিউনিস্ট দার্শনিক কার্ল মার্কস একে ভারতের প্রথম 'স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন।'

মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে যে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয় খুব শীঘ্রই তা মিরাট, দিল্লি এবং ভারতের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি এটা সারা বাংলাদেশ জুড়ে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকার প্রতিরোধ এবং সিলেট, যশোর, রংপুর, পাবনা ও দিনাজপুরের খণ্ডযুদ্ধসমূহ তার প্রমাণ বহন করে। ১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রামের পদাতিক বাহিনী প্রকাশ্য বিদ্রোহে মেতে ওঠে এবং জেলখানা থেকে সকল বন্দীদের মুক্তি দেয়। তারা অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ দখল করে নেয়। কোষাগার লুণ্ঠন করে এবং অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই বিদ্রোহ ত্রিপুরা পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

১৮৫৭ সালের ১১ মে মিরাট থেকে তিনশ' বিদ্রোহী-সিপাহী দিল্লি এসে ৪৯ জন ব্রিটিশ নারী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করে এবং দিল্লির দখল হাতে নিয়ে বাহাদুর শাহ জাফরকে মুঘল সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করে। সম্রাটকে তারা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ জানায়। অবস্থার চাপে পড়ে তিনি রাজি হলেও কর্তৃত্ব থেকে গিয়েছিল সিপাহিদের হাতে। যদিও সকল আদেশ-নির্দেশ তার নামে, তার সিলমোহরসহ বেরিয়েছিল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ১৮৫৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ইংরেজরা দিল্লি পুনর্দখল করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা ভারতীয় সমাজে যে জুলুম-নিপীড়ন চালায় তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ছিল এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহ।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. বিদ্রোহী ভারত– নীহাররঞ্জন গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৯১।

২. মহাবিদ্রোহের কাহিনী– সত্যেন সেন, মুক্তধারা প্রকাশনী, প্রকাশকাল ২০০২, অষ্টম সংস্করণ।

৩. ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস– সুপ্রকাশ রায়, ডিএনবিএ ব্রাদার্স, কলকাতা, প্রকাশকাল ১৯৮০, দ্বিতীয় সংস্করণ।

৪. www.biplobiderkotha.com

ক্ষুদিরাম বসু



'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি/হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী/কলের বোমা তৈরি করে/দাঁড়িয়ে ছিলেম রাস্তার ধারে মাগো/বড়লাটকে মারতে গিয়ে/মারলাম আরেক ইংল্যান্ডবাসী।/শনিবার বেলা দশটার পরে/জজকোর্টেতে লোক না ধরে মাগো/হল অভিরামের দ্বীপ চালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি/দশ মাস দশদিন পরে/জন্মনেব মাসির ঘরে মাগো/তখন যদি না চিনতে পারিস দেখবি গলায় ফাঁসি'।

এই গানের মধ্যে দেশমাতাকে ছেড়ে যাওয়ার যে আবেগ অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এবং যার কথা উঠে এসেছে সে এ উপমহাদেশেরই সূর্য সন্তান– ক্ষুদিরাম। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী যাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, যে ফাঁসির মঞ্চে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন, সে আর কেউ নয়, বাংলার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। ক্ষুদিরামের ফাঁসি কার্যকর হয় ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট। সময়ের ঘড়িতে তখন ভোর ৪টা। সে সময় ক্ষুদিরামের পক্ষের আইনজীবি ছিলেন শ্রী উপেন্দ্রনাথ সেন। তার ভাষ্যমতে, 'ফাঁসির মঞ্চে ক্ষুদিরাম নির্ভিকভাবে উঠে যান। তার মধ্যে কোন ভয় বা অনুশোচনা কাজ করছিল না। এদেশের নবীন যৌবনের প্রতীক হয়ে হাসিমুখে তিনি উঠে যান ফাঁসির মঞ্চে।' যে গানটি আজও বিভিন্ন গণআন্দোলনের অনুপ্রেরণা যোগায়, বিপ্লবী ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবি চেতনার আয়নায় চিত্রায়ণ করে, সেটি রচনা করেছিলেন বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাস। যে বিপ্লবীর আত্মত্যাগের উপাখ্যানকে কেন্দ্র করে এই গান তার নাম ক্ষুদিরাম বসু। সরল লৌকিক ঝুমুর বাউল সুরে গানটি সারা বাংলায় জনগণের অন্তরে গেঁথে রয়েছে।

ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। দুটি নাম। দুজন বিপ্লবীর নাম। নাম দুটি শুনলেই চেতনার আয়নায় ভেসে ওঠে একটি ফাঁসির দৃশ্য ও একটি রিভলবার দিয়ে মাথায় গুলি ছোড়ার দৃশ্য ও শব্দ। কিছুক্ষণের জন্য হলেও চেতনা অসাড় হয়ে যায়। সমস্ত শরীর-মন শিহরণে কেঁপে উঠে। এ এক অদ্ভুত ক্ষোভ আর গর্বের অনুভূতি। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা সব ভুলে যাই। ফিরে চলি সাম্রাজ্যবাদী চেতনায়। তখন আমাদের সামনে দেশপ্রেমের চেয়ে নিজস্বার্থ বড় হয়ে দাঁড়ায়। কোনো ত্যাগ নয়, ভোগই মূল দর্শন। যার কারণে আজকে কাউকে বিপ্লবী বললে সন্দেহ চলে আসে। এবং যারা সন্দেহ করে তারাও এই বৃত্তের বাইরে আসতে সক্ষম হয় নি। আপনি আমি সকলে একই।

প্রফুল্ল চাকী ক্ষুদিরামের তিন মাস দশ দিন পূর্বে নিজের রিভলবারের গুলিতে মোকামঘাট রেলস্টেশনে জীবন বিসর্জন দেন। ব্রিটিশ বুনো জানোয়ারের হাতে মরবে না বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১৯০৮ সালে কানাইলাল, সত্যেন বসু, গোপাল সেনসহ আরো অনেক বিপ্লবীকে ইংরেজের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছিল।

ক্ষুদিরামের বাবা ত্রৈলক্যনাথ। মা লক্ষ্মী দেবী। অপরূপা, সরোজিনী, ননীবালা তিন বোনের নাম। ক্ষুদিরামের জন্মের পূর্বে দুই ভাই মারা যায়। ছেলে সন্তান না বাঁচার কারণে লক্ষ্মী দেবী ক্ষুদিরামের জন্মের পর তাকে তিন মুঠো চালের ক্ষুদের বদলে দিদির কাছে বিক্রি দেন। বাবা মারা যায় ক্ষুদিরামের বয়স যখন সাত বছর। মা মারা যান তার ছয় মাস পরে। দূর সম্পর্কের এক দাদা ও বৌদির কাছে কতটুকু আর স্নেহ-ভালবাসা পাওয়া যায়। শুধু কাজ আর অত্যাচার। অশান্তিতে ভরা মন। সঙ্গী হল দুঃখ আর একাকীত্ব। তবু পেটের দায় ৮/৯ বছরের ছেলেকে সবই সইতে হতো। এ সকল কারণে পড়াশোনায় তার মন আর বসলো না। কিন্তু ফাঁক পেলেই খেলাধুলা, ব্যায়াম, এ্যাডভেঞ্চার জাতীয় কাজে প্রচুর আকর্ষণ ছিল তার।

দাদা-বৌদির দিনের পর দিন অমানবিক আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন ক্ষুদিরাম। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন একদিন। বোনের বাসায় যাবেন কিনা ভাবতে ভাবতে মেদিনীপুরে এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে ভগ্নীপতির বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ওই বাড়িতে থেকে মেদিনীপুর হ্যামিলটন স্কুলে ক্লাস ফোরে ভর্তি হলেন। তারপর ভর্তি হন কলেজিয়েট স্কুলে। এই স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।

ক্লাস ফাঁকি দেয়া ও পড়াশোনা না পারার জন্য তাকে স্কুলের মাস্টার মহাশয় সকল প্রকারের শাস্তি দিতেন। তার উপর বখাটেদের ওস্তাদ বলেও গালি দিতে বাদ দিতেন না কখনো। ক্ষুদিরাম তার মতো বাউণ্ডুলে স্বভাব ছেলেদের নিয়ে ভূত ধরা এবং তাড়ানোর দল গড়লেন। তখনকার দিনের কুসংস্কার তাকে মোটেও স্পর্শ করতে পারেনি। তাই সমাজের মানুষের মধ্য থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য এই প্রচেষ্টা। এজন্যও তাকে অনেকের বকাবকি খেতে হয়েছে। এক পর্যয়ে স্কুলটা ছেড়ে দিলেন। মেধাবী ও দুরন্ত এবং কিছুটা বাউণ্ডুলে স্বভাবের কিশোর ক্ষুদিরাম ১৯০৩ সালে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে পড়াশুনা বন্ধ করে দেন। এ সময় তিনি ঝুঁকে পড়েন দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সংকল্প গ্রহণ করেন।

স্কুলের অদূরে ভবানী মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে সময় কাটাতেন। সেখানে সাক্ষাৎ হল সত্যেন বসুর সাথে। ১৯০৩ সালে ক্ষুদিরাম তার কাছে গুপ্ত সমিতির (সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠন) মন্ত্র শিষ্য হিসেবে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এতোদিন পর ক্ষুদিরাম মুক্তভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারলেন। মনের ইচ্ছা মতো পড়াশোনা, খেলাধুলাসহ নানা কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকতেন। বিপ্লবীদের আদর-স্নেহ-ভালবাসায় সিক্ত করলেন নিজেকে। রাজনৈতিক পড়াশোনা ক্রমান্বয়ে বাড়াতে থাকলেন। শপথ গ্রহণ করলেন দেশমাতৃকাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করার।

১৯০৫ সালের অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন চলার সময় বরিশালের টাউন হলে অশ্বিনী কুমার বক্তব্য দেন। বক্তব্যে তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে জোরদার করা প্রসঙ্গে তার উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমরা যে সব বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি, যদি কেউ

তা যাত্রাপালা আকারে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে, তাহলে তা আমাদের এরূপ সভা বা বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হবে'।

অশ্বিনী কুমার দত্তের এই বক্তব্য মুকুন্দদাস খুবই গুরুত্বসহকারে নিলেন। মাত্র ৩ মাসের মধ্যে রচনা করলেন অসাধারণ যাত্রাপালা 'মাতৃপুঁজা'। মাতৃপুঁজার মূল বিষয় ছিল দেশপ্রেম। দেশমাতৃকাকে একত্রীকরণের লক্ষ্যে তার সন্তানরা প্রয়োজনে জীবন দিয়ে ভারতমাতাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করবে। পুলিন দাস, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মুকুন্দদাস দারুণ দেশপ্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টি করলেন তরুণ সমাজের মধ্যে।

'বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে জন্ম নেয় স্বদেশি আন্দোলন। যে আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ছাত্ররা। বিশেষ করে স্কুলের কিশোরেরা। আর এই দুই আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয় অহিংস সংগ্রাম যেমন পরিচালিত হয়, তেমনি সহিংস কর্মকাণ্ডভিত্তিক গোপন সংগঠনেরও জন্ম হতে থাকে।

বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন ক্ষুদিরাম বসু। এখানে তার শারীরিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা শুরু হয়। এখানে পিস্তল চালনার শিক্ষাও গ্রহণ করেন। গুপ্ত সংগঠনের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ক্ষুদিরাম ইংল্যান্ডে উৎপাদিত কাপড় জ্বালিয়ে দেন এবং ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত লবণ বোঝাই নৌকা ডুবিয়ে দেন। এসব কর্মকাণ্ডে তার সততা, নিষ্ঠা, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে ধীরে ধীরে গুপ্ত সংগঠনের ভেতরে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়'– রতন সিদ্দিকী।

১৯০৬ সালে কথা প্রসঙ্গে সত্যেন বসু বললেন, হঠাৎ দেশটা বেশি রকম কালীভক্ত হয়ে উঠছে। তার কথার জবাবে ক্ষুদিরাম বলে উঠলেন, আর যাই হোক কালীর কৃপায় পাঠা খেতে মিলে আর সেই পাঠার লোভে ভক্তও জোটে। সত্যিকার অর্থে এমন সময়টাই তখন চলছিল। দেশপ্রেমের একটা ছোট বই ছাপা হয়েছে, এগুলো বিক্রির জন্য তরুণদের উপর দায়িত্ব পড়ল। ক্ষুদিরাম তাদের মধ্যে অন্যতম।

মেদিনীপুর মারাঠা কেল্লায় প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম বই হাতে বলছেন- আসুন পড়ুন। দেশের দুর্দশার খবর জানুন। অত্যাচারী রাজশক্তির নির্মমতার নজির– এই বই আপনাদের জন্য।

'ভারতের ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। বৃটিশদের শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার অদম্য মানসিকতা সেদিনের ছাত্র সমাজকে আপোসহীন বিপ্লবী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বহু যুবক বিপ্লবী দলগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এমনকি আমরা দেখেছি শিক্ষকদের প্রেরণাতেও বহু মেধাবী ছাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষক-ছাত্রের এক অনুকরণীয় সম্পর্ক গড়ে দিয়েছিল সে সময়। ক্ষুদিরামেরা সেই অগ্নিগর্ভ সময়েরই সৃষ্টি। সে সময়ে তারুণ্যের প্রাবল্য আঘাত হানে অত্যাচারী শাসকের দুর্গে। 'বোকা' ক্ষুদিরামরাই নতুন পথ দেখান'– নির্মল সেন।

হঠাৎ 'এ্যাই কেয়া করত্যা হ্যায়। চুপ বই।' একজন হাবিলদার ক্ষুদিরামের হাত চেপে ধরল। শক্তি ও বয়সে তার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও ক্ষুদিরামের কাছে-কুছ পরোয়া নেহি। হাবিলদারের মুখের মধ্যে এক বকসিং মেরে দিলেন সমস্ত শক্তি দিয়ে। তৎক্ষনাৎ নাক ফেঁটে রক্ত বেরুলো। সত্যেন বসু ঠিক ওই সময় এসে হাজির হলেন। দেখলেন বিষয়টি। সান্তনা দিলেন হাবিলদারকে। ক্ষুদিরাম মুহূর্তের মধ্যে হাওয়া। কয়েকদিন আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করে রইলেন। তাতে কি আর একজন দেশপ্রেমিক শান্তি পায়? দেশ জোড়া

বিপ্লবের ঢেউ। হাজার হাজার ছেলে মেয়ে জড়িয়ে আছে দেশমাতৃকার কাজে। পুলিশে ধরার ভয়ে আর কত দিন পালিয়ে থাকা যায়। মনস্থির করলেন পুলিশের কাছে ধরা দেবেন। তাই আলীগঞ্জের তাঁতশালায় চলে এসে ধরা দিলেন। পুলিশ মারা ও নিষিদ্ধ বই বিলির অপরাধে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হল। এই প্রথম বাংলাসহ সারা ভারতবর্ষ ক্ষুদিরামকে চিনলো। ১৩ এপ্রিল ক্ষুদিরাম মুক্তি পেল। খানিকটা শান্তি পেলেন সত্যেন বসু। ক্ষুদিরাম এবার গুপ্ত সমিতির কাজে আরো উঠে পড়ে লাগলেন।

ইতোমধ্যে বিলেতি পণ্য বর্জনের পালা শুরু হল। বিলেতি পণ্য নৌকায় দেখলে ক্ষুদিরামসহ বাংলার অসংখ্য ক্ষুদিরাম বাহিনী তা ডুবিয়ে দিত। ১৯০৭ সালের শেষের দিকে ক্ষুদিরাম তার দিদির সাথে কালী পুঁজা দেখতে যান। কালী পুঁজার সময় একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ডাকহরকরাকে ছুরি মেরে গুপ্ত সমিতির জন্য টাকা সংগ্রহ করে আনেন।

সারাদেশে শুরু হল ব্রিটিশ শাসক আর সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের সংঘর্ষ। ধরপাকড় আর নির্যাতন। বিপ্লবীরাও সুযোগ বুঝে গুম করে দেয় ব্রিটিশ শকুনদের। ব্রিটিশ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিল। এক্ষেত্রে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর যথেষ্ট উস্কানি ছিল। তিনি ছিলেন হিন্দু বিদ্বেষী।

স্বাধীনতাকামী বিপ্লববাদী দলগুলোকো দমন করার জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে উঠে। একের পর এক বিপ্লবীকে ধরে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা রুজু করে শারীরিক নির্যাতন, আন্দামান, আলিপুরসহ বিভিন্ন জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে পাঠানো শুরু করলো। ব্রিটিশ বিচারক ছিলেন কিংসফোর্ট। এক নিষ্ঠুর বিচারক। ১৩ বছরের ছেলে সুশীল সেন। পুলিশ সার্জেন্টকে ঘুসি মেরে নাক ফাঁটিয়ে দেয়। সুশীল সেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হল। কিংসফোর্ট বিচারক। বিচারে ১৫টি বেত্রাঘাত মারার হুকুম দিল। রক্তাক্ত হল সুশীল সেন। দুঃসহ যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। সকল তরুণ বিপ্লবী এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজকে বিতাড়িত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো। বিপ্লববাদী দলের সুবোধ মল্লিক, হেমচন্দ্র, চারুদত্ত, বারীন ঘোষ ও অরবিন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন কিংসফোর্টকে হত্যা করার। মিটিংয়ে প্রশ্ন উঠলো একাজের দায়িত্ব কাকে দেব? আড়াল থেকে মিটিংয়ের কথা শুনে প্রফুল্ল চাকী বললেন, আমি প্রস্তুত। বলুন কি করতে হবে আমাকে। কিন্তু সবাই ভাবলেন একাজের জন্য আরো একজন দরকার। ভেবেচিন্তে ক্ষুদিরাম বসুর নাম ঠিক হল।

ক্ষুদিরামের অভিভাবক সত্যেন বসুর কাছে চিঠি লিখে পাঠানো হল। চিঠি অনুযায়ী ১৯০৮ সালের ২৫ এপ্রিল ক্ষুদিরাম কোলকাতায় এসে পৌছালেন। গোপীমোহন দত্তের ১৫ নম্বর বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের তীর্থক্ষেত্র। এখানে বসেই হেমচন্দ্র ও উল্লাসকর শক্তিশালী বোমা তৈরি করলেন। এ বোমা বইয়ের ভাঁজে রাখা যেত। বেশ কৌশলে একটি বই কিংসফোর্টের কাছে পাঠানো হল। কিন্তু কিংসফোর্ট বই না খোলার কারণে সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন। আবার নতুন প্রস্তুতি।

কোলকাতার নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের ৩৮/৫ এর বাড়ি। বারীন ঘোষের মাধ্যমে কিংসফোর্টকে মারার বোমা পৌঁছে গেল প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের কাছে। রিভলবার কেনার জন্য টাকা ও মজফ্ফরপুরে যাওয়ার মানচিত্র দেয়া হল তাদেরকে। দুজন একত্রিত হল রেলস্টেশনে। এর আগে কেউ কাউকে চিনতো না। কথা হল। সিদ্ধান্ত নিল কিংসফোর্টকে হত্যা করার। পাঁচ পাঁচটা দিন চলে গেল। ক্লাব হাউজ থেকে সন্ধ্যার পর সাদা ফিটন গাড়িতে নিয়মিত ফিরে

আসেন কিংসফোর্ট। ৩০ এপ্রিল। ছায়াঘন পিছঢালা পথ দিয়ে সাদা ফিটন গাড়ি আসছিল। গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলো লড়াকু সৈনিকরা। কিন্তু ওই গাড়িতে কিংসফোর্ট ছিল না। ছিল দু'জন বিদেশি। তারা মারা গেল। তাৎক্ষণিক ওই স্থান থেকে চলে গেলেন উভয়ে। কিন্তু এক পর্যায়ে ধরা পড়লো ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। প্রফুল্ল ধরা পড়ার সাথে সাথে নিজের মাথায় রিভলবারের গুলি ছুড়ে মারা যান। প্রায় তিন মাস দশ দিন পর ১১ আগস্ট ১৯০৮ সাল। ক্ষুদিরামের সকল বিষয় জানা ছিল। হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভারতমাতার জয়– একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি..

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যেসব সত্য কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে কিংবদন্তির রূপ নিয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল ভগৎ সিং, সূর্যসেন, বিনয়-বাদল-দিনেশ ও ক্ষুদিরামের কাহিনী। এর মধ্যে ক্ষুদিরামের কাহিনী অধিক মাত্রায় লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তার কারণ সম্ভবত ক্ষুদিরামের বয়স ও দুঃসাহসিকতা।'– রতন সিদ্দিকী।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. বিদ্রোহী ভারত– নীহাররঞ্জন গুপ্ত, প্রকাশকাল ১৩৯১ (বাংলা)।
২. বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী– শহীদ আশরাফ।
৩. ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা– চিন্ময় চৌধুরী, প্রকাশকাল - ১৯৯৮।
৪. www.biplobiderkotha.com

প্রফুল্ল চাকী



প্রফুল্ল চাকী। নামটি বললেই আরকেটি নামের কথা সবার মনে পড়ে। নামটি হল, ক্ষুদিরাম বসু। দু'জন বিপ্লবীর নাম। নাম দু'টি শুনলেই চেতনার আয়নায় ভেসে উঠে একটি ফাঁসির দৃশ্য ও একটি রিভলবার দিয়ে মাথায় গুলি ছোড়ার দৃশ্য ও শব্দ। কিছুক্ষণের জন্য হলেও চেতনা স্তিমিত হয়ে যায়। সমস্ত শরীর-মন শিহরণে কেঁপে উঠে। এ এক অদ্ভুত ক্ষোভ আর গর্বের অনুভূতি। ভারত উপমহাদেশের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সর্বকনিষ্ঠ দুই বিপ্লবী।

১৯০৭ সালের শেষের দিকে সারাদেশে শুরু হল ব্রিটিশ শাসক আর সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের সংঘর্ষ। ধড়পাকড় আর নির্যাতন। বিপ্লবীরাও সুযোগ বুঝে গুম করে দেয় ব্রিটিশ শকুনদের। ব্রিটিশ হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিল। এক্ষেত্রে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর উস্কানি ছিল। তিনি ছিলেন হিন্দু বিদ্বেষী।

স্বাধীনতাকামী বিপ্লববাদী দলগুলোকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী মরিয়া হয়ে উঠে। একের পর এক বিপ্লবীকে ধরে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা রুজু করে শারীরিক নির্যাতন, আন্দামান, আলিপুরসহ বিভিন্ন জেলে যাবতজীবন কারাদণ্ড দিয়ে পাঠানো শুরু করলো। ব্রিটিশ বিচারক ছিলেন কিংসফোর্ট। এক নিষ্ঠুর বিচারক। ১৩ বছরের ছেলে সুশীল সেন। পুলিশ সার্জেন্টকে ঘুসি মেরে নাক ফাঁটিয়ে দেয়। সুশীল সেনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা হল। কিংসফোর্ট বিচারক। বিচারে ১৫টি বেত্রাঘাত মারার হুকুম দিল। রক্তাক্ত হল সুশীল সেন। দুঃসহ যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। খবরটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। সকল তরুণ বিপ্লবী এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজকে বিতাড়িত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলো।

বিপ্লববাদী দলের সুবোধ মল্লিক, হেমচন্দ্র, চারুদত্ত, বারীন ঘোষ ও অরবিন্দ সিদ্ধান্ত নিলেন কিংসফোর্টকে হত্যা করার। মিটিংয়ে প্রশ্ন উঠলো একাজের দায়িত্ব কাকে দেব? আড়াল থেকে মিটিংয়ের কথা শুনে প্রফুল্ল চাকী বললেন, আমি প্রস্তুত। বলুন কি করতে হবে আমাকে। কিন্তু সবাই ভাবলেন একাজের জন্য আরো একজন দরকার। ভেবেচিন্তে ক্ষুদিরাম বসুর নাম ঠিক হল।

ক্ষুদিরামের অবিভাবক সত্যেন বসুর কাছে চিঠি লিখে পাঠানো হল। চিঠি অনুযায়ী ১৯০৮ সালের ২৫ এপ্রিল ক্ষুদিরাম কোলকাতায় এসে পৌঁছালেন। গোপীমোহন দত্তের ১৫ নম্বর বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের তীর্থক্ষেত্র। এখানে বসেই হেমচন্দ্র ও উল্লাসকর শক্তিশালী book bomb তৈরি করলেন। এ বোমা বইয়ের ভাঁজে রাখা যেত। বেশ কৌশলে একটি বই

কিংসফোর্টের কাছে পাঠানো হল। কিন্তু কিংসফোর্ট বই না খোলার কারণে সে যাত্রায় বেঁচে গেলেন।

আবার নতুন প্রস্তুতি। কোলকাতার নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের ৩৮/৫ এর বাড়ি। এ বাড়িতে বসে বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নিল কিংসফোর্টকে হত্যা করার। ১৯০৮ সালে ২৫ এপ্রিল বারীন ঘোষ প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের কাছে বোমা পৌছে দিলেন রেলস্টেশনে। কিংসফোর্টকে মারার জন্য। রিভলবার কেনার জন্য কিছু টাকা ও মজফ্ফরপুরে যাওয়ার মানচিত্র দেয়া হল তাদেরকে। এই প্রথম দুজন একত্রিত হল রেলস্টেশনে। এর আগে কেউ কাউকে চিনতো না। কথা হল। ইস্পাত দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল কিংসফোর্টকে হত্যা করার জন্য। সর্তকতার সাথে চলে যান মোজাফ্ফরপুরে। মজফ্ফরপুরে প্রফুল্ল চাকীর ছদ্মনাম ছিল 'দীনেশচন্দ্র রায়'। প্রতিদিন ক্লাব হাউজ থেকে সন্ধ্যার পর সাদা ফিটন গাড়িতে নিয়মিত ফিরে আসেন কিংসফোর্ট। কিংসফোর্টকে হত্যা করা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় পাঁচ পাঁচটা দিন চলে গেল। কিন্তু কিংসফোর্টকে বাগে পাওয়া গেল না। মজফ্ফরপুরের একটি মন্দিরে টানা ৬ দিন অপেক্ষা করার পর তারা কিংসফোর্ডকে হত্যার সুযোগ পান ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল। মোজাফ্ফরপুরে ইউরোপিয়ান ক্লাবে কিংসফোর্ড প্রতিদিন মদ পান ও আড্ডা দিতে যান। ফেরেন রাত ৮ টায়। এই সুযোগটাকে তারা কাজে লাগাবে বলে স্থির করলেন। ৩০ এপ্রিল। ৬ দিনের দিনের দিন বোমা নিক্ষেপের সুযোগ পাওয়া গেল। ছায়াঘন পিছঢালা পথ দিয়ে সাদা ফিটন গাড়িটি আসতে ছিল। গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করলো লড়াকু সৈনিকরা। কিন্তু ওই গাড়িতে কিংসফোর্ট ছিল না। ছিল দু'জন বিদেশি। তারা মারা গেল। তাৎক্ষণিক ওই স্থান থেকে চলে গেলেন উভয়ে।

এই ঘটনার ১ ঘন্টা পর পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরদর্শন করলেন। সকল রেলস্টেশনে খবর পৌছে গেলো। আততায়ীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা দিল। কিন্তু পুলিশ সমস্ত শহরে আততায়ীকে খুঁজে পেলো না।

ক্ষুদিরাম অনেক সতর্কতার সাথে মোজাফ্ফরপুর থেকে ২৪ মাইল পায়ে হেঁটে ওয়ালি স্টেশনে পৌছান। তখন প্রচণ্ড পানির তৃষ্ণায় খাবার দোকানে তৃষ্ণা মিটাতে যান। পুলিশ সমস্ত শহরে আততায়ীকে ধরার জন্য ওঁত পেতে আছে। সাদা পোশাকের পুলিশ ওই ওয়ালি স্টেশনে ছিল। তারা ক্ষুদিরামকে সন্দেহ করে। ঠিক পানি খাওয়ার সময় ২ জন পুলিশ ক্ষুদিরামের দুই হাত শক্ত করে ধরে। সাথে সাথে আরো ৫/৬ জন পুলিশ ক্ষুদিরামকে ঘিরে ফেলে। ক্ষুদিরামও দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আত্মাহুতি দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। কিন্তু তা সময় ও সুযোগের অভাবে পারেননি। পুলিশ তাকে ধরার পর তৎক্ষণাৎ অস্ত্রমুক্ত করে নেন। ক্ষুদিরাম বোমা হামলার সব দায় নিজের কাঁধে নেন। সহযোগীদের কথা বললেন না। ফলে বোমা হামলা ও দুজনকে হত্যার অপরাধে ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয়।

অন্যদিকে অনেক পথ নানা ভাবে পাড়ি দিয়ে গ্রেফতার এড়ানোর জন্য প্রফুল্ল চাকী আলাদা পথে পালাবার সিদ্ধান্ত নেন। প্রফুল্ল ছদ্মবেশে ট্রেনে করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ট্রেনে নন্দলাল ব্যানার্জী নামে এক পুলিশ দারোগা সমস্তিপুর (মোকামঘাট রেলস্টেশন) রেল স্টেশনের কাছে প্রফুল্লকে দেখে সন্দেহ করেন। ওই পুলিশ দারোগা সন্দেহ করার আচরণ বুঝতে পেরে প্রফুল্ল চাকী পালাবার চেষ্টা করেন। ট্রেন থেকে নেমে দৌড়ে অনেকটা দূর গিয়েছিলেন। কিন্তু নন্দলাল তার পিছু ছাড়লো না, বরং ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার করতে থাকলো। তখন স্টেশনের পাহারত পুলিশ ও জনতাও প্রফুল্ল চাকীকে ধরার জন্য পিছু ছুটতে থাকে। প্রফুল্ল চাকী পুলিশ দারোগা নন্দলালকে তাক করে একটি গুলিও ছুড়েছিল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বাকী গুলি তিনি আর ছুড়লেন না। কারণ তিনি জানতেন, যে করে হোক পুলিশের হাতে ধরা পড়া যাবে না। ধরা পড়ার পর পুলিশের মারের মুখে বিপ্লবীদের অনেক

গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। তাই না পালাতে পারলে বাকীগুলো দিয়ে নিজেকে হত্যা করতে হবে। যার নাম আত্মহত্যা।

দৌড়ানোর এক পর্যায়ে প্রফুল্ল চাকী কোণঠাসা হয়ে পড়েন। পুলিশ প্রায় তার কাছাকাছি চলে গেছেন, হয়তো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধরে ফেলবেন তাকে। এমন সময় পকেটে রাখা রিভলবার বের করে চিবুকের নিচে পর পর ২টি গুলি বর্ষণ করে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আত্মাহুতি দেন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ২ মে বেলা ১২ টায়। ব্রিটিশ বুনো জানোয়ারের হাতে মরবে না বলে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করার প্রায় তিন মাস দশ দিন পর ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ক্ষুদিরামকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনায় পর থেকে মূলত ভারতবাসী জাগতে শুরু করে। আর তখন থেকেই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রাম আরো জঙ্গি রূপ ধারন করে।

প্রফুল্ল চাকীর জন্ম ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর। বগুড়া জেলার বিহার গ্রামে (বর্তমানে যা বাংলাদেশের অন্তর্গত)। তার পিতার নাম রাজ নারাছু চাকী। তিনি বগুড়ার নবাব এ্যাস্টেটে কর্মরত ছিলেন। মাতা স্বর্ণময়ী চাকী। প্রফুল্ল চাকী ৪ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে ছিলেন কনিষ্ঠ সন্তান। পিতা নারাছু চাকী বগুড়ার নবাব এ্যাস্টেটে কর্মরত ছিলেন। মাত্র ২ বছর বয়সে প্রফুল্ল চাকীর পিতা মারা যায়।

প্রফুল্ল চাকীর পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে, মায়ের কাছে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে বগুড়ার নামুজা জ্ঞানদা প্রসাদ ইংরেজি বিদ্যালয়ে তাকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। এই স্কুল থেকে তিনি মাইনর পাশ করেন। তারপর ১৯০২ সাল থেকে প্রায় ১৯০৫ সাল পর্যন্ত রংপুর জেলা স্কুলে পড়াশুনা করেন। এরপর ভর্তি হন রংপুর জাতীয় স্কুলে। রংপুর জাতীয় স্কুলে পড়ার সময় তিনি গুপ্ত সমিতির সভ্য হন।

১৯০৫ সালের 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' আন্দোলনের মাধ্যমে জন্ম নেয় স্বদেশি আন্দোলন। যে আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ছাত্ররা। বিশেষ করে স্কুলের কিশোরেরা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থনে সক্রিয় অহিংস সংগ্রাম যেমন পরিচালিত হয়, তেমনি সহিংস কর্মকাণ্ডভিত্তিক গোপন বিপ্লবী সংগঠনেরও জন্ম হতে থাকে।

১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন প্রফুল্ল চাকী। এ সময় প্রফুল্ল চাকী জিতেন্দ্র নারাছু রায়ের নেতৃত্বে গুপ্ত সংগঠনে সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেন। এখানে তার শারীরিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা এবং পিস্তল চালনার শিক্ষাও হয়। ওই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম শুরু হয়। বাংলার অসংখ্য তরুণ, যুবক এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের উৎখাতের লক্ষ্যে বৈপ্লবিক জীবন বেছে নেয়।

নবম শ্রেণিতে পড়াশুনার সময় পূর্ববঙ্গ সরকারের কারলিসল সার্কুলারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়ে তাকে রংপুর জেলা স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি পুনরায় নবম শ্রেণিতে রংপুর ন্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনা করেন। সেখানে পড়ার সময় জিতেন্দ্র নারাছু রায়, অবিনাশ চক্রবর্তী, ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীসহ অন্যান্য বিপ্লবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। আর এসময় থেকে তিনি বিপ্লবী ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হতে থাকেন।

১৯০৭ সালে স্বদেশি আন্দোলনের সময় প্রফুল্ল চাকী নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। ওই বছর বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ রংপুরে আসেন। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ রংপুরে পূর্বে গঠিত গুপ্ত সমিতিকে নিয়ে নতুন আঙ্গিকে একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। এর পূর্বে রংপুরে ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী ও তার ছেলে প্রফুল্ল চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী ও প্রফুল্ল চাকীর চেষ্টায় একটি কুস্তির আখড়া গড়ে উঠেছিল। এই আখড়ায় স্থানীয় ছাত্র-যুবকরা বিপ্লবাত্মক কাজে

দীক্ষা নেন। তৎকালীন সময়ে বিপ্লবীদের মানসিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী এবং সখারাম গনেশ দেউস্কর লিখিত দেশের কথা গ্রন্থ বিপ্লবীদের অবশ্য পাঠ্য ছিল।

শ্রী অরবিন্দর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে ও শ্রী অরবিন্দর অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবী দল। ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িটি ছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের মূল কেন্দ্র। ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িটি ছিল অরবিন্দ, বারীন্দ্র, মনোমোহন ও বিনয় ঘোষের যৌথ সম্পত্তি। মুরারীপুকুরের বাগানের কেন্দ্রস্থলে ছিল ছোট আকারের একটি বাড়ি। মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িটিতে সাধারণত থাকতেন সশস্ত্র বিপ্লবী নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

প্রফুল্ল চাকী রংপুরের কুস্তির আখড়ার পরিচালক ছিল। এ সম্পর্কে প্রফুল্ল চাকীর বৈপ্লবিক সাধনার সহযোদ্ধা শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্তী যা লিখেছিলেন, 'রংপুরে আমাদের একটি বৈপ্লবিক দল ছিল। আমরা তিনজনেই (প্রফুল্ল চক্রবর্তী, সুরেশ চক্রবর্তী ও প্রফুল্ল চাকী) অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। এই দলে প্রবেশের অনুষ্ঠান ছিল– বুক কেটে সেই রক্ত দিয়ে কয়েকটি প্রতিজ্ঞা সম্বলিত একখানি কাগজে স্বাক্ষর করা। এই প্রতিজ্ঞাগুলোর একটি ছিল– প্রয়োজন হলে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবো।'

ওই বছর শেষের দিকে প্রতিষ্ঠানিক পড়াশুনার ইতি ঘটিয়ে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য কলকাতায় চলে যান। সেখানে তিনি ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িতে উঠেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নির্দেশে প্রফুল্ল চাকী যুগান্তর দলে যোগ দেন। রংপুর থেকে আরো কয়েক জন কর্মী কৃষ্ণজীবন, নরেন বক্সী ও পরেশ মৌলিক কলকাতায় যান। তারাও ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িতে উঠেন এবং বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। বারীন ঘোষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য মুরারীপুকুরের একটি বাগানবাড়ীতে বোমা, পিস্তল প্রস্তুত ও সংগ্রহ, অস্ত্র ব্যবহার, তরুণ ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া, বিপ্লবের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে থাকেন।

১৯০৬ সালে গুপ্ত সমিতির বিপ্লবীরা পূর্ব বঙ্গের ছোট লাট স্যার রামফিল্ড ফুলারকে দুইবার হত্যা করার প্রচেষ্টা নেন। কিন্তু সফল হননি। ১৯০৭ সালে আবার বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ছোট লাট স্যার রামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। এজন্য টাকার প্রয়োজন। তাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও অরবিন্দ ঘোষ রংপুরের বিপ্লবী দলকে রংপুরে গিয়ে এক জমিদার বাড়ি ডাকাতি করে টাকা সংগ্রহ করতে পাঠান। এই দলে ছিলেন নরেন বক্সী, হেমচন্দ্র দাস, মহেন্দ্র লাহিড়ী, পরেশ মৌলিক ও প্রফুল্ল চাকী। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রফুল্ল চাকীও পরেশ মৌলিক। আর রংপুরে থেকে যুক্ত হয়েছিলেন ঈশান চক্রবর্তী ও তার ছেলে মনোরথ। সন্ধ্যার আগে মনোরথকে পাঠানো হয়েছিল জমিদার বাড়ি। বিপ্লবী দল ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুত। রাতে মনোরথ এসে খবর দেয় যে, পূর্বেই কোনো রকম সংবাদ পেয়ে জমিদার বাড়ি পুলিশ এসেছে। এই খবর শুনে ডাকাতি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। যে কারণে সেবারও ছোট লাট স্যার রামফিল্ড ফুলারকে হত্যা করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

এরপর আবার ফুলারকে হত্যার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ফুলার সাহেব ধুবড়ী হতে যখন স্পেশাল ট্রেনে রংপুর আসবেন, তখন একজন বিপ্লবী ফুলার সাহেবের আসার কথা টেলিগ্রাম করে জানাবেন। আর তখন রংপুর স্টেশনের একমাইল দূরে রেললাইনের নিচে ব্যাটারি সংযোগে একটি বোমা রাখা হবে। আর যদি বোমা না ফাটে তাহলে পরেশ মৌলিক ও প্রফুল্ল চাকী লাল লণ্ঠন দেখিয়ে বিপদ সঙ্কেত বুঝিয়ে গাড়ি থামাবেন। তারপর প্রফুল্ল চাকী রিভলবার দিয়ে ফুলারকে হত্যা করবেন। কিন্তু এ যাত্রায়ও ফুলার হত্যা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কারণ ওই দিন ফুলার স্টিমার দিয়ে চলে যান।

১৯০৭ সালের জুলাই মাসে যুগান্তর সম্পাদক স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্র নাথ দত্তকে রাজদ্রোহমূল প্রবন্ধ লেখার জন্য কারদণ্ড দেয়া হয়। কয়েক সপ্তাহ পর বন্দে মাতরম সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষকে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এছাড়া ব্রিটিশ সরকার সমগ্র দেশবাসীর উপর বিশেষ করে বাঙালি যুবকদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করে। এক সময় আদালত অবমাননার অভিযোগে সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়কে কারাদণ্ড দেয়া হয়। সে সময় এর প্রতিবাদ প্রচণ্ড রূপ নেয়। সমগ্র বাংলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে ছাত্র-যুবকদের মিছিল ও ধর্মঘট শুরু হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের রূপ নেয়।

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ লিখেছেন, 'প্রফুল্ল বড় জেদী ছেলে। খালি বলত– আমাকে এ কাজে পাঠানো হয় না? ও কাজের ভার কেন আমাকে দেওয়া হল না– আমি কি মরতে পারি না? আমার কি সাহস নাই?' আর কাজ না দিলে মুখ ভার করে থাকত। তাই ওকে আমরা কঠিন কাজের ভার দেওয়া শুরু করলাম। একবার ফুলার সাহেবকে হত্যা করার জন্য নৈহাটি রেল স্টেশনে গেলেন। ফুলার সাহেব স্পেশাল ট্রেনে উঠার আগে প্রফুল্ল চাকী গিয়ে রেল স্টেশনে হাজির হলেন। স্টেশনে প্রচুর পুলিশ। ফুলার সাহেব আসছেন ট্রেনে উঠার জন্য। প্রফুল্ল চাকীর ব্যাগে বোম। সতর্কতার সাথে প্রফুল্ল চাকী ওঁত পেতে আছেন বোমা নিক্ষেপ করার জন্য। এমন সময় একজন পুলিশ প্রফুল্ল চাকীকে ধাক্কা মেরে স্টেশন থেকে বের করে দেয়। আর অন্যদিক থেকে ফুলার সাহেব ট্রেনে উঠে গেলেন।

ওই বছর নভেম্বর মাসে প্রথমবার স্যার এন্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড পরিচালনার জন্য দায়িত্ব নেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শান্তি ঘোষ ও প্রফুল্ল চাকী। তাকে মারার জন্য চন্দননগরে রেললাইনের নিচে একটি বোমা রাখা হয়। কিন্তু ট্রেন চলে যাওয়ার সময়ে বোমাটি না ফাটায় এন্ড্রু ফ্রেজার বেচে যান। এরপর তিন/চার দিন পর আবার ফ্রেজার কলকাতা থেকে যাওয়ার সময় বিপ্লবীরা একই পদ্ধতি অবলম্বন করে। কিন্তু এন্ড্রু ফ্রেজারের স্পেশাল ট্রেন ওই পথ দিয়ে না আসায় দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হল। এরপর প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু বড় লাট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য দায়িত্ব নেন।

বি:দ্র: বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী উভয়েই বড় লাট কিংসফোর্ডকে হত্যা চেষ্টার ঘটনায় যুক্ত ছিলেন। যে কারণে দুই জনের জীবনীতে অনেকটা অংশ মিল রয়েছে।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী– সম্পাদনা: দেবপ্রসাদ জানা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশকাল ৫ জানুয়ার ২০০৮।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি, কলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৯।

৩. জীবনী গ্রন্থমালা: প্রফুল্ল চাকী– প্রান্তিক অরণ্য, কথাপ্রকাশ, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

তিতুমীর



জন্মের পর মা-বাবা ছেলেটির নাম রাখেন সৈয়দ মীর নিসার আলী। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে নিসার আলীর প্রচণ্ড জ্বর হয়। এই জ্বর সারানোর জন্য তাকে ঘুষড়া নামের ভীষণ তেতো ওষুধ খেতে দেয়া হয়। সেই সময় এই তেতো ওষুধটি অন্য ছেলে-মেয়েরা সহজে খেতে চাইতো না। আর তাদেরকে জোর করে খাওয়াতে গেলে ভীষণ কান্না-কাটি করে চোখ-নাক কুঁচকিয়ে অবশেষে ওষুধটি গিলত তারা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই ভয়ংকর তেতো ওষুধটি যখন মীর নিসার আলী নামের এই ছোট ছেলেটিকে দেয়া হল তখন সে কোন রকম আপত্তি না করে চোখ-নাখ কুঁচকানো ছাড়াই হাসিমুখে খেয়ে ফেলল।

ছেলের এই কাণ্ডে মা-বাবাসহ পরিবারের সবাই খুব অবাক হলেন এবং নিসার আলীর ডাকনাম রাখলেন তেতো। তেতো থেকে পরবর্তীতে হল তিতু। তার সঙ্গে মীর লাগিয়ে হয় তিতুমীর। ব্রিটিশবিরোধী লড়াই-সংগ্রামে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখার কারণে তিতু নামের এই ছেলেটিই বিদ্রোহী তিতুমীর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ছেলেবেলাতে সেই ভীষণ তেতো ওষুধটি হাসিমুখে খাওয়ার মধ্য দিয়েই জানান দিয়েছিলেন যেকোন কষ্টকেই হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারেন তিনি, এমনকি মৃত্যুকেও। আর তাইতো নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও পালিয়ে না গিয়ে লড়াকু বীরের ন্যায় ব্রিটিশ সরকারের ছোঁড়া কামানের গোলার সামনে লড়েছেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত।

তিতুমীর, ব্রিটিশবিরোধী এই বিপ্লবীর নাম শুনলেই চেতনার আয়নায় ভেসে ওঠে নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লার কথা। হিন্দু জমিদার ও ইংরেজদের যৌথ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিতুমীর ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর বারাসাতের কাছে নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন। বাঁশ এবং কাদা দিয়ে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট এই কেল্লা নির্মাণ করেন তিনি। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও অন্য ধর্মের প্রতিও ছিল তার গভীর শ্রদ্ধা। তাই ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এই অকুতোভয় বীরকে দুর্ভেদ্য বাঁশের কেল্লা তৈরিতে সহযোগিতা করেছিল জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষ। তিতুমীরের নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে প্রতিরোধ করার জন্য সশস্ত্রভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তিতুমীর অত্যাচারিত-বঞ্চিত কৃষকদেরকে সংগঠিত করে লাঠি-সড়কি জাতীয় দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গড়ে তোলেন। এই কেল্লাতে অবস্থান করেই তিতুমীর তার সঙ্গী ও গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের নিয়ে জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর

বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই গড়ে তুলেছিলেন। বেশ কয়েকবার ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তার কাছে পরাজিত হয়েছিল। অবশেষে এই কেল্লাতে অবস্থান করেই তিতুমীর লড়াকু বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন।

তিতুমীর ১৭৮২ সালের ২৭ জানুয়ারি, চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার আন্তঃপাতী চাঁদপুর গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে) জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মীর হাসান আলী। মায়ের নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। তিতুমীররা চার ভাই-বোন। তার পূর্বপুরুষ সৈয়দ শাহাদাত আলী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথম আরব থেকে বঙ্গে আসেন।

তিতুমীরের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে, বাবার কাছে। ১৭৮৬ সালে তিতুমীরের বয়স যখন ৪ বছর তখন বাবা মীর হাসান আলী তার হাতে তখতী দিয়ে হাতেখড়ি দেন। হাতেখড়ির পর তিনি গ্রামের ওস্তাদের কাছে উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ভাষা ও ধারাপাত (অংক) শেখেন।

এরপর গ্রামের মাদ্রাসায় তিতুমীর ২ বছর শরীয়তী ও তরীকতী পড়াশুনা করার পর ১৭৯৮ সালে শিক্ষাবিদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ'র সাথে বিহার শরীফে যান। ৬ মাস শিক্ষাসফর শেষে ওস্তাদ-সাগরেদ মিলে চাঁদপুরের হায়দারপুর গ্রামে ফিরে আসেন। পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠিখেলা, তীর ছোঁড়া ও অসি চালনা শেখেন। তখন যুবকরা আখড়া বা সংঘের আওতায় কুস্তি, কাবাডিসহ স্থানীয় নানা খেলাধুলা চর্চা করত। সে সময় এই সকল শরীর চর্চামূলক খেলাধুলায় প্রথম হওয়ার প্রতিযোগিতা ছিল সর্বত্র। যৌবনের সূচনালগ্নে তিতুমীর ছিলেন নাম করা কুস্তিগীর।

১৮০১ সালে ১৮ বছর বয়সে তিতুমীর কোরানে হাফেজ হন এবং হাদিস বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সেই সাথে তিনি বাংলা, আরবি ও ফারসি ভাষা, দর্শন ও কাব্যশাস্ত্রে সমান দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের জন্য সময় পেলেই ঘুরে বেড়াতেন দূর-দূরান্তে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। এভাবে চলতে থাকে বেশ কিছু দিন।

কর্মজীবন শুরুর পূর্বে তিতুমীর মায়মূনা খাতুনকে বিয়ে করেন। মায়মূনা খাতুন ছিলেন চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়ার অন্তর্গত খালপুর গ্রামের হযরত শাহ সূফী মুহম্মদ রহীম উল্লাহ সিদ্দিকীর মেয়ে। বিয়ের ৬ মাস পর তিতুমীরের বাবা সৈয়দ হাসান আলী মারা যান। কিছু দিন পর তিনি তার শিক্ষক হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌র সাথে কলকাতায় যান।

খুব সম্ভবত ১৮০৮-১৮১০ সালের কোনো এক সময়ে তিনি ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা শহরে যান। এখানেও তিনি কুস্তি লড়াইয়ের প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশ নিতেন। তিনি একবার কলকাতায় কুস্তি লড়াইয়ে প্রথম হয়েছিলেন। এরপর থেকে তিতুমীরের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই কারণে তিনি জমিদার মির্জা গোলাম আম্বিয়ার সুনজরে পড়েন এবং তার সান্নিধ্য লাভ করেন। তিতুমীর এখানে বসে যুদ্ধ জয়ের সামরিক কৌশল আয়ত্ব করেন। মির্জা গোলাম আম্বিয়া ছিলেন কলকাতার মির্জাপুর এলাকার জমিদার। তিতুমীর যেখানে যেতেন সেখানেই নানা বিষয় শেখার চেষ্টা করতেন, ফলে কর্মজীবনে তিনি কোথাও স্থায়ী হতে পারেননি। তিনি কিছুটা বাউণ্ডুলে স্বভাবের ছিলেন। তিনি প্রচণ্ড সাহসী ও দৃঢ়চেতার অধিকারী ছিলেন। তিনি সাধারণ ধর্মভীরু মুসলমান হিসেবে নামাজ-রোজা করতেন।

ব্রিটিশ-ভারতের সরকারি নথি অনুযায়ী, '১৮১৫ সালের দিকে তিতুমীর বাজে ও দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এ সময় তিনি নদিয়া জমিদারের অধিনে চাকুরি নেন এবং তার হিংসাত্মক কার্যাবলীর জন্য কারাবরণ করেন।' ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কোলডিন তার সম্পর্কে বলেন, 'তিতুমীর ছিলেন একটি গোলযোগ সৃষ্টিকারী ও বিশৃঙ্খল চরিত্রের, যার জন্য তাকে বিভিন্ন সময় দায়ী করা হয়েছিল। এর ফলে তাকে জেল ও শাস্তি ভোগ করতে হয়'। সেইসময় ব্রিটিশ সরকার এরকম অপবাদ-দুর্নাম প্রতিটা স্বাধীনতাকামী-প্রতিবাদী মানুষের মানবিক চরিত্রে লাগিয়ে দিয়েছিল।

১৮২২ সাল, তিতুমীরের বয়স তখন ৪০বছর। ওই বছর তিনি হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় গেলেন। কাবাশরীফে হজ্জ পালনের পর তিনি মদিনায় গমনের উদ্যোগ নেন। হজ্জে যাওয়ার পর থেকেই তিতুমীরের চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। মদিনায় গমনের পূর্বে তিনি হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইনের সাথে দেখা করেন। হযরত শাহ মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন তিতুমীরকে নিয়ে তার পীর হযরত ব্রেলভীর কাছে যান। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সংগ্রামী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। হযরত ব্রেলভী তখন মক্কায় বাস করছিলেন। তিনি তখন বিখ্যাত ইসলামি ধর্মসংস্কারক ও বিপ্লবী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হযরত ব্রেলভী প্রথম দেখাতেই তিতুমীরের প্রতি আকৃষ্ট হন। ২-৩ দিন গুরু-শিষ্যের মনদর্শন বিষয়ে আলোচনা শেষে তিতুমীর তার মুরিদ হলেন। এরপর গুরু-শিষ্যের দল মদিনায় যান। মদিনার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে মিশর, পারস্য, আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দর্শন ও পীর-আলেমদের কবর জিয়ারত শেষে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন তিনি।

১৮২৭ সালে নিজ গ্রামে ফিরে এসে তিনি শিরক ও বিদয়াতমুক্ত মুসলিম সমাজ গঠনের দাওয়াতে নেমে পড়েন। মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দিকেও মনোযোগ দেন তিনি। তার কাজ শুরু হয় চব্বিশ-পরগনা ও নদীয়া জেলায়। তিতুমীর নদীয়া জেলার নারিকেলবাড়িয়ার কাছাকাছি হায়দরপুরে বসবাস শুরু করেন এবং ধর্ম সংস্কারক হিসেবে তার কাজ অব্যহত রাখেন।

তিতুমীর তার গ্রামের দরিদ্র কৃষকদেরকে সাথে নিয়ে জমিদার এবং ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি এবং তার অনুসারীরা তৎকালীন হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে ধুতির বদলে 'তাহ্বান্দ' নামে এক ধরনের বস্ত্র পরিধান শুরু করেন। ১৮২৮ সাল পর্যন্ত তিতুমীরের মুসলিম সমাজ গঠনের দাওয়াত শান্তিপূর্ণভাবে চলে।

অন্যদিকে ১৮২০ সালে সৈয়দ আহম্মদ শহীদ উত্তর ভারত ও বাংলাদেশে এক বিশুদ্ধবাদী ইসলাম প্রচার করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ওই সময় তার ইসলাম প্রচারে মুগ্ধ হয়ে এ অঞ্চলের শত শত মানুষ ইসলাম প্রচার করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়। ১৮২২ সালে সৈয়দ আহম্মদ শহীদ শত শত অনুসারীদের নিয়ে মক্কায় হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে যান। ১৮২৩ সালে অনুসারীদের নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। ১৮২৪ সালে তিনি শিখ মহারাজা রনজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। এভাবে চলতে থাকে সৈয়দ আহম্মদ শহীদ অনুসারীদের সংগ্রাম। যে সংগ্রাম ও প্রতিবাদ তিতুমীরের ইসলাম প্রচার ও ইংরেজকে রুখে দাঁড়ানোর অনুকূলে কাজ করে। যার ধারাবাহিকতায় ১৯২৮ সালে তিতুমীর বিভিন্ন এলাকায়

বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তিনি ধীরে ধীরে ৩০০-৪০০ জন অনুসারীদের একটা দল গড়ে তোলেন।

ক্রমেই তিতুমীরের বিচক্ষণতা এবং পারদর্শিতা সবার দৃষ্টি কাড়ে। শুধু ধর্ম সংস্কারই নয়, হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার থেকে নিম্নবিত্ত মুসলমান জনসাধারণকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যেও তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্বীয় ধর্মের অত্যাচারিত মানুষ তার নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। তার এই অসাধারণ সাফল্যে হিন্দু জমিদাররা ভয় পেয়ে যায়। তিতুমীরের কার্যকলাপে রুষ্ট হয়ে ওঠেন জমিদার ও নীলকররা এবং তারা সবাই মিলে তিতুমীরকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

শুরু হয় তিতুমীর বাহিনীর ওপর জমিদারদের অত্যাচার, এমনকি তাদের দাড়ির ওপর খাজনা আদায় শুরু হয়। তিতুমীর হিন্দু জমিদার কর্তৃক মুসলমানদের উপর বৈষম্যমূলকভাবে আরোপিত 'দাড়ির খাজনা' (Beared Tax) এবং মসজিদের করের তীব্র বিরোধিতা করেন। এরপর তিতুমীর ও তার অনুসারীদের সাথে স্থানীয় জমিদার ও ব্রিটিশ শাসকদের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্রতর হতে থাকে। ফলে তিতুমীর জমিদারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এই সময় ফকির মিসকিন শাহ তার শিষ্যদের নিয়ে তিতুমীরের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করার প্রতিজ্ঞা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই দেবনাথ রায় (গোবরা গোবিন্দপুর), গৌড়ী প্রসাদ চৌধুরী (নাগপুর), রাজনারায়ণ (তারাকান্দি), কালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙ্গা) প্রমুখ হিন্দু জমিদারদের সাথে তিতুমীরের লড়াই বাঁধে। সেইসময় স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে কয়েকটি সংঘর্ষে তিতুমীর জয়লাভ করেন। তার দলে অনেকে এসে যোগ দেয়। তার নির্দেশে হিন্দু-মুসলমান প্রজারা জমিদারদের খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয়।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমঝোতা করার সব উপায় ব্যর্থ হবার পর তিতুমীর বারাসাতে ইংরেজ সরকারের বিপক্ষে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। চব্বিশ পরগনার কিছু অংশ, নদীয়া ও ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। এটাই বারাসাত বিদ্রোহ নামে পরিচিত হয়। বর্ণহিন্দুর অত্যাচারে জর্জরিত অনেক হিন্দু কৃষকও এ বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। বারাসাত বিদ্রোহে গোবরাগোবিন্দপুরের জমিদার নিহত হয়।

জমিদার ও নীলকরদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৮৩০ সালে ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে পাঠায় তিতুমীরকে দমন করার জন্য। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ও তার সিপাহী বাহিনী তিতুমীরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়। তিতুমীরের বাহিনী বাঘারেয়ার নীলকুঠি প্রাঙ্গণের এক যুদ্ধে নদীয়ার কালেক্টর এবং নদীয়া ও গোবরডাঙ্গার জমিদারের সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হয়। তিতুমীর বাহিনী কয়েকটি নীলকুঠিও লুণ্ঠন করে। ইতিমধ্যে তিতুমীর নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করেন।

ওই বছর জমিদার কৃষ্ণদেব রায় পার্শ্ববর্তী সরফরাজপুরে (বর্তমান সর্পরাজপুর) শত শত লোক জড় করে লাঠিসোটা, ঢাল-তলোয়ার, সড়কিসহ শুক্রবার জুমার নামাজরত অবস্থায় মসজিদ ঘিরে ফেলে এবং মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওইদিন দু'জন মৃত্যুবরণ করেন, আহত হন অসংখ্য যোদ্ধা। মুসলিম বিদ্বেষী পুলিশ ঘটনাস্থলে না গিয়ে থানায় বসেই মামলার রিপোর্ট দেয়।

তিতুমীর তার লোকজন নিয়ে সরফরাজপুর থেকে ১৮৩১ সালের ১৭ অক্টোবর নারকেলবাড়িয়ায় চলে আসেন। জমিদার ও ব্রিটিশদের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলার জন্য

নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে একটি সুদৃঢ় বাঁশের কেল্লা তৈরি করেন তিনি। এ কেল্লায় তিতুমীরের অনুসারীর সংখ্যা বেড়ে এক সময় ৫,০০০ জনে গিয়ে পৌছে। এই দুর্গে তিনি তার শিষ্যদের লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার কৌশল শেখানোর পাশাপাশি তাদের আক্রমণ করার প্রস্তুতিও নিতে থাকেন তিতুমীর বাহিনী। তারা সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন।

ওই বছর ২৯ অক্টোবরেই কৃষ্ণদেব নারকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে বহু লোক হতাহত করে। ৩০ অক্টোবর এই বিষয়ে মামলা দায়ের করতে গেলে কোনো ফল হয় নি। জমিদার ও কৃষ্ণদেবের তৃতীয়বার অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে তিতুমীরের ছেলে সৈয়দ গওহর আলী ও তার ভাগনে শেখ গোলাম মাসুম চাঁদপুর, হায়দারপুর, কীর্তিপুর, রাজাপুর, নয়াপাড়া, আটঘরাসহ বিভিন্ন এলাকার পাঁচশতাধিক বীর লড়াকুদের নিয়ে নারিকেলবাড়িয়ায় উপস্থিত হলেন।

গোলাম মাসুম নারিকেলবাড়িয়ায় উপস্থিত হওয়ায় সবাই খুব খুশি হলেন। সবাই মিলে সমবেত কণ্ঠে বললেন, আমরা এই অত্যচারের প্রতিকার চাই। গোলাম মাসুম তার মামা তিতুমীরকে বললেন, শত্রুদের মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে আরো শক্তিশালী হতে হবে এবং শত্রুরা যেন সহজেই কোনো ক্ষতি করতে না পারে সে জন্য আত্মরক্ষা করতে হবে। তার পরামর্শ অনুযায়ী আত্মরক্ষার জন্য সবাই মিলে বিশাল এলাকা জুড়ে বেড়া নির্মাণ করলেন। দক্ষিণ ও উত্তর দিকে দুটি দরজা রাখা হল। এই দরজায় নিয়মিত প্রহরী রাখার ব্যবস্থা হল। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় প্রায় সকল মুসল্লিদের লাঠি খেলা, সুড়কী চালনাসহ শরীরচর্চামূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হত।

আত্মরক্ষার কাজ শেষ হওয়ার পর গোলাম মাসুম পরামর্শ সভা ডাকলেন। সভায় নানা বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা শেষে গোলাম মাসুমকে যোদ্ধা দলের নেতা নির্বাচিত করা হল এবং তিতুমীরকে সকল কাজের ও দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া হল।

৬ নভেম্বর কৃষ্ণদেব আবার নারকেলবাড়িয়ার মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করল। উভয় দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। হতাহত হল প্রচুর। কৃষ্ণদেব এই খবর তার জমিদার ও প্রভূ ব্রিটিশের কাছে এমনভাবে প্রচার করলো যে সবার ধারণা হল, তিতুমীর বাহিনী নিষ্ঠুরভাবে শান্তিপ্রিয় হিন্দু জমিদার ও তাদের জনগণকে অত্যাচার করেছে। গোবরডাঙ্গার নীলকর জমিদার কালী প্রসন্ন মোল্লা, আটী নীলকুটির ম্যানেজার মি. ডেভিসকে এই খবর দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুললেন। মি. ডেভিস ক্ষেপে গিয়ে প্রায় ৪ শতাধিক হাবশী যোদ্ধা ও বিভিন্ন মরণাস্ত্রসহ নারকেলবাড়ীয়া আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে এবারও বেশ কিছু লোক হতাহত হল। তিতুমীর বাহিনীর কাছে নিশ্চিত পরাজয় দেখে শেষ পর্যন্ত মি. ডেভিস প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন। ২-৩ দিন পর জমিদার দেবনাথ বাহিনী নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে এলেন। গোলাম মাসুম এই খবর শুনে তার বাহিনী নিয়ে জমিদার দেবনাথ বাহিনীকে মোকাবেলা করেন। এখানেই জমিদার দেবনাথ প্রাণ হারায়।

এ রকম কয়েকটি সংঘর্ষের পর ১৩ নভেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার কর্নেল স্টুয়ার্ডকে সেনাপতি করে একশত ঘোড়া, তিনশত পদাতিক সৈন্য, দু'টি কামানসহ নারকেলবাড়িয়ায় পাঠায়। উদ্দেশ্য বিদ্রোহী তিতুমীর ও তার অনুসারীদের চিরতরের জন্য নিঃশেষ করে দেয়া। ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডার একজন হাবিলদার, একজন জমাদার,

পঞ্চাশ জন বন্দুক ও তরবারিধারী সৈন্য নিয়ে নারকেলবাড়িয়ার কাছাকাছি ভাদুড়িয়ায় উপস্থিত হন। বশিরহাটের দারোগা সিপাহী নিয়ে ভাদুড়িয়ায় আলেকজান্ডারের সাথে মিলিত হয়। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় তিতুমীর বাহিনীর সাথে। এতে উভয় পক্ষের লোক হতাহত হয়। যুদ্ধে দারোগা ও একজন জমাদ্দার মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়, বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. আলেকজান্ডার পালিয়ে বেঁচে যান।

১৮৩১ সালের ১৯ নভেম্বর, তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ও কর্নেল স্টুয়ার্ডের নেতৃত্বে বিরাট সেনা বহর পাঠান তিতুমীরকে শায়েস্তা করার জন্য। কর্নেল স্টুয়ার্ড বিরাট সেনাবহর আর গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা। স্টুয়ার্ডের ছিল হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সৈন্য আর অজস্র গোলাবারুদ। তিতুমীরের ছিল মাত্র চার-পাঁচ হাজার স্বাধীনতাপ্রিয় সৈনিক। তার না ছিল কামান, না ছিল গোলাবারুদ-বন্দুক। তবুও প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। তিতুমীর আর তার বীর সৈনিকরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেন। কিন্তু তারা তলোয়ার ও হালকা অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের আধুনিক অস্ত্রের সামনে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়াতে পারেননি। কিন্তু তাই বলে কেউ পিছু হঠেননি, জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়েও যাননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ সৈনিকদের গোলার আঘাতে ছারখার হয়ে যায় নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা। শহীদ হলেন বীর তিতুমীর। শহীদ হলেন অসংখ্য মুক্তিকামী বীর সৈনিক। তিতুমীরের ২৫০ জনেরও বেশি সৈন্যকে ইংরেজরা বন্দী করল। এদের কারও হল কারাদণ্ড, কারও হল ফাঁসি। আর এভাবেই শেষ হল নারিকেলবাড়িয়ার বিখ্যাত বাঁশের কেল্লা যুদ্ধ।

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এই বাঁশের কেল্লা পরবর্তী লড়াই-সংগ্রামকে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিতুমীর জমিদার ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তার বাঁশের কেল্লার জন্য জগৎবিখ্যাত হয়ে আছেন।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. শহীদ তিতুমীর– আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (বাংলা একাডেমী)।

২. ব্রিটিশ ভারতীয় নথিতে তিতুমীর ও তার অনুসারীগণ– অনুবাদ: ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া (বাংলা একাডেমী)।

৩. বিদ্রোহী তিতুমীর– মনির জামান (কথা প্রকাশ)।

৪. তিতুমীর– বিহারীলাল সরকার।

বাঘা যতীন



বাঘা যতীন, একটি নাম। একজন বিপ্লবীর নাম। বিপ্লবী বাঘা যতীন। একজন বাঙালি বিপ্লবী। ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের সর্বাধিনায়ক। তিনি বাংলার সশস্ত্র বিপ্লববাদী দল যুগান্তর এবং পরে সকল বিপ্লববাদী দলের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। জার্মানদের সহায়তায় ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর পরিকল্পনার উদ্যোক্তাও তিনি।

সময়টা ছিল ১৯০০ সাল। বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে। হঠাৎ একদিন কুষ্টিয়ার কয়া গ্রামের পাশের গ্রামে একটি মস্তবড় বাঘ দেখা গেল। গ্রামবাসী বাঘটি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বাঘটির ভয়ে মানুষ দিনের বেলায়ও রাস্তা-ঘাটে একা একা বের হতে ভয় পেত। রাতের বেলায় কেউ বের হত না। ওই বাঘটি গ্রামের গরু, ছাগল খেতে শুরু করে। তখন কয়া গ্রামের মানুষ আরো বেশি ভয়ে-আতঙ্কে অতিষ্ট হয়ে উঠে।

কয়া গ্রামের ফণিবাবু জনগণের কথা ভেবে জীবনবাজী রেখে বন্দুক দিয়ে বাঘটিকে মারার সিদ্ধান্ত নিলেন। ওই সময় কৃষ্ণনগর থেকে যতীন্দ্রনাথ মামাবাড়ি (কয়া গ্রামে) আসেন। কৃষ্ণনগরের মানুষ বাঘটি সম্পর্কে কিছুই জানত না। ফণিবাবু বাঘ মারতে যাবেন শুনে যতীন্দ্রনাথ তার সাথে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। মামাবাড়ির সবাই যতীন্দ্রনাথকে যেতে নিষেধ করে। কারণ একটি মাত্র বন্দুক, তা ফণিবাবু সাথে নিয়ে যাচ্ছেন। খালি হাতে যতীন্দ্রনাথ যাবে কি করে, বাঘ যদি তাকে আক্রমণ করে? কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কারও কথা শুনলেন না। খালি হাতে যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে যতীন্দ্রনাথ একটি ভোজালি নিয়ে মামাতো ভাই ফণিভূষণের সাথে দুপুরের পরে বাঘ মারতে রওনা হলেন।

বাঘ মারতে যাওয়ার কথা শুনে গ্রামের মানুষ তাদের পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করে। অনেকক্ষণ ধরে বাঘটি খোঁজা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না। অবশেষে ফণিবাবু ও যতীন্দ্রনাথ গ্রামের পাশে জঙ্গলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ওই জঙ্গলের মধ্য একটি বড় মাঠ ছিল। যতীন্দ্রনাথ সেই মাঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিলেন। ফণিভূষণ মাঠের এক প্রান্তে বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছেন। গ্রামের মানুষ জঙ্গলের পাশে দাড়িয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে নৃত্য করছেন। অনেকক্ষণ পরে যতীন্দ্রনাথ যেখানে দাঁড়িয়েছেন, সেইদিক দিয়ে বাঘ বের হল। বাঘ দেখে গ্রামের মানুষ পালাতে শুরু করে। ফণিভূষণ বাঘটি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। গুলি বাঘের মাথা স্পর্শ করে চলে যায়। বাঘ আহত না হয়ে বরং আরো উত্তেজিত হয়ে

যতীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ করে। যতীন্দ্রনাও সাহস করে বাঘটিকে বাম বগলের মধ্যে কষে ধরে, বাঘের মাথার উপরে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ভোজালি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। বাঘও যতীন্দ্রনাথকে কামড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। চলতে থাকে উভয়ের মাটিতে গড়াগড়ি। নখ দিয়ে যতীন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে। তার হাটুতে একটা কামড়ও দিয়েছিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ জানতো যে বাঘটিকে আঘাতে আঘাতে না মারতে পারলে তার রক্ষা নেই। তাই জীবন বাঁচানোর লড়াই চালিয়ে যায়।

অন্যদিকে বাঘটিকে গুলি করার জন্য ফণিভূষণ পুনরায় চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাঘের সাথে যতীন্দ্রনাথ যেভাবে গড়াগড়ি করতেছিলেন, তাতে গুলি করা সম্ভব ছিল না। কারণ গুলি যদি যতীন্দ্রনাথ শরীরে লাগে! এভাবে ১০ মিনিট ধরে লড়াই করে যতীন্দ্রনাথ বাঘটিকে আহত করেছিলেন। অবশেষে বাঘটিকে মারার পর যতীন্দ্রনাথ ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

ফণিভূষণ দৌড়ে এসে যতীন্দ্রনাথকে সেবা করতে শুরু করেন। তাৎক্ষণিক লোকজনের সহায়তায় যতীন্দ্রনাথকে ও মৃত বাঘটিকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। গ্রাম্য ডাক্তার দেখিয়ে যতীন্দ্রনাথকে একটু সুস্থ করে তুলেন। তার শরীরে প্রায় ৩০০ স্থানে ক্ষত দেখা গেল। ডাক্তার তার অবস্থা দেখে তাড়াতড়ি করে কলকাতায় নিয়ে যেতে বললেন। তখন যতীন্দ্রনাথের মেজ মামা হেমন্তকুমার কলকাতায় ডাক্তারি করতেন। মামার কাছে তাকে পাঠানো হয়। হেমন্তকুমার ভাগ্নের অবস্থা ভয়াবহ দেখে কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার, সর্বশ্রেষ্ঠ সার্জন সুরেশপ্রসাদের উপর চিকিৎসার ভার দিলেন। এই নামকরা ডাক্তারও যতীন্দ্রনাথকে বাঁচানো ও পুরাপুরি সুস্থ করার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাসখানেক পর একটু সুস্থ হলেও তার পায়ে পচন ধরে। এসময় ডাক্তার পা কেটে ফেলার কথা বলেছিলেন। কিন্তু যতীনের মামাদের আপ্রাণ চেষ্টা ও ডাক্তারদের সুচিকিৎসার জন্য শেষ পর্যন্ত তার পা দুখানি কাটতে হয়নি। ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ তাকে দেখে, তার বীরত্বের কথা শুনে রীতিমতো অবাক হন। যতীন্দ্রনাথের এই কীর্তিকে সম্মান জানিয়ে তাঁকে 'বাঘা যতীন' নাম উপাধি দেন।

বাঘ মারার পূর্বেও নানা দুঃসাহসিক কাজ করেছেন যতীন্দ্রনাথ। ১৮৯৩ সালে স্কুলে পড়ার সময় তিনি একদিন লাগামহীনভাবে ছুটে চলা একটি ঘোড়াকে বস করে তার মালিককে দিয়েছিলেন। বাঘ মারার পর গ্রামের সাধারণ মানুষ তাকে ভালোবেসে 'বাঘা যতীন' নামে ডাকতে শুরু করেন।

তিনি জন্মেছিলেন ১৮৭৯ সালের ৭ ডিসেম্বর (১২৮৬ সালের ২১ অগ্রাহায়ণ)। তৎকালীন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহাকুমার কয়া গ্রামে, মাতুলালয়ে। জন্মের পর পারিবারিকভাবে তার নাম রাখা হয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বাবা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মা শরৎশশী দেবী, ছিলেন স্বভাবকবি। তাদের আদিনিবাস ছিল যশোর জেলার জিনাইদাহ মহাকুমার রিশখালী গ্রামে। বাঘা যতীনের ৫ বছর বয়সের সময় তার বাবা মারা যান। এরপর মা ও বড়বোন বিনোদবালার সাথে তিনি মাতামহের বাড়ি কয়ে গ্রামে চলে আসেন। মায়ের আদর-স্নেহে মাতুলালয়েই তিনি বড় হতে থাকেন। এখানেই কেটেছে তার শৈশব-কৈশর।

যতীনের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক লেখাপড়া শেষে বড় মামা বসন্ত কুমার যতীনকে কৃষ্ণনগরের অ্যাংলো ভার্ণাকুলার হাইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। ছোটবেলা থেকে যতীন ছিল দুরন্ত স্বভাবের। শরৎশশী দেবী ছেলেকে চোখে চোখে রাখতেন। পড়াশুনা

করাতেন। সেই ছোটবেলা থেকেই ছেলেকে আদর্শবান ও স্পষ্টভাষী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মা কত কিছুই না করেছেন!

স্কুলের পড়াশুনা আর খেলাধূলার পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়া, শিকার করা, মাছধরা, গাছে চড়া, দৌড়-ঝাঁপসহ নানা দুরন্তপনায় মেতে থাকতেন যতীন। পড়াশুনায় ভাল, দুষ্টমিতে সেরা ও স্পষ্টভাষী– এসব গুণের কারণে যতীন তার সহপাঠী ও শিক্ষক মহলে প্রিয় হয়ে উঠেন। এছাড়াও বেশ কৌতুকপ্রিয় ছিলেন তিনি। পাড়া-মহল্লা ও স্কুলে নাটকের অভিনয় করতেন। অভিনয় করতে ভালোবাসতেন। অনেক সময় তিনি নাটক মঞ্চস্থ করতেন। অভিনয়ের জন্য বেছে নিতেন হনুমান, রাজা হরিশচন্দ্র, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি চরিত্র। মামাও দারুণভাবে ভালবাসতেন ভাগ্নেকে। বড় মামা যতীনকে সাথে নিয়ে কুস্তি খেলা দেখতে যেতেন।

রাতের বেলায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে যতীনকে বড়বোন বিনোদবালা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্প, রানাপ্রতাপ, শিবাজী, সীতারাম রায়ের কাহিনী শুনাতেন। এসব ইতিহাস শুনে যতীন বড়বোনকে প্রায়ই বলতেন, 'আমি বড় হয়ে ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিব'। অ্যাংলো ভার্ণাকুলার হাইস্কুল থেকে তিনি ১৮৯৮ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এন্ট্রান্স পাসের স্বীকৃতি অর্জন করেন। তারপর কলেজে এফ. এ পড়ার জন্য মেঝমামার কাছে চলে যান। তার মামা কলকাতার শোভাবাজারের বসবাস করতেন। মেঝমামা যতীনকে কলকাতা সেন্ট্রাল কলেজে ফার্স্ট-আর্টস (এফ. এ) ভর্তি করিয়ে দেন। বার্ষিক পরীক্ষার পূর্বে তিনি সর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখতে শুরু করেন মামাদের উপর একেবারে সম্পূর্ণ নির্ভর না করে নিজে কিছু উপার্জন করার জন্য। যদিও তার মামারা তাকে খুব ভালবাসতেন।

ওই সময়ে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। যতীনেরও স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়ে। তার ছোট মামা ললিতকুমার ভাগ্নের শরীরের খারাপ অবস্থা দেখে তাকে শরীরচর্চার জন্য অম্বুগুহের কুস্তির আখড়ায় ভর্তি করে দেন। সেখানে যতীন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পান। এ সমস্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে যতীনের চেতনায় দেশপ্রেমের মন্ত্র ঢুকে যায়। মনে মনে দেশের জন্য কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। স্কুল জীবন থেকে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচনাদি পড়তেন। স্বামীজির দেশপ্রেম ও তার বাণী যতীন সব সময় মনে রাখেন। কুস্তির আখড়ার অম্বুগুহের আহবানে যতীন তার বন্ধুদের দল নিয়ে নানা রোগে আক্রান্ত রোগীদের সেবা ও সমাজ সেবামূলক কাজ করেন।

টাইপরাইটিং শেখা শেষে তিনি কলকাতার আমহুটি এন্ড কোম্পানি নামক একটি ইউরোপীয় সওদাগরী অফিসে মাসে ৫০ টাকা বেতনে চাকুরি নেন। এখানে বেশ কিছুদিন চাকুরি করার পর তিনি ১৮৯৯ সালে মোজাফ্ফরপুরে ব্যারিস্টার মি. কেনেডির স্টনোগ্রাফার হিসেবে ৫০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি অচিরেই একজন আন্তরিক, সৎ, দক্ষ কর্মচারী হিসেবে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। চাকুরি করার কারণে তার আর এফ. এ ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হল না। ব্যারিস্টার কেনেডি যতীনকে তার সততার জন্য পছন্দ করতেন, ভালবাসতেন। কেনেডির উৎসাহে মোজফ্ফরপুরের তরুণদের জন্য যতীন ফুটবল ও অ্যাথলেটিক ক্লাব গড়ে তুলেন।

১৯০০ সালে যতীন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অধিনে ১২০ টাকা বেতনে একটি চাকুরি পেয়ে কলকাতায় চলে আসেন। ওই বছর তিনি ইন্দুবালাকে বিয়ে করেন। তাদের পরিবারে ৪টি সন্তানের জন্ম হয়। অতীন্দ্র, আশালতা, তেজেন্দ্র, ও বীরেন্দ্র।

বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অধিনে চাকুরি করার সময় যতীনকে মাঝে মাঝে দার্জিলিং যেতে হত। ১৯০১-০২ সালের কোনো একদিন তিনি ট্রেনে করে দার্জিলিং যাচ্ছেন। তার পাশের সিটে একটি লোক তার সন্তানের জন্য শিলাগুড়ি স্টেশনে পানি আনতে যাবেন। কিন্তু ট্রেন যদি ছেড়ে দেয়! তাই আর ট্রেন থেকে নামলেন না। শিশুটি পানির জন্য কাঁদছে। যতীন তা দেখে ওই লোকটির কাছে গ্লাসটি নিয়ে পানি আনতে নামলেন। তাড়াহুড়ো করে পানি নিয়ে আসতে না আসতেই ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছে। যতীন দৌড়ে গিয়ে ট্রেন উঠার চেষ্টা করছেন এমন সময় ৪ জন গোরা সৈনিকের একজনের গায়ে একটু পানি পড়ে। সৈনিকরা যতীনকে ধাক্কা মারেন। যতীন ও তার হাতের গ্লাসটি মাটিতে পড়ে যায়। যতীন উঠে প্রতিবাদ করতে তাকে কালো বলে, ছোট জাত বলে গালি দিল। যতীন স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করে 'তোমার গালে যদি কেউ এক চড় মারে, তাকে যদি দশ চড় ফিরিয়ে না দাও, তুমি পাপ করবে। ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে জীবন যাপন করলে, ইহকালে নরকভোগ, পরকালেও তাই।' ৪ জন গোরা সৈন্যকে একাই রাম ধোলাই দিলেন। তার আর দার্জিলিং যাওয়া হল না, শিলাগুড়িতে থেকে গেলেন। যতীনের নামে মামলা হল। মামলার কথা শুনে সবাই চমকে গেলেন– একা ৪ জন গোরা সৈনিকের নাক-মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে শুনে। দার্জিলিং শহরের ইংরেজ প্রশাসক হুইলার সাহেব এই ঘটনার কথা শুনে সৈন্যদেরকে মামলা তুলে নিতে বললেন। কারণ এই মামলা আদালতে গেলে সংবাদপত্রের মাধ্যমে দেশের মানুষ জানবে। এতে করে ইংরেজদের মান-ইজ্জত নষ্ট হবে, তাই।

আর একদিন যতীন অফিস শেষে বাসায় যাচ্ছেন। এমন সময় দেখেন এক ইংরজে কলকাতা রাস্তায় জনসম্মুখে ১০/১২ বছরের এক ফেরিওয়ালাকে মারছে। লোকজন দাঁড়িয়ে তা দেখছে। কেউ প্রতিবাদ করছে না। তখন যতীন ওই ছেলেটিকে ছেড়ে দিতে বলেন এবং মারের কারণ জিজ্ঞেস করেন? কিন্তু শেতাঙ্গ লোকটি ছেলেটিকে না ছেড়ে যতীনকে ধমক দিয়ে আবার মার শুরু করেন। এবার যতীনও ওই ইংরেজকে রাম ধোলাই দেয়া শুরু করলেন। অবশেষে ইংরেজ লোকটি যতীনের হাত-পা ধরে ক্ষমা চেয়ে প্রাণে বাঁচেন।

ওই সময় ১৯০২ সালে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বারোদায় ৭০০ টাকা বেতনের চাকুরি ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে শ্যামপুকুর স্ট্রিটে পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথের বাড়িতে অবস্থান নিলেন। এখানে অবস্থান করে তিনি কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে গোপনে গোপনে ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেন। ১৯০৩ সালে শ্রী অরবিন্দের সাথে পরিচিত হয়ে যতীন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হন। অরবিন্দ ঘোষের সংস্পর্শে এসে যতীন শরীর গঠন, সাঁতার কাটা ও বন্দুক চালানো প্রশিক্ষণ নেন। চাকুরিরত অবস্থায় শুরু করেন গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। যুগান্তর দলে কাজ করার সময় এম এন রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। যতীন বুঝতে পেরেছিলেন, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশকে বিতাড়ন করা সম্ভব নয়। সে কারণে তিনি ব্রিটিশের কবল থেকে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবী পথ বেছে নেন। বাঘা যতীন সরকারি চাকুরিতে থেকে অত্যন্ত সুকৌশলে গোপনে বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। ১৯০৩ সালে অরবিন্দ, যতীন এবং প্রমথনাথ ১০২ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে একটি বিপ্লবী আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই আখড়া থেকে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নেন।

১৯০৮ সাল। হঠাৎ একদিন কলকাতার মানিকতলায় বিপ্লবীদের গোপন বোমার কারখানার বিপ্লবীরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ জানতে পারলো, এই বিপ্লবীদের মধ্যে একজন

সরকারি লোক রয়েছেন। তার নাম বাঘা যতীন। তিনি ওই দলের নেতা। অথচ তিনি তখন বাংলায় গভর্নরের পার্সোনাল সেক্রেটারি। তার 'বিপ্লবী' পরিচয় পেয়ে সরকারি মহল ও পুলিশ প্রশাসন স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। তার উপর কঠোর নজরদারি রাখা হল।

ওই সময় থেকে যতীন সতর্ক হয়ে গেলেন। এরপর তার নেতৃত্বে ১৯০৯-১০ সাল পর্যন্ত যত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে, তা খুব সর্তকতার সাথে সম্পাদন করেছেন। সারা ভারতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিয়েছেন। গড়ে তুলেছে অসংখ্য সশস্ত্র বিপ্লবী।

১৯০৯ সালে থেকে ব্রিটিশ সরকারের ম্যাজিস্ট্রেট সামসুল আলম বিপ্লবীদের উপর চড়াও হয়ে একের পর এক বিপ্লবীদেরকে গ্রেফতার করতে শুরু করেন। ১৯০৯ সালের ৩০ নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার সামসুল আলমকে স্পেশাল ক্ষমতা দেন, যে ক্ষমতাবলে তিনি যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারবেন। ১৯১০ সালের ২০ জানুয়ারি এই কথা যতীন জানতে পারেন। ২৪ জানুয়ারি সামসুল আলম যখন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন, তখন বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দপ্তগুপ্ত (১৮ বছর) তাকে গুলি করে হত্যা করে। বীরেন্দ্রনাথের সাথে সতীশ সরকারও ছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ ধরা পড়ে গেলেন আর সতীশ সরকার পালাতে সক্ষম হন। বীরেন্দ্রনাথ ১৬ বছর বয়সে বিপ্লবী রাজনীতির হাতেখড়ি নিয়েছিলেন যতীনের কাছে। তারপর তাকে অনুশীলন সমিতির সাথে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন যতীন। কিন্তু যখন সামসুল আলম বিপ্লবীদেরকে গ্রেফতার করতে থাকেন, তখন থেকে তিনি তাকে মারার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এমন সময় একদিন তিনি জানতে পারলেন, তার নেতা যতীনের পরবর্তী পরিকল্পনা সামসুল আলমকে সরিয়ে দেয়া, তখন তিনি নেতা যতীনের কাছে গিয়ে বললেন, এই হত্যাকাণ্ডটি তিনি করতে চান। যতীন পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে বীরেন্দ্রনাথের সাথে সতীশ সরকারকে পাঠালেন।

যতীনের নির্দেশে সামসুল আলম হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটিশ সরকার যতীনের উপর গ্রেফতার পরওয়ানা জারি করে। টেগার্টকে পাঠানো হল যতীনকে গ্রেফতার করার জন্য। যতীন তখন কয়েকজন সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে কলকাতার ২৭৫ নম্বর আপার চিৎপুর রোডের বাড়িতে তার এক অসুস্থ মামার সেবাযত্ন করতেন। সেই বাড়ি থেকে যতীনকে টেগার্ট গ্রেফতার করে। এরপর যতীনকে আটক রেখে চালানো হয় অত্যাচারের স্টিম রোলার। কিন্তু একটি তথ্যও বের করতে পারেনি। তাকে বিভিন্ন ধরনের লোভ ও প্রলোভন দেখানো হয়। এতেও কোনো কাজ হয়নি। হতাশ হয়ে সরকারি মহল তাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে, পরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠায়। তার নামে দেয়া হয় বিখ্যাত 'হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা'। এ মামলা চলে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। এই মামলায় যতীনসহ কয়েকজন বিপ্লবীকে জড়ানো হয়। এ সময় অনুশীলন সমিতিকে বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার। তাদেরকে এমন নির্মমভাবে অত্যাচার করে যার ফলে কয়েকজন মারা যান এবং কয়েকজন পাগল হয়ে যান।

যথাযথ প্রমাণের অভাবে বাঘা যতীনকে দোষী সাব্যস্ত করতে ব্যর্থ হয় ব্রিটিশ সরকার। ১৯১১ সালের একুশ ফেব্রুয়ারি তিনি এ মামলা থেকে মুক্তি পান।

জেল থেকে মুক্তি লাভের পর দলের সবাইকে বলে দিলেন, আর ডাকাতি করা যাবে না। গোপনে গোপনে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যদি ডাকাতি না করি তাহলে ইংরেজ সরকার বুঝবে আমরা বিপ্লবী কার্যক্রম ছেড়ে দিয়েছি। তখন আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে।

এরপর যতীন তার দিদি বিনোদবালা, স্ত্রী ইন্দুবালা, কন্যা আশালতা আর দু'বছরের ছেলে তেজেন্দ্রনাথকে নিয়ে যশোরের ঝিনাইদাতে বসবাস শুরু করেন। এসময় তিনি ঠিকাদারী ব্যবসা শুরু করে ব্রিটিশ সরকারকে পুরোপুরি সংসারি হওয়ার চিত্র দেখান। যশোর শহরে আর মাগুরাতে দুটি শাখা অফিস করেন। ব্যবসার আড়ালে গোপনে বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১৯১১ সালে তিনি হরিদ্বারে যান। সেখান থেকে বৃন্দাবনে গিয়ে বিপ্লবী এলাকা বারোদার বিপ্লবী যতীন মুখার্জীর কাছে বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের খোঁজখবর নেন। পরে কাশীতে যান তিনি। সেখানে তিনি স্বামী প্রজ্ঞানন্দের (সতীশ মুখার্জী) কাছে বরিশালের বিপ্লবী সংগঠনের খোঁজখবর নেন। আর কাশীতে ছিলেন গুপ্ত সমিতির মোক্ষদা সামাধ্যায়ী, তার কাছে জানেন কলকাতার বিপ্লবীদের কার্যক্রম সম্পর্কে। সবার সাথে আলাপ-আলোচনা হয়। এ সময় তিনি নরেন সন্ন্যাসী নামে পুরো ভারত চষে বেড়ান এবং বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবীদের একত্র করার কাজ চালিয়ে যান।

১৯১৩ সালের ভীষণ বন্যা ও মহামারীর সময় যতীন তার দলবল নিয়ে বর্ধমান ও কাশীতে বন্যার্তদের সেবা-যত্ন করেন। এসময় তিনি সমস্ত জেলার বিপ্লবী নেতা-কর্মীদেরকে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াবার জন্য চলে আসতে বললেন। সকল জেলার নেতৃবৃন্দ আসল। বন্যার্তদের মাঝে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে যতীন গোপন বৈঠকে বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজকে হঠানোর পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে নিলেন। এসময় নিষিদ্ধ সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলো যতীনকেই তাদের সার্বাধিনায়ক নির্বাচিত করেন। এরপর থেকে তার কমাণ্ডেই সকল বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। ওই বছর শেষের দিকে উত্তর ভারত থেকে রাসবিহারী বসু এসে সার্বাধিনায়ক যতীনকে সংগঠনের কাজ সম্পর্কে বললেন। শচীন সান্যালও যুক্ত হলেন এই বিপ্লবী পরিকল্পনার সাথে।

১৯১৪ সালের ৪ আগস্ট ইংরেজ-জার্মান যুদ্ধ বাধে। এ যুদ্ধ বাধার ২২ দিন পরে সার্বাধিনায়ক যতীনের নেতৃত্বে সারা কলকাতায় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড ব্যাপক আকারে সংগঠিত হতে থাকে।

নভেম্বর মাসে আমেরিকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভারতে এসে যতীনকে জানালেন, গদার পার্টির চার হাজার সদস্য আমেরিকা থেকে বিদ্রোহের জন্য ভারতে এসেছেন। বিদ্রোহ শুরু হলে আরো ২০ হাজার ভারতে আসবেন। তারপর সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও বিষ্ণু গনেশ পিঙ্গলু যতীনের কাছে পরিচয় পত্র নিয়ে কাশীতে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা বলেন এবং বিপ্লবী সংগঠনের কাজে যুক্ত হন।

১৯১৪ সালে যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের জাগরণ সৃষ্টি করতে অবিরত কাজ করেন সার্বাধিনায়ক যতীন। গোপনে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বিপ্লবী গদার পার্টির হাজার হাজার সশস্ত্র সদস্যের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হয়। সংগ্রহ করা হয় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ।

১৯১৫ সালে সার্বাধিনায়ক যতীন সমগ্র ভারত নিয়ে একটি বিপ্লবের চিন্তা করেন। তিনি রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ স্যানালের সহযোগীতায় বেনারস, দানাপুর, সিকোল, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, মীরাট, দিল্লি, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, আম্বালা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের সৈন্যদের 'জাতীয় অভ্যুত্থানের' জন্য অনুপ্রাণিত করে তাদেরকে প্রস্তুতি নিতে বলেন।

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। বিদ্রোহ ঘটানোর দিন ধার্য করা হয় ২১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত। কিন্তু পরে ২১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তন করে ১৯ ফেব্রুয়ারি করা হয়। প্রধান লক্ষ্যস্থল পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর। কারণ ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে সেখানে স্বাধীন ভারতের পতাকা ওড়াতে হবে। সেই সঙ্গে বারাণসী ও জব্বলপুর সেনা ঘাঁটিও প্রস্তুতি নিয়ে অধীর অপেক্ষায়। রাসবিহারী, শচীন সান্যাল ও হেরাম্বলাল গুপ্ত এই সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনীর প্রধান গুপ্ত দপ্তর স্থাপন করেন লাহোর শহরের ৪টি গুপ্তস্থানে।
অবাঙালি বিপ্লবী রামশরণ দাসের বাড়িতে বিদ্রোহের আদেশ প্রদানের সময়টুকুর প্রতীক্ষায় ছিলেন তারা। কিন্তু বিদ্রোহের ঠিক ৪ দিন পূর্বে এই ষড়যন্ত্রের খবর ফাঁস করে দেয় এই রামশরণ দাস লোকটি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে যেখানে যেখানে সম্ভব দেশীয় সৈন্যদেরকে অস্ত্রহীন করে এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ৪ প্রধান দপ্তরের একটিতে অকস্মাৎ হামলা চালায়। বিপ্লবীদের একটি দল ১৯ তারিখ সন্ধ্যেবেলায় লাহোরে নিযুক্ত ব্রিটিশ সেনানিবাসে হামলা চালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই সশস্ত্র হামলায় দুপক্ষের অনেক লোক মারা যায়। দ্রুত সমস্ত লাহোরব্যাপী এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসন সমস্ত শক্তি দিয়ে এই সশস্ত্র বিদ্রোহের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। এটাকেই ব্রিটিশরা ঐতিহাসিক 'লাহোর ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত করে।
এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর যতীন বিপ্লবীদের নিয়ে একটা বৈঠক করেন এবং এক এক জনকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। সকলে ভারতের স্বাধীনতার জন্য নতুন আঙ্গিকে কাজ শুরু করেন। নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বিপ্লব করার জন্য লড়ে যান। এ সময়কালে বিপ্লবীদেরকে সুরেশ নামক এক পুলিশ অফিসার প্রায়ই জ্বালাতন করতেন এবং বিনা কারণে ধরে নিয়ে যেতেন। বিপ্লবীরা একদিন সুরেশকে সুযোগ বুঝে শেষ করে দেয়। মৃত্যুর আগে যতীনের সঙ্গীরা তাকে মেরেছে বলে সুরেশ লিখিত দিয়েছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার যতীনের উপর আবার গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মোটা অংকের টাকা ঘোষণা করে। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারত রক্ষা আইন চালু করে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের একের পর এক গ্রেফতার করে বিনা বিচারে বন্দী রাখার ব্যবস্থা করে। আগস্ট মাসের প্রথম দিকে গুপ্ত সমিতির পররাষ্ট্র বিভাগের দপ্তরে পুলিশ হানা দিয়ে ওই দপ্তরে নিয়েজিত বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে। এরপর থেকে বিপ্লবীদের আস্তানাগুলোতে পুলিশ একের পর এক হানা দিতে থাকে। ইতোমধ্যে সার্বাধিনায়ক যতীন জার্মান সরকার ভারত থেকে ইংরেজকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা করেন। জার্মানির সাহায্য কামনা করলে জার্মান সরকার সম্মত হয়। কলকাতাস্থ জার্মান কনসাল জেনারেলের সাথে আলোচনার জন্য ইন্ডিয়ান-ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি যতীন মুখোপাধ্যায়ের নিকট একজন দূত পাঠান। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, জার্মান জাহাজ মাভেরিক থেকে অস্ত্র নিয়ে বালেশ্বর রেললাইন অধিকার করে ইংরেজ সৈন্যদের মাদ্রাজ থেকে কলকাতা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করবেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী চারজন সহযোদ্ধাকে নিয়ে বুড়িবালাম নদীর তীরে অপেক্ষা করতে থাকেন যতীন্দ্রনাথ।
কিন্তু ব্রিটিশ গোয়েন্দারা লোভী গ্রামবাসীর মাধ্যমে তাদের আত্মগোপন করার কথা জানতে পারে। ওই গ্রামবাসীরা এই বিপ্লবী দলকে পালাতে সুযোগ দেয়নি। তারা সারাক্ষণ বিপ্লবীদের পিছু নিয়ে পুলিশকে খবর দেন। ইতোপূর্বে সমস্ত পরিকল্পনা জানতে পেরেছিল পুলিশ। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। বিপ্লবী দলকে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘিরে ফেলে। তবে যতীন তার চার সহযোদ্ধাকে সাথে নিয়ে ইংরেজ পুলিশের বিরুদ্ধে লড়ে যান। যুদ্ধের

মাঝেই মারা যায় চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী। যতীন গুরুতর আহত হয়ে পরদিন বালেশ্বর হাসপাতালে মারা যান। সহযোদ্ধা মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তর ফাঁসি হয় এবং জ্যোতিষ পালের ১৪ বছর কারাদণ্ড হয়।

যতীন বেঁচে ছিলেন মাত্র ৩৬ বছর। এই ছোট জীবনে তিনি তার জীবন-সংগ্রাম দিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখে গেছেন। মানুষের স্বাধীনতা, অধিকার ও শোষণমুক্তির আন্দোলন যতদিন চলবে ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, বেঁচে থাকবেন মানুষের মাঝে। বেঁচে থাকবেন যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসে। মানুষের চেতনায় ও কর্মে। জয়তু বিপ্লবী বাঘা যতীন।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

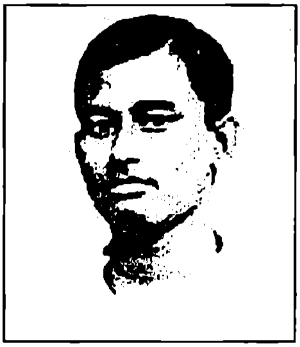
১. বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী– সম্পাদনা: দেবপ্রসাদ জানা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশকাল ৫ জানুয়ার ২০০৮।

২. বাঘা যতীন– পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিকেশন-কলকাতা, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৩।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি কলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৯।

৪. বাংলার মুক্তি সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টপাধ্যায়/রাখী চট্টপাধ্যায়, কলকাতা, প্রকাশকাল মে ২০০৫।

বিনয় বসু



১৯৩০ সালের ২৯ আগস্ট, সকাল ৯ টায় ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে নিহত হন বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এফ. জে লোম্যান এবং গুরুতর আহত হন ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. ই হডসন।

হাসপাতালে জেল পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. বার্ট অসুস্থ ছিলেন। তাকে দেখতে লোম্যান হাসপাতালে গিয়েছিলেন। অসংখ্য পুলিশ সতর্ক নিরাপত্তা বেষ্টনি তৈরি করে লোম্যানকে গার্ড দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবীরাও সতর্ক অবস্থায় হাসপাতালে রোগী বেশে অবস্থান করেছিলেন। বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিনয় বসু। এফ. জে লোম্যান তার সহকর্মী মি. বার্টকে দেখে হাসপাতালের ওয়ার্ড থেকে বের হওয়ার পরপরই বিনয় বসু'র রিভলবারের গুলিতে নিহত হন এবং লোম্যানের দেহরক্ষী আহত হয়। এসময় ব্রিটিশভক্ত কন্ট্রাক্টর সত্যেন সেন বিনয় বসুকে জড়িয়ে ধরে রাখার চেষ্টা করে। বিনয় বসু তৎক্ষণাৎ তাকে একটি মাত্র ঘুষি মারে। এক ঘুষিতে সত্যেন সেন যমালয়ে চলে যায়। তারপর বিপ্লবী বিনয় বসু হাসপাতালের সুউচ্চ পাঁচিলের উপর উঠে সুকৌশলে পার্শ্ববর্তী বাড়ির ছাদের জলট্যাঙ্কের উপর লাফিয়ে পড়েন এবং মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির ভিতর দিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান। লোম্যান হত্যাকারী বিপ্লবী বিনয় বসুকে উদ্দেশ্য করে সেদিন বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাকে আর্শিবাদ করে বলেছিলেন, 'ধন্যি ছেলে, দেখিয়ে গেছে আমরাও জবাব দিতে জানি।'

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর ঢাকায় সর্বত্র পুলিশের অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে বাংলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ এফ. জে লোম্যানকে হত্যা করে এক আততায়ী নিরাপদে পালিয়ে যাওয়া ঢাকা পুলিশের অকর্মণ্যতার পরিচায়ক। সুতরাং অকর্মণ্যতার গ্লানি দূর করার জন্য আসামীর সন্ধান করতে থাকে পুলিশ। পুলিশ হন্যে হয়ে ছুটে শহরের ওলি-গলিতে। জনসাধারণকে মারধর শুরু করে। যুবকদের ধরে থানায় আটক রেখে নির্যাতন চালায়। এসময় ঢাকাবাসী পুলিশের অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠে। পুলিশের অত্যাচারের ভয়ে অনেক স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ঢাকা ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। লোম্যান হত্যাকারী আততায়ীকে পুলিশ ধরতে সক্ষম না হলেও তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। আততায়ী যুবকের নাম বিনয় বসু। তার বাবার নাম রেবতী মোহন বসু।

গ্রাম রাউথভোগ, বিক্রমপুর। বিনয় বসু মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। বিনয় বসুকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ সারা বাংলাদেশ তন্নতন্ন করে খুঁজে। সবত্র বিনয় বসুর ছবিওয়ালা পোস্টার লাগিয়ে দেওয়া হয়। ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মোটা অংকের টাকা দশ সহস্র মুদ্রা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কোথাও বিনয়কে পাওয়া গেল না। কেউ ধরিয়েও দিল না।

আর অন্যদিকে বিনয় বসু ও দলীয় সদস্য সুপতি রায় মুসলিম শ্রমিক বেশে দোলাইগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে চাষাড়া যান। চাষাড়া রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন থামা মাত্র তারা দেখতে পেলেন, পুলিশ প্রতিটি কামরায় উঠে আততায়ীকে ধরার জন্য চিরুনি অভিযান চালাচ্ছে। বিনয় বসু ও সুপতি রায় খুব সতর্কভাবে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে ট্রেন থেকে নেমে যান। তারা দুই জন স্থানীয় বিপ্লবী গিরিজা সেনের বাড়িতে আত্মগোপন করেন। পরদিন ভোরে তারা খেয়া পার হয়ে বন্দরে যান (নারায়নগঞ্জ শহরের বিপরীত পাড়)। সেখান থেকে বৈদ্যনাথবাজার। তারপর মেঘনা পাড়ি দেওয়ার পালা। মেঘনা পাড়ি দেওয়ার জন্য মুসলমান শ্রমিকের বেশ পরিত্যাগ করে সুপতি রায় জমিদার বেশ এবং জমিদারের ভৃত্য ছদ্মবেশ ধারণ করেন বিনয় বসু। বিনয় বসু জমিদারের (সুপতি রায়) সফরের জন্য একখানা নৌকা জোগাড় করেন। শুরু হয় মেঘনা পাড়ি। কিন্তু পথিমধ্যে আরেক বিপদ এসে উপস্থিত। এ বিপদের নাম কালবৈশাখী ঝড়। অনেক কষ্টে তারা ওই পাড়ে গিয়ে স্টিমারে উঠতে সক্ষম হন। স্টিমারে উঠে পুনরায় মুসলমান শ্রমিকের বেশ ধরেন। তারপর স্টিমারে চড়ে ভৈরব এসে ট্রেন স্টেশনে যান এবং ট্রেনে চড়ে কালকাতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। কিশোরগঞ্জ স্টেশনে এসে তারা দেখতে পান যে, পুলিশ আততায়ীকে ধরার জন্য ট্রেনে উঠে গাড়ির কামরাগুলো একে একে তল্লাশি চালাচ্ছে। এসময় তারা কিছুটা ভীত হয়ে পড়েন। দুজনই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হঠাৎ জানালার পাশে টি.টি'কে দেখতে পান। 'দু'জনে তড়িঘড়ি করে গাড়ি থেকে নেমে টি.টি'র পা জড়িয়ে ধরেন আর বলেন, কর্তা এইবার একটা আকাম কইরা ফালাইছি। এইবারের মতো আমগো ম্যাফ কইরা দ্যান। আমরা পোলাপান মানুষ, তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতা গিয়া টিকিট কইরতা পারি নাই। এহন পুলিশ ধইরা নিব।' টি. টি বললেন, কোথাকার টিকিট চাই? 'খাইছে অহন জায়গার নামতো মনে নাই। মকবুল চাচা কি যে কইছিল, ভুইল্যা গেছি। সবুর করেন, মনে কইরা কইতাছি। হো হো কইলকাতা। কইলকাতা গিয়া আমরা কাপড়ের দোকানে কাম কইরুম। কর্তা আর দেরি কইরেন না, কর্তা। আপনার চরণ ধরি। লই যান টিকেট ঘরে। আমরাও আপনার লগে যাইতাছি।' দুজনই টি.টি'র সাথে টিকেট ঘরের দিকে চলে গেল। ইতোমধ্যে ট্রেনের সকল কামরা তল্লাশি করা শেষ হয়েছে। তারপর উভয়ে গিয়ে ট্রেনের কামরায় উঠলেন। ট্রেন চলে গেল ময়মনসিংহ স্টেশনে।

ময়মনসিংহ স্টেশনে আবার এক মহাবিপদে পড়লো তারা। ট্রেন থামার সাথে সাথে এক বপু দারোগা পুঙ্গব তাদের বগিতে উঠে তার সহযোগী পুলিশ কনস্টেবলদের বলছে, 'চারদিক সতর্ক দৃষ্টি রাখবি তোরা। দেখিস বিনয় বোসটা যেন কোনো ফাঁকে পালিয়ে না যায়। ও ব্যাটা ভয়ানক ধূর্ত, এই গাড়িতে হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে।' সঙ্গী পুলিশরা দারোগা সাহেবের প্রতিটি কথা সমর্থন করল। বিনয় বসু ও সুপতি রায় ততক্ষণাৎ পুলিশকে

ফাঁকি দেয়ার পরামর্শ সেরে নিয়ে বিনয় বসু ছেঁড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল আর সুপতি রায় দু-হাত জোড়ে দারোগার দিকে দাড়িয়ে রইলেন। মুখে-চোখে তার এমনি ভাব যেন দারোগা দেখে বুঝতে পারে সে অত্যন্ত ভয়ের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। দারোগা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে ব্যাটা! অমন হা করে এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ছদ্মবেশি সুপতি রায় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্তর দিলেন, 'আপনাগো অনুমতি না পাইলে তো বইতে পারি না হুজুর! আর কি কইতাছেন আপনে, বিনয় বোস আবার ক্যাডা? তারে ধরবার লাইগা বলছেন– পাইলে ধইরা দিমু আমরা।' 'আচ্ছা বেশ ভাল কথা। বিনয়কে যদি ধরতে পারিস দশ হাজার টাকা বকশিশ পাবি– বুঝলি।'

'বড় বিপদে পড়েছি হুজুর! ভাতিজাডারে লইয়া চলছিলাম ট্রেনে– তার হয়ে গেছে তাপ– কাইল থাইক্যা গায়ে দুই একডা ফুসকিরিও উঠতাছে– বড় ভাবনায় পড়ছি সা'ব।' 'ফুসকিরি– কিসের ফুসকিরি রে ব্যাটা?' কথাগুলো বলে দারোগা উঠে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে দারোগার মুখ বিবর্ণ হয়ে পড়েছে– বিনয়কে ধরার উৎসাহ অনেকটা কমে এসেছে। গ্রাম্য মুসলমানটি (সুপতি রায়) কামরার একপাশে শায়িত ভাতিজাটিকে দেখিয়ে বলল– 'আমার চাচাতো ভাই নূর মিয়ার পোলা– প্রলাপ বকছে হুজুর! কাঁপতেছে– এক্কেবারে বেহুঁশ– এই দেহুন।' এই কথা বলে রোগির দেহে জড়ানো কাপড়ে হাত দিতেই দারোগা এক লাফে দুই/তিন হাত দূরে সরে গেলেন এবং মুখ ভ্যাংচাইয়া বললেন– আর দেখবার কাজ কি রে ব্যাটা? বসন্ত রোগী নিয়ে ট্রেনে চড়েছ– আবার বলছো দেখুন!' বসন্তরোগভীত দারোগা পরবর্তী স্টেশনে সদলবলে নেমে গেলেন।

দারোগা চলে যাওয়ার পর তারা নিরাপদে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে পৌছালেন। জগন্নাথগঞ্জ ঘাট হতে সিরাজগঞ্জ আর সেখান থেকে সোজা কলকাতা। ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছানোর পূর্বে তারা দমদম স্টেশনে নেমে ওয়ালীউল্লাহ্ লেনে অবস্থিত বিপ্লবী সুরেশ মজুমদারের বাড়িতে গিয়ে উঠেন। সুরেশ বাবুর বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। ঢাকা থেকে বহু বিপদ-আপদের পথ পাড়ি দিয়ে বিনয় কলকাতা পৌছলেও নেতৃবৃন্দ নিশ্চিন্ত বোধ করেননি। বরং তারা বিনয়কে সর্বোচ্চ নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য 'কাতারামগড়' কালিয়ারীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। অন্যদিকে কলকাতা পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারছিল যে, বিনয় কলকাতায় পালিয়ে রয়েছে এবং এখান থেকে খুব শীঘ্রই নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে। ফলে সবগুলো রেলস্টেশনে তাকে ধরার জন্য বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

ব্যান্ডেল স্টেশনে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বন্দুক হাতে প্রস্তুত। দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই কলকাতাগামী ট্রেন এসে পৌছাবে। তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সবগুলো কামরা বিশেষভাবে তল্লাশী করতে হবে বলে নির্দেশ প্রদান করছেন। কারণ এই গাড়িতেই বিনয়ের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ট্রেন এসেছে এমন সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মোটরগাড়ি দেখে পুলিশ বিস্মিত হল। দেখলেন মোটরগাড়ি হতে নামলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কনফিডেন্টসিয়াল ক্লার্ক সরোজ রায় এবং তার সঙ্গে আরো দুজন। আত্মীয় দুজনকে ট্রেনের কামরায় তুলে দিয়ে হাসি মুখে পুলিশকে বললেন, 'চারদিকে নজর রেখো। বিনয় এই গাড়িতে আসার কথা। বেটা ভারী ধূর্ত। কোনো ছদ্মবেশ ধারন করে হয়ত পালিয়ে যাবে। খুব সাবধান।

মনে রেখ এবারের পুরস্কার দশ হাজার টাকা।' তারপর সরোজ বাবু গাড়িতে উঠে চলে যান। সরোজ বাবুর আত্মীয় দুজনের একজন ছিলেন, বিনয় বসু। সরোজ বাবুই বিনয়ের পালাবার ব্যবস্থা করেন।

বিনয় কাতারামগড় কালিয়ারীতে দলীয় বন্ধু অনাথ দাশগুপ্তের বাড়ি চলে গেলন। এই বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের আর একটি গোপন আস্তানা। সেখান থেকে বিনয় কিছুদিন পর কলকাতায় আসেন। নেতারা তখন চিন্তিত হয়ে পড়েন বিনয়ের নিরাপত্তার জন্য। বিপ্লবীরা দেশবরণ্যে নেতৃবৃন্দের কাছে বিনয়ের ব্যাপারে পরামর্শ চান। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, লেডি অবলা বসু, শরৎ বসু, সুভাষ বসু, শরৎ চাটার্জিসহ প্রায় সকল নেতাই আত্মরক্ষার জন্য বিনয়কে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার উপদেশ দেন।

বিনয়কে বিদেশ পাঠানোর জন্য 'কিংস-বর্জ ডকে'র জনৈক পদস্থ কর্মচারীকে ঠিক করা হল। পরদিন বিনয়কে সমুদ্রগামী একখানা জাহাজে তুলে দেওয়া হবে। যাতে করে সে সোজা ইটালিতে যেতে পারে। কিন্তু সকল পরামর্শ ও প্রস্তুতির অবসান ঘটিয়ে দিল বিনয়। তিনি কিছুতেই মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে রাজি নন, বরং পরবর্তী অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য সিনিয়র বিপ্লবীদের কাছে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন।

বিপ্লবীদের পরবর্তী অভিযান ছিল কলকাতার 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণ। অসংখ্য পুলিশ প্রহরী পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য অফিস রাইটার্স বিল্ডিং। এই ভবন আক্রমণ করে সেখান হতে ফিরে আসার আশা কেউ করতে পারে না। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা চলল। কে করবেন এই আক্রমণ পরিচালনা? এই দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন বিনয় বসু। তার সঙ্গী হলেন আরো দুইজন নির্ভীক যুবক। দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত। কিশোর বয়স থেকেই বিনয়, দীনেশ ও বাদল পরস্পর পরিচিত ছিলেন। তিনজনই ছিলেন পূর্ববাংলার (ঢাকার) সন্তান। কৈশোরকাল থেকেই তিনজন দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতার মুক্তিযজ্ঞে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেন। ঘটনাচক্রে এই তিন বন্ধুই একসঙ্গে 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণে দায়িত্ব নেন।

বিপ্লবী নেতারা অনেক ভেবেচিন্তে তাদেরকে 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণ করার অনুমতি দেন। নেতারা স্থির করলেন ভারত সরকারের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঘাঁটিগুলোর সরকারি অফিসের কেন্দ্রস্থল 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণ করে দেখাতে হবে যে বিপ্লবীরা সক্রিয় রয়েছে। তাদের একজনকে জেলে বন্দী করলে দশজন অগ্রসর হয়।

ওই বছর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-নির্যাতন আরো শতগুণে বেড়ে যায়। শতশত রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে জেলে আটক রেখে নির্যাতন চালায়। এই সময় ব্রিটিশ পুলিশ সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সত্য বকসীর মত নেতৃত্বকেও গ্রেফতার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখে। একের পর এক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ভরিয়ে ফেলা হচ্ছিল। এই সব বন্দীদের মধ্যে ছিলেন অসংখ্য সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য এবং অহিংস আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরা। একপর্যায়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে নতুন বন্দীদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছিল না।

জেলের মধ্যে সৃষ্টি হল এক অসহনীয় অবস্থা। রাজবন্দীদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। তারা জেলকোড অনুযায়ী কয়েকটি দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন দমানোর জন্য ব্রিটিশ পুলিশ বেদমভাবে লাঠিচার্জ চালায়। অতঃপর পাগালা ঘন্টি বাজানো হল। রাজন্দীরের উপর চলল নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার। সুভাসচন্দ্র, যতীনন্দ্রমোহন এবং সত্য বকসীরাও বাদ গেলেন না নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে। এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ল জেলের ভিতরে। জানা গেল এই নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচারের পিছনে রয়েছে ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এনএস সিম্পসন সাহেব।

বিপ্লবীদের টার্গেট ছিল কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনরেল লে. কর্নেল সিম্পসন। যিনি বসতেন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ। জেলখানার বন্দীদের উপর পাশবিক নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত ছিল সিম্পসন। তাই সিম্পসনের নাম হত্যা তালিকার শীর্ষে ছিল। সিম্পসনের পরে ছিল সেক্রেটারি মি. আলবিয়ানের নাম। আলবিয়ানের পর ছিল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মি. ক্রেগ ও জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মি. নেলসনের নাম। এরা সবাই ছিল নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত পুলিশ অফিসার। স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের উপর এরা নানামাত্রিক অত্যাচার-নির্যাতন চালাত।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। আক্রমণের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল। খুব সতর্ক অবস্থায় তাদের প্রশিক্ষণের কাজও সমাপ্ত হল। বিনয়-বাদল-দীনেশ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে বিদায় নিলেন। ৮ ডিসেম্বর এ্যাকশনের জন্য তিন বিপ্লবী প্রস্তুত। 'রাইটার্স বিল্ডিং' এর একটি কক্ষে কারা বিভাগের সর্বময় কর্তা ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসন তার কাজকর্ম পরিচালনা করতেন। তার ব্যক্তিগত সহকারী জ্ঞান গুহ পাশে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছেন। বেলা ঠিক ১২ টার সময়। সামরিক পোশাক পরে তিনজন বাঙালি যুবক এসে কর্নেল সিম্পসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তারা সিম্পসনের চাপরাশীকে (সহকারি) ঠেলে কামরার ভিতরে প্রবেশ করেন। হঠাৎ পদধ্বনি শুনে কর্নেল তাদের দিকে তাকান। বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তে দেখতে পান সম্মুখে মিলিটারি পোশাক পরে তিনটি বাঙালি যুবক রিভলবার হাতে দণ্ডায়মান। মুহূর্তের মধ্যে বিনয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়– 'প্রে টু গড কর্নেল। ইওর লাস্ট আওয়ার ইজ কামিং।' কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনটি রিভলবার হতে ছয়টি গুলি সিম্পসনের দেহ ভেদ করে। সিম্পসন লুটিয়ে পড়ে মেঝের ওপর। এরপরই গুলির আঘাতে আহত হন জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মি. নেলসন। এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করতে করতে আততায়ীরা পরবর্তী লক্ষ্য হোম সেক্রেটারি আলবিয়ান মারের কক্ষের দিকে অগ্রসর হন। ততক্ষণে এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ছুটে আসেন পুলিশ-ইন্সপেক্টর জেনারেন মি. ক্র্যাগ ও সহকারি ইন্সপেক্টর জেনারেল মি. জোনস। তারা কয়েক রাউন্ড গুলিও ছুড়েন। কিন্তু বিনয়-বাদল-দীনেশের বেপরোয়া গুলির মুখে তারা দাঁড়াতে পারলেন না। প্রাণ নিয়ে পালালেন। সমস্ত 'রাইটার্স বিল্ডিং' জুড়ে তখন এক বিভীষিকাময় রাজত্ব। চারিদিকে শুধু ছুটাছুটি। কে কোন দিকে পালাবে খুঁজে পায় না। শুধু কলরব-কোলাহল-চিৎকার। শুধু এক রব 'বাঁচতে চাও তো পালাও'। 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট আসেন। ডেপুটি কমিশনার গার্ডন আসেন সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে। পাদ্রী রেভারেন্ড জনসন 'ড্রেন-

পাইপে'র মধ্য পালিয়ে থাকলেন। জুডিসিয়েল সেক্রেটারি মি. নেলসন, মি. টয়নয় প্রমুখ অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ আহত হলেন। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ডেকে আনা হল গুর্খাবাহিনী।

একদিকে তিনটি বাঙালি তরুণ, হাতে শুধু তিনটি রিভলবার। আর অপরদিকে রাইফেলধারী সুশিক্ষিত গুর্খাবাহিনী। আরম্ভ হল 'অলিন্দ যুদ্ধ'। ইংরেজ মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার ভাষায় 'বারান্দা বেটল'। দীনেশের পিঠে একটি গুলি বিদ্ধ হল। তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। অসংকোচে গুলিবর্ষণ করতে লাগলেন শত্রুকে লক্ষ্য করে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিনয়-বাদল-দীনেশের হাতে গুলি ছিল, ততক্ষণ কেউই তাদের আক্রমণ করে প্রতিহত করতে পারেননি। এক পর্যায়ে তাদের গুলি নিঃশেষ হল। গুর্খা ফৌজ অনবরত গুলিবর্ষণ করে চলল। তখন তিনজন বিপ্লবী একটি শূন্য কক্ষে প্রবেশ করে সঙ্গে আনা 'সায়ানাইড'-বিষের পুরিয়াগুলি মুখ দিলেন। বিষ-ক্রিয়ায় অতি-দ্রুত জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত না হওয়ার আশংকায় এবং মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ ললাট লক্ষ্য করে রিভলবারে রাখা শেষ গুলিটি ছুঁড়ে দিলেন। বাদল তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন। বিনয় ও দীনেশ সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মেঝের উপর পড়ে রইলেন।

ভীষণভাবে আহত বিনয় ও দীনেশকে একটু সুস্থ করে তাদের উপর চলল প্রচণ্ড অত্যাচার। উভয়কেই পুলিশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট এতদিন পরে বিনয়ের উপর আক্রোশ মিটানোর সুযোগ পেলেন। অচেতন বিনয়ের হাতের আঙ্গুলের উপর সবুট পদক্ষেপে সবগুলি অঙ্গুল ভেঙ্গে ফেলে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন।

বিনয় ছিলেন মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। তিনি জানতেন মৃত্যুর পথ। হাসপাতালে অবস্থানকালে তিনি ১৪ ডিসেম্বর রাত্রে আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে বরণ করার জন্য মস্তকের 'ব্যান্ডেজে'র ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে স্বীয় মস্তিষ্ক বের করে আনেন এবং মৃত্যুকে বরণ করে নেন। অন্যদিকে ডাক্তার ও নার্সদের আপ্রাণ চেষ্টায় দীনেশ ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠেন। সুস্থ হওয়ার পর দীনেশের উপর চলে প্রচণ্ড অমানবিক নির্যাতন। এভাবে দীর্ঘদিন নির্যাতন ও চিকিৎসার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে 'কনডেমনড' সেলে নেয় হয়। অতঃপর দীনেশের বিচারের জন্য আলীপুরের সেসন জজ মি. গার্লিকের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সরকার এক ট্রাইবুন্যাল গঠন করে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই দীনেশের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

বিনয় বসু জন্মেছিলেন ১৯০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। মুন্সিগঞ্জ জেলার রোহিতভোগ গ্রামে। তার পিতা নাম রেবতীমোহন বসু। তিনি ছিলেন একজন প্রকৌশলী। বিনয়ের বাবা পরিবার নিয়ে ঢাকাতে বসবাস করতেন। তাই বিনয় বসু ছোটবেলা থেকে ঢাকায় বড় হয়েছেন। ঢাকা থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পর তিনি মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল (বর্তমানের স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ) এ ভর্তি হন। এই মেডিকেল কলেজে পড়াশুনাকালীন সময়ে বিনয় বিপ্লববাদী রাজনীতিতে যুক্ত হন। ব্রিটিশবিরোধী অগ্নিবিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সংস্পর্শে এসে বিপ্লববাদী যুগান্তর দলে যুক্ত হন।

শৈশব থেকে বিনয় ছিলেন প্রচণ্ড জেদী ও সাহসী। বিপ্লববাদী দলে যুক্ত হওয়ার পর বিনয় তার অসীম সাহস ও দূরদর্শিতা দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার শপথ নেন।

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার জন্য তিনি তার ডাক্তারি লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। বিনয় বিপ্লবী দলে যুক্ত হওয়ার পর সহপাঠিদের অনেককেই বিপ্লবী দলে ভেড়ান। ১৯২৮ সালে বিনয় ও তার সহপাঠিরা/সহযোদ্ধারা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে যুক্ত হন। এই বিপ্লবী দলে যুক্ত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই বিনয় এই দলের ঢাকা শাখা গড়ে তোলেন। এসময় সারা ভারত জুড়ে চলতে থাকে বিপ্লবীদের উপর পুলিশের জলুম-নির্যাতন। এই বিপ্লবী দল রাজবন্দীদের উপর পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৩০ সালে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে বিপ্লবীরা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই হত্যার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিনয়। ১৯৩০ সালের ২৯ আগস্ট বিনয় লোম্যানকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনাস্থলেই লোম্যান মারা যায়।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে বিনয়-বাদল-দীনেশের নামানুসারে কলকাতার ডালহৌসি স্কয়ারের নাম পালটে রাখা হয় বি-বা-দী বাগ। অর্থাৎ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিযুগের ইতিহাস– ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন, প্রকাশক: মুক্তধারা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭৯।

২. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা– হেমচন্দ্র কানুনগো, চিরায়ত প্রকাশনি, কলকাতা, প্রকাশকাল জুন, ১৯২৮।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি কলকাতা।

৪. ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা– চিন্ময় চৌধুরী, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রকাশকাল, জানুয়ারি ১৯৯৮।

৫. বিদ্রোহী ভারত– নীহাররঞ্জন গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিলেট, কলকাতা, প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৯১।

৬. হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ভারতের বিপ্লব কাহিনী, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮।

বাদল গুপ্ত



জন্ম থেকে মৃত্যু, এই চলার পথটির নামই জীবন। কিন্তু সব জীবন অর্থবহ হয় না। সবার জীবন নিয়ে জীবনী হয় না, তাই ইতিহাস তাদের ধরেও রাখে না। ইতিহাস ধরে রাখে শুধু তাদেরই, যারা হয়ে ওঠেন বিশিষ্ট ও অনন্য-অসাধারণ জীবনের অধিকারী। যে জীবনকে সবাই শ্রদ্ধা করে। আবার অনেকে অনুকরণ-অনুসরণ করার চেষ্টা করে। এমন জীবন শুধু জন্মসূত্রে পাওয়া যায়না, এটা অর্জন করতে হয়, তৈরি করতে হয় কঠোর শ্রম, গভীর নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ দিয়ে। এর জন্য তৈরি কোনো পথ নেই, পথ তৈরি করে করে এগোতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রেরণা হয়ে পথ দেখায় এক মহৎ জীবনবোধ, আদর্শবোধ ও দেশপ্রেম। দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার মহান আদর্শে দীক্ষিত এমনি কিছু মুক্তি-পাগল মানুষ 'জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' করে সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাফেলায়। অনেকের সঙ্গে সংগ্রামের কাফেলায় শামিল হয়েছিলেন বিপ্লবী বাদল গুপ্তও।

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই-সংগ্রাম গড়ে উঠে। ভারত উপমহাদেশ সেই সমস্ত দেশের মধ্যে অন্যতম। এখানেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তুখোড় আন্দোলন গড়ে উঠে। এই আন্দোলন সাধারণত: দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল। একটি দল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। যাকে বলা যায় কংগ্রেসীয় নরমপন্থী আন্দোলন। আর অন্যটি ছিল সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলন। মূলত: সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের কারণে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তরান্বিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ বিতাড়িত হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবী রয়েছেন, তাদের মধ্যে ঢাকার বিনয়-বাদল-দীনেশ অন্যতম বিপ্লবী।

অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই ঢাকার অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর পার্টি, চট্টগ্রামের দি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, কলকাতার অনুশীলন সমিতি, মেদিনীপুর বিপ্লবী দল, বিপ্লবী কমিউনিস্ট সংগঠন, মালামার বিপ্লবী দল ও স্বরাজ পার্টিসহ অন্যান্য বিপ্লবী দল স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। এ সমস্ত দলের অসংখ্য বিপ্লবী সদস্যরা ভারতমাতার স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। বাদল গুপ্তও এই জীবন উৎসর্গকারী বিপ্লবীদের একজন।

বিপ্লবী বাদল গুপ্ত একজন বাঙালি বিপ্লবী। তার আসল নাম সুধীর গুপ্ত। ডাক নাম ছিল বাদল। বাদল গুপ্ত জন্মেছিলেন ১৯১২ সালে। ঢাকার বিক্রমপুর এলাকার পূর্ব শিমুলিয়া

গ্রামে। যা বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। তার বাবার নাম অবনী গুপ্ত। তার ভ্রাতা তরণী গুপ্ত ছিলেন ৫৬ নম্বর গৌরীবাড়ি লেন-এর 'ভবানী ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেডিং কোম্পানি'র প্রধান। তার পিতৃব্য নরেন্দ্র গুপ্ত ও ধরণী গুপ্ত মুরারীপুকুর বোমা মামলায় দণ্ডিত হয়েছিলেন। পারিবারিকভাবেই বাদল গুপ্ত বিপ্লবী রাজনৈতিক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেন। যা তার পরবর্তী বিপ্লবী জীবনকে প্রভাবিত করে।

বাদল গুপ্তের পড়াশুনার হাতেখড়ি পিতা-মাতার কাছে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ হলে তাকে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় বানারিপাড়া স্কুলে। ছোটবেলা থেকেই বাদল গুপ্ত ছিলেন অসীম সাহসী ও দুরন্ত স্বভাবের। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও তার বেশ মনোযোগ ছিল। কিছুটা রাগী মানসিকতারও ছিলেন। তবে সহজে কাউকে কিছু বলতেন না। একটু বড় হওয়ার পর বাদলের রাগী মানসিকতা হ্রাস পায়। স্কুলে পড়াশুনাকালীন সময় থেকেই বাদল গুপ্ত স্বদেশপ্রেম ও রাজনীতির নানাবিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেন। কারণ ওই সময়ে সারা ভারতে ব্রিটিশবিরোধী ও ভারতমাতার স্বাধীনতা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। যা বাংলা-ভারতের প্রতিটি সচেতন পরিবারের সদস্যরা জানতো। সন্ধ্যার পরে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে পাড়া-মহল্লায় আলোচনা হতো। এই আলোচনায় অনেক সময় ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীনসহ আরো অনেক বিপ্লবীর বিপ্লবী জীবনের কথা উঠে আসতো। ওই সমস্ত পরিবারের কিশোর-তরুণরা তখন খুব মনোযোগ দিয়ে এই সমস্ত কিংবদন্তী বিপ্লবীদের জীবন কাহিনী শুনতো। কিশোর-তরুণরা মাঝে মাঝে বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা বই-পুস্তক সংগ্রহ করে বেশ আগ্রহ সহকারে পড়তো। বাদল গুপ্তও ছিল সেসব তরুণদের মধ্যে একজন।

তদানীন্তনকালে ঢাকাতেই বিপিনবিহারী দাসের নেতৃত্ব 'ওয়ারিতে' প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী দল গড়ে ওঠে, ঠিক বঙ্গভঙ্গের পরেই। বিনয়-বাদল-দীনেশও ছিল ঢাকার ছেলে। পাশাপাশি গ্রামের। কিশোর বয়সে বিনয়, দীনেশ ও বাদল পরস্পর পরিচিত হন এবং তিন জনই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মুক্তিযজ্ঞে আত্মসমর্পণ করেন। ঢাকাও জন্ম দিয়েছিল বহু সশস্ত্র বিপ্লবী দলকে। ঢাকার অবদান ছিল যথেষ্ট। ঘটনাচক্রে এই তিন বন্ধুই একসময়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ আক্রমণ করে অত্যাচারী ব্রিটিশকে উচিৎ শিক্ষা দেয়।

বাদল গুপ্ত বানারিপাড়া স্কুলে পড়াশুনাকালে সেখানকার শিক্ষক নিকুঞ্জ সেনের সংস্পর্শে আসেন। তার সান্নিধ্যেই বাদল গুপ্ত স্বদেশি রাজনীতির হাতেখড়ি নেন। বানারিপাড়া স্কুলের শিক্ষক নিকুঞ্জ সেন ছিলেন বিপ্লববাদী দলের সদস্য। এই শিক্ষকের মাধ্যমে খুব সম্ভবত ৯ম বা ১০ম শ্রেণিতে পড়াশুনাকালীন সময়ে বাদল গুপ্ত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স (বিভি) নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। বাদল গুপ্ত তার আন্তরিক নিষ্ঠা ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অল্পদিনেই বিপ্লববাদী দলের একজন সংগঠক হয়ে উঠেন।

১৯২৮ সাল, সারা ভারতের বিপ্লবীদের উপর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে শুরু করে। এ অত্যাচার পূর্বের সকল অত্যাচারকে ছাড়িয়ে যায়। ব্রিটিশ প্রশাসন এসময় তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। একের পর এক বিপ্লবীকে ধরে নিয়ে বিনা বিচারে জেলখানায় আটক রাখে। তারপর বন্দীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এই নির্যাতনের কারণে ওই সময় অনেক বিপ্লবী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। যারা জীবনে আর কোনোদিন পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেননি। বড়লাটকে উদ্দেশ্য করে ক্ষুদিরামের বোমা হামলার পর ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীদের দৃঢ়ভাবে

দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়। যারাই সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ-শাসনকে উচ্ছেদ করতে চাইবে, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করে। যাদেরকে প্রমাণের অভাবে ফাঁসিরকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা যাবে না, তাদেরকে আন্দামানে পাঠানো হবে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ফাঁসিরকাষ্ঠ থেকে রেহাই পাওয়া প্রায় সকল সশস্ত্র বিপ্লবীকে আন্দামানে পাঠায়। আর আন্দামান সেলুলার জেল ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর জেল। যেখান থেকে কেউ ফিরে আসতো না। এক কথায় বলা যায়, এটা ছিল ব্রিটিশদের তৈরি দ্বিতীয় মৃত্যু ফাঁদ।

এসকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ নরপশুদের চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুভাষ চন্দ্র বসু তখন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'কে এ্যাকশনধর্মী বিপ্লবী প্লাটফর্মে রূপান্তর করেন। উদ্দেশ্য একটাই, বিপ্লবীদের রক্তের প্রতিশোধ নেয়া এবং ভারত থেকে ব্রিটিশদের উচ্ছেদ করা। পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হয় ভলান্টিয়ার্সদের আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় দীনেশ গুপ্ত ভলান্টিয়ার্সদের প্রশিক্ষণ দিতেন। এক পর্যায়ে সুভাষ চন্দ্র বসু'র নেতৃত্বে এই ভলান্টিয়ার্সদের বিপ্লবীরা কুখ্যাত ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারদেরকে হত্যা/নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯২৯-৩০ সালের মধ্যে দিনেশ গুপ্তের প্রশিক্ষিত বিপ্লবীরা ডগলাস (Douglas), বার্জ (Burge) এবং পেডি (Paddz)-কে হত্যা করে। এরা ছিল কুখ্যাত অত্যাচারী ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

এভাবে বাংলার বিপ্লবীরা একের পর এক তাদের সহযোদ্ধা হত্যার প্রতিশোধ নিতে থাকে। ফলে ১৯৩০ সালের দিকে ব্রিটিশ আরো বেশি স্বৈরাচারী হয়ে উঠে এবং স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এসময় ব্রিটিশ পুলিশ শত-সহস্র রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে। একের পর এক জেলে আটক রেখে নির্যাতন চালায়। ওই সময় ব্রিটিশ পুলিশ সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সত্য বকসীর মত নেতৃত্বকেও গ্রেফতার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখে। অন্যদিকে একই সময় স্বাধীনতা-সংগ্রামী নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ভরিয়ে ফেলা হচ্ছিল। এই সমস্ত বন্দীদের মধ্যে ছিলেন অসংখ্য সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য এবং অহিংস আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরা। এহেন বাস্তবতা ও পরিস্থিতির ফলে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নতুন বন্দীদের জায়গা দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। এ সমস্যা ছিল প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে।

জেলের মধ্যে সৃষ্টি হল এক অরাজক ও অসহনীয় অবস্থা। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রাজবন্দীরা ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা নানা বিষয়ে প্রতিবাদ শুরু করে। যা এক সময়ে বিক্ষোভে পরিণত হয়। রাজবন্দীরা জেলকোড অনুযায়ী বেশ কয়েকটি দাবিতে জেলের মধ্যে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন দমানোর জন্য ব্রিটিশ পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিচার্জের উন্মত্ততায় মেতে উঠে। অতঃপর বিপ্লবীরাও নিজেদের বাঁচাতে প্রতিবাদ করে। হঠাৎ জেলের পাগলাঘন্টি বাজানো হল। সকল পুলিশ অস্ত্রহাতে রাজন্দীদের উপর নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু করলো। সুভাসচন্দ্র, যতীনন্দ্রমোহন এবং সত্য বকসীরাও বাদ গেলেন না নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে। এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ল জেলের ভিতরের সমস্ত ওয়ার্ডে। অবশেষে জানা গেল এই নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচারের পিছনে রয়েছে ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এন. এস সিম্পসন সাহেব। যিনি এর পূর্বেও বন্দী বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাতেন।

জেলের বাহিরের ভলান্টিয়ার্সের বিপ্লবীরা প্রস্তুতি নিলেন অত্যাচারী সিম্পসনকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য। পরিকল্পনা হল শুধু সিম্পসন নয়, অত্যাচারী ইংরেজ আমলাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বাঙালিরাও লড়তে জানে, প্রতিশোধ নিতে জানে, মারতে জানে এবং এজন্য জীবন দিতেও তারা পিছু হটে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কাঁপিয়ে দিতে হবে, বুঝিয়ে দিতে হবে এই দেশমাতৃকা আমাদের।

বিপ্লবীরা জেলের কুখ্যাত ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এন. এস সিম্পসনকে টার্গেট করল। সিম্পসন জেলখানার মধ্যে বন্দীদের উপর পাশবিক নির্যাতনে প্রধান ভূমিকা পালন করত। শুধু সিম্পসন নয়, রাইটার্স ভবনের আরো অনেক অত্যাচারী পুলিশ বন্দীদের উপর নির্যাতন চালাত। তৎকালীন সময়ে কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ শাসকদের সচিবালয়। যার নাম রাখা হয়েছিল রাইটার্স ভবন। এই ভবনেই উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ আমলারা নিয়মিত অফিস করতেন।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর সকাল বেলা। সমস্ত প্রস্তুতি ঠিক-ঠাক, 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল ভলান্টিয়ার্সের বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে। আক্রমণের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল। খুব গোপনীয়ভাবে এবং সতর্ক অবস্থায় তাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণের কাজও সমাপ্ত হল। বিনয়-বাদল-দিনেশ ভলান্টিয়ার্সের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে বিদায় নিলেন। ৮ ডিসেম্বর দুপুর ১২টা, এ্যাকশনের জন্য তিন বিপ্লবী প্রস্তুত। 'রাইটার্স বিল্ডিং' এর একটি কক্ষে কারা বিভাগের সর্বময় কর্তা ইনপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসন তার নিয়মিত কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। তার ব্যক্তিগত সহকারী জ্ঞান গুহ পাশে দাঁড়িয়ে কি বিষয়ে যেন আলোচনা করছেন। ঠিক এমন সময়, সামরিক পোশাক পরে তিনজন বাঙালি যুবক রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করলেন। প্রহরীকে বললেন, তারা কর্নেল সিম্পসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

প্রহরী তাদের কাছে নানা প্রশ্ন করছে। প্রশ্ন শেষ ভিতরে প্রবেশ করলো। ভবনের ভিতরে প্রবেশ করেই তারা সিম্পসনের চাপরাশিকে (সহকারী) ঠেলে দিয়ে কামরার ভিতরে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ পদধ্বনি শুনে কর্নেল তিন যুবকের দিকে তাকান। বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তে দেখতে পেলেন সম্মুখে মিলিটারি পোশাক পরে তিনটি বাঙালি যুবক রিভলবার হাতে দণ্ডায়মান (বিনয়-বাদল-দিনেশ)। মুহূর্তের মধ্যে বিনয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'প্রে টু গড কর্নেল। ইওর লাস্ট আওয়ার ইজ কামিং।' কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে'তিনটি রিভলবার হতে ছয়টি গুলি সিম্পসনের দেহে ভেদ করে। সিম্পসন লুটিয়ে পড়ে মেঝের উপর। এরপরই বিপ্লবীরা সেক্রেটারি মি. নেলসনকে গুলি করেন। প্রচণ্ড আহত হন জুডিসিয়েল সেক্রেটারি মি. নেলসন।

সামরিক পোশাক পরা এই তিন যুবক এরপর এলোপাথাড়ি গুলি করতে করতে হোম সেক্রেটারি আলবিয়ান মারের কক্ষের দিকে যান। উক্ত সময়ের মধ্যে এই বিপ্লবীদের প্রতিরোধ করার জন্য ছুটে আসেন পুলিশ-ইন্সপেক্টর জেনারেল মি. ক্র্যাগ ও সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেল মি. জোনস। তারা বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে কয়েক রাউণ্ড গুলিও ছুড়েন। কিন্তু বিনয়-বাদল-দীনেশের বেপরোয়া গুলির মুখে মি. ক্র্যাগ ও মি. জোনস দু-মিনিট দাঁড়াতে পারলেন না। তারা দুজন প্রাণ নিয়ে পালালেন। সমস্ত 'রাইটার্স বিল্ডিং' জুড়ে তখন

এক বিভীষিকাময় শব্দ, চারিদিকে শুধু ছুটাছুটি, কে কোন্ দিকে পালাবে খুঁজে পায় না পথ! শুধু কলরব-কোলাহল-চিৎকার..

মাঝে মাঝে শুধু একটি কথা শোনা যায়, বাঁচতে চাও, তো পালাও। এই ঘটনা কয়েক মিনিটের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে কলকাতা জুড়ে। ব্রিটিশ প্রশাসন আঁতকে উঠে। কেউ কেউ নিরাপদ স্থানে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রিটিশ প্রশাসন 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে পাঠান। ডেপুটি কমিশনার গার্ডনকে পাঠানো হয় সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে। তৎক্ষণাত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ডেকে আনা হল গুর্খাবাহিনী। আবার শুরু হল তুমুল লড়াই। একদিকে তিনটি বাঙালি যুবক, হাতে শুধু তিনটি রিভলবার। আর অন্যদিকে শতশত ব্রিটিশ পুলিশ। আরম্ভ হল 'অলিন্দ যুদ্ধ'। ইংরেজ মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার ভাষায় 'বারান্দা বেটল'। সংঘর্ষের একপর্যায়ে পাদ্রি রেভারেণ্ড জনসন 'ড্রেন-পাইপে'র মধ্য পালিয়ে থাকলেন। আর জুডিসিয়েল সেক্রেটারি মি. নেলসন, মি. টয়নয় প্রমুখ অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ প্রচণ্ড আহত হয়ে কাতরাতে থাকলেন।

হঠাৎ দীনেশের পিঠে একটি গুলি বিদ্ধ হল। তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। অবিরত গুলিবর্ষণ করতে লাগলেন শত্রুকে লক্ষ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিনয়-বাদল-দিনেশের হাতে গুলি ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই তাদের আক্রমণ করে প্রতিহত করতে পারেননি। একপর্যায়ে বিনয়-বাদল-দিনেশের রিভলবারের গুলি নিঃশেষ হল। কিন্তু তখনও গুর্খা ফৌজ অনবরত গুলিবর্ষণ করে চলল। এমতাবস্থায় বিপ্লবীরা একটি শূন্য কক্ষে প্রবেশ করে সঙ্গে আনা 'সায়ানাইড'-বিষের পুরিয়াগুলি মুখে দেন। বিষ-ক্রিয়ায় অতি-দ্রুত জীবনপ্রদীপ না নিভে যাওয়ার আশংকায় এবং মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ মাথা টার্গেট করে রিভলবারে রাখা শেষ গুলিটি ছুঁড়ে দিলেন। বাদল তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন। বিনয় ও দীনেশ সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মেঝের উপর পড়ে রইলেন।

অবশেষে ভীষণভাবে আহত বিনয় ও দীনেশকে একটু সুস্থ করে ব্রিটিশ পুলিশ তাদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালাতে আরম্ভ করে। একপর্যায়ে অবস্থা বেগতিক দেখে উভয়কেই পুলিশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট এতদিন পরে বিনয়ের উপর আক্রোশ মিটানোর সুযোগ পেল। অচেতন বিনয়ের হাতের কব্জি ভেঙ্গে ফেলে বীরত্ব প্রদর্শন করল। বিনয় ছিলেন মেডিকেলের ছাত্র। তিনি জানতেন কিভাবে মরতে হয়। হাসপাতালে অবস্থানকালে তিনি ১৪ ডিসেম্বর রাত্রে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য মস্তিস্কের 'ব্যাণ্ডেজে'র ভিতর অঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে স্বীয় মস্তিষ্ক বের করে আনেন এবং মৃত্যুকে বরণ করে নেন।

অন্যদিকে ডাক্তার ও নার্সদের আপ্রাণ চেষ্টায় দীনেশ একটু সুস্থ হয়ে উঠেন। সুস্থ হওয়ার পর তাকে হাসপাতাল থেকে 'কনডেমনড' সেলে নেয় হয়। অতঃপর দীনেশের বিচারের জন্য আলীপুরের সেসন জজ মি. গার্লিকের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সরকার এক ট্রাইবুনেল গঠন করে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই দীনেশের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে বিনয়-বাদল-দীনেশের নামানুসারে এবং এই তিন বিপ্লবীর স্মৃতিরক্ষার্থে কলকাতার ডালহৌসি স্কয়ারের নামকরণ করা হয় বি-বা-দী বাগ। অর্থাৎ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ। এটি ছিল কলকাতা শহরের লালদীঘি সংলগ্ন একটি বিখ্যাত ও

প্রাচীনতম এলাকা যা পূর্বে ডালহৌসি স্কয়ার নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য প্রশাসনিক কেন্দ্র ও কলকাতার মুখ্য বাণিজ্যিক স্থাপনাসমূহ এই এলাকায় অবস্থিত।

বি:দ্র: বিপ্লবী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত তিনজনই রাইটার্স ভবন হামলার ঘটনায় যুক্ত ছিলেন এবং তিন জনেরই শৈশবের মানস গঠনের সময় ও স্থান একই। যে কারণে তিন জনের জীবনীতে অনেকাংশে মিল রয়েছে।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিযুগের ইতিহাস– ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন, প্রকাশক: মুক্তধারা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭৯।

২. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা– হেমচন্দ্র কানুনগো, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল জুন ১৯২৮।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি কলকাতা।

৪. ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা– চিন্ময় চৌধুরী, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রকাশকাল জানুয়ারি ১৯৯৮।

৫. বিদ্রোহী ভারত– নীহাররঞ্জন গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৯১।

৬. হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ভারতের বিপ্লব কাহিনী, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮।

৭. ছবির তথ্যসূত্র: BanglaGallery.com &.net

দীনেশ গুপ্ত



ভারত উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারতমাতা স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবী রয়েছেন, তাদের মধ্যে ঢাকার বিনয়-বাদল-দীনেশ অন্যতম বিপ্লবী।

অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই ঢাকার অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর পার্টি, চট্টগ্রামের দি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, মালামার বিপ্লবী দল, কলকাতার অনুশীলন সমিতি, মেদিনীপুর বিপ্লবী দল, বিপ্লবী কমিউনিস্ট সংগঠন, স্বরাজ পার্টিসহ অন্যান্য বিপ্লবী দল স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এসব দলের অসংখ্য বিপ্লবী সদস্যরা ভারতমাতার স্বাধীনতার জন্য জীবন বলিদানের মন্ত্র সানন্দে গ্রহণ করেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই জীবন উৎসর্গ করেন। বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তও এই জীবন উৎসর্গকারীদের একজন।

বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত জন্মেছিলেন ১৯১১ সালের ৬ ডিসেম্বর (বাংলা ১৩১৮ সনের ২০ অগ্রহায়ণ)। তৎকালীন ঢাকা জেলার (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলা) যশোলঙে। তার বাবা সতীশচন্দ্র গুপ্ত। আর মা বিনোদিনী দেবী। ছোটবেলায় দীনেশ গুপ্তের ডাকনাম ছিল নসু। চার ভাই ও চার বোনের মধ্যে দীনেশ গুপ্ত ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় সন্তান।

দীনেশ গুপ্তের বাবা সতীশচন্দ্র ছিলেন ডাক বিভাগের কর্মচারী। চাকুরির সূত্রে তিনি একবার পরিবার নিয়ে বেশ কিছুদিন গৌরীপুরে ছিলেন। গৌরীপুরেই দীনেশ গুপ্ত একটি পাঠশালাতে পড়াশুনার হাতেখড়ি নেন। এরপর তারা বাবার চাকুরির কারণে ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন। তখন দীনেশ গুপ্ত নয় বছরে পা দিয়েছেন। ঢাকায় আসার পর তাকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করানো হয়। এসময় দীনেশ গুপ্ত ঢাকার গেন্ডারিয়া অঞ্চলে দাদুর বাড়িতে বসবাস করতেন। কিছুদিন পর পৈত্রিক বাসভবন ওয়ারীতে চলে আসেন।

ছোটবেলা থেকেই দীনেশ গুপ্ত ছিলেন নির্ভীক ও দুরন্ত প্রকৃতির। পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলায়ও পারদর্শী ছিলেন তিনি। স্কুল জীবন থেকেই দীনেশ গুপ্ত স্বদেশপ্রেম ও রাজনীতির বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। কারণ ওই সময়ে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। যা প্রতিটি সচেতন পরিবারের সদস্যরা জানতো এবং সন্ধ্যার পরে পাড়া-মহল্লায় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন নিয়ে নানা আলোচনা হতো। এই আলোচনার মাঝে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীনসহ আরো অনেক বিপ্লবীর বিপ্লবী

জীবনের কথা উঠে আসতো। তখন ওই সমস্ত পরিবারের কিশোর-তরুণরা খুব মনোযোগ দিয়ে এসব কিংবদন্তী বিপ্লবীদের জীবন কাহিনী শুনতো। কিশোর-তরুণরা বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা বই-পুস্তকও বেশ আগ্রহ সহকারে পড়তো। দীনেশ গুপ্তও ছিল সেইসব তরুণদের একজন। ১০ম শ্রেণিতে পড়াশুনাকালীন সময়ে তিনি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স (বিভি) নামে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের সংস্পর্শে আসেন।

১৯২৬ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে (ঢাকা বোর্ড) ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার পরে তিনি মেদেনীপুরে বেড়াতে যান। সেখানে তার বড়দা জ্যোতিশ চন্দ্র গুপ্ত থাকতেন। দীনেশের দাদা জ্যোতিষ গুপ্ত ছিলেন মেদিনীপুর আদালতের স্বনামধন্য আইনজীবী।

মেদেনীপুর ছিল বাংলার বিপ্লবীদের আরেক তীর্থস্থান। মেদেনীপুরের বিপ্লবীদের সাথে ভারতের প্রায় সকল বিপ্লববাদী দলের কমবেশি সম্পর্ক ছিল। এই সময় দীনেশ গুপ্ত মেদেনীপুরের বিপ্লবী কার্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার কথা দলকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু দল তাকে মেদেনীপুরে কাজ করার অনুমতি দেয়নি। বরং তাকে ঢাকায় গিয়ে কাজ করতে বলা হয়। ঢাকায় ফিরে দীনেশ গুপ্ত ঢাকা কলেজে আইএসসি'তে ভর্তি হন। পড়াশুনা ও বিপ্লবী কাজকর্মে মনোনিবেশ করেন। এক পর্যায়ে তিনি পড়াশুনার চেয়ে বিপ্লবী দলের কাজকর্মের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। ১৯২৮ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে আইএসসি পরীক্ষা দেন। কিন্তু পড়াশুনার চেয়ে বিপ্লবী দলের কাজকর্মের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণে তিনি আইএসসি'তে পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হতে পারেননি।

ওই বছর সুভাষ চন্দ্র বসু নতুনভাবে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনীকে গড়ে তোলেন। যার চরিত্র ছিল সামরিক। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনীতে নারী ও পুরুষ বিপ্লবী ছিল। তার উদ্যোগে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনীকে সামরিক মানসিকতায় শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং স্বাধীনতার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে বিপ্লবীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। দীনেশ গুপ্ত ঢাকা কলেজে পড়াশুনাকালী সময়ে সুভাষ চন্দ্র বসু'র নতুনভাবে গড়া বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন।

১৯২৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুরে গিয়ে পড়াশুনা করার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তিনি দলের অনুমতি নিয়ে মেদেনীপুরে চলে যান। সেখানে গিয়ে মেদেনীপুর বিপ্লবী দলের সাথে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেন। সাথে সাথে তিনি ওইখানে বিভি'র শাখা স্থাপনের কাজ শুরু করেন। তখন দীনেশ গুপ্ত পড়াশুনা করার জন্য ভর্তি হলেন মেদিনীপুর কলেজে। থাকতেন আইনজীবী দাদা'র কাছে। এসময় তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য সংগ্রহের পাশাপাশি পড়াশুনা চালিয়ে যেতে থাকেন। দীনেশ মেদিনীপুরের বহু স্কুল-কলেজের ছাত্রকে বিপ্লবী দলে টেনে এনেছিলেন।

সে সময় বাংলাসহ সারা ভারতের বিপ্লবীদের উপর ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নির্মমভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে শুরু করে। একের পর এক বিপ্লবীকে ধরে নিয়ে জেলখানায় আটক রেখে পাশবিক নির্যাতন চালায়। যে কারণে অনেক বিপ্লবী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে যায়। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর ব্রিটিশ সরকার দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, যারা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ-শাসনকে উচ্ছেদ করতে চাইবে, তাদের মধ্যে যারা ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে রেহাই পাবে, তাদেরকে আন্দামানে পাঠানো হবে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে রেহাই পাওয়া প্রায়

সকল সশস্ত্র বিপ্লবীকে আন্দামানে যেতে হয়েছিল। আর আন্দামান সেলুলার জেল ছিল সবচেয়ে ভয়ংকার জেল। এক কথায় বলা যায়, মৃত্যু ফাঁদ।

এসমস্ত ঘটনার কারণে ব্রিটিশদের চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুভাষ চন্দ্র বসু তখন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'কে এ্যাকশনধর্মী বিপ্লবী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলেন। শুরু হয় বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণে দীনেশ গুপ্তও বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। এক পর্যায়ে সুভাষ চন্দ্র বসু'র নেতৃত্বে এই সংগঠনের বিপ্লবীরা কুখ্যাত ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারদেরকে হত্যা বা নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেন। ১৯২৯-৩০ সালের মধ্যে দিনেশ গুপ্তের প্রশিক্ষিত বিপ্লবীরা ডগলাস (Douglas), বার্জ (Burge) এবং পেডি (Paddz) এই তিনজন কুখ্যাত ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেছিল।

১৯৩০ সালে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-নির্যাতন আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। শতশত রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে জেলে আটক রেখে নির্যাতন চালায়। এই সময় ব্রিটিশ পুলিশ সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং সত্য বকসীর মত নেতৃত্বকেও গ্রেফতার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখে। একের পর এক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ভরিয়ে ফেলা হচ্ছিল। এই সব বন্দীদের মধ্যে ছিলেন অসংখ্য সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য এবং অহিংস আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরা। একপর্যায়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নতুন বন্দীদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছিল না। জেলের মধ্যে সৃষ্টি হল এক অসহনীয় অবস্থা। রাজবন্দীদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছিল। তারা জেলকোড অনুযায়ী কয়েকটি দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন দমানোর জন্য ব্রিটিশ পুলিশ বেদমভাবে লাঠিচার্জ করে। অতঃপর পাগলা ঘন্টি বাজানো হ'ল। রাজবন্দীদের উপর চলল নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার। সুভাষচন্দ্র, যতীনন্দ্রমোহন এবং সত্য বকসীরাও বাদ গেলেন না নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচার থেকে। এঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ল জেলের ভিতরে। জানা গেল এই নির্মম-নিষ্ঠুর অত্যাচারের পিছনে রয়েছে ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এন. এস সিম্পসন সাহেব।

বিপ্লবীরা প্রস্তুতি নিলেন অত্যাচারী সিম্পসনকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য। পরিকল্পনা হল শুধু সিম্পসন নয়, ইংরেজ আমলাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, বাঙালিরাও লড়তে জানে, মারতে জানে। কাঁপিয়ে দিতে হবে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদকে।

বিপ্লবীরা জেলের ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এন. এস সিম্পসনকে টার্গেট করেছিল। সিম্পসন জেলখানার বন্দীদের উপর পাশবিক নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত ছিল। শুধু সিম্পসন নয়, রাইটার্স ভবনে আক্রমণ করে ব্রিটিশ অফিসারদের হত্যা করে ওদের অত্যাচার-জলুমের জবাব দিতে হবে। কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে অবস্থিত ছিল ব্রিটিশ শাসকদের সচিবালয়। যার নাম রাখা হয়েছিল রাইটার্স ভবন। এই ভবনেই উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ আমলারা অফিস করতেন।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল। আক্রমণের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল। খুব সতর্ক অবস্থায় তাদের প্রশিক্ষণের কাজও সমাপ্ত হল। বিনয়-বাদল-দিনেশ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে বিদায় নিলেন। ৮ ডিসেম্বর এ্যাকশনের জন্য তিন বিপ্লবী প্রস্তুত। 'রাইটার্স বিল্ডিং' এর একটি কক্ষে কারা বিভাগের সর্বময় কর্তা ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসন তার কাজকর্ম পরিচালনা করছেন। তার ব্যক্তিগত সহকারি জ্ঞান গুহ পাশে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছেন। বেলা ঠিক

১২ টার সময়। সামরিক পোশাক পরে তিনজন বাঙালি যুবক এসে কর্নেল সিম্পসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তারা সিম্পসনের চাপরাশিকে (সহকারি) ঠেলে কামরার ভিতরে প্রবেশ করেন। হঠাৎ পদধ্বনি শুনে কর্নেল তাদের দিকে তাকান। বিস্ময়-বিমূঢ় চিত্তে দেখতে পান সম্মুখে মিলিটারি পোশাক পরে তিনটি বাঙালি যুবক রিভলবার হাতে দণ্ডায়মান। মুহূর্তের মধ্যে বিনয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়– 'প্রে টু গড কর্নেল। ইওর লাস্ট আওয়ার ইজ কামিং।' কথাগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনটি রিভলবার হতে ছয়টি গুলি সিম্পসনের দেহ ভেদ করে। সিম্পসন লুটিয়ে পড়ে মেঝের উপর। এরপরই গুলির আঘাতে আহত হন জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মি. নেলসন। এলোপাথাড়ি গুলি বর্ষণ করতে করতে বিপ্লবীরা পরবর্তী লক্ষ্য হোম সেক্রেটারি আলবিয়ান মারের কক্ষের দিকে অগ্রসর হন। ততক্ষণে এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ছুটে আসেন পুলিশ-ইন্সপেক্টর জেনারেল মি. ক্র্যাগ ও সহকারি ইন্সপেক্টর জেনারেল মি. জোনস। তারা কয়েক রাউন্ড গুলিও ছুড়েন। কিন্তু বিনয়-বাদল-দীনেশের বেপরোয়া গুলির মুখে তারা দাঁড়াতে পারলেন না। প্রাণ নিয়ে পালালেন। সমস্ত 'রাইটার্স বিল্ডিং' জুড়ে তখন এক বিভীষিকাময় রাজত্ব। চারিদিকে শুধু ছুটাছুটি। কে কোন দিকে পালাবে খুঁজে পায় না। শুধু কলরব-কোলাহল-চিৎকার। শুধু এক রব, বাঁচতে চাও তো পালাও। 'রাইটার্স বিল্ডিং' আক্রমণের সংবাদ পেয়ে পুলিশ কমিশনার টেগার্ট আসেন। ডেপুটি কমিশনার গার্ডন আসেন সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে। পাদ্রী রেভারেন্ড জনসন 'ড্রেন-পাইপে'র মধ্য পালিয়ে থাকলেন। জুডিসিয়াল সেক্রেটারি মি. নেলসন, মি. টয়নয় প্রমুখ অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ আহত হলেন। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ডেকে আনা হল গুর্খাবাহিনী।

অন্যদিকে তিনটি বাঙালি তরুণ, হাতে শুধু তিনটি রিভলবার। আর অপরদিকে রাইফেলধারী সুশিক্ষিত গুর্খাবাহিনী। আরম্ভ হল 'অলিন্দ যুদ্ধ'। ইংরেজ মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার ভাষায় 'বারান্দা বেটল'। দীনেশের পিঠে একটি গুলি বিদ্ধ হল। তিনি তাতে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। অসংকোচে গুলিবর্ষণ করতে লাগলেন শত্রুকে লক্ষ্য করে। যতক্ষণ পর্যন্ত বিনয়-বাদল-দীনেশের হাতে গুলি ছিল, ততক্ষণ কেউই তাদের আক্রমণ করে প্রতিহত করতে পারেননি। একপর্যায়ে তাদের গুলি নিঃশেষ হল। গুর্খা ফৌজ অনবরত গুলিবর্ষণ করে চলল। তখন তিনজন বিপ্লবী একটি শূন্য কক্ষে প্রবেশ করে সঙ্গে আনা 'সায়ানাইড'-বিষের পুরিয়াগুলি মুখে দিলেন। বিষক্রিয়ায় অতি-দ্রুত জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত না হওয়ার আশংকায় এবং মৃত্যুকে নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ মস্তক লক্ষ্য করে রিভলবারে রাখা শেষ গুলিটি ছুঁড়ে দিলেন। বাদল তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন। বিনয় ও দীনেশ সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মেঝের উপর পড়ে রইলেন।

ভীষণভাবে আহত বিনয় ও দীনেশকে একটু সুস্থ করে তাদের উপর চলল প্রচণ্ড অত্যাচার। উভয়কেই পুলিশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট এতদিন পরে বিনয়ের উপর আক্রোশ মিটানোর সুযোগ পাইলেন। অচেতন বিনয়ের হাতের আঙ্গুলের উপর সবুট পদক্ষেপে সবগুলি অঙ্গুল ভেঙ্গে ফেলে বীরত্ব প্রদর্শন করলেন। বিনয় ছিলেন মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষের ছাত্র। তিনি জানতেন মৃত্যুর পথ। হাসপাতালে অবস্থানকালে তিনি ১৪ ডিসেম্বর রাত্রে আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুকে বরণ করার জন্য মস্তকের

'ব্যান্ডেজে'র ভিতর অঙ্গুল ঢুকিয়ে স্বীয় মস্তিষ্ক বের করে আনেন এবং মৃত্যুকে বরণ করে নেন।
অন্যদিকে ডাক্তার ও নার্সদের আপ্রাণ চেষ্টায় দীনেশ ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠেন। সুস্থ হওয়ার পর দীনেশের উপর চলে প্রচণ্ড অমানবিক নির্যাতন। এভাবে দীর্ঘদিন নির্যাতন ও চিকিৎসার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে 'কনডেমনড' সেলে নেয় হয়। দীনেশের বিচারের জন্য আলীপুরের সেসন জজ মি. গ্রালিকের সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সরকার এক ট্রাইবুনেল গঠন করে। দীনেশের ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। উক্ত ট্রাইবুন্যালে বিচারের নামে চলে প্রহসনের নাটক। অবশেষে ইংরেজ সরকার ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই দীনেশের ফাঁসি কার্যকর করার নির্দেশ দেয়।
ফাঁসির আদেশ কার্যকরি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাত্র পনের দিনের মধ্যে দীনেশের দৈহিক ওজন কয়েক পাউন্ড বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বোঝা যায় যে মৃত্যুভয়ে দীনেশ মোটেই ভীত ছিলেন না। মৃত্যুর পূর্বে দীনেশ তার মা, বোন, প্রত্যেকের নিকট পত্র লিখে যান। যাতে লেখা থাকে মৃত্যুর জন্য শোক না করার অনুরোধ বাক্য। এই চিঠিগুলি ভারতের বিপ্লবী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল এবং সাহিত্যিক বিচারেও অত্যন্ত মূল্যবান।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, কলিকাতা
২-২-৩১ (রবিবার)
স্নেহের বেটু ভাই,
কিছুদিন আগে একটা গান শুনেছিলাম। আজ তার পদগুলো বারে বারে মনে পড়ছে।
আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা
গোপন-মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি
হার মানি তার অজানা জনের সাজে।
শীতের কুজ্ঝটিকার সঙ্গে আমার দিনও ফুরিয়ে এল। আমায় ভুলো না ভাই। শীতের পুনরাগমনের সঙ্গে আমিও আবার তোমাদের মধ্যে ফিরে আসব। উত্তুরে বাতাসের পরশ পেলে মনে করো, আমি এসেছি তোমাদের আলিঙ্গন করতে, তোমাদের ভালবাসা কুড়িয়ে নিতে।
ইতি--
দাদা

১৯৩১ সালের ৭ জুলাই দীনেশের ফাঁসির তারিখে তিনি ভোরবেলা স্নান করে ফাঁসির পোশাক পরলেন। অতঃপর হাসতে হাসতে সার্জেন্টকে বললেন, 'এবার যাওয়া যেতে পারে।' ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে ফাঁসিমঞ্চের দিকে অগ্রসর হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী দীনেশ। সার্জেন্ট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কিছু বলার আছে কি বন্দী?' দীনেশের উত্তর দিল 'প্লিজ স্টপ। আমাদের বলার অধিকার যে কারা কেড়ে নিয়েছে, সে কথা তোমরাই ভাল জান। ডু

ইওর ডিউটি, আই এম রেডি।' পর মুহূর্তে দীনেশ ফাঁসির মঞ্চে উঠে নিজ হাতে ফাঁসি-রজ্জু গলায় পরেন। বন্দেমাতরম বলতে বলতে ফাঁসি-রজ্জুতে শেষ নিঃশ্বাস থমকে যায়। সেই সাথে নিভে যায় বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের জীবন প্রদীপ। জয়তু বিপ্লবী দীনেশ গুপ্ত। ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করার সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৯ বছর।

৮ জুলাই দীনেশের ফাঁসির দিন সমস্ত কলিকাতা নগরী শোকাভিভুত হয়ে হরতাল পালন করে। লক্ষ লক্ষ বিষাদক্লিষ্ট নর-নারী মনুমেন্টের নিচে সমবেত হয়ে সেদিন বিকালবেলা দীনেশের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং ভারতমাতার স্বাধীনতার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করার শপথ নেয়। বিপ্লবী তরুণরা ঘোষণা করে, 'দীনেশ আমাদের জাতীয় বীর। অন্যায়ভাবে তার ফাঁসি আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করিব না। এর প্রতিশোধ আমরা নিবোই।'

সত্যিই বিপ্লবীরা এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। বাংলাসহ ভারতের অন্যান্য অংশে বিনয়, বাদল এবং দীনেশকে শহীদ বিপ্লবী হিসেবে সম্মান করা হয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে বিনয়-বাদল-দীনেশের নামানুসারে কলকাতার ডালহৌসি স্কয়ারের নাম পাল্টে রাখা হয় বি-বা-দী বাগ। অর্থাৎ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিযুগের ইতিহাস– ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন, প্রকাশক: মুক্তধারা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭৯।

২. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা– হেমচন্দ্র কানুনগো, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল জুন ১৯২৮।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি কলকাতা।

৪. ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা– চিন্ময় চৌধুরী, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রকাশকাল জানুয়ারি ১৯৯৮।

৫. বিদ্রোহী ভারত: নীহাররঞ্জন গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৯১।

৬. হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ভারতের বিপ্লব কাহিনী, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮।

ভগৎ সিং



'যে মানুষ প্রগতির পক্ষে তাকে পুরোনো বিশ্বাসের প্রত্যেকটি বিষয়কেই চ্যালেঞ্জ করতে হবে। যথেষ্ট যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিবেচনার পর যদি কেউ কোনো তত্ত্ব বা দর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে তার বিশ্বাসকে স্বাগত জানাতে হয়। তার চিন্তাভাবনা ভুল বা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। কিন্তু তা শোধরানোর সুযোগ আছে, কারণ সে পরিচালিত হয় বিচারবুদ্ধির দ্বারা, অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা নয়। বিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাস বিপজ্জনক, তা মস্তিষ্ককে অকেজো করে দেয়, মানুষকে প্রতিক্রিয়াশীল বানিয়ে তোলে।'–ভগৎ সিং

বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার জন্য যে সকল মহান ব্যক্তি, বিপ্লবী, লড়াকু যোদ্ধা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী ভগৎ সিং অন্যতম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে রয়েছে অসংখ্য বিপ্লবী দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ। অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনুশীলন, যুগান্তর, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স প্রভৃতি বিপ্লবী দল ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে নিয়েজিত ছিল। এসব দলই তৈরি করেছিল শত-সহস্র বিপ্লবী।

ভগৎ সিং জন্মেছিলেন ১৯০৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। পশ্চিম পাঞ্জাবের লায়লাপুর জেলার বংগা গ্রামে। একসময় পাঞ্জাবের ওই অঞ্চলে জলের অভাবে চাষ-আবাদ কিছুই হত না। উনিশ শতকের শেষদিকে মধ্য পাঞ্জাবের বেশ কিছু লোক উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এসে প্রচুর পরিশ্রম করে খাল কেটে চাষবাস শুরু করেন। ভগৎ সিংয়ের পূর্বপুরুষ ছিলেন এদের দলে। এরা ছিলেন দুঃসাহসী, কঠোর পরিশ্রমী আর স্বাধীন চিন্তার মানুষ। এদের বলা হত জাঠ।

ভগৎ সিংয়ের ঠাকুরদাদা অর্জুন সিংহ। তিনি দয়ানন্দ সরস্বতীর হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলনে আর্যসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার বাবার নাম সর্দার কিষাণ সিংহ সান্ধু এবং মা বিদ্যাবতী। ভগৎ সিংয়ের বাবা ছিলেন একজন মানবপ্রেমিক মানুষ। মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকাই ছিল তার জীবনের আসল ব্রত। ভগৎ সিংয়ের ছোট কাকা স্বর্ণ সিং ছিলেন একজন বিপ্লবী। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। যে কারণে মাত্র ২৩ বছর বয়সে মারা যান তিনি। ভগৎ সিংয়ের মেঝকাকা অজিত সিং ছিলেন আরেক বিপ্লবী। তিনি লালা লাজপৎ রায়ের খুব কাছের লোক ছিলেন। অজিত সিং পাঞ্জাবে 'ভারত দেশপ্রেমিক সমিতি' গড়ে তুলে বিপ্লবী কার্যক্রম শুরু করেন। তাদের গোটা

পরিবারই ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। এমন এক দেশপ্রেমিক বিপ্লবী রাজনৈতিক পরিবেশে ধীরে ধীরে ভগৎ সিং বেড়ে উঠেন।

ভগৎ সিংয়ের প্রাথমিক পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর স্কুলে পড়ার পালা। কিন্তু ভগৎ সিং তার সমবয়সী ছেলেদের মত লাহোরের খালসা হাইস্কুলে পড়াশোনা করেননি। কারণ এই স্কুলে লেখাপড়া করলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হয়। যে কারণে তার ঠাকুরদাদা তাঁকে এখানে পড়াশুনা করাতে রাজি ছিলেন না। তিনি ভগৎ সিংকে অন্য একটি স্কুলে পড়াশুনা করানোর সিদ্ধান্ত নেন। তারপর ভগৎ সিংয়ের বাবা তাঁকে আর্যসমাজি বিদ্যালয় দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক স্কুলে ভর্তি করেন।

এই স্কুলে পড়াশুনাকালে হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা ভগৎ সিংকে খুজে পাওয়া যাচ্ছিল না। স্কুলের সবাই বাড়ি ফিরেছে, কিন্তু ভগৎ সিংকে কোথাও পাওয়া গেল না। সে তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। বয়স মাত্র ১২ বছর। সবাই তাকে খুঁজতে বেরোল। ওদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের খবর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, আতঙ্কে সবাই ছুটাছুটি করছেন। স্কুলে খবর নিয়ে জানা গেল ভগৎ সিং যথারীতি ক্লাস করেছে; তারপর কোথায় গেছে কেউ জানে না। অনেক রাতে ভগৎ সিংয়ের দেখা মিলল। হাতে জালিয়ানওয়ালাবাগের শত শহীদের রক্ত মাখা মাটি। স্কুল থেকে বেরিয়ে শুনেছে সেই মর্মান্তিক ঘটনা, তারপর বাসে করে ৪০/৫০ মাইল দূরে অমৃতসরে ছুটে গেছে সে, সেখানকার ত্রাস ও দুর্যোগের পরিবেশ উপেক্ষা করে কুড়িয়ে এনেছে সে রক্তরঞ্জিত মাটি। এই মাটি তার কাছে সোনার চেয়েও খাঁটি। এ মাটি বিদ্রোহের প্রতীক।

গান্ধীজী ১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের মাধ্যমে বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ করলেন। বিপ্লবীদেরকে অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হতে বললেন। তিনি বিপ্লবীদের জানালেন অসহযোগ আন্দোলন করে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দিবেন। যদি না পারেন তাহলে বিপ্লবীরা আবার সশস্ত্র সংগ্রামে সামিল হলে তার বলার মতো কিছু থাকবে না। গান্ধীজীর অনুরোধে বিপ্লবীরা সাময়িকভাবে সম্মত হন। এসময় কিশোর ভগৎ সিং অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি নিজ এলাকাতে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি সহপাঠীদের সাথে নিয়ে বিলাতী কাপড় জোগাড় করে মহানন্দে পোড়াতে শুরু করেন। তখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর। ওই বয়স থেকে তিনি ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের উপর পড়াশোনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত মার্ক্সবাদে আকৃষ্ট হন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে তিনি একদিন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ঘৃণা প্রকাশ করার জন্য তার সরকারি স্কুল বই ও স্কুল ইউনিফর্ম পুড়িয়ে ফেলেন।

এক বছরের মধ্যে সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এতে সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ যুক্ত হয়। ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি হঠাৎ উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরীচেরা গ্রামে কৃষকদের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন হটিয়ে দেয়ার জন্য পুলিশ জনতার উপর গুলি চালায়। এতে কয়েকজন কৃষক মারা যায়। ফলে বিক্ষুব্ধ জনতা থানা ঘেরাও করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। থানার ভিতর ২২ জন পুলিশ পুড়ে মারা যায়। এতদিন ধরে ব্রিটিশ প্রসাশন যে পরিমাণে ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে সে তুলনায় এটি কিছুই নয়, একটি বিক্ষিপ্ত দুঃখজনক ঘটনা। তবু গান্ধীজী এই ঘটনার কারণে অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান।

অসহযোগ আন্দোলন থেমে যাওয়ার পর ভগৎ সিং 'শিখ গুরুদ্বার' সংস্কারের কাজে যুক্ত হন। শিখ ধর্মের নানা অনুষ্ঠান যেখানে পালিত হয়, সেই মন্দিরকে বলে গুরুদ্বার। এইসব গুরুদ্বারে যে আয় হত তার প্রায় বড়ো অংশটাই পুরোহিতেরা নিজেদের ব্যক্তিগত বিলাসে ব্যয় করতেন। গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলনের নেতারা বললেন, তা হবে না। নির্বাচিত প্রতিনিধি দল গঠন করতে হবে। তারাই আয়-ব্যায়ের হিসাব রাখবেন। এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে ভগৎ সিং বড়ো বড়ো চুল রাখলেন, কোমরে ঝোলালেন শিখ ধর্মের নিয়ম অনুসারে কৃপাণ নামে তলোয়ারের চেয়ে ছোট একটা অস্ত্র, মাথায় পড়লেন বড়ো কালো পাগড়ি। সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে ভগৎ সিং তার 'কেন আমি নাস্তিক?' বইয়ে লিখছেন, 'সেই সময়ে আমি লম্বা লম্বা চুল রাখতে থাকি। কিন্তু শিখ বা অন্য কোন ধর্মের পৌরাণিক কাহিনী বা মতবাদে আমি আস্থা রাখতে পারিনি। তবু ঈশ্বরে আমার খুব বিশ্বাস ছিল।'

মেট্রিক পাশ করার পর ভগৎ সিং ন্যাশনাল কলেজে (স্বদেশি বিদ্যালয়) ভর্তি হন। এই কলেজে ভগৎ সিং দুজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের কাছে পড়াশুনার সুযোগ পান। অধ্যাপক পরমানন্দের কাছে শুনলেন ইতিহাসের কত জানা-অজানা কাহিনী। শুনলেন আন্দামান জেলে বন্দী বীর দেশপ্রেমিকদের কথা। অধ্যাপক নিজেই এই আন্দামানে বহুদিন বন্দী জীবন কাটিয়েছেন।

অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের কাছে শুনলেন বিশ্ব-ইতিহাস নিয়ে আলোচনা। তখন থেকে ভগৎ সিং বুঝতে পারলেন, ভারতের স্বাধীনতা তখনই আসবে যখন এদেশের মানুষের একটা বড়ো অংশ সচেতন হবে। আর তার জন্য চাই বিশেষ শিক্ষা আর বিশাল কর্মকাণ্ড। ভগৎ সিং এই কলেজে পড়াশুনাকালীন সময়ে আজীবন সংগ্রামের সাথী রূপে শুকদেব, যশপাল এবং ভগবতীচরণ ভোলার মত কয়েকজন অসম সাহসী তরুণকে সহযোদ্ধা হিসেবে পেয়ে যান।

ভগৎ সিং খুব মনোযোগী ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। যে বিষয় বুঝতে পারতেন না তা বুঝার জন্য বার বার ভালো করে চেষ্টা করতেন। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক পড়াশুনার প্রতি তার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। সহপাঠীদেরকে নিয়ে পাঠচক্র করতেন। সবাইকে নিয়ে দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস পড়তেন। পড়লেন ইতালির দেশপ্রেমিক ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডি অস্ট্রিয়ার শাসককে উৎখাত করে ইতালিকে স্বাধীনতার ইতিহাস, আয়ার্ল্যান্ডের বিপ্লবী ইমন-ডি-ভ্যালেরার লেখা 'আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম' ও রুশ বিপ্লবী ক্রোপটকিনের ঘটনাবহুল জীবনের নানা দিক। আরো পড়লেন ভলতেয়ার আর রুশোর আগুনঝরানো রচনাবলী। পড়াশুনার সাথে সাথে ভগৎ সিং লাহোরের ন্যাশনাল ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্য হয়ে যুবকদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য একে একে অভিনয় করলেন সম্রাঁ চন্দ্রগুপ্ত, রাণা প্রতাপ, ভারত দুর্দশা। এসব নাটকের খল-চরিত্রে বিদেশি শাসকের অন্যায়-অত্যাচারের রূপরেখা ফুটে উঠত। এইভাবে মঞ্চে সফল একাধিক নাটকের মাধ্যমে কলেজের ছাত্র সমাজের মধ্যে বিদ্রোহের উদ্দীপনা নিয়ে এলেন তিনি।

১৯২৩ সালে ভগৎ সিং বি. এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিছুদিন পর বাড়ি থেকে বিয়ে করার জন্য বার বার চাপ আসতে থাকে। কিন্তু ভগৎ সিং বিয়ে করতে রাজি নন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার। তাই লাহোরের বিপ্লবী নেতা শচীন সান্যালের পরামর্শে ভগৎ সিং কানপুরের বিপ্লবী গণেশ শঙ্করের কাছে

চলে যান। গণেশ শঙ্করের 'প্রতাপ প্রেস' ছিল উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবীদের মিলন কেন্দ্র। গণেশ শঙ্করের মাধ্যমে এখানে বসে ভগৎ সিং বিপ্লবী পথের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেন। ছুড়ে ফেলেন উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি লাভের মোহকে। উপেক্ষা করলেন বাবার সুখী পরিবারের নিরাপদ জীবন, ফিরেও তাকালেন না গৃহকোণের দিকে। দুনিয়ার সব ছন্নছাড়া বাঁধনহারা মুক্তিকামী মানুষের মিছিলে এক হয়ে গেলেন তিনি। যুক্ত হলেন 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এ। তারপর থেকেই শুরু হয় তার সশস্ত্র বিপ্লবী জীবনের পথচলা।

১৯২৪ সালে ভারত উপমহাদেশব্যাপী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র সংগঠিত হয় সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠন। চট্টগ্রামে রেলওয়ে ডাকাতি, বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ডাকাতি ও বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র কার্যকলাপের কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ব্রিটিশ '১ নম্বর বেঙ্গল অর্ডিনান্স' নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল 'রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা'।

১৯২৫ সালের ৯ আগস্ট। উত্তরপ্রদেশের কাকোরী রেল স্টেশন দিয়ে ব্রিটিশ পুলিশ সরকারি টাকা নিয়ে যাচ্ছিল। যখন ট্রেন কাকোরী স্টেশনে থামলো তখন ট্রেনে ডাকাত পড়েছে খবর ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আতঙ্কিত। এমন সময় হঠাৎ ১৪/১৫ সশস্ত্র লোকের মধ্যে একজন বললেন, আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনাদের কিছু নিতে আসিনি। এই গাড়িতে করে ইংরেজ আমাদের দেশের টাকা লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা সেই টাকা উদ্ধার করে দেশের কাজের জন্য নিয়ে গেলাম।

এরপর ব্রিটিশ শুরু করল 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা'। এই মামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ উত্তরপ্রদেশের নেতৃত্বস্থানীয় ৪৪ জনকে গ্রেফতার করে। মামলায় রাজেন লাহিড়ী, ঠাকুর রোশন সেন, আসফাকুল্লা খান এবং রামপ্রসাদ বিসমিল্লা-এর ফাঁসি হয় ও গণেশ শঙ্কর, শচীন সান্যালসহ ১৪ জনকে আন্দামান পাঠানো হয়।

এই ঘটনার পর দলের নির্দেশে ভগৎ সিং কানপুর থেকে পাঞ্জাবে চলে আসেন। এখানে এসে তিনি সহযোদ্ধাদের নিয়ে 'নওজোয়ান ভারতসভা' নামে একটি দল গঠন করেন। দলের সভাপতি হন রামকিষণ, ভগৎ সিং হন সম্পাদক। এই দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে দিনমজুর ও কিষাণদের এক করে সশস্ত্র বিপ্লবের সপক্ষে নিয়ে যাওয়া। ১৯২৫ সালের শেষের দিকে বিপ্লবী শচীন সান্যালের পরিচালনায় উত্তরপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন' ইংরেজিতে লেখা দুটি বই প্রকাশ করে। বই দুটিতে বিপ্লবের গতি-প্রকৃতি এবং বিপ্লবী দলের গঠন প্রণালী নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছিল। ভগৎ সিংয়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের তরুণ ছাত্রসমাজ বই দুটি পড়ে সেদিন বিপ্লবী আদর্শে জীবন গড়ে তোলার শপথ নিয়েছিলেন। ভগৎ সিং তাদের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক বিপ্লবীদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানচেতনাকে হাতিয়ার করে বিপ্লবী জীবন গড়ে তোলার জন্য নতুন পথ দেখান।

১৯২৬-২৭ সাল, পুরো এক বছর ভগৎ সিং ভারতে স্বাধীনতা, ভারতের গণমানুষের মুক্তি কোন পথে এ দু'টি বিষয় নিয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করলেন। পূর্বেই তিনি মার্ক্সবাদ সম্পর্কে অধ্যায়ন করেছিলেন। যে কারণে তিনি মাত্র একবছরের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আর্দশকে ধারণ করে এগুতে থাকেন। গরীব-মেহনতি মানুষ, যারা পিছিয়ে পড়া, নানা কুসংস্কারাছন্ন, তাদেরকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

১৯২৮ সালের ৮-৯ সেপ্টেম্বর 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এর ব্যানারে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবীদের নিয়ে দিল্লীতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার সভাপতিত্ব করেন ভগৎ সিং। ওই সমাবেশে তিনি বললেন, 'অবশ্য আমাদের প্রথম লক্ষ্য দেশকে স্বাধীন করা। কিন্তু মূল লক্ষ্য হল ভারতে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষই আমাদের স্বপ্ন। বিপ্লবের চেতনা নিয়ে আমরা সেই পথে এগিয়ে যাব'। এই সভায় 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন' নাম পরিবর্তন করে 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন' করা হয়।

ওই বছর স্যার জন সাইমনের অধীনে ব্রিটিশ সরকার একটি কমিশন গঠন করে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর রিপোর্ট প্রদানের জন্য সেটিকে ভারতে প্রেরণ করে। কিন্তু কমিশনে কোনো ভারতীয় না থাকায় ভারতের সকল রাজনৈতিক দল তা প্রত্যাখ্যান করে এবং সারা দেশে এটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গড়ে উঠে। যার ধারাবাহকিতায় ১৯২৮ সালের ৩০ অক্টোবর লাহোরে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে একটি নীরব অহিংস পথযাত্রার উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে। এসময় লালা লাজপৎ রায় পুলিশের নৃশংস লাঠি চার্জের শিকার হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একপর্যায়ে মারা যান। ভগৎ সিং এই পথযাত্রায় ছিলেন। তিনি এ ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। বিপ্লবী ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেব ও জয় গোপাল একত্রে মিলিত হয়ে ওই ঘটনার নেতৃত্বদানকারী পুলিশ প্রধান স্কটকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। জয় গোপালকে দায়িত্ব দেয়া হয় স্কটকে সনাক্ত করে ভগৎ সিং-কে গুলি করার সংকেত প্রদানের জন্য। জয় গোপাল ডেপুটি পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট J. P Saunders কে দেখে পুলিশ প্রধান স্কটকে ভেবে ভগৎ সিং-কে গুলি করার সংকেত দেন। ফলশ্রুতিতে Saunders গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। সামান্য ভুলের কারণে বেঁচে যান পুলিশ প্রধান স্কট। ভগত সিং পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপনে চলে যান। পুলিশ যাতে তাঁকে চিনতে না পারে সেজন্য তিনি চুল-দাড়ি কেটে ফেলেন। কিছু দিন পর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এখানে এসে বাংলার বিপ্লবী যতীন দাসের আশ্রয়ে একটি হোস্টেলে উঠলেন। খুব সতর্কতার সাথে বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ করে পার্টির কাজ অব্যহত রাখলেন।

অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীদেরকে দমনের জন্য পুলিশকে অধিক ক্ষমতা প্রদান করে ভারত প্রতিরক্ষা আইন পাশ করার সমস্ত প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে আইনটির অধ্যাদেশ পাশ হবার সিদ্ধান্ত হয়। এই আইনকে রুখে দেওয়ার জন্য ভগৎ সিং এর 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন' প্রস্তুতি গ্রহণ করে। দলের নেতা ভগৎ সিং-এর নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত হয় ৮ এপ্রিল সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে এর প্রতিবাদে বোমা নিক্ষেপ করা হবে। উদ্দেশ্যটা রক্তপাত ঘটানো ছিল না; তারা চেয়েছিলেন, ভগৎ সিং-এর ভাষায় 'বধিরের কানের কাছে' আওয়াজ তুলতে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত বোমা নিক্ষেপ করবেন আর দলের অন্যরা তাদেরকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নিবেন। ৮ এপ্রিল যথা সময়ে 'বধিরের কানের কাছে' আওয়াজ পৌছানোর জন্য ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর বোমা নিক্ষেপ করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগান দেন, যে আওয়াজ ওইভাবে এর আগে কখনো শোনা যায় নি। পলায়নের চেষ্টা না-করে তারা নিজেরা ইস্তেহার বিলি করতে থাকেন। এসময় পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে।

এই ইস্তেহার হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মির নামে প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাতে মার্ক্সবাদের প্রতি সংগঠনের অঙ্গীকার অভিব্যক্ত হয়েছিল, বলা হয়েছিল নতুন একটি মানবিক সমাজ গড়বার প্রয়োজনে তারা যে কোনো শাস্তি সানন্দে গ্রহণ করবেন। তারা ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁদের পথটা গণআন্দোলনের। মামলায় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত উভয়েই যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তাঁদের দু'জনের উপর পুলিশ ইন্সপেক্টর সান্ডার্সকে হত্যা করার মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলায় প্রমাণাভাবে বটুকেশ্বর দত্ত অব্যাহতি পান। কিন্তু ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে জেলে প্রেরণ করে।

জেলে বন্দী থাকাকালে ভগৎ সিং ব্রিটিশ ও ভারতীয় বন্দীদের সমানাধিকারের দাবিতে ৬৩ দিন অনশন করেন। সে সময় ভারতীয় বন্দীদের চেয়ে ব্রিটিশ চোর ও খুনিদের প্রতি অধিকতর ভাল আচরণ করা হত। ৬৩ দিন অনশনের ফলে ব্রিটিশ সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ভগৎ সিং জেলে থাকাকালীন সময়ে ডায়রি লিখতেন। তিনি প্রচুর বই পড়তেন। যে কথাগুলো ভালো লাগত, সেগুলো টুকে রাখতেন নিজের ডায়েরিতে। ১৯৩০-৩১ সালে, জেলের মধ্যে ফাঁসির অপেক্ষায় যখন ভগৎ সিং-এর দিন কাটছিল সে সময় তিনি 'why I am An Atheist' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। ফাঁসির কয়েক মাস পরে 'The People' (Lahore, 27 Sept. 1931) নামক পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। তা নিম্নে:

(একটা নতুন প্রশ্ন উঠেছে। সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান ও সর্বজ্ঞ ভগবানের অস্তিত্ব আমি যে বিশ্বাস করিনা তা কি আমার দম্ভের জন্য? আমাকে যে এরকম প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে তা আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি। কয়েকজন সুহৃদ আমাকে জানিয়েছেন যে, আমার বন্ধুদের কেউ কেউ (যদি অবশ্য তাদের বন্ধু বলাটা অত্যুক্তি না হয়) আমার সাথে সামান্য যোগাযোগের ভিত্তিতেই ঠিক করে ফেলেছেন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে আমি প্রচণ্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি এবং আমার আত্মম্ভরিতাই এর জন্য দায়ী। যাই হোক, বিষয়টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমি মানুষের এইসব দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে উঠে গেছি-এ গর্ব আমি করি না। একজন সাধারণ মানুষ হিসাবেই আমার পরিচয়, এর বেশি নয়। কেউই এর থেকে বেশি দাবি করতে পারে না। আমার মধ্যেও এই দুর্বলতা আছে, অহংবোধ আমার চরিত্রেও আছে। আমার কমরেডরা আমাকে স্বেচ্ছাচারী বলত। এমনকি আমার বন্ধু বি. কে দত্তও মাঝে মাঝে এ-কথা বলতেন। কোন কোন সময় স্বৈরাচারী বলে আমাকে সমালোচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এমন অভিযোগ করেন এবং খুব গুরুত্বের সঙ্গেই করেন যে আমি নাকি অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও জোর করে অন্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার মতামত চাপিয়ে দিই এবং আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়ে নিই, এই অভিযোগগুলোর কিছুটা যে সত্য তা আমিও অস্বীকার করি না। এর থেকে আত্মশ্লাঘা আসতে পারে। অন্যান্য প্রচলিত মতবাদের থেকে যেহেতু আমাদের চিন্তাধারা অনেকখানি স্বতন্ত্র,. তাকে ভিত্তি করে আমার মধ্যে খানিকটা অহংবোধ আসতে পারে। কিন্তু একে কখনই ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসাবে বলা যেতে পারে না। হয়ত আমাদের মতাদর্শকে ভিত্তি করে একটা যুক্তিসঙ্গত গর্ববোধ আছে, কিন্তু একে কখনই দাম্ভিকতা বলা যাবে না। দম্ভ বা আরও সঠিকভাবে বললে অহংকার একজন মানুষের নিজের সম্পর্কে একটা মাত্রাতিরিক্ত গর্ববোধ। এমন অহেতুক অহংবোধ আমায় নাস্তিক করেছে,

নাকি এ বিষয়ে সযত্ন অধ্যয়ন এবং বহু চিন্তা-ভাবনার ফলশ্রুতিতে আমার মধ্যে ঈশ্বর অবিশ্বাস জন্মেছে– আমি এখন সে প্রসঙ্গে আলোচনার অবতারণা করতে চাই।

প্রথমেই একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলে রাখা ভাল যে, আত্মশ্লাঘা আর আত্মম্ভরিতা এক জিনিস নয়। প্রথমত আমি একটা বিষয়ে বুঝতে সম্পূর্ণ অপারগ যে দাম্ভিকতা বা আত্মশ্লাঘা কি করে একজনের ঈশ্বর বিশ্বাসের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। একজন প্রকৃতই বড় মানুষের মহত্ত্বকে তখনই আমি অস্বীকার করতে পারি যখন আমি বুঝব আমি কোন দিক দিয়েই তার সমকক্ষ না হয়েও অথবা আবশ্যিক কোন মহৎ গুণ না থাকা সত্ত্বেও কোন কারণে আমি একটু বিখ্যাত হয়ে পড়েছি। এটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু একজন আস্তিক কিভাবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত দম্ভের জোরেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ছেড়ে দিতে পারে? দুভাবে পারে। হয় ওই ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে অথবা নিজেকেই ঈশ্বর হিসেবে ভাবতে শুরু করে। আর এ দুটোর কোন ক্ষেত্রেই সে যথার্থ নাস্তিক হতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে না। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রকৃতির ঘটনাবলীর নিয়ন্তা হিসাবে পর্দার আড়ালে এক সচেতন সত্তার অস্তিত্বকে মেনে নিচ্ছে। এখানে সেই পরম সত্তা হিসাবে সে নিজেকেই ভাবছে না কি নিজের থেকে স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব হিসাবে ভাবছে– এ প্রশ্ন গৌণ। মূল কথাই হল তার বিশ্বাস আছে এবং সে অর্থে সে নাস্তিক নয়। আমার কথা হল, আমি প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ি না। বরং সর্বশক্তিমান কোন ওই পরমাত্মার অস্তিত্বই আমি অস্বীকার করি। কেন করি সেই আলোচনায় পরে আসব। এখানে একটা কথা আমি পরিষ্কার করে বলে যেতে চাই যে কোন দম্ভ থেকে আমি নাস্তিকতার তত্ত্ব গ্রহণ করতে উদ্দীপ্ত হইনি। ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী অবতার কিংবা পরমসত্ত্বা-এর কোনটাই আমি নই। সুতরাং দম্ভ থেকে যে আমি এই চিন্তাধারায় পৌঁছইনি এই বিষয়টা পরিষ্কার। এখন আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো আমি দুটো ঘটনার সাহায্যে খণ্ডন করতে চাই। আমার এই বন্ধুদের মতে দিল্লীর বোমা ও লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাকে কেন্দ্র করে অহেতুক জনপ্রিয়তা লাভ করাই আমার মধ্যে আত্মশ্লাঘা সৃষ্টির কারণ। কিন্তু তাদের যুক্তি কি সঠিক? বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আমার মধ্যে নাস্তিকতার জন্ম মাত্র কয়েকদিন আগে ঘটেনি। আমি যখন অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবক ছিলাম তখন এই বন্ধুরা কেউ আমাকে চিনতেন না, তখনই আমার মধ্যে থেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস চলে গেছে। সামান্য একজন কলেজের ছাত্রের মধ্যে কোন দাম্ভিকতা থাকতে পারে না, যা তাকে নাস্তিকতার পথে ঠেলে দিতে পারে।'

–(মানিক মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভগৎ সিং রচনা সংগ্রহ' বই থেকে সংগৃহীত)

১৯৩০ সালের ৭ অক্টোবর। তিন ব্রিটিশ বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার রায় প্রদান করে। ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ সন্ধ্যা ৭ টায় এই তিন বিপ্লবীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

ভগত সিং-এর উপর নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহ:

১. Shaheed-e-Azad Bhaga: Singh (১৯৫৪)

২.Shaheed Bhaga: Singh (১৯৬৩)

৩.Shaheed (১৯৬৫)

৪.The Legend of Bhaga: Singh (২০০২)

৫.23rd March 1931: Shaheed (২০০২)
৬.Shaheed-E-Azam (২০০৩)
৭.Rang De Basanti (২০০৬)

মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদককে লেখা ভগৎ সিং-এর চিঠি

মাননীয় সম্পাদক
মডার্ন রিভিউ

আপনার বহুল প্রচলিত ম্যাগাজিনের ১৯২৯ ডিসেম্বর সংখ্যায় আপনি 'লং লিভ রেভোলিউশন' নামে একটি নিবন্ধে এই আপ্তবাক্যটিকে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। আপনার মতো একজন বর্ষীয়ান, অভিজ্ঞ, বিখ্যাত সাংবাদিক যাকে তামাম ভারতীয়রা শ্রদ্ধা করে তখন আপনাকে ভৎর্সনা বা সমালোচনা করা আমাদের সাজে না। তবুও আমাদের মনে হচ্ছে উক্ত আপ্তবাক্যটির মধ্যে দিয়ে আমরা কী বলতে চাইছি তা জনসমক্ষে বলা উচিত।

এই আন্দোলন বহু আগে শুরু হয়েছে। রাশিয়ায় আন্দোলন চলাকালীনও একই আওয়াজ উঠেছিল। বিখ্যাত সমাজবাদী লেখক আপটন সিনক্লেয়ার তার সাম্প্রতিক উপন্যাস বস্টন অ্যান্ড অয়েল-এ কিছু বিদ্রোহীদের নিয়ে এই একই প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। এই আপ্তবাক্যটির মানে এই নয় যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতেই থাকবে বা চলা উচিত। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই আন্দোলন চলার ফলে এর একটা অর্থ নিজে থেকেই তৈরি হয়ে গেছে যা ব্যাকরণ বা আক্ষরিক অর্থে হয়তো কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এরকম আবেদনগুলির একটা সাধারণ অর্থ থেকে যায় যা পার্টি অর্জন করেছে বা বলা ভালো দল এর সঙ্গে প্রায় একাত্ম হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা 'লং লিভ যতীন দাস' বলে চিৎকার করি তার মানে এই নয় যে যতীন দাস শারীরিকভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুন। আমরা এই আবেদনের মাধ্যমে যেটা বলতে চাই তা হল তার অদম্য স্পৃহা, জীবনদর্শন, আত্মত্যাগ বেঁচে থাকুক যা এই বিখ্যাত শহীদকে দেশের জন্য নিজেকে বলিদান দিতে সাহায্য করেছে। আর তার জন্যই আমরা সেই অদম্য সাহস আমাদের নিজেদের মতাদর্শনে দেখাতে পারি। আর তারই জন্য এই অদম্য স্পৃহার কথাই আমরা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করছি।

একাই একজনের 'রেভোলিউশন' শব্দটির কাব্যিক অর্থ নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। যাঁরা এই শব্দটিকে ভুলভাবে ব্যবহার করতে চাইছেন তারা তাঁদের নিজস্ব স্বার্থে 'রেভোলিউশন' শব্দটির উপর অসংখ্য অর্থ ও ব্যাখ্যা আরোপ করেছেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে বেশ কিছু বিখ্যাত লোক বা সংস্থা শব্দটিকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভয়ের অনুভূতি হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু সংগ্রামীদের কাছে এর অর্থ পবিত্র। বিধানসভায় বোমা নিক্ষেপ কাণ্ডের বিচারের সময় দিল্লির সেশন জাজের সামনে আমরা আমাদের প্রদত্ত তথ্যে 'রেভোলিউশন' শব্দটির অর্থ পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছিলাম।

আমরা সেখানে বলেছিলাম, 'রেভোলিউশন' শব্দটিকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সঙ্গে মেলানো উচিত নয়। বিপ্লব মানে যে শুধুই একটা বোমা বা পিস্তল এমনটাও নয়। একজন বিদ্রোহী কখনই বিপ্লবী হয় না।

ওই আপ্তবাক্যে 'রেভোলিউশন' শব্দটিকে অদম্য স্পৃহা, উন্নয়নের জন্য পরিবর্তন কামনা এই অর্থে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। বিপ্লবী স্পৃহার দ্বারা অলস স্পৃহাকে দূর করতে হবে। তা না হলে বিপ্লব পথভ্রষ্ট হয়ে কর্তৃত্ব হারাবে। বিপ্লবের এই স্পৃহাকে মানব উন্নয়নের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। পুরানো নীতিকে চিরকালের জন্য সরিয়ে নতুন নীতি প্রণয়ন করতে হবে। এই অর্থ বোঝাতেই আমরা 'লং লিভ রেভোলিউশন'-এর জন্য চিৎকার করে আসছি।

আপনার অনুগত

ভগৎ সিং

বি. কে দত্ত

ভগৎ সিংয়ের স্মৃতি

কুলদীপ নায়ার । তারিখ: ১৯-০৩-২০১০

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের ভগৎ– বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, র‍্যাডিক্যাল প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল জানুয়ারি ২০১১, ছবি এই বই থেকে নেয়া।

২. অগ্নিযুগের ইতিহাস– ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন, প্রকাশক, মুক্তধারা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭৯।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি, কলকাতা।

৪. উইকিপিডিয়া।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার



১৯২৪ সালের কথা। দিনটির কথা কারো মনে নেই। খুব সম্ভবত জুলাই-আগস্ট মাসের কোনো একদিন। ঝাপসা গরম। আকাশে মেঘ জমেছে। যেকোনো সময় বৃষ্টি আসতে পারে। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে ভাই-বোনরা সবাই মিলে পড়তে বসেছে। রানী তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। সবাই পড়ছে। শুধু থেমে আছে মধুসূদন। মধুসূদন প্রীতিলতার বড় দা। বড় দা'র পড়া না শুনতে পেয়ে তার দিকে তাকালো প্রীতিলতা। বড় দা মধুসূদন বোনের মুখের দিক তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো– আজ রেল শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য বিপুল অংকের টাকা ব্রিটিশ কর্মচারীরা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছিল। ওই গাড়িতে দুজন পুলিশও ছিল। কিন্তু হঠাৎ দিনের বেলায় বড় রাস্তায় ধারে চারজন লোক পিস্তল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ি থামালো। তারা গাড়ি থেকে সবাইকে নামিয়ে দিয়ে টাকাসহ গাড়ি নিয়ে চম্পট।

পরে জানা গেলো ওই লোকগুলো ডাকাত নয়, স্বদেশি। স্বদেশি আন্দোলনের কর্মী। তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে। তারা মৃত্যুকে পরোয়া করে না। এই দুর্ধর্ষ ডাকাতির কথা সেদিন প্রীতিলতাকে দারুণভাবে আলোড়িত করে।

এক মাস পর, একদিন সেই রেলওয়ে ডাকাতির লোকদের আস্তানায় পুলিশ হামলা চালায়। উভয় দলের সাথে শুরু হয় সংঘর্ষ। দীর্ঘ সময় ধরে চলে বন্দুক যুদ্ধ। অবশেষে শোনা গেল সেই ডাকাত দলের দুজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আহত দুজনের একজন হল উমাতারা ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক সূর্যসেন। অন্যজন পোস্ট অফিসের কেরানী অম্বিকা চক্রবর্তী।

গরুর গাড়িতে করে তাদের নিয়ে রহমতগঞ্জের রাস্তা দিয়ে জে. এম. সেন হলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তখন রানী তার এক সহপাঠিনীর বাসায় বসে জানালার ফাঁক দিয়ে তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখেছিল। সহপাঠিনীর যে ভাইটি উমাতারা স্কুলে পড়ে, সে বলে উঠলো ঐ-তো আমাদের মাষ্টারমশাই, চাদর গায়ে বসে আছে। উনি আমাদের অংকের মাষ্টার।

একথা শুনে সবাই অবাক হল। তারা দুজনছিল গুলিবিদ্ধ অবস্থায়। তাদেরকে নিয়ে যাওয়ার সময়ও পুলিশ লাথি, চড় মারছিল। ক্লান্ত অবস্থায় দুজনই গাড়ির মধ্যে বার বার ঢুলে পড়ছিল। এই দৃশ্য দেখে রানী খুব কষ্ট পেল। তাদের জন্য তার মায়া হল। কিন্তু কি করার আছে তার! বাসায় গিয়ে মা-বাবাকে এই ঘটনা বলল। তারাও রানীর পূর্বেই এই ঘটনাটি

শুনেছিলেন। রানী মা-বাবাকে বলেছিল চল আমরা মাষ্টারমশাইকে দেখে আসি। বাবা সরকারি চাকরি করার কারণে রানীর অনুরোধ রাখতে পারলো না। একবুক কষ্ট নিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়া আর কোনো কিছুই করার ছিল না রানীর!

কিছুদিন পর শোনা গেল, কলকাতা থেকে বিখ্যাত ব্যারিস্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর পক্ষ সমর্থন করে চট্টগ্রাম এসেছেন। কোর্টে এই মামলা দেখার জন্য অনেক লোকের ভিড় জমে। সূর্যসেনের অনেক প্রিয় ছাত্রও এই মামলা দেখার জন্য কোর্টে আসে। রানীর এক খুড়তুত ভাই রোজ এই মামলা দেখতে যেত। সেছিল চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্র। খেতে খেতে ভাইটি সেই মামলার কাহিনী বলল। রানী বলল দাদা, তারা কবে ছাড়া পাবে? তাদের গায়ে নাকি গুলি লেগেছিল, কেমন আছে?

ভাইটি বলল দেখলাম-তো ভালই আছে। রানীর মা বলল ডাকাতদের না ধরে ভাল মানুষকে ওরা মামলা দিয়েছে। রানী দেখিস তারা একদিন ছাড়া পেয়ে যাবে। মায়ের কথা শুনে রানীর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রানীর মা প্রতিভাদেবী ওই ছেলেটিকে মনু বলে ডাকত। তিনি বললেন মনু তারা যেদিন ছাড়া পাবে সেদিন বাসায় এসে আমাদের খবরটা জানিয়ে যেও। কিছু দিন পর তারা দু'জন বেকসুর খালাস পেল।

রানীর স্কুলের শিক্ষিকা উষাদি একদিন অন্যান্য মেয়েদের সাথে গল্প করার জন্য রানীকে ডেকে নিয়ে যায়। দেশ-বিদেশের গল্প শুনায়। ওই দিন তিনিই তার ছাত্রীদেরকে সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর মামলার কথা বলছিলেন। রানী সবার আগে বলে উঠল তাদের ছাড়া পাওয়ার কথা মা কয়েক দিন আগে বলেছিলেন।

উষাদি হেসে বললেন দোষ করেছে, মানে ডাকাতি করেছে। অপরাধ করেছে এই কথাতো? কিন্তু দোষ কার? কে শাস্তি দিবে? সেই বিচার কে করবে? এই যে আমাদের স্বদেশ, এখানে আমরা কিভাবে আছি কেন আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ না খেয়ে থাকে, শিক্ষা পায় না, রোগে ঔষধ পায় না, অবাক হয়ে তার কথা শুনতেছিলেন। ওই দিন উষাদি রানীকে একখানা বই 'ঝাঁসির রানী লক্ষীবাই' দিয়ে বলেছিলেন এটা ভাল করে পড়। এটা পড়া শেষ হলে আরো বই পড়তে দেব। উষাদি ছিলেন স্বদেশিদের গোপন সহযোগী।

বাড়িতে ফিরে পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ওই বইখানি পড়তে শুরু করলো। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে বইটি পড়ে শেষ করলো রানী। খুড়তুত ভাই ও উষাদি'র সংস্পর্শে এসে রানী রাজনীতির অনেক কিছু বুঝতে শিখলো।

স্কুলে রানীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন কল্পনা দত্ত (পরবর্তীতে বিপ্লবী)। এক ক্লাসের বড় রানী কল্পনার সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতেন। তাদের স্বপ্নের কথা লিখেছেন কল্পনা দত্তঃ 'কোন কোন সময় আমরা স্বপ্ন দেখতাম বড় বিজ্ঞানী হব। সেই সময়ে ঝাঁসীর রানী আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। নিজেদেরকে আমরা অকুতোভয় বিপ্লবী হিসাবে দেখা শুরু করলাম'।

১৯২৪ সাল। ভারত উপমহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। সর্বত্র সংগঠিত হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠন। চট্টগ্রামে রেলওয়ে ডাকাতি, বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ডাকাতি ও বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র কার্যকলাপের কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ব্রিটিশ 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল– 'রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা'। এই

আইন পাশ হওয়ার পর ব্রিটিশ সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের গ্রেফতার করা শুরু করে। চট্টগাম থেকে সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্তীসহ অনেকেই এই আইনে আটক করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে রানী শিক্ষক বিপ্লবী সূর্যসেনের কথা বহুবার শুনেছেন।

একবার পুলিশ সূর্যসেনকে ধরার জন্য দেওয়ান বাজারে তার এক আত্মীয় বাড়ি ঘেরাও করে। সূর্যসেন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে চট্টগ্রাম কলেজের মেধাবী ছাত্রের বাসায় উঠেন। এই মেধাবী ছাত্রটি শহরের ছাত্র-যুব বিপ্লবীচক্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। রানীর খুড়তুত ভাই। এই তরুণ বিপ্লবী নেতা সূর্যসেনের পলাতক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের যেসব গোপন বই-পত্র ছিল তা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল এই তরুণ যুবকটির উপর। 'ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, দেশের কথা ও সরকারি রাউলাট কমিশন' ইত্যাদি বই।

'বেঙ্গল অর্ডিনান্স'-এ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর ওই ছেলেটি এই বইগুলো কাগজে মুড়িয়ে রানীর কাছে রাখে। রানীকে এই বইগুলো কাউকে দেখাতে নিষেধ করে দেয় এবং বলে এগুলো দেখালে অনেক বড় ক্ষতি হবে। রানী প্রতিজ্ঞা করে বলে, দাদা আমি এই বইগুলো লুকিয়ে রাখবো মা-বাবাকে দেখাবো না। রানী ততদিনে বেশ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে। রানী তখন থেকেই চিন্তা করতে থাকে এর মধ্যে এমন কি বই আছে যা কেউ দেখলে অনেক ক্ষতি হবে? দ্বিধা-সংকোচ-ভয় কাটিয়ে একদিন ভাবলেন দাদা বইগুলো অন্যদের দেখাতে নিষেধ করেছে কিন্তু আমাকে দেখতে বা পড়তে নিষেধ করেনি। তাই একদিন রাতে বাসার সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ওই কাগজে মুড়ানো বইয়ের প্যাকেটটি খুলল। খুলে দেখে 'ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, দেশের কথা, ও সরকারি রাউলাট কমিশন' ইত্যাদি বই। 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স'সহ আরো কিছু কাগজ-পত্র। রানী মাসখানেকের মধ্যে এই বইগুলো পড়ে প্রায় শেষ করে ফেলল।

২ মাস পর একদিন রানীর ভাইটি তাদের বাসায় আসলো। তখন বিকেল বেলা। সন্ধ্যা হতে হয়তো বড়জোর আধঘন্টা বাকী। রানী বাড়ির পাশে আম গাছের নিচে বসে বাঘা যতীন বইটি পড়ছিল। ঘরে রানীকে না পেয়ে সে বাড়ির পাশে আম গাছের নিচে চলে গেল। সে আগে থেকেই জানতো রানী মাঝে মাঝে এই সময়টাতে ওই খানে গিয়ে বই পড়ে। চুপিচুপি রানীর পাশে গিয়ে সে দেখে বাঘা যতীন বইটি পড়ছে। প্রথমে কিছুটা ভয় পেয়ে গেল পূর্ণেন্দু দস্তিদার (রানীর খুড়তুত ভাই, চট্টগ্রাম কলেজের মেধাবী ছাত্র, ছাত্র-যুব বিপ্লবীচক্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক)। রানী একি করছিস? দাদা ভয় নেই, আমি কাউকে এই বই দেখাই নি। শুধু গোপনে গোপনে আমি পড়েছি। সন্ধ্যা নেমে আসতে আসতে দুজন ঘরে চলে গেল। পূর্ণেন্দু দস্তিদার টেবিলের পাশে বসে রানীর ইতিহাসের বইটি উল্টাচ্ছিল। হঠাৎ বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্য থেকে একটি ছবি পড়ে গেল। রানী ছবিটি উঠিয়ে দাদাকে দেখিয়ে বলে, নিশ্চয়ই তুমি এই ছবিটি চেন? 'ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই'। এই বইটি অনেক আগে পড়ে শেষ করেছি। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঝাঁসির রানী, রানী ভবানীর মতো দেশের জন্য লড়বো। প্রয়োজনে এদের মতো জীবন উৎসর্গ করবো। তোমাদের সাথে যুক্ত হব। তাছাড়া তোমরা আমায় 'রানী' বলে ডাক। নাটোরের আর ঝাঁসির রানী যা পেরেছিল, চাটগার রানী নিশ্চয়ই তা পারবে। দাদা অবাক হয়ে তার কথা শুনে গেল। কিছুই বলল না। কারণ দলের অনুমতি নেই। পরে কোনো একদিন পূর্ণেন্দু দস্তিদার এই কথাগুলো দলনতো সূর্যসেনকে বলেছিল। মূলত: এই বইগুলো পড়ার পর রানী মনে মনে বিপ্লবী হয়ে উঠতে শুরু করেন। দেশের

মুক্তির জন্য অগ্নি শপথ নেন। রানী থেকে বিপ্লবী প্রীতিলতার বিপ্লব জীবনের সূত্রপাত হয় এখানে।

প্রীতিলতার জন্ম ১৯১১ সালের ৫ মে। চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে। এখানে জন্ম হয়েছে অসংখ্য বিপ্লবীর। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গ্রাম ছিল বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি। প্রীতিলতার বাবার নাম জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল অফিসের প্রধান কেরানী। জগদ্বন্ধু শৈশবে পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক বাড়ি ডেঙ্গাপাড়া ত্যাগ করে মায়ের সাথে পটিয়া থানার ধলঘাট গ্রামে চলে আসেন। ধলঘাট ছিল তার মামা বাড়ি ছিল। এখানেই তিনি বড় হন এবং বসতি স্থাপন করেন।

মাতা প্রতিভাদেবী। তিনি ছিলেন গৃহিণী। জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার ও প্রতিভাদেবী, তাদের পরিবারে ছয় সন্তানের জন্ম হয়। মধুসূদন, প্রীতিলতা, কনকলতা, শান্তিলতা, আশালতা ও সন্তোষ। জগদ্বন্ধু পরিবারের আদি পদবী ছিল দাশগুপ্ত। তাদের বংশের কোনো এক পূর্বপুরুষ নবাবী আমলে 'ওয়াহেদেদার' উপাধি পেয়েছিলেন। সেই ওয়াহেদেদার থেকে ওয়াদ্দেদার বা ওয়াদ্দার। মা প্রতিভাদেবী প্রীতিলতাকে আদর করে রানী নামে ডাকতেন।

প্রীতিলতার পড়াশুনার হাতেখড়ি বাবা, মা'য়ের কাছে। তার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। যে কারণে জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার মেয়েকে (১ম ও ২য় শ্রেণিতে ভর্তি না করে) সরসরি তৃতীয় শ্রেণিতে স্কুলে ভর্তি করে দেন। ডা. খাস্তগীর উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় ওই সময়ের অন্যতম নারী শিক্ষালয়। এই নামকরা স্কুলে প্রতিটি শ্রেণিতে তিনি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় ছিলেন। ৮ম শ্রেণিতে প্রীতিলতা বৃত্তি পান।

ওই স্কুল থেকে ১৯২৭ সালে প্রীতিলতা প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করার পর ভর্তি হলেন ঢাকায় ইডেন কলেজে। থাকেন কলেজের ছাত্রীনিবাসে। তখন প্রীতিলতা বিপ্লবী লীলা নাগের সংস্পর্শে আসেন। তখন বিপ্লবী লীলা নাগের নেতৃত্বে 'দীপালী সংঘ' সংগঠনটি পরিচালিত হত। দীপালী সংঘ ছিল 'শ্রীসংঘ'-এর মহিলা শাখা সংগঠন। 'শ্রীসংঘ' ছিল তখনকার ঢাকার একটি বিপ্লবী দল।

অনেকদিন পর লীলা নাগের সাথে প্রীতিলতার দীপালী সংঘ নিয়ে কথা হল। কথাবার্তার মাধ্যমে লীলা নাগ বুঝে নিলেন একে দিয়ে দেশের কাজ হবে। তাই লীলা নাগ প্রীতিলতা দীপালী সংঘের সদস্য হওয়ার জন্য একটি ফর্ম দিয়ে বলল, তুমি এর উদ্দেশ্য ও আদর্শের সাথে একমত পোষণ করলে বাড়ি থেকে এসে ফর্মটি পূরণ করে দিও।

বাড়ির আসার পরের দিন ওই ফর্মটি খুড়তুত ভাইকে দেখালো এবং বললো দাদা আমি এই সংঘের সাথে কাজ করবো। তোমরা তো আর আমাকে তোমাদের দলে নিবে না, তাই! এখানে যুক্ত হয়ে আমি দেশের জন্য কাজ করবো। ভাই পূর্ণেন্দু দস্তিদার ওই ফর্মটি প্রীতিলতা কাছ থেকে নিয়ে গেল আর বলল দলনেতাকে দেখিয়ে তোমাকে ফেরত দিব।

১৯২৯ সাল। তখন সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। পূর্ণেন্দু দস্তিদার পরের দিন বিকেল বেলা বিপ্লবীদের গোপন বৈঠকে উপস্থিত হল। বৈঠক শেষে জেলা কংগ্রেসের কার্যলয়ে তিনি মাষ্টার দা সূর্যসেনকে ওই ফর্মটি দেখালেন এবং প্রীতিলতার মনের কথাগুলো বললেন। মাষ্টার দা সূর্যসেন সবকিছু শুনে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে বললেন, আজ থেকে আমরা প্রীতিলতাকে আমাদের দলের সদস্য করে নিলাম। কিন্তু এই কথা আপাতত আমরা তিনজন ছাড়া অন্য কাউকে জানানো যাবে না। প্রীতিলতাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে এসো।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে ভারত উপমহাদেশ থেকে উৎখাত করার জন্য বিপ্লবীরা একেকটি অঞ্চলের দায়িত্ব নেন। সূর্যসেন চট্টগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তার নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী দল গঠন হয়। যার মধ্যে ছিলেন নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, ধীরেন চক্রবর্তী, উপেন চক্রবর্তী, নগেন সেন, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, বিনয় সেন, মধু দত্ত, রাজেন দে, লোকনাথ বল প্রমুখ। ওই সময় পর্যন্ত দলে কোনো মেয়ে সদস্য ছিল না। সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান, সাহসী যুবক ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরই নেয়া হতো এই বিপ্লবী দলে।
একদিন পত্রিকায় খবর হয়, 'চাঁদপুর স্টেশনের ইন্সপেক্টরের' হত্যাকারী দুই বাঙালি যুবক গ্রেফতার। তাদের নাম রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালিপদ চক্রবর্তী। প্রীতিলতার সঙ্গে রামকৃষ্ণের পরিচয় ছিল না। নিজেকে বোন পরিচয় দিয়ে জেলের ভেতর অসংখ্যবার রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন প্রীতিলতা। তার মুখেই শোনেন সূর্যসেনের দৃঢ়চরিত্র ও বীরত্বের কথা। দাদা রামকৃষ্ণের কাছেও প্রীতির একই প্রশ্ন, 'আমরা মেয়েরা কি তোমাদের মতো হতে পারি না, দাদা?'
প্রীতিলতা আই. এ পরীক্ষা শেষ করে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে চলে আসেন। ওই সময়ও মাষ্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। সূর্যসেনের সাথে প্রীতিলতার ভবিষৎ কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় প্রীতিলতার আই. এ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাসিক ২০ টাকা বৃত্তিও পাবেন তিনি। ঠিক হল কলকাতার বেথুন কলেজে পড়াশুনা করবেন। ইংরেজি সাহিত্যে নিয়ে বি. এ ভর্তি হলেন প্রীতিলতা। থাকেন ছাত্রীনিবাসে। এখানে মাষ্টারদার নির্দেশে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড শুরু করলেন প্রীতিলতা। গড়ে তুললেন এক বিপ্লবী চক্র। এই বিপ্লবী চক্রে অনেক মেয়ে সদস্য যোগ দিলেন। তাদের মূল কাজই হল অর্থ সংগ্রহ। অর্থ সংগ্রহ করে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে পাঠাতে লাগলেন।
কলকাতার এক গোপন কারখানায় তখন তৈরি হয় বোমার খোল। মাষ্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী সে বোমার খোল সংগ্রহ করে প্রীতিলতা। ১৯২৯ সালে পূজার ছুটিতে প্রীতিলতা-কল্পনা দত্ত, সরোজিনি পাল, নলিনী পাল, কুমুদিনী রক্ষিতকে নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন। বোমার খোলগুলো পৌঁছে দেন বিপ্লবীদের হাতে। মাষ্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী প্রীতিলতা এরপর থেকে প্রকাশ্য বিপ্লবী কাজেও যুক্ত হয়ে পড়েন। অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও তাকে তখন নিতে হয়। কলকাতায় যে বিপ্লবী চক্র গঠন করা হয়েছে, তাদের সকল প্রকার প্রশিক্ষণও প্রীতিলতাকে দিতে হতো।
বি.এ. শেষ বর্ষে চট্টগ্রামের অস্ত্রগার দখল, জালালাবাদ সংঘর্ষ ও সেই যুদ্ধে তার আত্মীয় শহীদ হওয়ায় লেখাপড়ায় সে অমনোযোগী হয়ে ওঠে এবং রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির পর থেকে সে বি. এ পরীক্ষা না দেয়ার জন্য মন স্থির করেন। কিন্তু তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বি. এ পরীক্ষা দিয়ে ডিসটিংশনে পাস করলেন।
সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের লৌহকঠিন দুঃশাসনের পাঁজর গুড়িয়ে দিয়েছে চট্টগ্রামের স্বাধীনতাকামীরা। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মহানায়ক সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে দখল হল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসন অচল হয়ে গেলো। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন বিকল। সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। রিজার্ভ পুলিশ ছত্রভঙ্গ। রেললাইন উপড়ে ফেলা হল। স্বদেশি বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে ফেলেছে। এ সময় প্রীতিলতা কলকাতায়।

চট্টগ্রামে আসার জন্য ব্যাকুল। সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তখনো পর্যন্ত মাষ্টারদার অনুমতি মেলেনি।

বি. এ পরীক্ষা শেষে মাষ্টারদার নির্দেশে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রামে চলে আসেন। ১৯৩২ সালের শুরুতে বি. এ পাস করার পর কর্মজীবনের শুরুতে চট্টগ্রাম অপর্ণাচরণ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন। এ সময় বিপ্লবী কাজে আরো বেশি সক্রিয় হওয়ার তাগিদে দিল সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা সূর্যসেন।

১৯৩২ সালের মে মাসে প্রীতিলতার জন্মস্থান ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে মাষ্টারদাসহ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপনে বৈঠক শুরু হয়। এই বৈঠক চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাথে বিপ্লবীদের বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়। সে যুদ্ধে প্রাণ দেন বিপ্লবী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। সূর্যসেন প্রীতিলতাকে নিয়ে বাড়ির পাশে ডোবার পানিতে ও গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকেন। সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর মাষ্টারদা বলেন, 'প্রীতি, তুমি বাড়ি ফিরে গিয়ে স্কুলের কাজে যোগ দেবে, তাহলে গত রাতের ঘটনায় কেউ তোমাকে সন্দেহ করবে না।' সাবিত্রী দেবীর বাড়িটি পুলিশ পুড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সরকার প্রীতিলতাকে সন্দেহ করা শুরু করে। মাষ্টারদার নির্দেশে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। অন্য একটি বিপ্লবী গ্রুপ ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থ হয়। যার কারণে মাষ্টারদা প্রীতিলতাকে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে বলেন। এই জন্য কাট্টলি সমুদ্র সৈকতে বিপ্লবী দলকে মাষ্টারদা সামরিক প্রশিক্ষণ দেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে এক গোপন বৈঠকে মাষ্টারদার নির্দেশে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত দেখা করতে রওনা হন পুরুষের বেশে। কিন্তু পথে পাহাড়তলীতে কল্পনা দত্ত ধরা পড়েন। প্রীতিলতা নিরাপদে নির্দিষ্ট গ্রামে এসে পৌঁছেন। এখানেই পরিকল্পনা নেয়া হয় প্রীতিলতার নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করার।

আক্রমণে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য কাট্টলীর সাগরতীরে প্রীতিলতা ও তার সাথীদের অস্ত্র শিক্ষা শুরু হয়। প্রীতিলতার নেতৃত্বে যেসব বিপ্লবীকে ওই আক্রমণ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত করা হয় তারা হলেন, ১. শান্তি চক্রবর্তী– দক্ষিণ কাট্টলী, ডবলমুড়িং থানা, ২. কালী দে– গোসাইলডাঙ্গা, ডবলমুড়িং থানা, ৩. সুশীল দে– ধৈরলা, বোয়ালখালী থানা, ৪. প্রফুল্ল দাশ– কাট্টলী, ডবলমুড়িং থানা, ৫. মহেন্দ্র চৌধুরী– মোহরা, পাঁচলাইশ থানা।

১৯৩২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মাষ্টারদার প্রীতিলতাকে বললেন, পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব তোমাকে নিতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে বীরকন্যা প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সফল হন। আক্রমণ শেষে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এ অবস্থায় ধরা পড়ার আগে সঙ্গে রাখা সায়ানাইড বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কারণ ধরা পড়লে বিপ্লবীদের অনেক গোপন তথ্য ব্রিটিশ পুলিশের মারের মুখে ফাঁস হয়ে যেতে পারে। প্রীতিলতা মারা যাওয়ার আগে মায়ের কাছে লিখেছিলেন, 'মাগো, অমন করে কেঁদোনা! আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না? কী করব মা? দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী বিদেশির অত্যাচারে জর্জরিত! দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা!

তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে?'

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ব্রিটিশদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজেকে গড়ে তোলার পাশাপাশি অসংখ্য বিপ্লবীদের প্রশিক্ষিত, অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে গেছেন। নিজেদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ধরা পড়ার পর যেন কেউ জানতে না পারে তাই স্বজ্ঞানে নিজেকে দেশমাতৃকার জন্য আকুণ্ঠভাবে উৎসর্গ করলেন। দেশের জন্য এই আত্মদান আজও মানুষকে উদ্বেলিত করে, শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সাহস যোগায়।

ভারত উপমহাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনেক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে ঘরে ঘরে মা, বোন, মাসিমা, কাকিমা, দিদি, বৌদিরা যুক্ত ছিলেন। যেমন ছিলেন অগ্নিযুগের প্রথম পর্বে স্বর্ণ কুমারী দেবী, সরলা দেবী, আশালতা সেন, সরোজিনী নাইডু, ননী বালা, দুকড়ি বালা, পরবর্তীকালে ইন্দুমতি দেবী, (অনন্ত সিংহের দিদি) লীলা রায়, পটিয়া ধলঘাটের সাবিত্রী দেবী প্রমুখ দেশপ্রেমিক নারী। তারই ধারাবাহিকতায় সেই অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা, বীর কন্যা প্রীতিলতার আবির্ভাব।

লেখক: শেখ রফিক

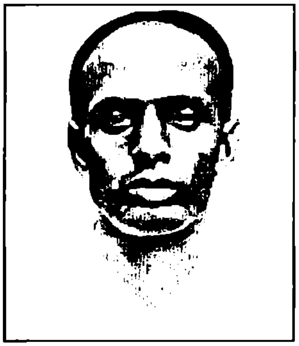
তথ্যসূত্র:

১. বীর কন্যা প্রীতিলতা– পূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রকাশকাল ১৩৭৯ বাংলা।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম– পূর্ণেন্দু দস্তিদার, চট্টগ্রাম বই ঘর, প্রকাশকাল ১৩৭৪ বাংলা।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রকাশকাল ১৯৯০ সাল, কলকাতা।

সূর্যসেন



১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি। সন্ধ্যাবেলা। চট্টগ্রাম জেলে বসে সূর্যসেন খুব সচেতনভাবেই ভাবছেন রাত ১২ টা ১ মিনিট বাজতে আর মাত্র পাঁচ ঘণ্টা বাকী। এই সময়টুকুই পার হওয়ার সাথে সাথে তার এবং তার সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদারের জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। রাত ১২ টা ১ মিনিটে ফাঁসির রজ্জু তাকে পরতেই হবে। এটাই আইন। ব্রিটিশ সরকারের আইন। ব্রিটিশ সরকারের বিজ্ঞ আইনজ্ঞ জজের রায়।

সূর্যসেনের অপরাধ 'দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করেছেন ব্রিটিশ শাসন-শোষণ, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে'। এজন্য তাকে মরতে হবে। মাস্টারদা সূর্যসেন পায়চারী করছেন আর ভাবছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য আরো অনেকটা পথ হাঁটতে হবে এবং এজন্য অনেকেরই জীবন উৎসর্গ করতে হবে। তাই তিনি তার সহযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা লিখে যান।

অন্যদিকে সূর্যসেনের সহযোদ্ধারা ও ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীরা অশ্রুসিক্ত নয়নে সূর্যসেনের কথা ভাবছেন। অনেক সহযোদ্ধার মনে নেতার সাথে তাদের লড়াই-সংগ্রামের অসংখ্য স্মৃতির কথা ভেসে উঠছে। রাত ১২ টা ১ মিনিটে তারা তাদের প্রিয় নেতাকে রেড স্যালুটের মাধ্যমে বিদায় জানিয়ে স্বাধীনতার জন্য অগ্নিশপথ নিবেন। অনেকেই নেতার লাশ ছুঁয়ে স্বাধীনতার জন্য শপথ করার প্রতিজ্ঞা নিবেন বলে জেলগেটে অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সূর্যসেনের লাশ দেয়নি। কারণ তারা ভেবেছিলেন, সূর্যসেনের লাশ লড়াই-সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে, তাই লাশটিকে গুম করে ফেলে। পরে জানা যায়, লাশটি লোহার খাঁচায় ভরে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

সে মঙ্গলপাণ্ডে থেকে শুরু করে সূর্যসেন পর্যন্ত বা তার পরেও যারা ব্রিটিশ সরকারের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তাদেরকে ফাঁসি অথবা জেলে আটকে রেখে নির্যাতনের মাধ্যমে মারা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসির ৫ ঘণ্টা পূর্বে লেখা মাস্টারদা সূর্যসেনের শেষ বাণী:

'আমার শেষ বাণী– আদর্শ ও একতা। ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলছে। এই তো সাধনার

সময়। বন্ধুরূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার এই তো সময়। ফেলে আসা দিনগুলোকে স্মরণ করার এই তো সময়।
কত মধুর তোমাদের সকলের স্মৃতি। তোমরা আমরা ভাই-বোনেরা তোমাদের মধুর স্মৃতি বৈচিত্রহীন আমার এই জীবনের একঘেঁয়েমিকে ভেঙ্গে দেয়। উৎসাহ দেয় আমাকে। এই সুন্দর পরম মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য দিয়ে গেলাম স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। আমার জীবনের এক শুভ মুহূর্তে এই স্বপ্ন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জীবনভর উৎসাহভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের মতো সেই স্বপ্নের পেছনে আমি ছুটেছি। জানি না কোথায় আজ আমাকে থেমে যেতে হচ্ছে। লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে মৃত্যুর হিমশীতল হাত আমার মতো তোমাদের স্পর্শ করলে তোমরাও তোমাদের অনুগামীদের হাতে এই ভার তুলে দেবে, আজ যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমার বন্ধুরা– এগিয়ে চল, এগিয়ে চল– কখনো পিছিয়ে যেও না। পরাধীনতার অন্ধকার দূরে সরে যাচ্ছে। ওই দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার নবারুণ। কখনো হতাশ হয়ো না। সাফল্য আমাদের হবেই। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন।
১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম ইস্টার বিদ্রোহের কথা কোনও দিনই ভুলে যেও না। জালালাবাদ, জুলখা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সব সময় মনে রেখো। ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে যেসব দেশপ্রেমিক জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লিখে রেখো।
আমাদের সংগঠনে বিভেদ না আসে– এই আমার একান্ত আবেদন। যারা কারাগারের ভেতরে ও বাইরে রয়েছে, তাদের সকলকে জানাই আমার আশীর্বাদ। বিদায় নিলাম তোমাদের কাছ থেকে।
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
বন্দেমাতরম।'

চট্টগ্রামের বিপ্লবী ইতিহাসের মহানায়ক সূর্যসেন জন্মেছিলেন ১৮৯৪ সালের ২২ মার্চ। চট্টগ্রামের রাউজান থানার নোয়াপাড়া গ্রামে। তার পূর্ণনাম শ্রীসূর্যকুমার সেন। তার বাবার নাম রাজমণি সেন। মা শশীবালা সেন। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান। পাঁচ বছর বয়সের সময় সূর্যসেনের পিতা মারা যায়। এরপর থেকে সূর্যসেন তার বড় কাকা গৌরমণি সেনের কাছে লালিত-পালিত হয়েছেন। পরবর্তীতে জ্যাঠতুতো দাদা চন্দ্রনাথ সেন তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেন।
সূর্য সেনের বর্ণমালার হাতেখড়ি বাবার কাছে। তারপর রাজমণি সেন সূর্যকে নোয়াপাড়া দয়াময়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। প্রাথমিক পাঠ শেষে সূর্য নোয়াপাড়া মাইনর স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি ৪ বছর পড়েছেন। মাইনর স্কুলটি পড়াশুনার জন্য ভালই ছিল। কিন্তু ওই স্কুলের সরকারি অনুমোদন না থাকায় তার চাচা গৌরমণি সেন সূর্যকে চট্টগ্রাম নন্দনকাননের ন্যাশনাল স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন।
পড়াশুনা আর কি যেন ভাবনা নিয়ে সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকেন সূর্য। খুব সম্ভবত ন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক হরিশ দত্তের কথাগুলো তার মনে গেঁথে গেছে যে, 'সত্যিকারের একটা মানব সন্তান চাই, মন দিয়ে লেখাপড়া শিখবে, মানুষের মতো মানুষ হওয়া চাই।' এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার বেশ কিছুদিন পর সূর্য ছাত্র পড়ানো শুরু করেন। এতোদিন জ্যাঠার

সাথে ছিলেন। এখন টিউশনি করে যে টাকা পেতেন তা দিয়ে নিজে চলেন এবং মাকেও কিছু পাঠান। মাকে খুব ভালবাসেন। মা ছাড়া তার আর কাউকে নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। পড়াশুনা আর মানুষের মতো মানুষ হওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

ওই সময় বঙ্গভঙ্গ রোধকল্পে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার ঢেউ বাংলার প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের মূলবিষয় সূর্য না বুঝলেও মাস্টার মশাইয়ের কাছে শুনে মোটাদাগে এর অনেক কিছু বুঝেছিলেন। এ আন্দোলন তার মাঝে রেখাপাত করে।

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল বড়লাটকে মারার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বোমা নিক্ষেপ করে। বোমা নিক্ষেপের পর প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ার সাথে সাথে নিজের মাথায় রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে আত্মহত্যা করেন। এর প্রায় তিন মাস দশ দিন পর ১১ আগস্ট ১৯০৮ ব্রিটিশ সরকার ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনাও তাকে সেই শৈশবে প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত করেছিল।

১৯১০ সালে সূর্যসেনের মা মারা যান। মা মারা যাওয়ার পর কিছুদিন ভীষণ মন খারাপ ছিল তার। মনের কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে তিনি গুপ্ত সমিতিতে নাম লেখান। দেশমাতাকে মা করে নেওয়ার মন্ত্রে দীক্ষা নেন। দেশমাতাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করার কাজে যুক্ত হন তিনি। সন্ধ্যায় দুটো টিউশনি, পড়াশুনা আর সমিতির কাজ। তিনি গণিতে ভাল ছিলেন। অনেক সময় ক্লাসের পিছিয়ে পড়া ছাত্রদেরকে গণিত শিখাতেন। ছাত্ররা কঠিন গণিত কষতে তার শরনাপন্ন হতেন। এ সময় থেকেই তিনি পাড়ার লোকজনের কাছে মাস্টার মশাই হিসেবে পরিচিতি পান। ১৯১২ সালে তিনি ওই স্কুল থেকে গণিতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশের স্বীকৃতি পান।

তারপর তিনি চট্টগ্রাম কলেজে আই. এ ভর্তি হন। এই কলেজটি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি নামকরা কলেজ। সূর্যসেন এই কলেজে পড়াশুনাকালে এক শিক্ষকের সংস্পর্শে বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুশীলন সমিতিতে যুক্ত হন। অনুশীলন সমিতি ছিল ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন। ওই শিক্ষক ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক– শতীশ চক্রবর্তী। এই অধ্যাপক ক্লাস থেকে ছাত্রদের বেছে নিয়ে আলোচনায় বসতেন। তাদেরকে ধীরে ধীরে বিপ্লবী দলে যুক্ত করতেন।

চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই. এ পাশ করার পর সূর্যসেন পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে বি. এ ভর্তি হন। এই কলেজে পড়াশুনাকালে তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলে যুক্ত হন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯১৮ সালে তিনি বি. এ পাসের স্বীকৃতি অর্জন করেন। এরপর তিনি চট্টগ্রামে ফিরে এসে গণিতের শিক্ষক হিসেবে ওরিয়েন্টাল স্কুলে যোগ দেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের (গুপ্ত সমিতি) দু'একজন ছাড়া প্রায় সকলকেই ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করে। ফলে সূর্যসেনের কাঁধে বিপ্লবী দল ও আন্দোলন সংগঠিত করার দায়িত্ব এসে পড়ে। সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী শহরের দেওয়ানবাজারের দেওয়ানজী পুকুর পাড়ে শান্তি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানেই থাকেন এবং বিপ্লবী দল গোছানোর কাজ করেন। তখনও চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' বিভক্ত হয়নি। উল্লেখ্য ১৯১০ সালে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সে কারণে চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতি নামে আরেকটি বিপ্লবী দল ছিল।

বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বিপ্লবীদের সাংগঠনিক শক্তি মতাদর্শিক পার্থক্যের কারণে চারুবিকাশ দত্ত তার সঙ্গীদের নিয়ে 'অনুশীলন' দলে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর সূর্যসেন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ 'যুগান্তর' দল গঠন করেন। এই বিপ্লবী দলের সভাপতি হন সূর্যসেন, সহ-সভাপতি অম্বিকা চক্রবর্তী, শহর সংগঠক গনেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ এবং গ্রাম সংগঠক হন নির্মল সেন। এ দলে পরবর্তীতে লোকনাথ বলকে যুক্ত করা হয়। মাঝে মাঝে এই দুই দলে নানা বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক বাঁধতো। সূর্যসেন এই দুই অংশের ভুল বোঝাবুঝি এবং মতপার্থক্য দূর করতে প্রচেষ্টা চালান।

১৯১৯ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে সূর্যসেনের দাদা-বৌদি মিলে তার বিয়ের আয়োজন করে। বিয়ে না করার কথা দাদা-বৌদিকে জানিয়ে দেন সূর্যসেন। কিন্তু কোনো আবেদনই তারা শুনলেন না। জ্যাঠতুতো দাদা চন্দ্রনাথ সেন এবং বৌদি বিরাজমোহিনী সেন সূর্যসেনের কাছে পিতা-মাতার সমতুল্য। তাই তাদের কথা ভেবে বিয়েতে রাজী হলেন। পাত্রী চট্টগ্রামের কানুনগো পাড়ার নগেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যা পুষ্পকুন্তলা দেবী। বিয়ের আসরে বসেই সূর্যসেন খবর পান, এক চিঠির জবাবে কলকাতা থেকে তার সহযোগিরা চিঠি লিখে নতুন করে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। সাথে সাথে তারা এটাও বলেছেন যে সূর্যসেনকেই এ সংগঠনের দায়িত্ব নিতে হবে।

এদিকে বিয়ে না করে চলে গেলে পাত্রী লগ্নভ্রষ্টাই শুধু হবে না, অপমানিত হবে, সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। কোথাও মেয়েটির ঠাঁই হবে না। একটি মেয়েকে এভাবে সমাজের চোখে হেয় ও অপমানিত করার কথা তিনি কিছুতেই ভাবতে পারলেন না। তাই বিয়ে করলেন। বিয়ের রাত্রেই পুষ্পকুন্তলা দেবীর কাছে নিজের জীবনের লক্ষ্য এবং ব্রহ্মচর্য পালনের সিদ্ধান্ত তুলে ধরে ক্ষমা চাইলেন সূর্যসেন। সে রাতেই চলে গেলেন বাড়ি ছেড়ে, আত্মনিয়োগ করলেন বিপ্লবী আন্দোলনে। কিন্তু এ ঘটনা মাস্টারদার জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। (সূর্যসেনের স্বপ্ন ও সাধনা– অনন্ত সিংহ, পৃষ্ঠা ৪৬)

১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেস নন-ভায়োলেন্স নন-কোঅপারেশন বা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করে। অন্যদিকে মুসলীম লীগ গ্রহণ করে খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। গান্ধী ভারতের সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠনগুলোকে তাদের কর্মকাণ্ড এক বছরের জন্য স্থগিত রেখে অসহযোগ আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানালেন। এ অসহযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি 'স্বরাজ' এনে দেওয়ারও আশ্বাস দিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও গান্ধীর দাবি প্রস্তাব মেনে নিয়ে এই আবেদন সাড়া দিতে বলেন। যে কারণে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও অসহযোগ আন্দোলনে শামিল হন। কাজেম আলী মাস্টার, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন, শাহ বদিয়াল আলম, মহিম চন্দ্র পাল, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, জালাল আহমেদ, মৌলভী নাজির আহমেদ, শাহ নূরুদ্দীন, মৌলানা নূরুল হক, প্রশান্ত চৌধুরী প্রমুখ নেতাদের পেছনে দাঁড়িয়ে মাস্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং তাঁদের দলের কর্মীরা সমস্ত শক্তি নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিন বছর ধরে চলা এ গণআন্দোলনে সূর্যসেন এবং তার দল সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তখন সূর্যসেন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এটি উমাতারা স্কুল নামে পরিচিত হয়। এই সময় তিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত হতে থাকেন।

তিনি ছাত্রদেরকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে জয় করতেন। আর তাই ছাত্ররাও তাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। এক সময় এই স্কুলই তার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ছাত্রদের সামনে তিনি তুলে ধরতেন স্বাধীনতার আহ্বান– 'তোমাদের বিদ্যার্জন, তোমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণ, তোমাদের ভাবী জীবনের স্বপ্ন ও চিন্তার মধ্যে সবকিছুর উর্ধ্বে মনে একটি কথাকে কি প্রোজ্জ্বল করে রাখতে পারবে– পরাধীনতার অভিশাপ থেকে, ইংরেজের পরাধীনতার পীড়ন থেকে এই দেশকে মুক্ত করাই তোমাদের ব্রত– আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য? (সূর্যসেন স্মৃতি: বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থা, কলকাতা)। (বসুমতী, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭; উদ্ধৃত: সংবাদপত্রে উপমহাদেশের স্বাধীনতা, আতোয়ার রহমান, বাংলা একাডেমি, পৃষ্ঠা ৩৯৮)

১৯২২ সালের শুরুতেই চৌরিচৌরার একটি ঘটনায় গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। এ সময় চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সে হতাশা আর স্থবিরতার আঘাত সামলে গণআন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্যোগ নিলেন। তারা অর্থ, অস্ত্র সংগ্রহের পাশাপাশি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সবরকম প্রস্তুতি নিতে থাকেন। নগেন সেন বা জুলু সেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্টে হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তার নেতৃত্বে শুরু হল বিপ্লবীদের সামরিক প্রশিক্ষণ। এ সময় বিপ্লবীরা অর্থসংগ্রহের জন্য ডাকাতির আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। প্রথম ডাকাতি সংগঠিত হয়েছিল আনোয়ারা থানার জমিদার সরসী বাবুর বাড়িতে। এ ডাকাতী থেকে নগদ ১৫/২০ হাজার টাকা ও সোনা-গহনা সংগ্রহ করা হয়।

১৯২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন প্রমুখের নেতৃত্বে বাটালি পাহাড় এলাকায় রেলের টাকা ডাকাতির সময় কোনো গুলি চালানো হয়নি। কারণ ডাকাতি করতে গিয়ে কাউকে আহত করা যাবে না– এমনটাই ছিল মাস্টারদার নির্দেশ। তার নির্দেশে অম্বিকা চক্রবর্তী ও দলিলুর রহমান রেল ডাকাতির সতের হাজার টাকা নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য অস্ত্র কেনা।

পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দেয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ নাগরখানা পাহাড়খণ্ড যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পর সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী ধরা পড়েন। কিন্তু মামলায় তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারায় তারা ছাড়া পান। জেল থেকে বেরিয়ে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে শুরু করলেন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি।

১৯২৪ সাল। ভারত উপমহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। সর্বত্র সংগঠিত হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠন। চট্টগ্রামে রেলওয়ে ডাকাতি, বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ডাকাতি ও বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র কার্যকলাপের কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ব্রিটিশ '১ নম্বর বেঙ্গল অর্ডিনান্স' নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল– 'রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা'। ১৯২৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় একটি অস্ত্রলুটের ঘটনায় মাস্টারদা জড়িত ছিলেন। এই অপরাধে চট্টগাম থেকে সূর্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্তীসহ অনেকেই এই আইনে আটক করা হয়েছিল। তারা কিছুদিন পরে মুক্তি পান।

এই বেঙ্গল অর্ডিনেন্স ঘোষণা করে সারা বাংলায় ব্যাপক বিপ্লবী গ্রেফতার করা হয়। শুধু ২৫ অক্টোবর বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ২০০ বিপ্লবী নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হন নেতাজী সুভাষ, অনিলবরণ রায় প্রমুখদের মতো নেতারাও। এরপর চট্টগ্রামের

বিপ্লবীরা পুলিশের চোখ ফাঁকি দিতে কলকাতায় আশ্রয় নেন। ওই সময় তারা কলকাতার দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ নিতেন। থাকতেন শোভাবাজারে।

১৯২৫ সালের ১০ নভেম্বর সেখানে পুলিশ হানা দেয়। সূর্যসেন গায়ের জামা খুলে খালি গায়ে একটা অপরিষ্কার ময়লা গামছা কাঁধে ফেলে চায়ের কেতলি হাতে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসেন। পুলিশ তাঁকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি সাদাসিদাভাবে বলেন, বাবু লোকদের জন্য চা আনতে যাচ্ছেন। পুলিশের দারোগা কিছুক্ষণ জেরা করার পর সন্দেহ করার মতো কোনো কিছু না পেয়ে তাকে ছেড়ে দেন। এরপর কিছু দিন আত্মগোপনে থেকে বিপ্লবী সংগঠনের কাজ সেরে কলকাতায় চলে যান।

১৯২৬ সালের ৮ অক্টোবর কলকাতার এক মেস থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় 'মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র মামলা' ও টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টা মামলা। মাস্টারদারা যখন জেলে ওই সময়ে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাড়া জাগানো উপন্যাস 'পথের দাবি'। ব্রিটিশ সরকার এ বইটি বাজেয়াপ্ত করলেও বিপ্লবীরা গোপনে নানা উপায়ে তা সংগ্রহ করতেন এবং গভীর মনোযোগের সাথে পড়তেন। 'পথের দাবি' সূর্যসেন ও তার সাথীদের মনে ব্যাপক নাড়া দেয়, অনন্ত সিংহের ভাষায়, 'চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়'।

১৯২৮ সালে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু তাকে নজরবন্দী রাখা হয়। ওই বছর শেষের দিকে তিনি মুক্তি পাওয়ার পর স্ত্রী পুষ্পকুন্তলার অসুস্থতার খবর পেয়ে সূর্যসেন তাকে দেখতে আসেন। যেদিন তিনি বাড়ি পৌঁছলেন, পুষ্পকুন্তলা সেদিনই মৃত্যুবরণ করেন। অবসান ঘটল তাদের ৯ বছরের বিবাহিত জীবনের। স্ত্রীর মৃত্যুশোক কাটতে না কাটতেই সূর্যসেন আক্রান্ত হলেন টাইফয়েডে। তিন মাস শয্যাশায়ী থাকলেন। এরই মধ্যে একদিন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এসে হাজির। প্রস্তাব দিলেন রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য। শুধু তাই নয়, বন্ড সই দিলে সংসারের খরচও ব্রিটিশ সরকার চালাবে বলে জানানো হল। সূর্যসেন চুপ করে রইলেন। এরপর একদিন আকস্মাৎ উধাও হয়ে গেলেন মাস্টারদা।

চলে গেলেন আত্মগোপনে। কিন্তু বিপ্লবীরা তাদের কাজকর্ম প্রকাশ্যে পরিচালনার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। চট্টগ্রাম শহরে অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলের পরিচালনায় একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করা হল। নাম দেয়া হল 'সদরঘাট ক্লাব'। ওই ক্লাবই পরিণত হল বিপ্লবীদের মিলনক্ষেত্রে। এবার তারা ডাকাতির আশ্রয় না নিয়ে নিজেদের বাড়ি থেকে চুরি করে, পরিচিতজনদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ইত্যাদি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করেন। ইতোমধ্যে মাস্টারদা সূর্যসেন প্রকাশ্যে চলে আসেন।

১৯২৯ সালের প্রথম দিকে তিনি চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই বছরের মে মাসে চট্টগ্রামে চারটি সম্মেলন সূর্যসেন দলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩০ সালের শুরু থেকেই তার উদ্যোগে ভবিষ্যৎ সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যাপক পরিকল্পনা শুরু হয়। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সশস্ত্র অভ্যুত্থান করার উদ্দেশ্যে নিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করেন। কারণ একটাই অস্ত্র সংগ্রহ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮ এপ্রিল যুববিদ্রোহ বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনাকে 'ভারতের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যা ছিল দেড়শত বছরের ইতিহাসের মধ্যে ইংরেজ জন্য খুবই অপমানজনক ঘটনা। ইংরেজ বাহিনী এদেশের মানুষের কাছে প্রথম পরাজয়।'

১৮ থেকে ২১ এপ্রিল এই চারদিন চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসন কার্যত অচল ছিল। পরাধীন জাতির ইতিহাসে বিপ্লবীদের এ বিজয় ছিল গৌরবগাঁথা। ২২ এপ্রিল ভোর ৪টা থেকে সাড়ে ৪টার মধ্যে চট্টগ্রাম নাজিরহাট শাখা রেললাইনের ঝরঝরিয়া বটতলা 'স্টেশনে একটি সশস্ত্র ট্রেন এসে থামল। বিপ্লবীদের তখন বুঝতে বাকি রইল না যে তাদের সম্মুখযুদ্ধের ক্ষণ আসন্ন। ওইদিন ব্রিটিশ সরকার সূর্যসেন, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলকে ধরে দিতে পাঁচ হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করে।

২২ এপ্রিল সকালে বিপ্লবীরা যখন জালালাবাদ পাহাড়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন কয়েকজন কাঠুরিয়া ওই পাহাড়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে যায়। তারা দেখল খাকি পোশাকে রাইফেলধারী কিছু যুবক সেখানে অবস্থান করছে। তারা দ্রুত লোকালয়ে ফিরে গিয়ে লোকজনের কাছে চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশনের আনন্দে প্রকাশ করে দেয় যে স্বদেশিরা ওই পাহাড়ে আছে। ওই খবর পুলিশের কাছে পৌঁছলে ঠিক জালালাবাদ পাহাড়ের কাছে এসে মিলিটারি সশস্ত্র রেল গাড়ি (আর্মড ট্রেন) থামে।

জালালাবাদ পাহাড়ে তখন বিপ্লবীরা কেউ রাইফেল পরিষ্কার করছে, কেউ বা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। গাছের আড়ালে পাহারারত বিপ্লবীরা দেখতে পায় সামরিক ট্রেনটি কোন স্টেশন না থাকা সত্ত্বেও অদূরে রেল লাইনের উপর থেমে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ গুলির আঘাতে সৈন্যদল বিভ্রান্ত হয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে। সৈন্যরা এরপর জালালাবাদ পাহাড়ের পূর্ব দিকে ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর লুইসগান বসিয়ে বিপ্লবীদের দিকে গুলিবর্ষণ করে। দেশপ্রেম আর আত্মদানের গভীর আগ্রহে তরুণ বিপ্লবীরা পাহাড়ের বুকের উপর শুয়ে সৈন্যদের লুইসগানের গুলিবর্ষণের জবাব দিচ্ছিল। তিন প্রধান নেতা সূর্যসেন, নির্মল সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী সঙ্গে থেকে ঘন ঘন তাদের উৎসাহিত করছেন, গুলি এগিয়ে দিচ্ছেন। জীবিত বিপ্লবীরা মৃতদের লাশ পাশাপাশি শুইয়ে রেখে সামরিক কায়দায় শেষ অভিবাদন জানায়। পাহাড়ে সুর্যসেনের নেতৃত্বে কয়েকশত পুলিশ-সেনা বাহিনীর সাথে বিপ্লবীদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ৮০ জন এবং বিপ্লবী বাহিনীর ১২ জন বিপ্লবী (কিশোর হরিগোপাল বল, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, মতি কানুনগো, পুলিন ঘোষ, জিতেন দাশগুপ্ত, অর্ধেন্দু দস্তিদার এবং মধুসূদন দত্ত) মৃত্যুবরণ করেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে ব্রিটিশ বাহিনী পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সংগঠিত ওই বিদ্রোহের নাম 'চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ', যার সর্বাধিনায়ক ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন।

১৯৩০ সালের ১ ও ২ সেপ্টেম্বর কলকাতার নিকটবর্তী চন্দন নগরের ফরাসি কলোনিতে অবস্থিত বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে পুলিশ হানা দেয়। পুলিশী হামলায় মারা যান জীবন লাল ঘোষ এবং গ্রেফতার হন গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত। সূর্যসেনকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার প্রচুর টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। এ সময় তাকে বেশ কিছু দিনের জন্য আত্মগোপনে থাকতে হয়। ১৯৩১ সাল জুড়ে আত্মগোপনে থাকেন তিনি।

১৯৩২ সালের ১৩ জুন। পটিয়ার ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে বিপ্লবীরা মিলিত হলেন এক গোপন বৈঠকে। সেখানে হঠাৎ ক্যাপ্টেন ক্যামেরুনের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সিপাহী হানা দিল। তারা বাড়িটি ঘিরে ফেলল। ব্রিটিশ সৈনদের ঠেকিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন

করতে গিয়ে শহীদ হন নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন (ভোলা)। ক্যাপ্টেন ক্যামেরনও নিহত হলেন বিপ্লবীদের হাতে।

এরপর মাস্টারদা পরিকল্পনা করলেন চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে অবস্থিত ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের। এ অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে। ১৯৩২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর মাস্টারদা প্রীতিলতাকে বললেন, পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব তোমাকে নিতে হবে। তারপর প্রীতিলতার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রাত্রে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান কাব আক্রমণ করে সফল হন। আক্রমণ শেষে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এ অবস্থায় ধরা পড়ার আগে সঙ্গে রাখা সায়ানাইড বিষ খেয়ে আত্মাহত্যা করেন। কারণ ধরা পড়লে বিপ্লবীদের অনেক গোপন তথ্য ব্রিটিশ পুলিশের মারের মুখে ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তাই। এভাবে দেশমাতৃকার জন্য নিজেকে আকুণ্ঠভাবে উৎসর্গ করলেন।

১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম থেকে ১০ মাইল দূরে পটিয়া থানার গৈরিলা গ্রামের ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে তিনি আত্মগোপন ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন ব্রজেন সেন, কল্পনা দত্ত ও মনি দত্ত। নগেন সেন নামের এক বিশ্বাসঘাতক এ খবর পৌঁছে দিল ব্রিটিশ পুলিশের কাছে। পুলিশ-বাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলে। শুরু হয় এক লড়াই। অবশেষে পুলিশ গ্রেফতার করে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনকে। কল্পনা দত্ত ও মনি দত্ত পুলিশের বেষ্টনীভেদ করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। গ্রেফতারের পর মাস্টারদা ও ব্রজেন সেনের ওপর চালানো হয় বর্বর অত্যাচার। হাত-পা শিকলে বেঁধে মাস্টারদাকে নিয়ে যাওয়া হয় চট্টগ্রামে। ২০ ফেব্রুয়ারি তাদের জেলে পাঠানো হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির হুকুম জারি করে। ফাঁসির সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি।

১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি। বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেন এবং তার সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তি দার নিঃশঙ্কচিত্তে ব্রিটিশের ফাঁসির রজ্জুতে হাসি মুখে জীবন বিসর্জন দেন।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. প্রথম দিনের সূর্য সূর্যসেন– শামসুল আলম সাঈদ, সাহিত্য প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৩।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম– পূর্ণেন্দু দস্তিদার, চট্টগ্রাম বই ঘর, প্রকাশকাল ১৩৭৪ বাংলা।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা, সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রকাশকাল ১৯৯০, কলকাতা।

৪. অবিস্মরণীয় চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ এবং মহানায়ক মাস্টারদা সূর্যসেন– আবু নাঈম, সামহোয়ারইনব্লগে ধারাবাহিকভাবে ২০০৯ প্রকাশ হয়।

৫. www.biplobiderkotha.com

অশ্বিনীকুমার দত্ত



'একদিন বরিশালে ব্রাহ্মসমাজ থেকে বক্তৃতা দিয়ে রাত ৯টায় অশ্বিনীবাবু বাসায় চলছেন, সঙ্গে সেদিন অপর কেউ ছিলেন না। সেদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল 'সত্য' (১৯৮৯ সাল)।
রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তিনি ভাবছেন এইতো আজ বক্তৃতা দিয়ে এলুম, আমাদের সকলকে সত্যবাদী হতে হবে, সত্যকে অবলম্বন করেই আমাদের কর্মের পথে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু কাল court-এ গিয়ে আমাকেই আবার মিথ্যা নিয়ে দাঁড়াতে হবে, বিবেকের অনিচ্ছায়ও মিথ্যাকে সমর্থন করে court-এ বক্তৃতা করতে হবে।
আচ্ছা আমি কি মিথ্যা না বলে পারি না? টাকা উপার্জনের জন্যই তো আজ আমায় ওকালতী করতে হচ্ছে, বাবা যা রেখে গেছেন তাতেই তো আমার মোটা ভাত মোটা কাপড় হতে পারে? মিথ্যা কথার ব্যবসা করতেই কি আমি এ সংসারে এসেছি, ঠাকুর কি আমায় এই জন্যই সংসারে পাঠিয়েছেন? এত ঘৃণিত জীবন কি আমার?
উপদেষ্টার আসনে বসে আজ আমি যে বাণী প্রচার করে এলুম, আমার ব্যক্তিগত জীবনে যদি তা বাস্তবায়িতই না হল তবে সমাজকে এ প্রতারণা করে আমার ভবিষৎ ম্লান করে তুলছি কেন? ... সত্যের বিমল রশ্মিতে প্রাণ উজ্জল হয়ে উঠলো, প্রাণ তার কর্তব্যের পথ চিনে নিল, তাই তখনই সঙ্কল্প করলেন 'আর আমি court-এ যাব না, জগতের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করবো।'– মুকুন্দদাস
আধুনিক বরিশালের রূপকার মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের একজন অন্যতম বিপ্লবী। তিনি আমৃত্যু রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকে বরিশালবাসীর জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করেছেন। দক্ষিণ বাংলার প্রাণ পুরুষ ১৮৮৪-১৯২৩ সাল পর্যন্ত আজীবন সংগ্রামী এই মানুষটি শুধু বিএম কলেজের শিক্ষার্থীদেরই মানুষ করেননি, বরং সমাজের অনেক অশিক্ষিত, অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। বাউণ্ডুলে স্বভাবের বখাটে মুকুন্দদাসকে তিনিই দিনের পর দিন বাড়িতে ডেকে এনে আদর-স্নেহ ভালবাসা ও সাহচর্য দিয়ে এক নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। যে কারণে মুকুন্দদাস একসময় চারণ সম্রাট মুকুন্দদাস হতে পেরেছিলেন।
১৯০৫ সালের অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন চলার সময় বরিশালের টাউন হলে অশ্বিনীকুমার দত্ত এক জ্বালাময়ী বক্তব্য দেন। বক্তব্যে তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে জোরদার করা প্রসঙ্গে তার উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমরা যে সব

বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি, যদি কেউ তা যাত্রাপালা আকারে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে, তাহলে তা আমাদের এরূপ সভা বা বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হবে'।

অশ্বিনীকুমার দত্তের এই বক্তব্য মুকুন্দদাস খুবই গুরুত্বসহকারে নিলেন। মাত্র ৩ মাসের মধ্যে মুকুন্দদাস রচনা করলেন অসাধারণ যাত্রাপালা 'মাতৃপূঁজা'। মাতৃপুঁজার মূল বিষয় ছিল দেশপ্রেম। দেশমাতৃকাকে একত্রীকরণের লক্ষ্যে তার সন্তানরা প্রয়োজনে জীবন দিয়ে ভারতমাতাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করবে। শুধু মুকন্দদাস নয়, শত শত মানুষকে সমাজ বদলের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্ম ১৮৫৬ সালের ২৫ জানুয়ারি। তৎকালীন বরিশাল জেলার পটুয়াখালী মহকুমা শহরে। তার পৈতৃক বাড়ি গৌরনদী উপজেলাধীন বাটাজোর গ্রামে। বাবা ব্রজমোহন দত্ত (১৮২৫-৮৮)। ব্রজমোহন কর্মজীবনের শুরুতে বানারীপাড়ায় শিক্ষকতা করেন। এরপর দেওয়ানী আদালতে কিছুদিন ওকালতী করেন। তারপর মুন্সেফ। মুন্সেফ থেকে জজ হওয়ার মধ্যবর্তী সময় তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি একজন সাহিত্যানুরাগী ও মানবতাবাদী দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে খ্যাত ছিলেন।

অশ্বিনীকুমার দত্তের মায়ের নাম প্রসন্নময়ী। প্রসন্নময়ী ছিলেন বানরীপাড়ার রাধাকিশোর গুহের মেয়ে। বাবার মতো মাও ছিলেন মানবতাবাদী ও দেশপ্রেমিক। ব্রজমোহন দত্ত ও প্রসন্নময়ীর পরিবারে ৪ ছেলে ও ২ মেয়ের জন্ম হয়। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন ওই পরিবারের বড় ছেলে।

অশ্বিনীকুমার দত্তের শৈশবের প্রথম পাঁচ বছর কাটে পটুয়াখালীতে। ৫ বছর বয়সে অশ্বিনীকুমার বাটাজোরে পিত্রালয়ে ২ বছর ছিলেন। ওই সময় তিনি পড়াশুনার হাতেখড়ি নেন গুরুমশাইয়ের কাছে, গ্রাম্য পাঠশালায়। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে ৭ বছর পরে তিনি পিতার কর্মস্থল বনবিষ্ণুপুরে গিয়ে সেখানকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন। পিতার সরকারি চাকরির সুবাদে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশুনা তাকে সম্পন্ন করতে হয়। পিতার কর্মস্থল ঢাকা, ঢাকা থেকে দৌলত খাঁ, রংপুর প্রভৃতি স্থানে পড়াশুনা করে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়ার যোগ্য হয়ে উঠেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ১৪ বছর। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে ১৭ বছরের নিচে কেউ পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার পেত না। তাই অশ্বিনীকুমার দত্তের বয়স বাড়িয়ে দিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়ে ওই বছরই কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হন। এরপর তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্ট থেকে আইন পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। ২৩ বছর বয়সে বি. এ (১৮৭৮) এবং এক বছর বাদে এম. এ পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি ১৮৭৯ সালে বি. এল পরীক্ষা দেন এবং এ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। ওই বছর তিনি শ্রীরামপুরের নিকটে চাতরা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই স্কুলে সার্বিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হন।

দীর্ঘ পড়াশুনা জীবনের অবসান ঘটিয়ে অশ্বিনীকুমার ১৮৮০ সালে বরিশালে আসেন। এ সময় তিনি বরিশালে আইন ব্যবসার সাথে যুক্ত হন। সেই সময় বরিশালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা নানাদিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ শুরু হয় তা থেকে

বরিশাল ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। গুটিকয়েক জমিদার ও সরকারি কর্মচারীর পরিবার ছাড়া বরিশালের প্রায় গোটা সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা থেকে ছিল সম্পূর্ণ বিমুখ।

১৮৮২ সালে অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। এ সময় তিনি বরিশালের ছাত্রসমাজের উন্নতির জন্য নিরলসভাবে নানাবিধ কাজ করতে শুরু করেন। বরিশালের যুবসমাজ অশ্বিনী কুমারের জীবনাদর্শ 'সত্য প্রেম পবিত্রতার' মন্ত্র গ্রহণ করে। ব্রাহ্মসমাজ ও অশ্বিনীকুমারের উদ্যোগে সেবক দল গঠন করা হয়। এই সেবক দল ছাত্রসমাজের শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এতে করে বরিশালে গণমানুষের মধ্য জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমের এক নবজাগরণ ঘটে। ফলে ধীরে ধীরে মানুষের চেতনা থেকে মধ্যযুগীয় চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে।

তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৪ সালে বরিশালে হাজারে মাত্র ৭ জন ছিল শিক্ষিত। সমগ্র জেলায় ১৫ জনের মত গ্রাজুয়েট ছিল। সমাজ জীবনে বিশেষত: অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মধ্যে দুর্নীতি, ব্যভিচার, অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও অনৈতিকতা জাঁকিয়ে বসেছিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত বরিশালের এই দুর্দশা দেখে মর্মাহত হলেন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিলেন।

তার উদ্যোগে বরিশালের শিক্ষা ক্ষেত্রেও অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়। অশ্বিনীকুমারের আন্তরিকতাপূর্ণ কথাবার্তা এবং উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় এবং সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে তিনি অল্পদিনে লোকমানসে স্থান করে নিলেন। ক্রমে ক্রমে তার প্রচেষ্টা সফল হতে থাকে। তিনি নানাবিধ দুর্নীতি, অসামাজিক কার্যকলাপ, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা ও সংগীতের পাশাপাশি জনসাধারণের প্রতিনিধি সভা সংগঠিত করেন।

১৮৮৪ সালে আশ্বিনীকুমার দত্ত তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য পিতার নামানুসারে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রজমোহন ইন্সটিটিউশন। ব্রজমোহন ছিল বৃহত্তর বরিশালের বঙ্গভঙ্গ রদ, অসহযোগ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলকেন্দ্র। ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫ বছর পর ১৮৮৯ সালে অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে কলেজরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। অশ্বিনীকুমারের সর্বত্যাগী নেতৃত্ব ও শিক্ষা আন্দোলনের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে বি. এম কলেজ ও বরিশাল সারা বাংলায় খ্যাতি অর্জন করে।

তিনি বরিশালের সমাজ জীবনে প্রথম রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করেন। গঠন করেন বরিশাল জনসাধারণ সভা। এই রাজনৈতিক সংগঠনটিকে তিনিই ধীরে ধীরে শক্তিশালী রূপে গড়ে তোলেন। জাতীয় কংগ্রেসের আগেই এই রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়। ১৮৮৬ সাল থেকে বরিশাল জনসাধারণ সভা কংগ্রেসের সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করে। ১৯৮৯ সালে ৯ বছর ওকালতি ব্যবসায় মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় বলে তিনি আইন ব্যবসাকে ত্যাগ করেন। তারপর থেকে তিনি পিছিয়ে পড়া বরিশালবাসীকে অগ্রসর করার জন্য শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতামূলক নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে শুরু করেন।

অশ্বিনীকুমার তার বিচক্ষণতা দিয়ে অনুভব করলেন গণশিক্ষা ছাড়া গণজাগরণ সম্ভব নয়। মানুষকে যদি প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করা যায় তবেই তারা রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠবে। গণশিক্ষা বিস্তারে ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অশ্বিনী কুমারের স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও

শিক্ষকতার জীবন গ্রহণ করেন। তারাই পরবর্তীকালে বরিশালকে এক বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত করেন।

শুধু মাত্র বক্তৃতা দিয়ে নয়, কাজের মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠন করে দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে Little Brothers of the poor (দরিদ্র বান্ধব সমিতি), Band of hope (আশ্বাসী সম্প্রদায়), Band of Mercy (কৃপালু সম্প্রদায়), Friendly Union (বান্ধব সমিতি) স্থাপন করেন। এই সংগঠনগুলোর মাধ্যমে দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয় স্থাপন, নারীশিক্ষা বিস্তার, দরিদ্রকে সহযোগিতা, দুর্নীতি, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মুক্তচিন্তা চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কারণে ২০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯০০ সালে বরিশালে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ২৫০ জনে দাঁড়ায়।

গণসচেতনতা সৃষ্টির তাগিদে এ সময় অশ্বিনীকুমার দত্ত সংবাদপত্রের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করেন। তার চেষ্টার কারণে বিকাশ, স্বদেশি, বরিশাল, বরিশাল হিতৈষী প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বরিশাল হিতৈষী ও স্বদেশি পত্রিকা অসহযোগ আন্দোলনে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। এই পত্রিকা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

অশ্বিনীকুমারের একান্ত চেষ্টায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনেরও প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। জনপ্রিয়তার কারণে তিনি বরিশাল পৌরসভা ও লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। এসময় তিনি এ. কে ফজলুল হককে পৌরসভা ও জেলা বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত করেন। মূলত অশ্বিনীকুমারের হাতেই শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়।

অশ্বিনীকুমার দত্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও চেতনায় আস্থাবান ছিলেন। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সারা জীবন লড়াই করেছেন। জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনপ্রতিনিধিরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে এ দাবির সমর্থনে তিনি ১৮৮৫-৮৬ সালে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক জনসভা করেন এবং আইনসভা বা পার্লামেন্ট গঠনের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন। এ সময় তিনি ৪০ হাজার বরিশালবাসীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আইনসভা প্রতিষ্ঠার জন্য তা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রেরণ করেন।

অশ্বিনীকুমার ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সম্মেলনে ভারতে আইনসভা প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। ওই বছরই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেসের আপসকামীতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণসর্বস্ব রাজনীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। অশ্বিনীকুমারই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম কংগ্রেসের প্রাসাদ রাজনীতিকে জনগণের দোরগোড়ায় আনতে ব্রতী হয়েছিলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের কারণে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন গড়ে ওঠে। বয়কট আন্দোলন এক সময় স্বরাজলাভের আন্দোলনে রূপ নেয়। এসময় বাংলা বিভক্তির প্রতিবাদে অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে বরিশালে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। বরিশালে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন যতটা তীব্র আকার ধারণ করেছিল বাংলার আর কোথাও তার নজীর নেই। তিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের অগ্রনায়ক। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটান।

বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমার যখন বরিশাল বা অন্যত্র বক্তৃতা দিতেন, তখন সেই বক্তৃতার আগে জাতীয় সংগীত গাওয়া হত। জাতীয় সংগীতের পরে দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হত। কিন্তু তৎকালীন সময়ে তেমন দেশাত্মবোধক গান ছিল না। তাই এসময় তিনি বেশকিছু দেশাত্ববোধক গান রচনা করেন। তার গানের সংখ্যা শতাদিক। তার একটি গান, যে গানটি সেই সময় বরিশালবাসী মনে দাগ কেটেছিল–

আয় আয়, ভাই, আয় সবে মিলে/হিন্দু মুসলমান, জাতিভেদ ভুলে/কাপায়ে অবনী, ভারত-জননী/করিছেন সবে আহ্বান।/আয়রে সকলে, আয় দলে দলে, করিতে হবে দান/ধন জন মান প্রাণ।/এখনও কি তোরা সবে মড়া পড়ে রবি?/এখনও কি তোরা আপন সবি?/উঠে ভাই দাঁড়া, পড়েছে সাড়া/ভারত ভুবনে উঠেছে ধ্বনি/'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম'।

মানুষ বলে' মোদের গণে না যে ভবে/সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে/(মোরা) পরমুখে চাই, পরে দিলে খাই/এ দুঃখ যে আর সহে না প্রাণে/'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম'।

পুরাতন মোদের শিল্পকলা যত/জাগাব নূতন, আনিব কত/নূতন প্রাণে, নূতন তানে, গাইব সকলে নিত্য নব নব–/'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম'।

আবার এদেশ ধন্য হবে ভবে/জগতের আবার শিরোমণি হবে/জয় জয় রবে ঘোষিবেরে সবে/জয় জয় রবে ঘোষিবেরে সবে/ভারতের নবীন জীবনকাহিনী;/'বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম'।

'বরিশাল স্বদেশি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ও পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের জীবনব্যাপী লোকসেবা ও দেশসেবার ফলে বরিশাল এই অনন্য সাধারণ মহিমা লাভ করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারই, সত্য বলিতে গেলে, দেশে একমাত্র লোকনায়ক ছিলেন'– বিপিন চন্দ্র পাল।

১৯০৫-০৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বরিশালে অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে উঠে তা বাংলার সর্বত্র উপচে পড়ে। এমন কি বাংলার বাইরেও অনেক প্রদেশে এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে এবং অন্যান্য প্রদেশের নেতৃত্ব জনসভায় অশ্বিনীকুমার ও বরিশালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের উদাহরণ দিতেন। 'স্বদেশি আন্দোলন' বরিশালকে প্রমত্ত করে তুলে। বয়কট আন্দোলনকে সফল করার জন্য অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে স্বদেশবান্ধব সমিতি শহরে ও গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করত। এই সমিতির কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য সরকার অশ্বিনীকুমারসহ ৯ জন নেতাকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আইনে গ্রেফতার করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। এ সময়ে অশ্বিনীকুমারকে রাখা হয় লক্ষ্মৌ জেলে।

১৯১০ সালে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পর তিনি জেলা স্বদেশবান্ধব সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সমিতির পক্ষ থেকে প্রচারক পাঠিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে নিম্ন বিদ্যালয় স্থাপন, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত গ্রামে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। ১৯১০-২৩ সাল পর্যন্ত মূলত অসুস্থ ছিলেন বলা যায়। এ সময়কালে তিনি রোগের সঙ্গে নিয়ত বোঝাপড়া ও দেশ পর্যটনে সময় কাটিয়েছেন। ১৯২১ সালে বরিশালে স্টিমার ধর্মঘটের সময় অশ্বিনীকুমার অসুস্থ অবস্থায় থেকেও স্বেচ্ছাসেবকদের যাবতীয় কাজ দেখভাল করেন। ১৯২২ সালে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯২৩ সালে ৭ নভেম্বর কলকাতায় মারা যান।

অশ্বিনীকুমার

কাজী নজরুল ইসলাম

আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রিশেষে, 'চল্ আগে চল্'–
'চল্ আগে চল্' গাহে ঘুমজাগা পাখী,
কুয়াশামশারি ঠেলি' জাগে রক্তআঁখি
নবারুণ নব আশা। আজি এই সাথে
এই নব জাগরণ আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিণু বীর প্রাতঃস্মরণীয়!
স্বর্গ হ'তে এ স্মরণ প্রীতিঅর্ঘ্য নিও।
নিও নিও সপ্তকোটি বাঙালির তব
অশ্রুজলে স্মৃতিপূজা অর্ঘ্য অভিনব।

আজো তা'রা ক্রীতদাস, আজো বদ্ধকর
শৃঙ্খলবন্ধনে, দেব! আজো পরস্পর
করে তা'রা হানাহানি, ঈর্ষাঅস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি-নিরস্ত্রের পুঁজি
মন্দভাষ গাঢ় মসি দিব্য অস্ত্র তার।
'দুই-সপ্ত কোটি ধৃত খর তরবার'
সে শুধু কেতাবী কথা, আজো সে স্বপন।
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদ্গারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হ'ল ভূমি!
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহ তুমি।
কে করিবে নমস্কার! হায় যুক্তকর
মুক্ত নাহি হ'ল আজো! বন্ধন জর্জর
এ কর পারে না দেব, ছুঁইতে ললাট।
কে করিবে নমস্কার? কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা-গান? রসনা অসাড়।
কথা আছে, বাণী নাই, ছন্দে নাচে হাড়
ভাষা আছে, আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এ জাতির নব মন্ত্র দান।
অমৃতের পুত্র কবি অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের আকাল
করিয়াছে হেয় তারে! লেখনী ও কালি
যত না গজিছে কাব্য ততোধিক গালি।
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ প'ড়ে সে অবশ।

গর্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে
নব জীবনের গান, বন্ধন রশিতে
চেপে আছে টুটি তার। জুলুম-জিঞ্জির
মাংস কেটে বসে আছে, হাতে খায় চিড়
আর্ত প্রতিধ্বনি তার। কোথা প্রতিকার।
যারা আছে– তা'রা কিছু না ক'রে নাচার,
নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু করি,'
তাও নাহি পারে, দেব। আইনের ছড়ি
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী। যাইব কোথায়!
আমার চরণ নহে মম বশে, হায়।

এক ঘর ছাড়ি' আর ঘরে যেতে নারি,
মর্দজাতি হয়ে আছে পর্দাঘেরা নারী!
এ লাঞ্ছনা এ পীড়ন এ আত্মকলহ,
আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ–
তব বরে দূর হোক। এ জাতির পরে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্বাদ ঝরে।
যে আত্মচেতনা-বলে যে আত্মবিশ্বাসে
যে আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন-উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে' মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে।
স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আজ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি
তব বর, শক্তি তব। জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি।
দিলে ধর্ম, দিলে কর্ম, দিলে ধ্যান-জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিল না, দিলে বলিদান
আত্মারে জননীপদে, হাঁকিলে, 'মাভৈঃ।
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই।
ওরে জড় ওঠ তোরা।' জাগিল না কেউ,
তোমারে লইয়া গেল পারাপারি ঢেউ!

অগ্রে তুমি জেগেছিলে অগ্রজ শহীদ,
তুমি ঋষি, শুভ প্রাতে টুটেছিল নিঁদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি-দিবা ধরি'
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি'
বেলাশেষে জাগিয়াছে। সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর দুর্গম কান্তার।

পশ্চাতে 'অতীত' টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের 'বর্তমান' অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ 'ভবিষ্যৎ',
যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ।
হে প্রেমিক, তব প্রেম-বরিষায় দেশে
এল ঢল বীর-ভূমি বরিশাল ভেসে'।
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে ঊষর বঙ্গ তব কাছে হায়!
পীড়িত এ বঙ্গ আজি চাহিছে তোমার,
অসুর-নিধনে কবে আসিবে আবার।

অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর পরে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদ্রোহী কবি 'অশ্বিনীকুমার' কবিতাটি লেখেন।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. অশ্বিনীকুমার দত্ত– তপংকর চক্রবর্তী, গতিধারা প্রকাশনী, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল– হীরালাল দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৯৭।

৩. জীবনী গ্রন্থমালা: অশ্বিনীকুমার দত্ত– তপংকর চক্রবর্তী, কথাপ্রকাশ, শাহ্বাগ আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

৪. মুকুন্দদাস রচনাসমগ্র– সম্পাদনা: শেখ রফিক, র‌্যামন.পাবলিসার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০০৮।

মুকুন্দদাস



ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে,
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে॥
তাথৈ তাথৈ থৈ দ্রিমী দ্রিমী দং দং
ভূত পিশাচ নাচে যোগিনী সঙ্গে।
দানব দলনী হয়ে উন্মাদিনী,
আর কি দানব থাকিবে বঙ্গে॥
সাজ রে সন্তান হিন্দু মুসলমান
থাকে থাকিবে প্রাণ না হয় যাইবে প্রাণ॥
লইয়ে কৃপাণ হও রে আগুয়ান,
নিতে হয় মুকুন্দে-রে নিও রে সঙ্গে॥

'যারা গান বা বক্তৃতা দ্বারা দেশের জাগরণ আনতে চেষ্টা করেন তারা সকলেই চারণ। আপনি, আমি, আমরা সবাই চারণ, তবে আপনি আমাদের সম্রাট। অর্থাৎ চারণসম্রাট। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণকবি মুকুন্দদাস।' বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুকুন্দদাসের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে কথাগুলো (সরাসরি সাক্ষাতে) বলেছিলেন।

গণমানুষের গান, স্বাধীনতার গান, সমাজ বদলের গান কেন গাইতে হয়! কেমন করে গাইতে হয়! কবি কেন চারণ হয়! চারণসম্রাট মুকুন্দদাসের জীবন, সময় ও সৃষ্টিকে জানলে 'চারণকবি' শব্দটির স্বরূপ-প্রকৃতি যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। সকল কবিই 'চারণকবি' নন। যিনি চারণ, তিনি তার সৃষ্টিকর্ম দিয়ে সমাজের সকল অসঙ্গতি দূর করার জন্য গণমানুষের মধ্যে মিশে গিয়ে প্রগতি, সাম্যের বিপ্লবকে অগ্রসর করে নেন।

মাটি ও মানুষের সাথে চারণকবি মুকুন্দদাসের সম্পর্ক ছিল সুনিবিড়। তার গান, যাত্রাপালা-অভিনয় এবং ভাষা, সুর, ছন্দ ও ভঙ্গি ছিল বাঙালির নিজস্ব জীবনবোধ ও সংস্কৃতির। তার গান গণমানুষের অন্তরকে অতি সহজেই অনুরণিত করে তুলতো। জাগরিত করতো অধিকার বঞ্চিত মেহনতি মানুষকে। অনুপ্রেরণা যোগাতো স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের।

স্বরাজ

স্বরাজ স্বরাজ করিস তোরা,
স্বরাজ কি রে গাছের ফল?
অবহেলে তায় পেড়ে খাবি তোরা,
পরপদলেহী ভীরুর দল॥
ধনীর দুয়ারে ধরণা দিয়া স্বরাজ তোরা ভিক্ষা চাস,
কপট বৈরাগ্যের মুখোশ পরিয়া,
ভাইয়ের কাছে ভাই করিস ছল–
কি করে স্বরাজ মিলিবে বল॥
পারিস যদি রে হতে বীরাচারী,
সোমরস আবার করিতে পান;
রক্তগঙ্গার পূণ্য সলিলে, পূঁজিতে মায়ের মূরতিখান।
রুধিরাসত্তা পানেতে মত্তা,
মা আজ ছেলের রক্ত চান–
দিতে হবে তাই মনে রাখিস ভাই,
স্বরাজ পথের যাত্রীদল;
মরণ দিয়েই বরণ করিতে,
হইবে তোদের মুক্তির ফল॥

চারণকবি মুকুন্দদাস দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতীক। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সফল সংস্কৃতিবিদ। তার জীবনদর্শন ও সৃষ্টি মানুষকে পরাধীনতার শিকল ছিড়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে শেখায়। মানুষের কাঙ্খিত সাম্যের সমাজ ও মানুষের পৃথিবী নির্মাণে বিপ্লবীদের আরো সাহসী করে তোলে।

চারণ বিপ্লবী মুকুন্দদাসের জন্ম ১৮৭৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ) বানরী গ্রামে। বাবা গুরুদয়াল দে। মা শ্যামসুন্দর দে। ১৮৮৫ সালে অর্থাৎ মুকুন্দদাসের বয়স যখন ৭ বছর তখন তার বাবা সপরিবারে বিক্রমপুর থেকে বরিশালে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বাল্যকালে মুকুন্দদাসের নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর। এ সময় সকলে তাকে আদর করে যজ্ঞা বলে ডাকতো। মুকুন্দদাসের পিতা-পিতামহ দু'জনেই ছিলেন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। তাদের সুরেলা কণ্ঠে সব সময় কীর্তন গান ধ্বনিত হতো। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই মুকুন্দদাস শৈশবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে ১৮৯০ সালে শারদীয় পুঁজার সময় তিনি সাধু রামানন্দ ওরফে হরিবোলান্দরের কাছে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষাগুরু তার পৈত্রিক নাম যজ্ঞেশ্বর পরিবর্তন করে মুকুন্দদাস নামকরণ করেন। মুকুন্দদাস অর্থাৎ কৃষ্ণের দাস।

মুকুন্দদাসের পিতা বরিশালে আসার কিছু দিন পর আলেকান্দায় একটি মুদি দোকান চালু করেছিলেন। এই মুদি দোকানে বসে মুকুন্দদাসের বাবা কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে সুরেলা কণ্ঠে সুমধুর গান গাইতেন। তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বরিশালের এক ডেপুটি মেজিস্ট্রেট তাকে আদালতপাড়ায় আর্দালির চাকুরি দেন। এই চাকুরির পাশাপাশি তিনি মুদি দোকানটিও চালু রেখেছিলেন। এক পর্যায়ে মুকুন্দদাস এই দোকানটি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

মুকুন্দদাসের সুরেলা কণ্ঠের সুর তার বংশ প্রদত্ত। মা-বাবাকে অনুসরণ-অনুকরণ করে ছোটবেলা থেকেই তিনি মুখে মুখে গান বাঁধতেন এবং তা সুরেলা কণ্ঠে নিজে সুর করে গাইতেন। কিন্তু পড়াশুনা তার ভাল লাগতো না।

যখন যা মনে চাইতো তখন তা-ই করতেন। পাঠ্য-পুস্তক পড়াশুনার প্রতি তার মনোযোগ ছিল না বললেই চলে। স্কুলে যাওয়ার কথা বলে পাড়ামহল্লার ছেলেদের সাথে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো কখনো চলে যেতেন গ্রামের মধ্যে। মাছ ধরা, পাখির বাসা ভাঙ্গা, জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোসহ নানারকম খেলাধূলায় মেতে থাকতেন। কিন্তু সবকিছুর সাথে তার মুখে সবসময় গান থাকতো। বাউণ্ডুলে স্বভাবের এই ছেলেটি সমাজের কথিত বখাটে ছেলেদের সাথে বেশি সময় কাটাতেন। বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে ৬ বছর পড়াশুনা করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেননি। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে একজন ছাত্রের এ ধরণের অবনতি দেখে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। পূর্ব থেকে তিনি অনেকবার মুকুন্দদাসের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ছেলেটি অসাধারণ প্রতিভাবান। মুকুন্দদাসকে তিনি দিনের পর দিন বাড়িতে ডেকে এনে আদর স্নেহ ভালবাসার সাহচর্য দিয়ে এক নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তুললেন।

১৯০১ সালে কীর্তন গান রচনা ও পরিবেশনার মাধ্যমে মুকুন্দদাসের শিল্পী জীবনের যাত্রা শুরু হয়। এই গানের মাধ্যমে তখন তিনি বেশ পরিচিতি পান। যে পরিচিতির মধ্য দিয়ে তিনি বরিশালের সংস্কৃতিমনা মুক্তচিন্তার মানুষের সান্নিধ্য ও ভালবাসা পেয়েছিলেন।

১৯০৪ সালে মুকুন্দদাস বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত বরিশালের সোনাঠাকুরের সাথে পরিচিত হন। ধীরে ধীরে তিনি সোনাঠাকুরের চেতনায় দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এসময় সোনাঠাকুরের কালী বাড়িতে অশ্বিনীকুমার, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, সেবাব্রতী, কালীদাস চন্দ্রসহ শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও সমাজসেবকরা আড্ডা জমাতেন। আর মুকুন্দদাসও প্রায়ই এই সমস্ত লোকের আড্ডায় যোগ দিতেন। এদের সংস্পর্শে আসার ফলে মুকুন্দদাস ক্রমশ সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন। যার ফলে মানুষ ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে প্রভাবিত হয়ে তিনি বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হন। একই সময় তিনি সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলের সাথে পরিচিত হয়ে ওই দলে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে তিনি সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলে যুক্ত হন। তিনি 'স্বদেশবান্ধব সমিতি'তেও যুক্ত ছিলেন।

১৯০৫-০৮ সাল পর্যন্ত সময়ে 'বরিশাল স্বদেশি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল ও পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের জীবনব্যাপী লোকসেবা ও দেশসেবার ফলে, বরিশাল এই অনন্য সাধারণ মহিমা লাভ করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমারই, সত্য বলিতে গেলে, দেশে একমাত্র লোকনায়ক ছিলেন'– বিপিন চন্দ্র পাল।

১৯০৫ সালের অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন চলার সময় বরিশালের টাউন হলে অশ্বিনীকুমার বক্তব্য দেন। বক্তব্যে তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনকে জোরদার করা প্রসঙ্গে তার উপলব্দির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমরা যে সব বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছি, যদি কেউ তা যাত্রাপালা আকারে গ্রামে গ্রামে প্রচার করে, তাহলে তা আমাদের এরূপ সভা বা বক্তৃতার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর হবে'।

অশ্বিনীকুমার দত্তের এই বক্তব্য মুকুন্দদাস খুবই গুরুত্বসহকারে নিলেন। নিজেই মনে মনে চিন্তা ও প্রতিজ্ঞা করলেন গ্রামে গ্রামে যাত্রাপালা পরিবেশন করে মানুষকে সচেতন ও সংগ্রামী

হিসেবে গড়ে তুলবেন। যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে, যারা ব্রিটিশকে ভারত উপমহাদেশ থেকে বিতাড়িত করবে। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ। মাত্র ৩ মাসের মধ্যে রচনা করলেন অসাধারণ যাত্রাপালা 'মাতৃপূঁজা'। মাতৃপূঁজার মূল বিষয় ছিল দেশপ্রেম ও দেশের স্বাধীনতা অর্জন। দেশমাতৃকাকে একত্রীকরণের লক্ষ্যে তার সন্তানরা প্রয়োজনে জীবন দিবে। ভারতমাতাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। তার এই যাত্রাপালায় ভারতকে স্বাধীন করার অনুপ্রেরণাই প্রাধান্য পেয়েছে। অল্প দিনের মধ্যে গড়ে তুললেন যাত্রা দল। নাম দিলেন 'স্বদেশি যাত্রা' দল।

অশ্বিনীকুমার দত্তের আশির্বাদ মাথায় নিয়ে গ্রামে গ্রামে হাটে মাঠে গঞ্জে তিনি এই যাত্রাপালা পরিবেশনের মাধ্যমে সকলের মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার চিন্তা-চেতনা জাগ্রত করে তুলতে শুরু করেন। 'মাতৃপূঁজা' যাত্রাপালায় তিনি তার কালজয়ী জাগরণী সঙ্গীত– 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে/মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে' গানটি অন্তর্ভূক্ত করেন, যা আজও আমরা আমাদের দুঃসময়ে নিজেদেরকে অগ্নিমন্ত্রে জাগরিত করার জন্য গেয়ে থাকি। ১৯০৬ সালে মুকুন্দদাস দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন এলাকায় যাত্রাপালা পরিবেশন করে তার যাত্রাদল নিয়ে নোয়াখালী, কুমিল্লা যান। এখানে যাত্রাপালা পরিবেশন করে বর্ষার মৌসুমে বরিশালে ফিরে আসেন। তিনি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তার অসাধারণ যাত্রাপালা 'মাতৃপূঁজা' মানুষকে স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে জাগরিত করেছে।

একই বছর জুন মাসে বরিশালে স্বদেশি উৎসবের সময় তিনি 'মাতৃপূঁজা' যাত্রাপালা পরিবেশন করেন। এসময় বরিশালের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মুকুন্দদাসকে প্রশংসা জানিয়ে আর্শিবাদ করেন। অক্টোবর মাসে তার 'মাতৃপূঁজা' যাত্রাপালার দ্বিতীয় বর্ষে তিনি যাত্রাপালা পরিবেশনের জন্য মাদারীপুরে যান। এখান থেকে বিভিন্ন এলাকায় যাত্রা গান পরিবেশন শেষে ১৯০৭ সালের এপ্রিলে বরিশালে আসেন। ১৬ এপ্রিল মুকুন্দদাস রাজবাহাদূরের হাবেলিতে যাত্রা গান পরিবেশন করেন। দর্শকরা সবাই মুগ্ধ, আবেগে আপ্লুত। মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম স্লোগান চলছে। গান শেষে অশ্বিনীকুমার আবেগে আপ্লুত হয়ে মুকুন্দদাসকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

মুকুন্দদাসের 'মাতৃপূঁজা' পালার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে ততকালে কয়েকটি পত্রিকা বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে। অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দেমাতরম', বারীণ ঘোষ ও ভূপেন দত্তের 'যুগান্তর', ব্রাক্ষবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি', অশ্বিনীকুমার দত্তের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি' রামানন্দ চট্টপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' ও 'মর্ডান রিভিউ' উল্লেখযোগ্য।

এই 'মাতৃপূঁজা' পালার মাধ্যমে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গণমানুষের জাগরণ সৃষ্টি হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার পূর্ব-বাঙলার জাগরণ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে পড়ে। সরকারের পক্ষ হতে পূর্ব-বাংলার জেলাগুলোতে 'শান্তিভঙ্গের কারণ' দেখিয়ে মুকুন্দদাসের গানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে মুকুন্দদাস সরকারি বাধার সম্মুখীন হন। যেখানে তিনি গান করতে যেতেন, সেখান থেকেই পুলিশ তাকে বিতাড়িত করে দিত। এভাবে এক এলাকায় নিষেধাজ্ঞা জারি হলে অন্য এলাকায় তিনি গান করতে চলে যেতেন।

১৯০৮ সালে তিনি আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে খুলনার কিছু অঞ্চলে গান করার পর বাগেরহাটে গান করতে গেলে পুলিশ তার উপর চড়াও হয় এবং পালা পরিবেশন বন্ধ করে দেয়। ওই সময় মুকুন্দদাস গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়িয়ে তার দলবল নিয়ে গোপনে বরিশালে চলে আসেন। ১৯০৮ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হয় মুকুন্দদাসের যাত্রাপালা

পরিবেশনের চতুর্থ বর্ষ। এ বছরও তিনি আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তার যাত্রপালা অব্যহত রাখেন। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ক্ষুদিরাম বসুকে ব্রিটিশ সরকার ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবি চেতনার আয়নায় চিত্রায়ণ করে, একটি কিংবদন্তী গান রচনা করেছিলেন বাঁকুড়ার লোককবি পীতাম্বর দাস।

'একবার বিদায় দে-মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে জগৎবাসী
কলের বোমা তৈরি করে
দাঁড়িয়ে ছিলেম রাস্তার ধারে মাগো
বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম আরেক ইংল্যান্ডবাসী
শনিবার বেলা দশটার পরে
জজকোর্টেতে লোক না ধরে মাগো
হল অভিরামের দ্বীপ চালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসি
দশ মাস দশদিন পরে
জন্ম নেব মাসির ঘরে মাগো
তখন যদি না চিনতে পারিস দেখবি গলায় ফাঁসি'।

এসময় মুকুন্দদাস পালা পরিবেশনের শুরুতে ও শেষে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর সম্পর্কে বক্তৃতা ও গান করেন। যে বক্তৃতা শুনে উপস্থিত জনতা ব্রিটিশকে উৎখাত করার জন্য অগ্নিশপথ গ্রহণ করে।

বরিশালে অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে যে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন গড়ে উঠে তা বাংলার সর্বত্র উপচে পড়ে। এমন কি বাংলার বাইরেও অনেক প্রদেশে এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে এবং অন্যান্য প্রদেশের নেতৃবৃন্দ জনসভায় অশ্বিনীকুমার ও বরিশালের বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের উদাহরণ দিতেন। বয়কট আন্দোলনকে সফল করার জন্য অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে স্বদেশবান্ধব সমিতি শহরে ও গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করত। ফলে সরকার ভীত হয়ে ১৯০৮ সালের ১৩ ডিসেম্বর পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ৯ জন নেতাকে (অশ্বিনীকুমার দত্তসহ) গ্রেফতার করে বিনা বিচারে জেলখানায় আটক করে রাখে।

অন্যদিকে মুকুন্দদাস গ্রামে গঞ্জে যাত্রাপালা পরিবেশনের সময় এই গ্রেফতারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। যে প্রতিবাদের কারণে পূর্ববঙ্গের হাজার হাজার জনতা সংগঠিত হয়ে ৯ নেতার মুক্তির জন্য আন্দোলন জোরদার করে। এভাবে স্বদেশবাসীকে জাগাতে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুক্তির জন্য মুকুন্দদাস গ্রামে গঞ্জে যাত্রাপালা পরিবেশন অব্যাহত রাখলেন।

মুকুন্দদাস তার যাত্রা দল নিয়ে বরিশালের পূর্বাঞ্চল উত্তর শাহাবাজপুরের দিকে রওনা করলেন। অন্ধকার রাত। মাঝ নদীতে নৌকায় বসে মুকুন্দদাস তার দল নিয়ে জোরগলায় গান ধরলেন 'মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী, যে দিন ডুবে যাবে'। হঠাৎ একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকার শব্দ (ট্রলার) শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই ওই নৌকাটি তাদের নৌকার কাছাকাছি চলে আসল। এসে বলল, নৌকা থামাও। দু'জন ইংরেজ পুলিশ নৌকায় উঠে এসে মুকুন্দদাস ও তার সহযোগী সকলকে গ্রেফতার করল। নিয়ে গেল বরিশাল। পরের দিন আদালতে তাদের জামিন মঞ্জুর করে মামলার পরবর্তী তারিখ পড়ল।

জামিন পাওয়ার ক'দিন পর মুকুন্দদাসকে 'দেশের গান' সংকলন প্রকাশ করার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এই মামলায় আদালত তাকে ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। এ মামলায় তার ৩ জন সহযোগী বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি ভোগ করেন। যে গানটির জন্য মুকুন্দদাসকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, তা হল 'বাবু বুঝবি কি আর ম'লে/কাঁধে সাদা ভূত চেপেছে/সাহেবি চালটি ছাড়, যদি সুখ চাও কপালে'। জেলখানার মধ্যে মুকুন্দদাস কয়েদীদের গান শুনাতেন। তাদেরকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে জাগরিত করতেন।

১৯১১ সালের মার্চ মাসে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়েই শুনতে পান, তার স্ত্রী শতদলবাসিনী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে বহুদিন পূর্বে মারা গেছেন। পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে জেলে ঢুকানো হয়েছে। অর্থের অভাবে মুদি দোকানটি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এসব শুনে মুকুন্দদাস খুবই ভেঙ্গে পড়লেন। এ অবস্থায় অশ্বিনীকুমার দত্তসহ অনেকেই মুকুন্দদাসকে নানাভাবে সহযোগীতা করেন। সকলেই আর্থিক সহযোগীতাও করেন। যে অর্থ দিয়ে মুকুন্দদাস শহরের কালীবাড়ি রাস্তায় একটি মুদি দোকান চালু করেন। অভাব, দারিদ্র্য ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত হয়েও তিনি কখনো আদর্শ ও দেশপ্রেম থেকে তিল পরিমাণ বিচ্যুত হননি।

কিছুদিনের মধ্যে আবারো মুকুন্দদাস যাত্রা দলকে পুনর্গঠিত করে যাত্রাপালা পরিবেশন শুরু করলেন। এর মধ্যে একের পর এক নতুন যাত্রাপালা লিখে ফেলেন। এভাবে তিনি জীবদ্দশায় ৫টি যাত্রাপালা লিখেছিলেন। ১৯১২-২৫ সাল পর্যন্ত তিনি 'পল্লীসেবা, ব্রহ্মচারিণী, সমাজ ও পথ' যাত্রাপালাগুলো পরিবেশন করে বেড়িয়েছেন। ব্রিটিশ সরকারের জেল, জুলুম, হুলিয়া মাথায় নিয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতেন। যাতে ওই জনগণই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করে। অবশেষে জনগণ তাই করেছিল।

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমস্ত ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে যাত্রাপালা পরিবেশনের মাধ্যমে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। এ সময় মুকুন্দদাস তার দল নিয়ে কলকাতায় চলে যান। ওই সময় মাতৃপুঁজা যাত্রাপালাটি নিষিদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকার। মুকুন্দদাস তখন সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য বাদ দিয়ে সামাজিক সমস্যাবলী নিয়ে রচিত যাত্রাপালা পরিবেশন করতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকার মুকুন্দদাসের এই অভিনব কৌশল বুঝতে পেরে ১৯৩২ সালে তার সকল যাত্রাপালা নিষিদ্ধ করে।

১৯২৬ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তার মেয়ের বিয়েতে গান গাইবার জন্য মুকুন্দদাসকে কলকাতায় নিয়ে যায়। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সামনে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। সকলেই তার গান ও যাত্রাপালার আকর্ষণীয় অভিনয়, বক্তব্য শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ওই সময় প্রখ্যাত কবি প্রিয়ংবদা দেবী মঞ্চে উঠে তাকে একটি সোনার সেফটিপিন উপহার দিয়েছিলেন।

১৯৩৪ সালে পালাগানের বায়না পেয়ে দল নিয়ে কলকাতায় যান। ছোট একটি বাসা ভাড়া নেন। সেখানে বসবাস শুরু করেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গানের বায়না আসতে থাকে। এ সময় মুকুন্দদাস শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ শরীর নিয়ে কোনোমতে গান গেয়ে যান। কারণ গান না গাইলে সাথীদেরকে বেতন দিবেন কি করে! ওই বেতনে তাদের সংসার চলে।

১৯৩৪ সালে ১৭ মে তিনি তার এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। গভীর রাতে বাসায় ফেরেন। দলকে ১ ঘন্টা তালিম দিলেন পরের দিন গান গাইবার জন্য। তারপর বিশ্রামে গেলেন। এটাই তার অনন্ত বিশ্রাম।

মুকুন্দদাসের রচনা নিদর্শন:
'একদিন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ থেকে বক্তৃতা দিয়ে রাত ৯টা অশ্বিনীবাবু বাসায় চলছেন, সঙ্গে সেদিন অপর কোনো লোক ছিলেন না। সেদিন বক্তৃতার বিষয় ছিল 'সত্য' (১৯৮৯ সাল)।
রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তিনি ভাবছেন এইতো আজ বক্তৃতা দিয়ে এলুম, আমাদের সকলকে সত্যবাদী হতে হবে, সত্যকে অবলম্বন করেই আমাদের কর্মের পথে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু কাল court-এ গিয়ে আমাকেই আবার মিথ্যা নিয়ে দাঁড়াতে হবে, বিবেকের অনিচ্ছায়ও মিথ্যাকে সমর্থন করে court-এ বক্তৃতা করতে হবে।
আচ্ছা আমি কি মিথ্যা না বলে পারি না? টাকা উপার্জনের জন্যই তো আজ আমায় ওকলাতী করতে হচ্ছে, বাবা যা রেখে গেছেন তাতেই তো আমার মোটা ভাত মোটা কাপড় হতে পারে? মিথ্যা কথার ব্যবসা করতেই কি আমি সংসারে এসেছি, ঠাকুর কি আমায় এই জন্যই সংসারে পাঠিয়েছেন? এত ঘৃণিত জীবন কি আমার?
উপদেষ্টার আসনে বসে আজ আমি যে বাণী প্রচার করে এলুম, আমার ব্যক্তিগত জীবনে যদি তা বাস্তবায়িতই না হল তবে সমাজকে এ প্রতারণা করে আমার ভবিষৎ ম্লান করে তুলছি কেন?– সত্যের বিমল রশ্মিতে প্রাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, প্রাণ তার কর্তব্যের পথ চিনে নিল, তাই তখনই সঙ্কল্প করলেন 'আর আমি court-এ যাব না, জগতের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করবো'– মুকুন্দদাস।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:
১. জীবনী গ্রন্থমালা মুকুন্দদাস– স্বরোচিষ সরকার, বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল নভেম্বর ১৯৯৯।
২. চারণকবি মুকুন্দদাস– জয়গুরু গোস্বামী, বিশ্বাবানী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল ১৯৭৮।
৩. মুকুন্দদাস রচনাসমগ্র– সম্পাদক: শেখ রফিক, র‍্যামন পাবলিসার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৮।
৪. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল– হীরালাল দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৯৭।

সোমেন চন্দ



সোমেনচন্দ। বাংলা সাহিত্যের তিন উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকের একজন। সুকান্ত কবি হিসেবে, সোমেনচন্দ আধুনিক কথাশিল্পের স্থপতি হিসেবে এবং খান মোহাম্মদ ফারাবী উভয়কে ধারণ করে বাংলা সাহিত্যে পরিচিতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই তিন সাহিত্যিকের কেউই ২২ বছরও বাঁচতে পারেননি। অর্থাৎ ২২ বছরের পূর্বে, ২১-এর ঘরে তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সোমেনচন্দকে হত্যা করা হয়। আর অন্য দু'জন মরণব্যাধী যক্ষ্মা ও ক্যান্সারে মারা যান।

তারুণ্যের গান, সৃষ্টির উন্মাদনা ও বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে সাহিত্যে বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন সোমেনচন্দ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমেনচন্দ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'নিজস্ব একটি জীবনদর্শন না থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। সোমেনচন্দ ছিল কমিউনিস্ট। সাহিত্যিক হিসেবেও তার রচনায় নানাভাবে ফুটে উঠেছে কমিউনিজমের জয়ধ্বনি'।

সোমেনচন্দ অন্যায়, অত্যাচার, অসঙ্গতি ও অসহায়ত্বের কাছে কখনো মাথা নত করেননি। সকল অসঙ্গতির বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন। রাজপথে শোষিত মানুষের অধিকার আদায় ও শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার সংগ্রাম আর লেখালিখির মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতি তুলে আনার অবিচল প্রত্যয়ে তিনি ছিলেন ইস্পাতদৃঢ়। সোমেনচন্দের সাহিত্যে ছিল কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষকে ঘিরে। শোষণ-বৈষম্য থেকে মানুষকে মুক্ত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে নিয়েজিত করেন সেই শৈশব থেকে। ইস্পাতদৃঢ় সংকল্প নিয়ে শোষণমুক্তির লড়াই-সংগ্রামের পাশাপাশি তিনি সাহিত্যে বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। সোমেনচন্দ এমন একটি মানুষ, যার সৃষ্টি হতাশাগ্রস্ত প্রতিটি মানুষকে জাগ্রত করে নতুন উদ্যমে পথ চলতে সহায়তা করে।

বিপ্লবী রোমান্টিসিজম বা প্রথাগত কমিউনিজমের ফ্যাশনের মোড়কে নয়, সত্যিকারার্থে কমিউনিজম ছিল তার প্রেরণা। কমিউনিজমের দর্শনের আলোয় চেতনাকে শান দিতেন প্রতিনিয়ত। কমিউনিজমই ছিল তার মূল জীবনদর্শন। কলম ছিল তার সংগ্রামের পাথেয়। আর খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ ছিল তার বেঁচে থাকার প্রেরণা ও সৃষ্টির মৌলিক কাঁচামাল। খাঁটি কমিউনিস্ট বলতে যা বুঝায়, সোমেনচন্দ ছিলেন তাই।

নির্মল ঘোষকে লেখা এক পত্রে সোমেন জানিয়েছিলেন, 'আর এই বিপ্লবের অনুভূতি কেবল আমার নয়। আরো অনেক সাহিত্য-সেবকের মনেই জেগেছে মনে হয়, তার মধ্যে অনেকেই

প্রকাশ করতে পারছেন, বা অনেকেরই কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে গেছে তথাকথিত সাহিত্য ডিক্টেটরদের গোলমালে। কিন্তু সেই অনুভূতির অস্তিত্ব আছে অনেকের মনেই। এইসব দেখে মনে হয়, আগামী দশ বছরে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস হবে একটা উজ্জ্বল অধ্যায়, এটা একটা বৈপ্লবিক অপূর্ব সৃষ্টি'।

সোমেন চন্দের জন্ম ১৯২০ সালের ২৪ মে, মাতুলালয়ে। ঢাকার নিকটবর্তী বুড়িগঙ্গার পশ্চিম পাড়ে শুভাড্ডা ইউনিয়নের তেঘরিয়া গ্রামে। 'তবে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত সোমেনচন্দ (জীবনী গ্রন্থমালা) বইয়ে হায়াৎ মামুদ লিখেছেন– 'সোমেন চন্দের জন্ম কেরানীগঞ্জ থানার অধীনস্থ পারজুয়ার এলাকায় অবস্থিত ধিতপুর গ্রামে'। তার বাবার নাম নরেন্দ্রকুমার চন্দ। আর মা'য়ের নাম হিরণবালা। সোমেন চন্দের পিতামহের নাম রামকুমার। নরেন্দ্রকুমার চন্দের আদিনিবাস ছিল ঢাকার নরসিংদি জেলার বালিয়া গ্রামে।

নরেন্দ্রকুমার চন্দ ঢাকার মিটফোর্ড মেডিকাল স্কুল ও হাসপাতালের স্টোরস বিভাগে চাকুরি করতেন। মা হিরণবালা। তিনি ছিলেন কেরানীগঞ্জের মেয়ে। মাত্র ৪ বছর বয়সে সোমেন চন্দ তার মাকে হারান। হিরণবালার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রকুমার শিশু ছেলে সোমেনকে লালন-পালনের জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে ঢাকার অদূরে টঙ্গীর তিন মাইল পশ্চিমে 'ধউর' গ্রামের ডা. শরৎচন্দ্র বসুর কন্যা সরযূদেবীকে বিয়ে করেন। সোমেন এই সৎ মা সরযূদেবীকে মা বলে জানতেন। আর সরযূদেবীও সোমেনকে নিজের সন্তানের মতো আদর-স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে বড় করেছেন। পিতার চাকুরির কারণে ঢাকায়ই সোমেনের বেড়ে ওঠা। এখানেই তার শৈশব-কৈশর ও মানস চেতনা গড়ে উঠে। সোমেনচন্দ শহরের বাইরে অর্থাৎ গ্রামে একনাগাড়ে কখনো বসবাস করেননি। তবে মাঝে মাঝে তিনি মামা বাড়ি 'ধউর' গ্রামে বেড়াতে যেতেন। তার শৈশব-কৈশোরের বেশ সময় কাটে পুরান ঢাকার তাঁতিবাজারে।

সোমেন চন্দের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। বিশেষ করে বাবার কাছে। তারপর অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের কাছে পড়েন। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে ১৯৩০ সালে তাকে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করে দেয়া হয় পুরান ঢাকা পোগোজ হাই স্কুলে। এই স্কুল থেকে ১৯৩৬ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ডাক্তারি পড়ার জন্য ভর্তি হন ঢাকা মিটফোর্ট মেডিকেল স্কুলে। কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের কারণে পড়াশুনা আর চালিয়ে যেতে পারেননি।

১৯৩৫ সালের নভেম্বরে লন্ডনে ভারতীয় ও ব্রিটিশ লেখকদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ই. এম ফরস্টার, হ্যারল্ড লাস্কি, হার্বার্ট রিড, রজনী পাম দত্ত, সাজ্জাদ জহির, মূলক রাজ আনন্দ, ভবানী ভট্টাচার্য প্রমুখ। নানা আলোচনার পর তারা একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন ডিসেম্বরে। এরই সূত্র ধরে ভারতে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠিত হয়। চার বছর পর ঢাকায় স্থাপিত হয় এর শাখা। লন্ডন বৈঠকে সাহিত্যিকরা এ সংগঠনের নাম 'প্রগতি সাহিত্য সংঘ' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যখন ইশতেহার প্রকাশিত হয় তখন প্রস্তাবিত নাম রাখা হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ'। ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিলের এ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত হিন্দি লেখক মুন্সী প্রেমচান্দ। সভায় সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'। এর সভাপতি নির্বাচিত হন প্রেমচান্দ, সম্পাদক সাজ্জাদ জহির।

১৯৩৭ সালে সোমেন চন্দ প্রত্যক্ষভাবে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। ওই সময় তিনি কম্যুনিস্ট পাঠচক্রের সম্মুখ প্রতিষ্ঠান প্রগতি পাঠাগারের পরিচালকের দায়িত্ব নেন। তিনি ও তার পরিবার এসময় শহরের দক্ষিণ মৈশণ্ডিতে থাকতেন। প্রগতি পাঠাগার-এর পরিচালক হন তিনি ১৯৩৮ সালে। তিনি বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশীর মতো আজীবন বিপ্লবী শিক্ষকের রাজনীতি ও দর্শনের পাঠ নেন। রণেশ দাশগুপ্তের সান্নিধ্যে থেকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, ম্যাক্সিম গোর্কী, মোপাঁসা, রঁলা, বারবুস, জিদ, মারলো, কডওয়েল রালফ্ ফক্সসহ আরো অনেকের লেখা বই পড়েন। তিনি রালফ্ ফক্স নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, সেটি নিম্নে উল্লেখ করা হল:

রালফ্ ফক্সের নাম শুনেছো?
শুনেছো কডওয়েল আর কনফোর্ডের নাম?
ফ্রেদরিকো গার্সিয়া লোরকার কথা জান?
এই বীর শহীদেরা স্পেনকে রাঙিয়ে দিল,
সবুজ জলপাই বন হল লাল,
মার- বুক হল খালি-
তবু বলি, সামনে আসছে শুভদিন।
চলো, আমরাও যাই ওদের রক্তের পরশ নিতে,
ওই রক্ত দিয়ে লিখে যাই
শুভদিনের সংগীত।

১৯৪১ সালের ২২ জুন। হিটলার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে। বিশ্বযুদ্ধ নতুন দিকে মোড় নেয়। এ সময় ভারত উপমহাদেশের প্রগতিবাদী জনতা ফ্যাসিস্ট হিটলারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং স্তালিনের নেতৃত্বে সংগ্রামরত দেশপ্রেমিক সোভিয়েত যোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে জনযুদ্ধ ঘোষণা করে। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তির লক্ষে হীরেন মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশু আচার্যকে আহ্বায়ক করে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদদের নিয়ে বঙ্গদেশে গড়ে উঠে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে গড়ে উঠে 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'। এর যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ও দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই সমিতির প্রধান প্রধান কাজগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম কাজ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার অগ্রগতি প্রসঙ্গে চিত্র প্রদর্শনী করা। এই প্রদর্শনীতে প্রগতি লেখক সংঘের সোমেন চন্দের ভূমিকা ছিল অনন্য। তার অবিরত শ্রমের কারণে ঢাকায় অল্পদিনের মধ্যে প্রগতি লেখক সংঘ ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন, 'সোমেন হত্যার ব্যাপারটি, বিশেষ করে তখনকার পটভূমিতে এবং প্রেক্ষিতে এই হত্যাকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী। সোমেন ছিলেন সে সময়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন, সোভিয়েত সুহৃদ সমিত, আর প্রগতি লেখক সংঘের অনেকখানি'। ১৯৪২ সালে সোমেনচন্দের মৃত্যুর পর কলকাতায় সম্মেলনের সময় প্রগতি 'লেখক সংঘের' নামকরণ হয় 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় আবার এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'।

সোমেন চন্দের মৃত্যু সম্বন্ধে সরদার ফজলুল করিমের স্মৃতিচারণ, 'ফ্যাসীবাদ বিরোধী আন্দোলন বাংলার সব জেলা শহরে ছড়িয়ে পড়ে, যার মধ্যে ঢাকা শহর ছিল অন্যতম শক্তিশালী কেন্দ্র। ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকার বুদ্ধিজীবি, লেখক প্রভৃতি শহরে এক ফ্যাসীবাদ বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন। স্থানীয় জেলা পার্টির অনুরোধে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি ও জ্যোতি বসু সেখানে বক্তা হিসেবে যান। সম্মেলন উপলক্ষে শহরে খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক মহল প্রায় তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম যারা সম্মেলনের পক্ষে, দ্বিতীয় যারা সরাসরি বিপক্ষে, তৃতীয় যারা মোটামোটিভাবে তুষ্টীভাব অবলম্বন করে নিরপেক্ষতার আবরণ নিয়েছিলেন। শেষোক্তদের মধ্যে প্রধানত কংগ্রেস মতবাদের অনুসারীরা ও দ্বিতীয় দলে ছিলেন জাতীয় বিপ্লবী, বিশেষত শ্রীসংঘ ও বিভি'র লোকেরা। যাই হোক, সম্মেলনের দিন সকালে উদ্যোক্তাদের অন্যতম তরুণ সাহিত্যিক সোমেনচন্দ আততায়ীর হাতে নিহত হন। তিনিই বাংলার ফ্যাসীবাদী বিরোধী আন্দোলনের প্রথম শহীদ। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের পরও যথারীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং আমাদের প্রতি আরও লোক আকৃষ্ট হয়।'

১৯৪২ এর ৮ মার্চ ঢাকায় এক সর্বভারতীয় ফ্যাসিবাদবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করা হয়। তথাকথিত জাতীয়তাবাদী কিছু দল এ সম্মেলন বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে। রেল শ্রমিক সাধারণ সম্পাদক সোমেন চন্দ রেল শ্রমিকদের মিছিল নিয়ে তখন সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। ওই দিন ঢাকার সুত্রাপুরে সেবাশ্রম ও লক্ষ্মীবাজারের হৃষিকেশ দাস লেনের কাছে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টির (আর. আস. পি) গুণ্ডারা তার উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়।

'সোমেন চন্দ ছিলেন ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে। হিটলার-মুসেলিনী ফ্যাসিস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল পৃথিবীকে শাসন করার জন্য। তারা স্পেনের ফ্যাসিস্ট ফ্র্যাঙ্কোর সঙ্গে সে সময়ে মিত্রতা গড়ে তোলে। এই ফ্যাসিস্ট চক্রের হাতেই সোমেন চন্দ শহীদ হয়। সোমেনের তাঁজা রক্ত ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত করে আন্দুলেশিয়া আর স্পেনের রাজপথের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তোলে'– চৌধুরী সুধীর নাথ

প্রগতি লেখক সংঘের নেতৃত্বে ১৯৪১-এ ঢাকায় তৈরি হয় ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগঠন– সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। একপর্যায়ে তিনি এ সমিতির অন্যতম সক্রিয় সংগঠক হয়ে উঠেন। ওই বছর সোমেন চন্দ প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রগতি লেখক সংঘের প্রধান সংগঠক ছিলেন তিনি। সংঘের সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক বৈঠকগুলোতে নিয়মিত লেখা উপস্থাপনের তাগিদ থেকেকেই তার সাহিত্যচর্চার বিস্তারলাভ। ১৯৪০ সালের শেষের দিকে কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নে আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। সোমেনের স্বপ্ন ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া। ১৯৪১ সালে সে স্বপ্ন তার পূরণ হয় মাত্র বিশ বছর বয়সে।

'ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়েছিল একটা সন্ধিক্ষণে। শাখা স্থাপনের [illegible] মুখে ছিলেন কয়েকজন তরুণ লেখক। যারা ভাবছিলেন প্রগতি লেখক সংঘের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও গণমুখী ঘোষণাপত্র অনুযায়ী অবিলম্বে কিছু করা দরকার। যারা এ প্রয়োজন অনুভব করছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ বয়সী ছিলেন সোমেন চন্দ, যার বয়স তখন আঠারো আর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন সতীশ পাকড়াশী বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের একজন, যার বয়স সে সময়ে পঁয়তাল্লিশ অতিক্রম করেছে। সোমেনের দুই

সমবয়সী বন্ধু একেবারে গোড়ার দিকে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন। একজন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অতি আধুনিক কবিতা লিখে নাম করেছিলেন অপরজন অমৃত কুমার দত্ত। এদের সঙ্গে একত্রিত হয়েছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত, তার বয়স তখন ২৭। পুরানো ঢাকা শহরের দক্ষিণ মৈত্রী মহল্লায় প্রগতি পাঠাগার ছিল সংঘের প্রথম কেন্দ্র'– রণেশ দাশগুপ্ত। ১৯৪০ সালের মাঝামাঝি গেন্ডারিয়া হাইস্কুল মাঠে সম্মেলন করে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্বোধন করা হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কাজী আবদুল ওদুদ। রণেশ দাশগুপ্ত সংগঠনের সম্পাদক ও সোমেনচন্দ সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সোমেনচন্দের লেখক জীবনের পরিধি মাত্র পাঁচ বছরের ১৯৩৭-৪২ সাল পর্যন্ত। ২৬টি গল্পের রচনাকাল, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির বিচারে গল্পগুলোকে দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে– প্রাথমিক পর্ব ১৯৩৭-৩৯ সাল এবং ১৯৩৯-৪২ সাল মৃত্যুকাল পর্যন্ত। প্রথমকাল পর্বে আমরা তার গল্পগুলোর মধ্য বিভুতিভূষণের কিছুটা প্রভাব দেখতে পাই। আর দ্বিতীয় পর্বে মানিক বন্দোপাধ্যায়ের। ২৬টি গল্প, একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস, তিনটি কবিতা, দুটি একাঙ্কিকা, আটটি চিঠি। বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে তার আরও কিছু রচনা। কিন্তু পত্রিকাগুলো দুস্প্রাপ্য। ফলে এসব রচনা আজও উদ্ধার করা যায়নি।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেয়া সোমেনচন্দ পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাস করতেন বিপ্লবে। সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অনুষঙ্গ হিসেবেই রাজনীতি চলে আসে তার লেখায়। নিত্যদিনের ঘরকান্নার মধ্য দিয়ে তিনি অবলীলায় দেখিয়ে দেন শাসনযন্ত্রের কুটিল চালপ্রয়োগ, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে থাকা ক্ষমতার সুক্ষ্ম জাল। তার সৃষ্টি চেতনার কারফিউ ভেঙ্গে জাগিয়ে দেয় মেহনতি মানুষের মুক্তির কথা বলতে। যোগায় আত্মপরিচয় খোঁজার অনুপ্রেরণা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যবনিকা পতনের কিছু পরেই বিশ্বমঞ্চে তার আবির্ভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আনাকাঙ্খিত মৃত্যু তাকে প্রচণ্ড পরিমানে ক্ষুব্ধ করে। আঞ্চলিক সমস্যা যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণের একটি উপাত্ত তা বলতে 'একটি রাত গল্পের' অবলম্বন নেন। সনাতনী মা ছেলের রাজনৈতিক মতাদর্শ বুঝে নিতে বই খুলে বসেন।

দাঙ্গা গল্পে দুই ভাইয়ের আদর্শগত বিরোধের মধ্য দিয়ে রূপক আকারে বেরিয়ে আসে উপনিবেশবাদের শেষ ছোবল জাতিগত বিভেদের ভয়াবহ চেহারাটি। দাঙ্গা গল্পের 'অজয়' একটি বাস্তব চরিত্র। ওই সময় আমি এমনটাই ছিলাম– কল্যাণ চন্দ।

ইঁদুর গল্পের ইঁদুরগুলো যেন দারিদ্র্যেরই কিলবিলে রূপ যা এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেয়না। ক্রমাগত শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে রত নিম্ন মধ্যবিত্তদের। নিরেট প্রেমের গল্প রাত্রিশেষেও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে শ্রেণীসংঘাত যা থেকে মুক্ত নয় আপাত সংস্কারত্যাগী বৈষ্ণবরাও।

অকল্পিত গল্পে তিনি দেখান 'যারা রাষ্ট্রদেবতার মন্দিরের কাছাকাছি থাকেন, যারা বিশ্ব মানচিত্রে মিজের ক্ষুদ্র অবস্থান সম্পর্কে বেশ সচেতনই বলা চলে, যারা দেখতে পায় কিংবা দেখেও না দেখার ভান করে 'আমাদের চারিদকে চাপা কান্নার শব্দ, আমাদের চারিদিকে জীবনের হীনতম উদাহরণ, খাদ্যের অভাবে, শিক্ষার অভাবে কুৎসিত ব্যারামের ছড়াছড়ি, মানুষ হয়ে পশুর জীবন-যাপন। আমাদের চারিদিকে অবরুদ্ধ নিঃশ্বাস, কোটি কোটি ভয়ার্ত চোখ, তারা যেন খুনের অপরাধে অপরাধী একপাল মানুষ'।

প্রত্যাবর্তন গল্পে তিনি গাঁয়ের কথা বলেন 'পঁচিশ বছর আগের পুরুষরা একদিন আকাশের দিকে চাহিয়া নিরুপায়ে কাঁদিয়াছে, তার বংশধরেরা আজও কাঁদিতেছে। তাহাদের চোখ-মুখ ফুলিয়া গেল'।

জীবনের এই স্বল্প পরিসরে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন শেষের কয়েকটি বছর। প্রতিটি রচনাতেই রয়েছে সৃষ্টিশীলতার ছাপ। তার 'ইঁদুর' গল্প বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইঁদুর প্রসঙ্গে লেখক হুমায়ূন আহমেদ বলেন, 'সোমেন চন্দের লেখা অসাধারণ ছোটগল্প 'ইঁদুর' পড়ার পর নিম্ন মধ্যবিত্তদের নিয়ে গল্প লেখার একটা সুতীব্র ইচ্ছা হয়। 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার' ও 'মনসুবিজন' নামে তিনটি আলাদা গল্প প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেলি।'

১৯৪০-এ প্রকাশিত সংঘের সংকলন 'ক্রান্তি'তে তার বিখ্যাত গল্প 'বনস্পতি' প্রকাশিত হওয়া ছিল বিরল ঘটনা। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি ভাল একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন, নাম-বন্যা। কিন্তু জীবিতাবস্থায় তার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

উৎসব গল্পে সোমেনচন্দ বলেন, 'এমন আশ্চর্য ব্যাপার আর দেখি নাই, লোকটা সরবে রোদন করিতে লাগিল-ভেউ ভেউ ভেউ! কান্নার কয়েকটি নামই জানি, জীবনের এতগুলি বছর ধরাপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া কান্না সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছি, কিন্তু এটি কোন জাতীয়, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। অথচ পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অচেতন হইয়া এখন কোনো ভাবনাই যে ভাবা উচিত নয়, এই তথ্যটি অতি সহজেই ভুলিয়া যাওয়ায় সহজেই বাধাপ্রাপ্ত হইলাম। চিন্তার সূত্র ধরিয়া বেশি দূর অগ্রসর হই নাই, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাসযুক্ত ফোঁপানির শব্দে সভয়ে মুখ তুলিয়া দেখি, কান্নার পর্ব সশব্দে সমাপ্ত করিয়া লোকটা এবার ফুঁপাইতেছে এবং জামার আস্তিনে চোখ মুছিতেছে।

তাড়াতাড়ি বলিলাম, দেখুন এমন করে কাঁদবেন না, ও দেখে আমারও যে ভারী কান্না পায়। ছোটবেলায় ভূমিষ্ট হওয়া মাত্রই মা হারিয়ে কত কেঁদেছি, বড়ো হয়ে পরীক্ষায় পাস করে কেঁদেছি, আর বিয়ে করে যা কেঁদেছি, তার তো তুলনাই হয় না, আর সে দিন সাহেবের সঙ্গে বচসা করে যা কেঁদেছি সে কথা মনে করে এখনও যে আমার ভয়ানক কান্না পাচ্ছে। দেখুন আমি বড়ো আর বলিতে পারিলাম না, কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল'।

সোমেনচন্দের 'উৎসব' গল্পটি প্রথম মুদ্রিত হয় সিলেট থেকে প্রকাশিত ১৩৪৮ সালের স্মৃতির শরৎ সংখ্যায়। স্মৃতির সম্পাদক ছিলেন জীতেশমাধব দত্ত ও হিরন্ময় দাশগুপ্ত। স্মৃতির ১৩৪৮ সালের শারদীয় সংখ্যায় লেখক মণ্ডলীতে সোমেন চন্দ ছাড়াও ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, সুরেন্দ্র মৈত্র, অজয় ভট্টাচার্য, গোপাল ভৌমিক, জগদীশ ভট্টাচার্য, বরদা দত্তরায়, সত্যভূষণ চৌধুরী, নরেন্দ্রচন্দ্র দেব, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জীতেশমাধব দত্ত ও রবীন্দ্র চৌধুরী। লেখকসূচি থেকেই স্মৃতির উচ্চমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কলকাতার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পাঠাগারের যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সংগ্রহশালায় স্মৃতি সাময়িকীটি পাওয়া যায়।

'মার্ক্সবাদী জীবনদৃষ্টিই সোমেন চন্দকে সমকালীন সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে বিশিষ্ট করে তুলেছে। জীবনকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন ইতিবাচক প্রেক্ষিতে। সমকালীন সাহিত্যিকেরা দুই বিশ্বযুদ্ধের আবর্তে পড়ে জীবনের শুভ্রতা আর স্বস্তির পরিবর্তে অঙ্কন করেছেন কেবল গ্লানি, হতাশা ও যৌনতার শব্দছবি। জীবনে তারা খুঁজে পাননি আশার কোনো আলো। বিপন্ন এই যুগ ও পরিবেশে দাঁড়িয়েও সদ্য কৈশোর-অতিক্রান্ত এক যুবক জীবনকে

দেখেছেন অনিমেষ আলোর দৃষ্টি দিয়ে– শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি সাঁতার কেটেছেন জীবনের মহাসমুদ্রে, জীবনকে জয় করার জন্য। বস্তুত জীবনকে জানাই ছিল সোমেন চন্দের প্রধান ব্রত। তিনি জানতে চেয়েছেন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে, যে জীবন মানুষের অগ্রযাত্রার মহাসড়ক নির্মাণে এগিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

মার্ক্সবাদী শ্রেণীচেতনার আলোকে সোমেন চন্দ নির্মাণ করেছেন তার ছোটগল্পের প্রিয় মানুষদের। বাংলা সাহিত্যে সাম্যবাদী চিন্তার প্রকাশ সোমেন চন্দের ছোটগল্পেই প্রথম সচেতনভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তার 'সংকেত', 'একটি রাত', 'দাঙ্গা', 'বনস্পতি', 'ইঁদুর' প্রভৃতি গল্পের কথা স্মরণ করা যায়। নিম্নবর্গের সংগ্রামশীল জীবন সোমেন চন্দের ছোটগল্পের প্রধান শিল্প-উপকরণ; ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামে নিম্নবর্গের দীপ্ত অভ্যুত্থানই সোমেনের ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়।'– অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের অসাধারণ উপন্যাস চিলেকোঠার সেপাই-এর এক স্থানে সোমেন চন্দের কথা উঠে আসে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হায়াৎ মামুদের সোমেন চন্দ গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। তবুও বাংলাদেশের সাহিত্যে সোমেন চন্দকে খুঁজে পেতে সেলিনা হোসেনের 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' হাতে নিতে হবে। সোমেনচন্দকে জানতে এ উপন্যাস প্রয়োজনীয়। লেখিকা উপন্যাসটিতে সযত্নে ফুটিয়ে তুলেছেন সোমেন চন্দের জীবনচরিত।

সোমেন চন্দ সাহিত্যেও বিপ্লবের স্রোতধারা আশা করতেন। বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য দ্বারা ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করার অনুপ্রেরণা মানুষের মধ্যে সঞ্চার করা সম্ভব। আর সেই লক্ষ্যকে সামন রেখে মানুষের মুক্তির কথা চেতনায় ধারণ করে রচনা করেছিলেন সমাজ পরিবর্তনের কথাশিল্প।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের লেখক শহীদ সোমেনচন্দ– সম্পাদনা: সাধন চট্টোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, প্রকাশক: উবিদশ, কলকাতা, প্রকাশকাল ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

২. সোমেনচন্দ– হায়াৎ মামুদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রকাশকাল ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭।

৩. সোমেনচন্দ রচনাসমগ্র– ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রকাশকাল একুশে বইমেলা ২০১০।

৪. সোমেনচন্দ– শিক্ষা ও সাহিত্য টিচার'স জার্নাল (নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি'র পত্রিকা, ভলিয়ুম ৭৫, এপ্রিল-১৯৯৬, কলকাতা), সম্পাদক-অজিত বাগ।

সুভাষ চন্দ্র বসু



১৯০৮ সাল। তখন বালক সুভাষ চন্দ্র বসু কটকের রাভেন্সেশ কলেজিয়েট স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়াশুনা করছেন। পড়াশুনায় তিনি খুব ভাল ছিলেন। প্রতি বছর ক্লাশে প্রথম স্থান অর্জন করতেন। বাঙলা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই তিনি দক্ষ ছিলেন। কারণ পাদ্রীদের স্কুলে বাঙলা ভাষা শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। একবার ক্লাসে গরু সম্বন্ধে বাঙলায় একটি রচনা লিখতে দেয়া হয়। নেতাজীর লেখা গরু রচনাটির এক বর্ণও ঠিক হয় নাই। শিক্ষক মহাশয় ক্লাসের মধ্যে তার রচনাটি পড়ে শোনালেন। তারপর ক্লাসে হাসির রোল পড়ে যায়। লজ্জায় লাল হয়ে যান সুভাষ চন্দ্র। ইতোপূর্বে পড়াশুনার জন্য তিনি কখনও এইরূপ বিদ্রুপের সম্মুখ হননি। যার ফলে তার আত্মসম্মানে বিশেষ আঘাত লাগে। এসময় তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, বাঙলা ভাষা তিনি ভাল করে শিখে এর প্রতিশোধ নিবেন। প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী পুরোদমে বাঙলা শিখেন এবং বাৎসরিক পরীক্ষার বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর পান।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার জন্য যে সকল মহান ব্যক্তি, বিপ্লবী, লড়াকু যোদ্ধা জীবন উৎসর্গ করেছেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু তাদর মধ্যে অন্যতম। অহিংসায় নয়, উদারতায় নয়, শক্তি প্রয়োগ করেই ব্রিটিশকে ভারত থেকে তাড়াতে হবে– এই মন্ত্রকে ধারণ করে তিনি আমৃত্যু লড়াই-সংগ্রাম চালিয়েছেন ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। ভারতের যুব সম্প্রদায়কে নেতাজী বলেছিলেন 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'। উপমহাদেশে সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের সংগঠক হিসেবেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যে কারণে বিপ্লবী যোদ্ধারা তাকে নেতাজী বলে সম্বোধন করতেন। তিনি এ উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনেরও অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন।

পরপর দুবার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধির সাথে রাজনৈতিক মতাদর্শগত মতভেদের কারণে এবং কংগ্রেসের অনাস্থার ফলে এই পদ থেকে তাকে পদত্যাগ করতে হয়। নেতাজী বিশ্বাস করতেন, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতি স্বাধীনতা আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তিনি সশস্ত্র বিপ্লববাদী প্রতিরোধের পক্ষ নিয়েছিলেন। তিনি অল-ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক নামে পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের অবসান ঘটানোর জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। এজন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাকে এগারো বার কারারুদ্ধ করেছিল। জাপান-অধিকৃত সিঙ্গাপুরে রাসবিহারী বসুর তত্ত্বাবধানে ভারতীয় উপমহাদেশের

যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে গঠন করেন আজাদ-হিন্দু ফৌজ। এই ফৌজ নিয়ে তিনি উত্তরপূর্ব ভারতীয় সীমায় প্রবেশ করে ইম্ফল অবধি দখল করতে সক্ষম হন।

সুভাষ চন্দ্র বসু ১৮৯৭ সালে ২৩ জানুয়ারি উড়িষ্যার কটক শহরে এক বাঙালি পরিবারে জন্ম নেন। জন্ম কলকাতায় হলেও তাদের পৈতৃক নিবাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। নেতাজীর বাবা জানকীনাথ বসু। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশ ছেড়ে কটকে চলে যান। সেখানে তিনি অইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এ পেশায় তিনি অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তিনি জ্ঞানী ও সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সরকারি দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি কটক মিউনিসিপ্যালিটি ও কটক জেলা বোর্ডের সভাপতির পদে ছিলেন। নেতাজীর মায়ের নাম প্রভাবতী দেবী। কলকাতার হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশদ্ভূত। অভিজাত সমাজে তাদের বিশিষ্ট স্থান ছিল। তিনি ছিলেন গৃহিণী ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। গরীব-দুঃখী মানুষের সেবা করা ছিল তার সহজাত স্বভাব। নেতাজী ছিলেন পিতা-মাতার নবম সন্তান ও ষষ্ঠ পুত্র।

১৯০২ সালে পাঁচ বছর বয়সের সময় সুভাষ বসু খ্রিস্টান পাদ্রীদের পরিচালিত কটক প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপীয়ান স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে তিনি ৭ বছর পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এই স্কুলে বাঙলা ছাড়া অন্য সকল বিষয় পড়ানো হতো। ছেলেবেলা থেকে তিনি মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। এজন্য শিক্ষকগণ তাকে খুব পছন্দ করতেন এবং ভালবাসতেন।

১৯০৮ সালে তিনি কটকের রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে ভর্তি হন। এই স্কুলে পড়াশুনাকালে তিনি বাঙলা ও সংস্কৃত ভাষা নিজ উদ্যোগে ভাল করে শিখে নেন। পড়াশুনা করার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। বাগানে তরিতরকারি ও ফুল গাছের প্রতি তার খুব ঝোঁক ছিল। প্রত্যহ তিনি বাড়ির মালিদের সাথে গাছে জল দিতেন। তিনি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতেন।

এই সময় বেণীমাধব দাস রাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তার সরল অমায়িক ব্যবহারে ছাত্ররা তাকে শ্রদ্ধা করত। এই শিক্ষকের প্রভাব সুভাষ চন্দ্রের উপর পড়ে। সুভাষ চন্দ্র আত্মজীবনীতে বলেছেন যে, 'প্রথম দর্শনেই তার প্রখর ব্যক্তিত্বে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স বারোর কিছু বেশি হবে। এর আগে আর কাউকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেছি বলে মনে পড়ে না। বেণীমাধব দাসকে দেখবার পর শ্রদ্ধা কাকে বলে মনে-প্রাণে অনুভব করলাম। কেন যে তাঁকে দেখলে মনে শ্রদ্ধা জাগতো তা বোঝবার মত বয়স তখনো আমার হয়নি। শুধু বুঝতে পারতাম, তিনি সাধারণ শিক্ষকের পর্যায়ে পড়েন না। মনে মনে ভাবতাম, মানুষের মতো মানুষ হতে হলে তার আদর্শেই নিজেকে গড়তে হবে।' মা প্রভাবতী দেবী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক বেণীমাধব দাসের নৈতিক আদর্শ তার পরবর্তীকালের জীবন কাঠামোটি সুন্দরভাবে তৈরি করে দেয়।

নেতাজীর বয়স যখন ১৩/১৪ বছর তখন তাদের এক আত্মীয় কটকে বেড়াতে আসেন। তিনি নেতাজীর বাড়ির নিকটেই থাকতেন। নেতাজী একদিন তার সাথে দেখা করেন এবং তার ঘরে স্বামী বিবেকানন্দের কতগুলি বই দেখতে পান। স্বামীজীর বইগুলা তিনি তার নিকট হতে এনে পাঠ করেন। এভাবে নেতাজী স্বামী বিবেকানন্দ ও তার গুরুদেব শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামীজীর বক্তৃতা ও চিঠিপত্রগুলি তাকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষ করে স্বামীজীর, 'বল ভারতবাসী– ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই–

তুমিও একটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া স্বদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, আর বল দিনরাত হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে আমার কাপুরুষতা, দুর্বলতা দূর কর আমায় মানুষ কর' প্রভৃতি কথাগুলি পড়ে তিনি যে আদর্শ খুঁজছিলেন, যেন ঠিক তা পেয়ে গেলেন।

এই সম্বন্ধে নেতাজী বলছেন, 'বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স বছর পনেরও হবে কি না সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। চেহারায় এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে বিবেকানন্দ ছিলেন আদর্শ পুরুষ। তার মধ্যে আমার মনের অসংখ্য জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম।'

স্বামীজীর বক্তৃতাবলী ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ পাঠ করে তিনি লেখাপড়ায় আর বিশেষ মনোযোগ দিতে পারলেন না। আধ্যাত্মিক উন্নতি করার জন্য যোগ অভ্যাস করতে শুরু করেন। কয়েকজন বন্ধুকে দলভুক্ত করে অধিকাংশ সময় দরিদ্রনারায়ণের সেবায়, রুগ্নের শুশ্রূষায় এবং দীন দুঃস্থের দুঃখ মোচনে ব্যয় করতেন। কি করে স্বামীজীর আদর্শকে তার জীবনে সফল করবেন, ইহাই তখন নেতাজীর একমাত্র চিন্তা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, 'বঙ্গ যুবক বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও, পশ্চাদপদ হইও না– তোমরাই আত্মবলিদানে ভারত মাতার প্রীতি সাধন করিবে। বিশ্বাস করো তোমাদের সার্থক জন্ম। বিশ্বাস করো তোমরা কখনই নিষ্ফল হইবে না; তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই একমাত্র কৃতি।'

নেতাজী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সকলেই আশা করেছিলেন যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করবেন। কিন্তু পরীক্ষা নিকটবর্তী দেখেও তার পড়াশুনায় গাফিলতি দেখে সকলেই নিরুৎসাহী হয়ে গেলেন। সুভাষ চন্দ্র তখন শ্রীরামকৃষ্ণের 'বাণী জীব শিব' এবং স্বামী বিবেকানন্দের 'বাণী সেবা ধর্ম'কেই তার জীবনের সার বলে গ্রহণ করেছেন। পড়াশুনা তার কাছে তুচ্ছ।

অথচ কি আশ্চর্য, ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে নেতাজী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন! সকলে তার ফলাফল দেখে অবাক। ভাল ফলাফল করার কারণে তিনি কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। এই বৃত্তির টাকা তিনি দীন দুঃখীর সেবায় দান করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর নেতাজী তার মাকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রের শেষাংশটি উল্লেখ করছি। 'পড়াশুনা করে যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞান না লাভ করিতে পারে– তবে সে শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি। তাহা অপেক্ষা মূর্খ থাকা কি ভাল নয়? চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য– বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চরিত্র গঠনকে সাহায্য করে– আর কার কিরূপ উন্নত চরিত্র তাহা কার্যেই বুঝিতে পারা যায়। কার্যই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই পড়া বিদ্যাকে আমি সর্বান্তকরণে ঘৃণা করি। আমি চাই চরিত্র-জ্ঞান-কার্য। এই চরিত্রের ভিতরে সবই যায়– ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশপ্রেম, ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা সবই যায়। বই পড়া বিদ্যা তুচ্ছ সামান্য জিনিস– কিন্তু হায় কত লোকে তাহা লইয়া কত অহঙ্কার করে।'

১৯১৩ সালে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে তিনি আই. এ পরীক্ষায় মেধাস্থান অর্জন করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ওই বছরই তিনি দর্শনে অনার্স

নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে 'অধ্যাপক ওটেন' বাঙালি ছাত্রদের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করায় তিনি তার ওপর সাংঘাতিক ক্ষিপ্ত হন এবং 'অধ্যাপক ওটেন'কে প্রহার করেন। এই ঘটনার জন্য তাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিত্যাগ করতে হয়। কলেজ জীবন থেকেই তার মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও বাঙালি জাতীয়তাবোধ গভীরভাবে বিকশিত হতে থাকে।

অবশেষে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের (স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ) সহযোগিতায় তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীতে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে তিনি ডিস্টিংশনসহ দর্শন শাস্ত্রে অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন (১৯১৯ সাল) এবং ওই পরীক্ষায়ও তিনি কলেজে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২০ সালে তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এ-পরীক্ষা দেন এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ওই বছর তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে (আইসিএস) যোগ দেন। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান দেন। ভারতকে ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীন করার জন্য তিনি তৎকালীন সময়ে সরকারি চাকুরি ত্যগ করেছিলেন। ১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর আইন অমান্য আন্দোলনের অভিযোগে চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজীকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে। ১৯২২ সালে মুক্তি পান।

যদিও গান্ধীজির সাথে সাক্ষাতের মধ্যে দিয়ে তার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়, তথাপি গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনের প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। গান্ধীজিকে ছেড়ে তিনি আসেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে। সেখানে তার সান্নিধ্য থেকে তিনি রাজনীতিতে নিজেকে আরো পরিপক্ক করে তোলেন। এরপর থেকে নেতাজী স্বাধীনতা সংগ্রামী চিত্তরঞ্জন দাশের সাথে রাজনীতি শুরু করেন। ১৯২৪ সালে এপ্রিল মাসে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন। চিত্তরঞ্জন দাশ তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। যদিও সুভাষ চন্দ্রের বেতন ছিল মাসে ৩০০০ টাকা, তিনি সিদ্ধান্ত নেন মাসে ১৫০০ টাকা বেতন নেওয়ার। ওই বছর অক্টোবর মাসে নেতাজীকে স্বদেশি বিপ্লবীদের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। ব্রিটিশরা তাকে বার্মার কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। ১৯২৫-২৭ সাল পর্যন্ত তিনি মান্দালয়সহ বিভিন্ন কারাগারে আটক ছিলেন। ১৯২৭ সালে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯২৮ সালে কলকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়েন। যার চরিত্র ছিল সামরিক। 'হিন্দুস্থান সেবক দল' নামে আরেকটি বাহিনী সেসময় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে দলের সাথে এ দলের পার্থক্য হল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনীতে নারী ও পুরুষ বিপ্লবী ছিল। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনীকে সামরিক মানসিকতায় শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং স্বাধীনতার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীকালে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ার ক্ষেত্রে নেতাজী এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনী থেকে প্রেরণা পান। ১৯২৯ সালে পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে তিনি ও বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সরকারের পাশাপাশি একটি প্যারালাল সরকার গঠন করার প্রস্তাব করেন। এ ভাবে তিনি বিপ্লবীদের স্বজন হয়ে উঠেন।

১৯৩০ সালে ২৩ জানুয়ারি ব্রিটিশ আইনের বিরুদ্ধে পদযাত্রায় প্রধান ভূমিকা পালন করার জন্য তাকে আবার আটক করা হয়। ওই বছর জেল থেকে বেরিয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতার মেয়র হিসাবে নিযুক্ত হন। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি স্বাধীনতা

আন্দোলনের কিংবদন্তী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩১ সালে নেতাজীর নেতৃত্বে কলকাতায় শোভাযাত্রা চলাকালে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে আবার গ্রেফতার করে। ৬ মাস পর মুক্তি পান। মুক্তির পরও বিপ্লববাদী সশস্ত্র আন্দোলনের জন্য ব্রিটিশ সরকার নেতাজীকে তার বাড়িতেই নজরবন্দী করে রাখে। ১৯৩২ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে ওই আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি হয়ে উঠেন। এসময়ও তাকে আবার ব্রিটিশ সরকার কারাগারে প্রেরণ করে। কিন্তু জনতার আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বারবার কারা নির্যাতনের কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ইউরোপে চলে যান। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি ইউরোপের বহু রাজনৈতিক নেতা ও মহান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করতেন, ভারতমাতাকে ব্রিটিশ সরকারের হাত থেকে স্বাধীন করতে হলে বাইরের দেশের সেনা ও রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতা দরকার হবে। এ সময় তিনি সমগ্র ইউরোপ ঘুরে বেড়ান এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য তীব্র প্রচার চালান।

তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রাগে, বার্লিনে, মিলানে, মিউনিখে, সোফিয়া ও রোমে সভা সমাবেশ করেন। ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত সংগ্রহ করেন এবং ভারতীয়দের সংগঠিত করেন। ১৯৩৬ সালের ৮ এপ্রিল দেশে আসার পর ব্রিটিশ সরকার তাকে আবার গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে নিখিল ভারত সুভাষ দিবস পালন করে। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ওই বছর তিনি তার ব্যক্তিগত সচিব এমিলিকে সহধর্মিনী করেন। ১৯৪২ সালে তাদের কন্যা সন্তান অনিতার জন্ম হয়। ১৯৩৮ সালে তাকে ভারতবাসী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সুভাষ চন্দ্র গান্ধীজীর অহিংস নীতির বিরোধিতা করে ইংরেজ সরকারকে ৬ মাসের মধ্যে স্বাধীনতা প্রদানের জন্য এক চরমপত্র পাঠানোর প্রস্তাব করেন। কিন্তু কংগ্রেস সহিংস সংগ্রাম শুরু করার পক্ষে ছিলনা। গান্ধীজী ওই সময় ইংরেজ সরকারকে বিব্রত করতে চাননি। এ প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিলে সুভাষ বোস পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক নামে আরেকটি দল গঠন করেন। কলকাতায় প্রবল জনমত সৃষ্টি করলে ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে ১৯৪০ সালের ২ জুলাই নেতাজীকে গ্রেফতার করে এবং কোলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে তাকে আটকে রাখে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি গৃহবন্দী অবস্থায় আত্মগোপন করেন এবং আফগানিস্তান হয়ে রাশিয়ার পথে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ভারত স্বাধীনের জন্য সোভিয়েত শক্তির সমর্থন চান। কিন্তু স্ট্যালিন সুভাষ বসুর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

সুভাষ বসু সরকারি গোয়েন্দা নজরদারি এড়ানোর জন্য মৌনব্রত ও নির্জনবাসের ঘোষণা দেন ও তার ভাতিজা অমিয় বোসের অনুমোদন ছাড়া কারো সঙ্গে দেখা করতেন না। ওই সুযোগে তিনি মৌলভী জিয়াউদ্দীনের মতো দাড়ি রাখেন ও তার মতোই পোশাক পরে গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ১৯৪১ সালের ২৮ মার্চ গোপনে আফগানিস্তান ও মস্কো হয়ে জার্মানির বার্লিন পৌছেন। তিনি জার্মান থেকে সাবমেরিনযোগে জাপান পৌছেন। সেখানে নানা ফ্রন্টের ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে এর সর্বাধিনায়ক হন।

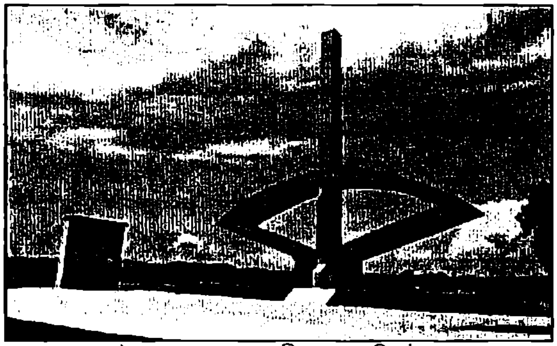
১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকার ফরওয়ার্ড ব্লক দলকে বেআইনি ঘোষণা করে। সমগ্র ভারত জুড়ে দল পার্টি অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৪৩ সালে নেতাজী জাপানে যান।

১৯৪৩ সালের ৪-৭ জুলাই সিঙ্গাপুরস্থ মহাএশিয়া মিলনায়তনে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রধান নেতৃবৃন্দের মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট বিপ্লবী রাসবিহারী বসু দাঁড়িয়ে সভায় একজন চমৎকার নতুন অতিথি হিসেবে সুভাষ চন্দ্র বসুকে পরিচয় করিয়ে দেন। একই সঙ্গে লীগের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুভাষ বসুকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য নিজের ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি সকলকে অবহিত করেন যে, ইতিমধ্যে টোকিওতে আমাদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং তিনি দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতা এবং বার্ধক্যজনিত কারণে বর্তমান পদ তার পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান। এই কথা বলার পর সভার সকল নেতৃবৃন্দ এবং সদস্য প্রাণবন্ত করতালি দিয়ে সুভাষ বসুকে স্বাগত জানায়। প্রবাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বমান্য সম্মানিত পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার কারণে রাসবিহারী বসু তখন তাকে 'নেতাজী' উপাধি প্রদান করেন। নেতাজী রাসবিহারী বসুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দু'ঘন্টাব্যাপী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন।
এ সম্মেলনে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বস্তুত 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনে রাসবিহারী বসুর অবদান অপরিসীম। পরে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে মিলিত হন। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হলে সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন রাসবিহারী বসু।
১৯৪৪ সালের ২১ মার্চ আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতভূমির মনিপুরে প্রবেশ করে। এই ফৌজের কার্যাবলী খুব দ্রুত ভারতব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাসবিহারী বসু খুবই আনন্দিত হন। কিন্তু ১৯৪৫ সালের শুরুতে জাপান আজাদ হিন্দ ফৌজ-কে যে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করে নেয়।
সুভাষ চন্দ্র বসু আশা করেছিলেন, ব্রিটিশদের উপর আই. এন-এর হামলার খবর শুনে বিপুল সংখ্যাক সৈন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে হতাশ হয়ে আই. এন-এতে যোগ দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হল না। বরং যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতির সাথে সাথে জাপান তার সৈন্যদের আই.এন-এ থেকে সরিয়ে নিতে থাকে। পাশাপাশি জাপান থেকে অর্থের সরবরাহ কমে যায়। অবশেষে, জাপানের আত্মসমর্পন এর সাথে সাথে আই.এন-এ ও আত্মসমর্পন করে।
ধারণা করা হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৫ সালের ১৯ আগস্ট টোকিও যাবার পথে, তাইওয়ানে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। তবে তার মৃত্যুর সঠিক তারিখ ও স্থান সম্পর্কে এখনো বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তার দেহাবশেষ কোনোদিনও উদ্ধার করা যায়নি।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:
১. বাংলার পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী– সম্পাদনাঃ দেবপ্রসাদ জানা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশকাল ৫ জানুয়ারি ২০০৮।
২. আমি সুভাষ বলছি– শ্রী শৈলেশ দে, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশকাল: রথযাত্রা-১৩৮১ প্রথম খণ্ড, রথযাত্রা -দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৮৪, রথযাত্রা -তৃতীয় খণ্ড ১৩৮৯ বাংলা।
৩. বাংলা ছোটদের সুভাষ চন্দ্র– কালীপদ দাস, সাহিত্যমালা প্রকাশনী, প্রকাশকাল ১৯৯৫।
৪. আধুনিক ভারত– প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২০-১৯৪৭) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৯।

রাসমণি



টঙ্গ আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিসৌধ

টঙ্ক আন্দোলন ব্রিটিশ-ভারতের সর্বশেষ গণআন্দোলন। বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকার গারো পাহাড়ের পাদদেশে সুসং-দুর্গাপুর এলাকায় সংগঠিত হয়েছিল এ আন্দোলন। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এই টঙ্ক আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নারী-পুরুষ-শিশুসহ ৬০ জন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কৃষকদের শতশত বাড়ি-ঘর ধুলিসাৎ ও গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলেও বেশ কিছুদিন এই আন্দোলন অব্যাহত ছিল। টঙ্ক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সুসং দুর্গাপুরের জমিদার সন্তান মণি সিংহ। এ আন্দোলন সংগঠিত করে আদিবাসী হাজং জনগোষ্ঠী। টঙ্ক আন্দোলনের কারণে ব্রিটিশ আমলে তাকে কয়েকবার জেলে যেতে হয়। পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ সরকার মণি সিংহের বাড়ি ভেঙ্গে ভিটায় হালচাষ করায় এবং তার স্থাবর সম্পত্তি নিলাম করে নেয়। টঙ্ক আন্দোলনে যে সমস্ত লড়াকু বীর শহীদ হন, তাদের মধ্যে রাসমণি অন্যতম। তিনিই টঙ্ক আন্দোলনের প্রথম শহীদ। তিনি টঙ্ক ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রীও ছিলেন। টঙ্ক আন্দোলনে মণি সিংহের পর যার নাম চলে আসে তিনি হলেন রাসমণি। তারপর কুমুদিনী হাজং।

টঙ্ক মানে ধান কড়ারী খাজনা। ধান হোক বা না হোক জমিদারকে কড়ায় গণ্ডায় ধান দিতে হবে। মাঠে ফসল ফলা বা না ফলার ওপর টঙ্ক ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল না। টঙ্ক জমির ওপর কৃষকদের কোন স্বত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কলমাকান্দা, সুসং-দূর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দি প্রভৃতি থানাগুলোতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং-জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। কেন টঙ্ক নাম হল তা জানা যায় না, তবে এটা স্থানীয় নাম। এই প্রথা বিভিন্ন নামে ওই সময়ের পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, যেমন চুক্তিবর্গা, ফুরণ প্রভৃতি। ওই সময়ে পশ্চিবঙ্গেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সুসং জমিদার এলাকার যে টঙ্ক ব্যবস্থা ছিল তা ছিল খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হত সাত থেকে পনের মন। অথচ ওই সময়ে জোত জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ওই সময়ে ধানের দর ছিল প্রতিমণ সোয়া দুই টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হত এগার টাকা থেকে প্রায় সতের টাকা। এই প্রথা শুধু জমিদারদের ছিল তা নয়; মধ্যবিত্ত ও মহাজনরাও টঙ্ক প্রথায় লাভবান হতেন। একমাত্র সুসং-জমিদাররাই টঙ্ক প্রথার মাধ্যমে দুই লক্ষ মণ ধান আদায় করতেন। এটা ছিল এক জঘন্যতম সামন্ততান্ত্রিক শোষণ।

মনে হয়, সুসং-জমিদাররা গারো পাহাড়ের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে এই প্রথা প্রবর্তন করেন। জোত স্বত্বের জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে প্রতি সোয়া একরে একশ টাকা থেকে দুইশ টাকা নজরানা দিতে হত। গরীব কৃষক ওই নজরানার টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ ছিলেন না। টঙ্ক প্রথায় কোন নজরানা লাগত না। কাজেই গরীব কৃষকের পক্ষে টঙ্ক নেওয়াই ছিল সুবিধাজনক। টঙ্কের হার প্রথমে এত বেশি ছিল না। কৃষকরা যখন টঙ্ক জমি নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন, তখন প্রতি বছর ওই সব জমির হার নিলামে ডাকা হত। ফলে হার ক্রমে বেড়ে যায়। যে কৃষক বেশি ধান দিতে কবুল করত তাদেরই অর্থাৎ পূর্বত বেশি ডাককারী কৃষকের নিকট থেকে জমি ছাড়িয়ে হস্তান্তর করা হত। এইভাবে নিলাম ডাক বেড়ে গিয়ে ১৯৩৭ সাল থেকে হার সোয়া একরে পনের মণ পর্যন্ত উঠে যায়।

টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে রাসমণি জীবনবাজী রেখে লড়াই করেন। রাসমণি জন্মেছিলেন ১৮৯৭ সালের মে মাসে। ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ পরগনার ভেদিপুরা অঞ্চলের বগাবারী গ্রামের এক গরিব হাজং পরিবারে। বাবা ও মায়ের নাম অজ্ঞাত। গরীব পরিবারে জন্মেছিলেন বলে বর্ণমালা শিক্ষা ছাড়া তার আর কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়নি। তবে ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব কৌতূহলী; প্রতিবাদী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন।

রাসমণির বয়স যখন ১২ বছর তখন পাঁচ মণ ধান ও নগদ দশ টাকার বিনিময়ে আর এক নিঃস্ব টঙ্ক যুবকের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পদিন পরেই রাসমণি বিধবা হন। অল্পদিনে বিধবা হওয়ার কারণে গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা রাসমণিকে 'ডাইনি' বলে ডাকত। এসময় তাকে অসহনীয় কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। একদিকে স্বামী হারানোর বেদনা, অন্যদিকে দারিদ্র্যতা- এই দুই কষ্ট তাকে ঘিরে ধরে। তবু তিনি জীবন-সংগ্রামের হাল ছাড়েননি। অসীম ধৈর্য ও সাহসের সাথে জীবনযুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন। সহায়-সম্বলহীনা বিধবা রাসমণি পরের জমিতে ধান লাগিয়ে এবং ধান কেটে মজুরি বাবদ যে সামান্য পরিমাণ ধান পেতেন তাই দিয়ে চলতেন। ধান সিদ্ধ করে, রোদে শুকিয়ে, ঢেঁকিতে ভেঙ্গে চাল তৈরি করে হাটেবাজারে বিক্রি করতেন। এছাড়া তিনি কখনও বনের কাঠ কুড়িয়ে সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন, কখনও কখনও কাপড় ও ওড়না বুনতেন। যা গরীব হাজং মেয়েদের কাছে বিক্রি করতেন।

বছর দুয়েক পর গ্রাম্য মানুষের নানাধরণের অশালীন কথাবার্তার পরিপ্রেক্ষিতে রাসমণি দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হন। এসময় তিনি দূর্গাপুর থানার কুল্লাপাড়া ইউনিয়নের আরাপাড়া গ্রামের পাঞ্জি হাজংকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তারা দুজনে আড়াপাড়ায় বসবাস করতেন। স্বামী পাঞ্জি হাজং একজন কবিরাজ ছিলেন। সেই সুবাদে তিনিও স্বামীর কাছ থেকে কবিরাজী বিদ্যা অর্জন করেন। তাছাড়া নিজেও কিছু তন্ত্রমন্ত্র ও ধাত্রী (দাইমা) জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তাই রাশিমণি প্রতিবেশিদের ছোটখাটো কোন রোগ সারাতে ও সন্তান প্রসব করানোর মতো সেবা করে একসময় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

রাসমণি হাজংসহ সব হাজং আদিবাসীদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন আসামের অধিবাসী। সুসং রাজ্যের গোড়াপত্তনের পর গারো পাহাড়ের পাদদেশে সুসং জমিদারেরা হাজংদের আমদানী করে এনে বসবাসের জায়গা করে দেন। হাজংদের আমদানীর পেছনে দুটি কারণ ছিল- এক. এরা অত্যন্ত সৎ, সাহসী, দুর্ধর্ষ এবং বিশ্বস্ত। দুই. পাহাড়ী গারো ও ব্রিটিশের হামলা প্রতিরোধে এদের ব্যবহার করা সহজ ছিল।

রাসমণি হাজং ছিলেন মূলতঃ হিন্দু। হাজং নারীদের মধ্যে তিনি বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তার দেখাদেখি অশ্বমণি, কলাবতী, রমমণি প্রমুখ নিজেরাই সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। হাজং নারীদের সাহস যোগাতেন রাসমণি। তিনি ছিলেন নির্ভীক।

১৯৩৭ সালের শেষের দিকে এই প্রতিবাদী নারী কমরেড মণি সিংহের আহ্বানে টঙ্ক আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তখন থেকেই মূলতঃ রাসমণির রাজনৈতিক সংগ্রামী জীবনের অধ্যায় শুরু হয়। তিনি নিজে টঙ্ক আন্দোলনের ভলান্টিয়ার বাহিনীর সদস্য হন এবং তার পরিচিত সাহসী ও প্রতিবাদী হাজং নারীদেরকেও ভলান্টিয়ার বাহিনীতে নিয়ে আসেন। ১৯৩৮ সালে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং সম্প্রদায় ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে। হাজং সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধকরণে কুমুদিনী হাজং ও রাসমণি হাজং অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৯ সালে মণি সিংহের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ এলাকায় কৃষকরা টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া শুরু করে। হাজংদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়ে। হাজং সম্প্রদায় বরাবরই সুসং জমিদারদের ভগবান তুল্য গণ্য করতেন। এরপরও গারো পাহাড়ি অঞ্চলে জমিদার, মহাজনদের সৃষ্ট টঙ্ক প্রথার শর্তানুসারে জমিতে ফসল হোক বা না হোক চুক্তি অনুসারে টঙ্কের ধান জমিদার-মহাজনদের দিতেই হতো। সহজ কথায় হাজং সম্প্রদায়ের কাছে অধিক শ্রম কেড়ে নেওয়ার জন্য জমিদাররা টঙ্ক প্রথার ফাঁদ পেতেছিল। এতে হাজংরা ক্রমেই জমি বাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হতে থাকে। এ সময় জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ধানের মূল্য ছিল মণ প্রতি ২.২৫ টাকা। গরিব হাজং কৃষকদের পক্ষে এ টঙ্ক দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল।

ফলে বাধ্য হয়ে তারা এই প্রথা রুখে দেওয়ার জন্য আরো বেশি সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যায়। মণি সিংহেরে নেতৃত্বে ১৯৪০ সালে আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ওই বছর সরকার সার্ভে করে টঙ্কের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। একই বছর নভেম্বর মাসে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে মণি সিংহ তাদের জমিদারী টঙ্কপ্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে গভর্নর টঙ্ক এলাকার অবস্থা সচক্ষে দেখতে এলে পূর্বাহ্নে কয়েকজন সহকর্মীসহ মণি সিংহকে গ্রেফতার করে ১৫ দিন আটক রাখে। ছাড়া পেয়ে পরিস্থিতি বুঝে তিনি আত্মগোপন করেন। ওই বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও এই যুদ্ধকালে কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী 'জনযুদ্ধের' নীতি গ্রহণ করায় টঙ্ক আন্দোলন কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকে। এক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার টঙ্ক প্রথার সংস্কার করলেও প্রথাটি একবারে উচ্ছেদ হল না। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন কৃষক সভা 'টঙ্ক' প্রথার পুরোপুরি উচ্ছেদ করার জন্য আন্দোলন অব্যহত রাখলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্যাসীবাদিবিরোধী গণসংগ্রামের সময় রাসমণি 'মহিলা অত্মরক্ষা সমিতিতে যোগ দেন। এই সমিতির হয়ে রাসমণি তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরে লঙ্গরখানা খুলে তিনটি গ্রামের গরীব মানুষের মুখে অন্ন যোগানোর ভার নেন। তার নেতৃত্বে খাদ্য সংগ্রহকারী দল সারা পরগনা ঘুরে ধান, চাল, অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ করত। হাজং চাষীদের দল চোরা ব্যবসায়ী মজুতদারদের গোপন খাদ্যের গুদাম খুঁজে বের করে সেই খাদ্য লঙ্গরখানার জন্য নিয়ে আসতো।

হাজং অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার জন্য যে 'বেশি খাদ্য ফলাও' 'খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা' আন্দোলন আরম্ভ হয় তার পুরোভাগে ছিলেন রাসমণি। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নির্দেশে রাসমণি নিজের গ্রামে ধর্মগোলা (যেখানে ফসল ওঠার সময় সকলে উদ্বৃত্ত ধান জমা দিত

এবং প্রয়োজনের সময় সেখান থেকে ধান নিত) এবং মেয়েদের জন্য নানা কুটির শিল্পের কেন্দ্র স্থাপন করেন। রাসমণি বুঝতে পারেন, জমিদার, তালুকদার এবং মহাজনদের হাতে হাজং চাষীদের শোষিত হওয়ার প্রধান কারণ তাদের অশিক্ষা-কুশিক্ষা। সেই সমস্যা দূর করার জন্য তিনি একটি নৈশ বয়স্ক বিদ্যালয় খোলাবার উদ্যোগ নেন। হাজং পল্লীতে এই বিদ্যালয় খোলা হলে তিনিই হন তার প্রথম ছাত্রী। এই নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি চলতো রাজনৈতিক আলোচনা। কিছুদিনের মধ্যেই লাঞ্ছিত ও অনগ্রসর হাজং ঘরের মেয়ে রাসমণি গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ এক বিপ্লবী দল গড়ে তোলেন। এভাবে তিনি ময়মনসিংহের সীমান্ত এবং পার্বত্য অঞ্চলের নারী আন্দোলনের নেত্রী হয়ে উঠেন।

১৯৪৫ সালের ৪-৫ এপ্রিল নেত্রকোনায় দু'দিনব্যাপী এক ঐতিহাসিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। এ সম্মেলনের বেশ কিছু দিন আগে হাজং নারীদের মধ্যে প্রচার কাজ চালাতে কলকাতা থেকে আসেন কমিউনিস্ট নেত্রী যুঁইফুল রায় ও নির্মলা সান্যাল। এ সম্মেলনে রাসমণিসহ বিপুল সংখ্যক আদিবাসী নারী অংশগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধি হয়ে আসেন পি. সি যোশী, ভবানী সেন, বঙ্কিম মুখার্জী, কৃষ্ণবিনোদ রায়, সোমনাথ লাহিড়ি, গুরুমুখ সিং, হরকিষণ সিং, সুরজিৎ ভাগ সিংহ, চন্দ্রভান সিংহ, গাড়োয়ান গোদাবরী পারুলেকর, নাম্বুদ্রিপাদ, সুন্দরায়া, কেরোলিয়ান, ড. জেড. এ আহমদ, যদুনন্দন শর্মা, নীলমণি, বড় ঠাকুর, ইরাবত সিংহ, মণিপসুর, বিষ্ণুরাতা ও কল্পনা যোশী (দত্ত)।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে পল্লীগানের ওপর ভিত্তি করে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিনয় রায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অখিল চক্রবর্তী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও হেনা দাসসহ অন্যান্যরা।

সম্মেলন থেকে আওয়াজ ওঠে–

'টঙ্ক প্রথার উচ্ছে চাই', 'টঙ্ক জমির স্বত্ব চাই', 'জোত স্বত্ব নিরিখমত টঙ্ক জমির খাজনা ধার্য করা চাই', 'বকেয়া টঙ্ক মওকুফ চাই', 'জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ চাই', 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'।

এ আন্দোলনের ফলে ১৯৪০ সালের টঙ্ক প্রথায় কিছুটা সংশোধনী আসে। এ সংশোধনীতে ছিল ৮টি কিস্তিতে টঙ্ক পরিশোধ এবং টঙ্ক পরিশোধ করতে পারলে জমিতে কৃষকের স্বত্ব স্থাপিত হবে।

ওই সময় ব্রিটিশ সরকার নেতাদের ওপর দমননীতি চালায়। ইংরেজদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে হাজং কৃষকরা বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। জমিতে কৃষকের স্বত্বের দাবিতে হাজং কৃষকদের এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ময়মনসিংহের পাঁচটি থানার সুদীর্ঘ নব্বই মাইলের মধ্যে প্রায় তিনশত গ্রাম জুড়ে। কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সভা, মিছিল, বক্তৃতা, হাট-প্রচার ও গ্রাম-বৈঠকের মাধ্যমে আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ চলতে থাকে। এই সমস্ত সভায় এবং মিছিলের পুরোভাগে নারী বাহিনী নিয়ে চলতেন রাসমণি। প্রচারবাহিনী নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে রাসমণি হাজং কন্যাদের মৃত্যুপণ সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ভীত-সন্ত্রস্ত জমিদার-তালুকদার মহাজনরা ইংরেজ শাসকের কাছে তাদের রাজত্ব রক্ষার জন্য আবেদন জানায়।

১৯৪৬ সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় দফায় টঙ্ক আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সুসং-দুর্গাপুর স্কুলের মাঠে এক বিশাল জনসভা হয়। এ সভায় বল্লভী

বকসীর নেতৃত্বে হাজার পাঁচেক কৃষকদের এক জঙ্গী মিছিল সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সভাস্থলে এসে পৌঁছায়। এ মিছিলে রাসমণি হাজংসহ প্রায় একশত হাজং নারী সংঘবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করে।

এ সভার উদ্দেশ্য ছিল–

পুনরায় টঙ্ক উচ্ছেদের পক্ষে আন্দোলন শুরু এবং ময়মনসিংহ শহরে ভিয়েতনাম দিবসে পুলিশের গুলিতে নিহত ছাত্রনেতা অমলেন্দু রায়ের হত্যার প্রতিবাদ করা।

এই সম্মেলনের খবর পৌঁছে যায় ময়মনসিংহের পুলিশ দপ্তরে। পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা টঙ্ক আন্দোলনের গতিকে থামিয়ে রাখার লক্ষ্যে সরকারি সশস্ত্র পুলিশবাহিনী তৎপর হয়ে ওঠে।

ওই দিনই ময়মনসিংহের পুলিশ দপ্তর দূর্গাপুর থানার বিরিশিরিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাম্প স্থাপন করে। বিরিশিরির সেই ক্যাম্প থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে টঙ্ক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী হাজংদের দমন করতে চেষ্টা চালানো হতো। বিভিন্ন গ্রামের হাজং পরিবারগুলো প্রতিদিনই সশস্ত্র বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের শিকার হতো।

১৯৪৬ সালের ৩১ জানুয়ারি সকাল ১০ টার দিকে বিরিশিরি থেকে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বহেরাতলী গ্রামে হাজং ও গারো আদিবাসী এলাকায় পাঁচজন সশস্ত্র পুলিশ আকস্মৎ তল্লাসী চালায়। তারা হাজং মা বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে। নারীরা বিপদ সংকেত হিসেবে শিঙ্গা বাজিয়ে সংকেতের মাধ্যমে গ্রামবাসীকে জানিয়ে দেয়। সেই অত্যাচারি নারীর আর্তনাদ শুনে রাসমণি তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। রাসমণির নেতৃত্বে হাজং নারীরা সবাই দা হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে পুলিশদের তাড়া করে। নারীদের এ জঙ্গী রূপ দেখে পুলিশেরা পিছু হটে পালিয়ে বাঁচে। পরে এ পাঁচজন পুলিশ ক্যাম্পে ফিরে যায়। পরবর্তীতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পঁচিশজনের একটি পুলিশ দল (ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনী) আবার বাহারতলী গ্রামে আসে। এ দলটি লংকেশ্বর হাজং-এর বাড়িতে হানা দেয়। টঙ্ক আন্দোলনের মাঠ পর্যায়ের নেতা লংকেশ্বর হাজং ও তার ভাইদের গ্রেফতার করাই ছিল পুলিশ বাহিনীর উদ্দেশ্য। পুলিশ বাহিনীর বহেরাতলীর দিকে আসার সংবাদ পেয়েই লংকেশ্বর হাজং ও তার তিন ভাই আত্মগোপন করেন মনি সিংহের গোপন আস্তানায়। লংকেশ্বর হাজং ও তার ভাইদের ধরতে না পেরে পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে লংকেশ্বর হাজং-এর সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী কুমুদিনী হাজংকে দেখে পুলিশ তার স্বামী কোথায় আছে জানতে চায়। টঙ্ক আন্দোলনের নেত্রী কুমুদিনী হাজং সঠিক উত্তর না দিয়ে 'জানিনা' বলে জবাব দেন। এতে পুলিশ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে কুমুদিনী হাজংকে ধরে নিয়ে রওয়ানা দেয়। কুমুদিনী হাজং-এর বাড়ির লোকজন পাশের বাড়িসহ গ্রামের অন্যান্য বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সংবাদ দেন।

রাসমণি এই খবর পেয়ে সাথে সাথে দিরস্তামনি হাজং, বাসন্তি হাজংসহ ১২ জনের একটি মহিলা সশস্ত্র (দা-কাস্তে-কুড়াল) দল কুমুদিনী হাজংকে ছাড়িয়ে নিতে গেলে সশস্ত্র পুলিশ নৃশংসভাবে তাদের ওপর গুলি চালায়। এতে রাসমণি হাজং গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখে পেছনের পুরুষ দলের নেতা সুরেন্দ্র হাজং রাসমণিকে ধরতে গেলে তাকেও নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় অন্যান্য হাজং নারী

পুরুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সশস্ত্র পুলিশের উপর বল্লম ও রামদা দিয়ে হামলা চালায়। পুলিশ বাহিনীর দু'জন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বাকি পুলিশ দৌড়ে পালায়।

কবি রফিক আজাদ তার 'মাতা রাসমণি' কবিতায় লিখেছেন–

'রাসমণি একটি নাম, জীবন-সমান দীর্ঘ নাম;
দেশবাসী, জানাও তোমরা তাঁকে সহস্র প্রণাম।
রাসমণি এই বিশাল বাংলায় একবারই জন্মান
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে গর্বিত শহীদ।'

নারী হয়ে নারীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে জীবন দিয়ে রাসমণি আজ হাজংদের কাছে হাজংমাতা হিসেবে পরিচিত। তারই স্মৃতি রক্ষার্থে ২০০৪ সালের ৩১ জানুয়ারি বহেরাতলী গ্রামের তার মৃত্যু সংলগ্ন স্থানে নির্মিত হয়েছে 'শহীদ হাজংমাতা রাসমণি স্মৃতিসৌধ' যা হাজং বিদ্রোহের অন্যতম সাক্ষী হিসেবে পরিচয় বহন করছে।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২০০৯।

২. বাংলার মুক্তি সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টপাধ্যায় ও রাখী চট্টপাধ্যায়, প্রকাশকাল ২০০৫, কলকাতা।

৩. মুক্তি মঞ্চে নারী– ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়রস্ত, রচনাকাল ১৯৯৪-৯৭।

৪. রাশিমণি হাজং এবং টঙ্ক আন্দোলন– সোহেল হাজং, সোমবার, ৩১ জানুয়ারি ২০১১, ১৮ মাঘ ১৪১৭ জনকণ্ঠ।

চিত্তরঞ্জন দাস



কৃষক নেতা জিতেন ঘোষের রচনা সমগ্রে তিনি লিখেছেন, 'দেশবন্ধু (চিত্তরঞ্জন দাশ) ময়মনসিংহ যাবেন। কর্মীরা তাঁকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন শুনে তিনি হেসে বললেন, আমি তো ভাই আর পঞ্চাশ হাজারী ব্যারিস্টার সি আর দাশ নই। কোনো মামলাও পরিচালনা করতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি দেশের জনগণের কাছে তাঁদের সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁরা তো তৃতীয় শ্রেণীতেই চড়েন। তোমাদের সাথে আমিও তৃতীয় শ্রেণীতেই যাবো। আমাকে আর আমার দেশের মানুষের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিও না। ব্যারিস্টারি জীবনে বহু শিক্ষিত সভ্য ভদ্রের সাথে তো মিশলাম, কিন্তু প্রাণ তো দেখলাম না কোথাও। শান্তিও তো পেলাম না। সবাই তো শো-কেসের প্রাণহীন ছবি। প্রাণ তো জনগণের মধ্যে।' জিতেন ঘোষ আরো লিখেছেন, 'তিলক স্বরাজ ফান্ডে টাকা তোলা হচ্ছে। কলকাতার পথে পথে কর্মীরা গান গেয়ে গেয়ে টাকা তুলছেন। প্রশ্ন উঠলো, বেশ্যাপাড়ায় অর্থ সংগ্রহের জন্য যাওয়া যাবে কিনা। এ নিয়ে দারুণ বাকবিতণ্ডা। কর্মীরা দ্বিধাবিভক্ত। দেশবন্ধু বললেন, এ নিয়ে তর্ক কেন? বেশ্যা বলে কি তারা বাংলার নারী নন? নন কি পরাধীনা? নিপীড়িতা? অর্থাভাব এবং অমানুষিক সামাজিক উৎপীড়নই তো তাঁদের দেহ-বিপণী সাজাতে এভাবে বাধ্য করেছে। স্বরাজ তো এদেরই জন্য। যে স্বরাজ দেশের অর্থাভাব দূর করবে না, দূর করবে না শোষণ, নির্যাতন, মুক্তি দেবে না পতিত-পতিতাদের, তেমন স্বরাজ এ দেশের মানুষ চান না। আমিও চাইনে। কাল আমি তোমাদের সাথে বেশ্যাপাড়ায় যাবো। পরদিন দেশবন্ধুকে সামনে রেখে একদল কর্মী গান গাইতে গাইতে বেশ্যাপাড়ার কোনো এক দুয়ারের সামনে যেয়ে উপস্থিত হলেন। দুয়ার হতে দেশবন্ধু হাঁক দিলেন, মা-বোনেরা স্বরাজ ফান্ডে ভিক্ষা দাও। এ তো ডাক নয়, যেন জাদুর ধূলা ছুঁড়ে দেয়া হলো। সোনাদানা, টাকাপয়সা যার যা ছিল সবই এনে বেশ্যা নারীরা দেশবন্ধুর পায়ে উজাড় করে ঢেলে দিলো। তার পায়ে কপাল ঠুকে বলতে লাগলো, বাবা আমাদের কি মুক্তি হবে? দেশবন্ধুর দু'চোখ বেয়ে দরদর করে জলের ধারা নামলো। অপূর্ব দৃশ্য, দেশপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন। দেশপ্রেম কারও একচেটিয়া নয়, এ কথাটা বুঝিয়ে দিলেন তিনি'।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জন্মেছিলেন ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর, কলকাতায়। তার বাবা ভুবনমোহন দাশ। মা নিস্তারিণী দেবী। চিত্তরঞ্জন দাশের পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল ঢাকা

জেলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। শিক্ষিত পবিবার হিসেবে তাদের পবিবারের যথেষ্ঠ সুনাম ছিল। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের পরিবার তৎকালীন ভারতের পুরোভাগে ছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি একই সাথে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চ সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি শ্লোক ও স্তোত্র গীত রচনা করতেন, যা প্রতিদিন সকালে গাইতেন। তিনি 'ব্রাহ্ম জনমত'-এর সম্পাদক ছিলেন। তাই কলকাতার সাংবাদিকতা জগতে তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন। রাজনীতি সচেতন ও দাতা স্বভাবের এই মানুষটি সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করতেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ছোটবেলা থেকেই পিতার গুণগুলো নিজের জীবনে প্রতিস্থাপন করতে শুরু করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের মা নিস্তারিণী দেবী উচ্চ শিক্ষিত না হলেও ছিলেন উচ্চমনা মানুষ। তিনি সহজ-সরল, অতিথিপরায়ণ ও নীতিবান ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশের বাবা দাতা স্বভাবের হওয়ার কারণে তাদের পরিবারে একসময় অভাব-অনটন দেখা দেয়। কিন্তু তার মা পরিবারের এই অভাব সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করে সফলতার সাথে পরিবার পরিচালনা করতে সক্ষম হন। কোনো প্রতিকূল পরিবেশ এলে তিনি ঘাবড়ে যেতেন না। ভুবনমোহন ও নিস্তারিণী দেবীর পরিবারে আটটি সন্তান জন্মেছিল। আট ভাই-বোনের মধ্যে চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন দ্বিতীয়।

চিত্তরঞ্জন দাশের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ হওয়ার পূর্বে চিত্তরঞ্জন দাশ শৈশবে তার বাবার সাথে কলকাতার ভবানীপুরে চলে আসেন। কারণ তখন তার বাবা কলকাতার ভবানীপুরে বসবাস করতে শুরু করেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯৭৯ সালে ভবানীপুর লন্ডন মিশানারি স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে তিনি পাঠ্যতালিকার বাইরের বই পড়তে বেশি পছন্দ করতেন। যে কারণে তার পড়াশুনার ফলাফল খুব একটা ভাল ছিলনা। স্কুলের সহপাঠীদের সাথে তার ভাল সখ্যতা ছিল। প্রায় সময় নিজের টিফিন সহপাঠীদের সাথে ভাগাভাগী করে খেতেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ শৈশবে বিপিন চন্দ্র পালের সংস্পর্শে আসেন। বিপিন চন্দ্র পাল সে সময়ের একজন নামকরা রাজনীতিবিদ ও বাগ্মী ছিলেন। তার প্রভাবে চিত্তরঞ্জন দাশ দেশাত্মবোধক গান ও কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ইংরেজি খুব ভাল জানতেন। কিন্তু অংকে ছিলেন একেবারে কাঁচা। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার ঝোঁক ছিল খুব বেশি। বঙ্কিম, রবীন্দ্র বেশ পড়তেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতাহীনতা' এবং হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' কবিতা দুটি তার খুব প্রিয় ছিল। এছাড়াও তিনি কীটস, শেলী ও ব্রাউনিং-এর ভক্ত ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯৮৬ সালে লন্ডন মিশানারি স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। এরপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এই কলেজে পড়াশুনার সময়ে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হন। কলেজ জীবনে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের সুরেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য হন। একপর্যায়ে তিনি এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৮৯০ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন। তারপর সিভিল সার্ভিসে পড়াশুনা করার জন্য বিলেত যান। বিলেতে থাকাকালীন সময়েও রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৩ সালে তিনি ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরেন। দেশে ফিরে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করে নেন। পেশা জীবনের শুরুতে তার সামান্য আয় হত, যা দিয়ে

তিনি তার দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে সক্ষম হতেন না। সামান্য কয়েক পয়সা ট্রামভাড়া বাঁচানোর জন্য তিনি হাইকোর্ট থেকে ভবানীপুর হেঁটে যেতেন।

এসময় তার পিতাও ঋণে ডুবে যান। এই কঠিন দুরাবস্থার সময় তার পিতা কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনে প্রচুর টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু তিনি নির্বাচনে জিততে পারেননি। পরোপকার ও উদারতার কারণে তার এই ঋণ বাড়তেই থাকে। এসময় তার অফিসের এক ক্লার্কের অনুরোধে এক ব্যক্তির জামিন হন। কিন্তু ওই ব্যক্তিটি আত্মগোপন করলে ভুবনমোহনের কাঁধে ৩০,০০০ টাকা পরিশোধের দায়িত্ব পড়ে। অনেক ঋণদাতা তাদের টাকা ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হয়। আদালত ১৮৯৬ সালের ১৬ জুন ভুবনমোহন ও চিত্তরঞ্জনকে দেউলিয়া হিসেবে ঘোষণা করে।

এসব ঘটনার পরে চিত্তরঞ্জন দাশ হতাশ না হয়ে পুনরায় নুতন উদ্যমে আদালতে যাওয়া শুরু করেন। কিছুদিন পর তিনি মামলা পেতে শুরু করলেন। এখন তার যা আয় হয়, তা দিয়ে মোটামুটি চলতে পারেন। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনের মোড় ঘুরতে থাকে। ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে চিত্তরঞ্জন দাশ বিজনী রাজকোর্টের বরদাপ্রসাদ হাওলাদারের কন্যা বাসন্তী দেবীকে বিয়ে করেন। জীবনের এক কঠিন সময়ে বাসন্তী দেবী তার জীবনসঙ্গী হন। তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যোগ্য সহধর্মিণী হিসেবে পাশে ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ সবকিছুর পরেও গোপনে গোপনে বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৩ সালে কলকাতায় প্রমথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে এই সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার সঙ্গেও তার সম্পৃক্ততা ছিল।

১৮৯৭-১৯০৪ সাল পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন দাশকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। চিত্তরঞ্জন দাশের একটি সুবিধা ছিল যে তার পারিবারিক অবস্থান। তার পিতামহ ছিলেন সরকারি আইনজীবী। দুই চাচা ছিলেন নামকরা আইনজীবী। এছাড়াও তার পরিবারের তিনজন ছিলেন জজ। সুধীররঞ্জন দাশ ছিলেন তাদের পরিবারের একজন। যিনি পরবর্তীতে ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন।

আইনজীবী হিসেবে চিত্তরঞ্জন দাশ সিভিল কোর্টের প্রাকটিসের পরিবর্তে ক্রিমিনাল কোর্টে প্রাকটিস শুরু করেন। এজন্য তাকে প্রায়ই মফস্বলে যেতে হত। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন কিন্তু যে কোনো ব্যারিস্টারের চেয়ে ফি নিতেন কম। গরীব মক্কেলের কাছ থেকে কোনো টাকা নিতেন না। তিনি সব সময় সত্যের-ন্যায়ের পক্ষ নিতেন। অনেক সময় দেখা যেত যার পক্ষ নিয়েছেন তিনি দোষী, তখন ওই দোষী ব্যক্তিকে দোষী প্রমাণ করে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। যে ব্যক্তিই তার কাছে মামলা নিয়ে এসেছেন তিনিই মানুষের কাছে গিয়ে তার মহত্বের কথা, বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা ও সততা-সেবার কথা প্রচার করে বেড়িয়েছেন। এভাবে তার নাম ও পরিচিতি গণমানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আইনজীবী হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করার পর চিত্তরঞ্জন দাশ মফস্বল ছেড়ে কলকাতায় প্রাকটিস শুরু করেন এবং পুনরায় সিভিল কেসগুলো পরিচালনা করে বেশ সাফল্য পান। সাথে সাথে রাজনীতিতেও পূর্বের চেয়ে বেশি সময় দিতে থাকেন। যার ফলে ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের কলকাতা প্রতিনিধি হন।

'কুতুবদিয়া রাজবন্দী মামলা' দেশবন্ধুর প্রথমজীবনে একজন আইনজীবী হিসাবে তার দক্ষতা প্রমাণ করতে সহায়তা করেছে। এই মামলায় ১৭ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তারা অন্তরীণ স্থল ত্যাগ করে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাদের জন্য বিনা ফি'তে কাজ করেন। এ সময় তিনি প্রায় পক্ষকালব্যাপী চট্টগ্রামে অবস্থান করেন মামলাটি পরিচালনার জন্য। দেশবন্ধু যুক্তি দেখান যে, রাজবন্দীরা পালিয়ে যাননি বরং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কিছু যুক্তিসঙ্গত ও আইনগত দাবির জন্যে গিয়েছিলেন। তার চমৎকার কৌশলের কারণে বন্দীদের মাত্র দুই মাসের সাজা হয়েছিল।

১৯০৭ সাল ছিল আইনজীবী হিসিবে চিত্তরঞ্জন দাশের টার্নিং পয়েন্ট। এই সময়ের মধ্যে তিনি নিজেক সিভিল ও ক্রিমিনাল উভয় কোর্টেই একজন সফল আইনজীবী হিসেবে প্রতিস্থাপন করেন। এই সময়ের মধ্যে কলকাতা কোর্টে দেশপ্রেমী, বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের যত মামলা এসেছে তিনি সেগুলোর পক্ষে অবিরাম লড়েছেন। এসময় কোন কোন মামলায় বা রাজনৈতিক কাজে বিপিন চন্দ্র পাল তাকে সহযোগীতা করতেন।

ওই বছর ব্রিটিশ সরকার বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদেরকে দমনের জন্য 'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা' ও 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। তখন চিত্তরঞ্জন দাশ আসামী পক্ষ সমর্থন করে এইসব মামলা পরিচালনা করেন। আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ। এসময় কিংসফোর্ড ছিলেন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি স্বদেশি আন্দোলনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন মামলার আসামী করতেন। একবার সামান্য কারণে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে কিংসফোর্ড সাহেব বালক সুশীল সেনকে ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এ ঘটনায় শুধু ভারতবাসী নয়, অনেক ইংরেজও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বিপ্লবীরা ক্ষুব্ধ হয়ে কিংসফোর্ডক হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই হত্যার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। ১৯০৮ সাল। ১ মে ওয়ার্নি স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হল ক্ষুদিরাম বসুকে। পুলিশ কনস্টেবলরা যখন প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেফতার করার জন্য জাপটে ধরেছিল তখন প্রফুল্ল চাকী রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

২ মে কলকাতার ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিশ আটটি জায়গায় খানা-তল্লাশি চালায়। মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত ও নলিনীকান্ত গুপ্তসহ ১৪ জনকে। ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রিট থেকে শ্রী অরবিন্দসহ তিনজনকে, ১৩৪ নম্বর হ্যারিসন রোড থেকে ৫ জনকে, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট থেকে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে কানাইলাল দত্তসহ দুইজনকে। হ্যারিসন রোডের বাড়ি থেকে পুলিশ প্রচুর পরিমান বোমা তৈরির মাল-মশলা ও সাজসরঞ্জাম উদ্ধার করল। এ ছাড়াও পুলিশ ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ি থেকে মাটির তলায় পোঁতা কতিপয় ট্রাঙ্ক উদ্ধার করে। এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বোমা ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা। এই মামলাটিরই নামকরণ হয়েছিল 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা'।

আলিপুর জজ আদালতে জেলা ও দায়রা জজ মি. চার্লস পোর্টেন বিচক্রফট্-এর আদালতে মুরারীপুকুর বোমা মামলার সূচনা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১৯ অক্টোবর। মামলায় অরবিন্দ ঘোষ-এর ওপর রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ আনা হয়। এই মামলা একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ বিনা টাকায় লড়েন। তখন তার মাসিক আয় ছিল পাঁচ হাজার টাকা। আর এই মামলা পরিচালনা করতে তাকে চল্লিশ হাজার টাকা দেনা করতে হয়েছিল। অরবিন্দের বিরুদ্ধে এই

মামলা চলে ১২৬ দিন। দু'শর বেশি সাক্ষীকে জেরা করা হয়। ৪০০০ কাগজপত্র এবং ৫০০ জিনিসপত্র প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ তার সওয়াল জওয়াবের পরিসমাপ্তি বক্তব্য দেন ৯ দিন ধরে। এই মামলায় তিনি যে সওয়াল করেছিলেন তা জ্ঞান ও দেশপ্রেমের অপূর্ব নিদর্শন। বিচারের রায়ে অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পান।

চিত্তরঞ্জন দাশ অর্থ-কড়ি আয় করার জন্য রাজনৈতিক মামলার পাশাপাশি মাঝে মাঝে জমিদার, মহাজনের মামলাও পরিচালনা করতেন। উপার্জিত টাকা গরীব-অসহায় মানুষকে দিতেন এবং তা দিয়ে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনা করতেন। একবার ডুমরাওনের মহারানীর মৃত্যুর পর রাজা কেশোপ্রসাদ তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার না হতে পেরে মামলা করেন। এই মামলায় চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতি মাসে ১০,০০০ রুপি পেতেন। আর মামলায় জয়ী হওয়ার পর রাজা কেশোপ্রসাদ খুশি হয়ে চিত্তরঞ্জন দাশকে ৫০,০০০ রুপি দিয়েছিলেন।

১৯১০ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ 'ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা' পরিচালনা করেন। এই মামলার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার অনুশীলন সমিতির প্রধান পুলিন বিহারী দাশ এবং সঙ্গীদেরকে নির্বাসন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ এই রায়ের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আপিল করেন। তার আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে তিন জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে ৬ মাসের শাস্তি এবং ৩৩ জনের মধ্যে মাত্র ১১ জনের তুলনামূলক কম পরিমানে শাস্তি হয়েছিল।

১৯১৪ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা' পরিচালনা করেন। এটাও ছিল একটি রাজনৈতিক মামলা। এই মামলার মাধ্যমে তিনি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা'র মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ১৪ জন বিপ্লবীকে লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত করে। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের তীক্ষ্ম যুক্তির কাছে ইংরেজ হেরে যায়। এই মামলায়ও তিনি জয়ী হন।

আইনী লড়াইয়ের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বিপ্লবীদেরকে ব্রিটিশের অত্যাচার-নির্যাতন ও জেল-জুলুমের হাত থেকে বাঁচানো ছিল তার প্রথম কাজ। আর দ্বিতীয় কাজ ছিল সরাসরি স্বদেশি রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকা এবং পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য কাজ করা। যে কারণে তিনি ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

১৯১৮ সালে 'আলিপুর ট্রাঙ্ক মার্ডার কেস' মামলা থেকে তিনি পাঁচজন ব্যক্তিকে মুক্ত করেন। এটা 'আলিপুর ট্রাঙ্ক মার্ডার কেস, ১৯১৮' নামে পরিচিতি মামলা। ওই বছর চিত্তরঞ্জন দাশের জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা হল 'অমৃতবাজার পত্রিকা মামলা'। কলকাতা হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ অভিমত প্রকাশ করে যে, কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্ট কোনো ব্যক্তিগত জমি রাখতে পারবে না। সে একই সময়ে হাইকোর্টে অন্য একজন বিচারক রায় দেন যে, কলকাতা উন্নয়ন ট্রাস্ট সে ক্ষমতা রাখে। এরকম বিপরীতধর্মী মতামতের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ গঠন করা হয়। প্রধান বিচারপতি Sir Lancelot Sanderson, বিচারপতি Jonh Woodroffe Ges Mr. Chitty-কে নিয়ে এই বেঞ্চ গঠন করা হয়। কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা অমৃতবাজার এ ব্যাপারে মন্তব্য করে সম্পাদকীয় ছাপে। পত্রিকাটি স্পেশাল বেঞ্চের গঠন সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতি অমৃতবাজারকে শো'কজ করেন এবং আদালত অবমাননার অভিযোগ আনেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' তখনকার কলকাতা বারের প্রখ্যাত আইনজীবীদের নিযুক্ত করে। মি. জ্যাকসন, মি. নরটন, বোমকেশ চক্রবর্তী এবং চিত্তরঞ্জন দাশ এই মামলায় নিযুক্ত হন। স্বাভাবিকভাবেই মামলা শুরু করেন মি. জ্যাকসন। কিন্তু পরবর্তিতে একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ ছাড়া আর কেউই মামলা পরিচালনা করার জন্য ছিলেন না। তিনি একাই তার ক্লায়েন্টের পক্ষে লড়েন। চিত্তরঞ্জন যুক্তি দেখান, হাইকোর্টের অবমাননার উদ্যেশে তার মক্কেল এই আর্টিকেল প্রকাশ করেনি বরং এটা ছিল লেখকের একান্তই নিজস্ব মতামত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর বক্তব্য কিছুটা আক্রমণসূচক হতে পারে এবং বাস্তবে কলামটি অযৌক্তিক হতে পারে কিন্তু এর দ্বারা আদালতের অবমাননা হয়নি। সমগ্র শুনানীতে চিত্তরঞ্জন তার যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা এমনভাবে প্রদর্শন করেন যে, এককথায় তা অপূর্ব। অবশেষে, বিচারকদের রায় চিত্তরঞ্জন দাশের পক্ষে অর্থাৎ অমৃতবাজার পত্রিকার পক্ষে যায়।

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরের ব্রিটিশ সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড চালায়। এ হত্যাকাণ্ডে ৩৭৯ জন নিহত এবং প্রায় ১১০০ জন আহত হয়েছিল। ইতিহাসে এটাই 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। ব্রিটিশের নানা টালবাহানার পর এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচারের জন্য সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিটি করে। এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মহাত্মা গান্ধী; সদস্য ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, আব্বাস তৈয়্যবজী এবং ড. জাকির হোসেন। তদন্ত কমিটির অধিকাংশ খরচ বহন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি তদন্ত কমিটিতে তার প্রজ্ঞার পরিচয় রাখেন। যে কারণে হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠ তদন্ত বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। এছাড়াও তিনি মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার, পাঞ্জাবে সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আইনসভা বর্জন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি নিজেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব কংগ্রেস অধিবেশনে উত্থাপন এবং গান্ধীজীর ডাকে ব্যারিস্টারি পেশা ত্যাগ করে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বয়ং ভারত সরকার প্রখ্যাত মিউনিশনস বোর্ড ঘটিত মামলায় প্রচলিত নজির উপেক্ষা করে সাহেব এডভোকেট জেনারেলের অপেক্ষা অধিক পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়ে তাকে সরকারি কৌসুলী নিযুক্ত করেন। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য এ দায়িত্বও পরিত্যাগ করেন। এই অসামান্য ত্যাগের জন্যে তিনি বাংলার মানুষ কর্তৃক 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯২১ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নেয়ার কারণে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও বোন ঊর্মিলা দেবীকেও কারাগারে নেওয়া হয়। এই প্রথম মহিলাদের প্রকাশ্য সত্যগ্রহে অংশগ্রহণ। ১৯২১ সালে কারাগারে থাকার কারণে আহমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েও উপস্থিত থাকতে পারেননি। পরের বছর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারি নীতির বিরোধিতা করার জন্যে আইন সভায় প্রবেশের পক্ষে মত দান করেন। গান্ধীজী কারাগারে ছিলেন, কিন্তু তার অনুগামীদের বিরোধিতায় এ নীতি কংগ্রেস কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তিনি ১৯২২ সালে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন। এরপর তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করেন। মতিলাল নেহেরু এবং দেশবন্ধুর নেতৃত্বে এই দল ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক দলে

পরিণত হয়। ১৯১৯-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন তিনি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ব্রিটিশ বস্ত্র পরিধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং নিজের ব্যবহৃত ইউরোপীয় পোশাক পুড়ে ফেলে খাদি পোশাক পরা শুরু করেন।

১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ বাংলার জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করেন। বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক ঐক্যের আহ্বান সমগ্র বাঙালিকেই প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। চিত্তরঞ্জন দাশ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মুখ্য প্রতিনিধি রূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের লক্ষ্যে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন করেন। এ চুক্তিতে মুসলমান মধ্যবিত্তের অনগ্রসরতা দূর করার বিশদ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্ভবত এ চুক্তির কারণেই ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত আইন সভা নির্বাচনে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বাধীন নবগঠিত রাজনৈতিক দল স্বরাজ্য দল বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। আর বিজয়ী আইনসভা সদস্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে স্বরাজ্য দল একটি প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে 'স্বরাজ্য দলের' বিশেষ সাফল্য লাভ হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন কলকাতা করপোরেশনের প্রথম মেয়র। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দমানোর জন্য ব্রিটিশ সরকার '১নং বেঙ্গল অর্ডিনান্স' নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল– 'রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা'। ওই সময় কলকাতা থেকে সুভাষ চন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রমোহনসহ প্রথম সারির নেতাদের গ্রেফতার করে। তখন চিত্তরঞ্জন দাশ নিজ বাড়িতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক আহ্বান করেন। এবার গান্ধীজীও উপলব্ধি করেন যে, স্বরাজ্য দলকে দমনের জন্যেই এই অর্ডিন্যান্স। এরপর থেকে গান্ধী দেশবন্ধুকে আকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে পরপর দুবার মেয়র নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি চাকরির ক্ষেত্রে অবহেলিত মুসলমানদের অধিক হারে সুযোগদানের নীতি গ্রহণ করেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ রাজনীতির মধ্যে থেকেও নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করতেন। তিনি সে সময়ের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। 'মালঞ্চ', 'সাগর সঙ্গীত' ও 'অন্তর্যামী' গ্রন্থের জন্য তিনি কবি ও লেখক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তার রচিত 'ডালিম' গল্পের নাট্যরূপ ১৯২৪ সালের ১৫ জুলাই-এ মিনার্ভায় (আলফ্রেড) পরিবেশিত হয়।

চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ সালের ১৬ জুন মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি পৈতৃক বসতবাড়িটি জনসাধারণের জন্য দান করে যান। সেখানে 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠিত হয়। তার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ/মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ এর জুনে মৃত্যুবরণ করলে জীবনানন্দ তার স্মরণে 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' নামক একটি কবিতা রচনা করেন, যা বঙ্গবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পরবর্তীতে ১৯২৭ সালে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক'-এ প্রকাশিত হয়।

দেশবন্ধু

জীবনানন্দ দাশ

বাংলার অঙ্গনেতে বাজায়েছ নটেশের রঙ্গমল্লী গাঁথা
অশান্ত সন্তান ওগো, বিপ্লবিনী পদ্মা ছিল তব নদীমাতা।
কাল বৈশাখীর দোলা অনিবার দুলাইতে রক্তপুঞ্জ তব
উত্তাল ঊর্মির তালে-বক্ষে তবু লক্ষ কোটি পন্নগ-উৎসব
উদ্যত ফণার নৃত্যে আষ্ফালিত ধূর্জটির কণ্ঠ-নাগ জিনি,
ত্র্যম্বক-পিনাকে তব শঙ্কাকুল ছিল সদা শক্র অক্ষৌহিণী।
স্পর্শে তব পুরোহিত, ক্লেদে প্রাণ নিমেষেতে উঠিত সঞ্চারি,
এসেছিলে বিষ্ণুচক্র মর্মন্তুদ– ক্লৈব্যের সংহারী।
ভেঙেছিলে বাঙালির সর্বনাশী সুষুপ্তির ঘোর,
ভেঙেছিলে ধূলিশ্লিষ্ট শঙ্কিতের শৃঙ্খলের ডোর,
ভেঙেছিলে বিলাসের সুরাভান্ড তীব্র দর্পে, বৈরাগের রাগে,
দাঁড়ালে সন্ন্যাসী যবে প্রাচীমঞ্চে-পৃথী-পুরোভাগে।
নবীন শাক্যের বেশে, কটাক্ষেতে কাম্য পরিহরি
ভাসিয়া চলিলে তুমি ভারতের ভাবগঙ্গোত্তরী
আর্ত অস্পৃশ্যের তরে, পৃথিবীর পঞ্চমার লাগি;
বাদলের মন্দ্র সম মন্ত্র তব দিকে দিকে তুলিলে বৈরাগী।
এনেছিলে সঙ্গে করি অবিশ্রাম প্লাবনের দুন্দুভিনিনাদ,
শানি-প্রিয় মুমুর্ষুর শ্মশানেতে এনেছিলে আহব-সংবাদ
গান্ডীবের টঙ্কারেতে মুহুর্মুহু বলেছিলে, আশি আমি আছি!
কল্পশেষে ভারতের কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছি নব সব্যসাচী।
ছিলে তুমি দধীচির অস্থিময় বাসবের দম্ভোলির সম,
অলঙ্ঘ্য, অজেয়, ওগো লোকোত্তর, পুরুষোত্তম।
ছিলে তুমি রুদ্রের ডম্বরুরূপে, বৈষ্ণবের গুপীযন্ত্র মাঝে,
অহিংসার তপোবনে তুমি ছিলে চক্রবর্তী ক্ষত্রিয়ের সাজে-
অক্ষয় কবচধারী শালপ্রাংশু রক্ষকের বেশে।
ফেরুকুল-সঙ্কুলিত উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষুকের দেশে
ছিলে তুমি সিংহশিশু, যোজনান্ত বিহরি একাকী
স্তব্ধ শিলাসন্ধিতলে ঘন ঘন গর্জনের প্রতিধ্বনি মাখি।
ছিলে তুমি নীরবতা-নিষ্পেষিত নির্জীবের নিদ্রিত শিয়রে
উন্মত্ত ঝটিকাসম, বহ্নিমান বিপ্লবের ঘোরে;
শক্তিশেল অপঘাতে দেশবক্ষে রোমাঞ্চিত বেদনার ধ্বনি
ঘুচাতে আসিয়াছিলে মৃত্যুঞ্জয়ী বিশল্যকরণী।
ছিলে তুমি ভারতের অমাময় স্পন্দহীন বিহ্বল শ্মশানে
শবসাধকের বেশে-সঞ্জীবনী অমৃত সন্ধানে।
রণনে রঞ্জনে তব হে বাউল, মন্ত্রমুগ্ধ ভারত, ভারতী;

কলাবিৎ সম হায় তুমি শুধু দগ্ধ হলে দেশ-অধিপতি।
বিধিবশে দূরগত বন্ধু আজ, ভেঙে গেছে বসুধা-নির্মোক,
অন্ধকার দিবাভাগে বাজে তাই কাজরীর শ্লোকে।
মল্লারে কাঁদিছে আজ বিমানের বৃন্তহারা মেঘছত্রীদল,
গিরিতটে, ভূমিগর্ভ ছায়াচ্ছন্ন-উচ্ছ্বাসউচ্ছল।
যৌবনের জলরঙ্গ এসেছিল ঘনস্বনে দরিয়ার দেশে,
তৃষ্ণাপাংশু অধরেতে এসেছিল ভোগবতী ধারার আশ্লেষে।
অর্চনার হোমকুন্ডে হবি সম প্রাণবিন্দু বারংবার ঢালি,
বামদেবতার পদে অকাতরে দিয়ে গেল মেধ্য হিয়া ডালি।
গৌরকানি- শঙ্করের অম্বিকার বেদীতলে একা
চুপে চুপে রেখে এল পুঞ্জীভূত রক্তস্রোত-রেখা।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জীবন ও কর্ম– রচনা সম্পাদনা: অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারী, মনির হোসাইন মনি, নাসিমা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌসি স্নিগ্ধা, প্রকাশক: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গবেষণা পরিষদ, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০০।

২. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম/তপন কুমার দে, প্রকাশকাল ২০০৯।

৩. বিদ্রোহী ভারত– নীহাররঞ্জন গুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৩৯১।

৪. হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ভারতের বিপ্লব কাহিনী, ২য় ও ৩য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৪৮।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী



বর্ণবাদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম ও আন্দোলন করার কারণে ২৭ বছর জেলখানায় বসবাস করে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা পৃথিবীর সব মানুষের হৃদয় কেড়ে নিয়েছেন। অথচ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন করে ৩৪ বছর জেলখানায় জীবন অতিবাহিত করা ময়মনসিংহের ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে (মহারাজ চক্রবর্তী) এখন আর এদেশের কেউ চেনেই না! মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে ব্রিটিশ মাথা নত করাতে পারেনি। ১৯৬৭ সালে তার লিখিত গ্রন্থ 'জেলে তিরিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'পৃথিবীতে সম্ভবত আমিই রাজনৈতিক আন্দোলন করার কারণে সর্বাধিক সময় জেলখানায় অতিবাহিত করেছি। মাঝখানে দু-এক মাস বিরতি ছাড়া আমি টানা ৩০ বছর জেলখানায় কাটিয়েছি।'

'আমি ১৯০৮ সন হইতে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত ৩০ বছর কারাগারে কাটাইয়াছি, ৪/৫ বছর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়াছি।.. জেলখানার পেনাল কোডে যেসব শাস্তির কথা লেখা আছে এবং যেসব শাস্তির কথা লেখা নাই তাহার প্রায় সব সাজাই ভোগ করিয়াছি।' কথাগুলো বিপ্লবী নেতা মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' পুস্তকটির ভূমিকায় লিখেছেন। ওই লাইনগুলোর মাধ্যমে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে তিনি দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য কতোটা বিপ্লবী মনোভাবের ছিলেন!

ভারত উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারতমাতা স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবী রয়েছেন, তাদের মধ্যে মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী অন্যতম বিপ্লবী। অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনুশীলন দলের সঙ্গে তিনি শৈশবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য তিনি সারাজীবন বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত ছিলেন। ক্ষমতালাভ বা কোনো প্রকার ব্যক্তি স্বার্থের ধ্যান-ধারণা তার মধ্যে ছিল না। আদর্শের রাজনীতি বাস্তবায়নের জন্য কীভাবে লড়াই করতে হয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি।

মানুষের জন্য, দেশের জন্য জীবনব্যাপী দুঃসহনীয় অত্যাচার সহ্য করে তিনি নিজেকে কখনো সফল বিপ্লবী বা মানুষ হিসেবে দাঁড় করানো চেষ্টা করেননি। বরং তিনি প্রায়ই

বলতেন, 'আমার স্বপ্ন সফল হয় নাই, আমি সফলকাম বিপ্লবী নই। আমার ব্যর্থতার কারণ, আমার দুর্বলতা নয়। আমি কখনও ভীরু ছিলাম না, আমার জীবনে কখনও দুর্বলতা দেখাই নাই। আমি আমার চরিত্র নির্মল ও পবিত্র রাখতে সক্ষম হইয়াছি। অর্থলোভ আমার ছিল না। এক সময় হাজার টাকা আমার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু সে টাকা নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য ব্যয় করি নাই।.. মৃত্যুভয় আমার ছিল না, যে কোনো বিপদজনক কাজে হাত দিতে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। আমার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, আমি কখনও অলস ছিলাম না, কঠিন পরিশ্রমের কাজে কখনও ভীত হই নাই, যখন যে কাজ করিয়াছি, আন্তরিকতার সাথে করিয়াছি। আমার ব্যর্থতার কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আমার ব্যর্থতার কারণ একজন দক্ষ ও সফলকাম বিপ্লবীর যতটা ধীশক্তি ও জন-গণ-মন অধিনায়কতার যে ব্যক্তিত্ব থাকা আবশ্যক তাহার অভাব'।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালের মে মাসে। ময়মনসিংহ জেলার কাপাসাটিয়ার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তার পিতার নাম দূর্গাচরণ চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী ধারার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। উদারমনা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনিই ছেলে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে স্বদেশি রাজনীতির সাথে যুক্ত করে দেন। তাদের পরিবারের অর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। ১৯০৫ সালে তার বাবা ত্রৈলোক্যনাথকে দেশি সাদা মোটা কাপড় কিনে পাঠান। যাতে করে ছেলে বিদেশি পোশাক বর্জন করে ওই কাপড় পরিধান করে, সে জন্য একটি আর্শিবাদ পত্রও পাঠান। তিনি চেয়েছিলেন তার ছেলে মনে-প্রাণে দেশপ্রেমিক হোক, স্বদেশি হোক। দেশমাতৃকার সেবা করার জন্য ত্রৈলোক্যনাথ পিতার পরম স্নেহের সেই আর্শিবাদ মাথায় পেতে নিলেন।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে ১৯০৩ সালে তাকে মালদাহ জেলার সানসাটের পুখুরিয়া মাইনর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। স্কুল জীবনে খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। শিক্ষকরা তাকে নিয়ে গর্ব করতেন। মাইনর স্কুল থেকে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর বৃত্তি দেওয়ার কথা ছিল। তিনি বৃত্তি পাবেন শিক্ষকরাও এ আশা করেছিলেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে তাকে ওই স্কুল ছেড়ে চলে আসতে হয়। ওই স্কুলে পড়াশুনাকালে তিনি 'অনুশীলন সমিতি'র সংস্পর্শে আসেন। এরপর তিনি ময়মনসিংহ জেলা হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুলে তিনি একবছর পড়েছিলেন। সেখানেও তিনি ভাল ছাত্র হিসেবে গণ্য হতেন। ১৯০৬ সালে তিনি অনুশীলন সমিতির সাথে সরাসরি যুক্ত হন। বিপ্লবী দলে যুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে দলের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যান।

তারপর তিনি সাটিরপাড়া হাইস্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি পড়াশুনায় মনোযোগ দেয়ার জন্য স্কুল বোর্ডিংয়ে উঠলেন। এই স্কুলের শিক্ষকরাও আশা করেছিলেন তিনি স্কলারশিপ পাবেন এবং সে জন্য শিক্ষকরা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে কম করে প্রতিদিন ৩ ঘণ্টা পড়াশুনা করার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মন পড়ে থাকতো দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে। সারাক্ষণ যুক্ত থাকতেন সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলের কাজে। পাঠ্যবই না পড়লেও তিনি রাজনৈতিক পড়াশুনায় ছিলেন অবিরত। বিপ্লববাদী দলের ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করে সহপাঠীদের নিয়ে নিয়মিত শরীর চর্চা ও দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য পাঠচক্র করতেন। নিজ জেলায় ক্ষুদে বিপ্লবী ঘাঁটি তৈরি করেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষার ২ মাস আগে ১৯০৮ সালে তিনি বিপ্লবী দলের কাজে নারায়ণগঞ্জে আসেন। এসময় ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য তাকে গ্রেফতার করে ৬ মাসের জেল দেয়। ওখানেই তার

প্রথাগত শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় এক নতুন জীবন। সে সময় তিনি ছয় মাস কারাভোগ করেন। মুক্তি পেয়ে ১৯০৯ সালে তিনি ঢাকায় আসেন।

ঢাকা আসার পর তাকে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। শুরু হয় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি অভিযান। মামলায় তিনি ছিলেন অন্যতম আসামী। পুলিশ হন্যে হয়ে তার সন্ধ্যান শুরু করে। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ঢাকার বিপ্লবীদের সাথে পরামর্শ করে আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপন অবস্থায় তিনি আগরতলার উদয়পুর পাহাড় অঞ্চলে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি বিপ্লববাদী দলের একটি শাখা স্থাপন করেন। দুই বছরের মধ্যে তিনি উদয়পুর পাহাড় অঞ্চলে বিপ্লবীদের একটি বিশাল ঘাঁটি তৈরি করেন। এই অঞ্চলের বিপ্লবী দলের তিনি সম্পাদক ছিলেন। তার কাজ ছিল শরীর চর্চা, ব্যায়াম, লাঠি খেলা, ছোঁরা খেলা, কুস্তি ইত্যাদির আড়ালে রাজনৈতিক শিক্ষা, বিপ্লবাত্মক প্রচার ও বিপ্লবী কর্মী তৈরি করা। উদ্দেশ্য ভারতমাতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত থেকে মুক্ত করা।

১৯১২ সালে ওখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তার বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। এই হত্যা মামলায় প্রমাণের অভাবে ব্রিটিশ তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এরপর তিনি স্থান পরিবর্তন করে মালদহ যান। সেখানে তিনি বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্য কাজ করেন। এখানে এই দলের একটি শক্তিশালী শাখা গঠন করার পর ১৯১৩-১৯১৪ সালে তিনি রাজশাহী ও কুমিল্লায় ঘুরে গুপ্ত বিপ্লবী দলের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই গুপ্ত সমিতি বা বিপ্লবী দল প্রতিষ্ঠা করতে তাকে দলের সিনিয়ররা সহযোগিতা করতেন। বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী ছিলেন তার স্কুল জীবনের সহপাঠী। তাদের স্কুলের প্রায় অর্ধেক ছাত্র অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। সহপাঠী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সংস্পর্শে এসে সতীশ পাকড়াশী এই সমিতির সভ্য হন।

রেবতী বর্মণের রাজনীতি শুরু স্কুল জীবন থেকেই। তখন থেকে বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজের জীবনাদর্শের প্রভাবে তিনি মার্ক্সীয় তত্ত্বে আকৃষ্ট হন। দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও মানুষের মুক্তির জন্য যুক্ত হন সশস্ত্র বিপ্লববাদী গ্রুপে। এ সময় তিনি ঢাকার শ্রী সংঘের সদস্য হন। এই শ্রী সংঘের সদস্য হিসেবে কোলকাতা, বাকুড়া, ও বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। ১৯১৪ সালে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে আবারও ব্রিটিশ পুলিশ কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর এসময় তাকে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার আসামি করা হয়। এই মামলার মাধ্যমে তাকে দশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাকে আন্দামানে প্রেরণ করা হয়। শুরু হয় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জালড়া।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে শৈশবে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সরকার অগ্নিযুগের ভগৎ সিং, সূর্যসেন, বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, তারেকশ্বর দস্তিদার, দীনেশ মজুমদার, বিনয় কৃষ্ণ বসু, বাদলগুপ্ত, সুশীল লাহিড়ী, বসন্ত বিশ্বাস, রাম প্রসাদ, গোপীনাথ সাহা, আসফাক উল্লা, ভবানী ভট্টাচার্য, কালাচাঁদ সাহা, অবোধ বিহারী, হনুমন্ত সহায়, হরেন্দ্র চক্রবর্তী, বালমুকুন্দ, রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ ভট্টচার্য, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়সহ আরো অনেকের মতো ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে হত্যা করার চেষ্টা করে। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন হত্যামামলার তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ার কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে আন্দামান দ্বীপান্তর সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেয়। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারত উপমহাদেশের মানুষকে শাসন করার জন্য শুরু থেকেই নানারকমের

দমননীতির আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে জেলখানাগুলো ছিল তাদের এই দমননীতির প্রধান হাতিয়ার। আর আন্দামান সেলুলার জেল ছিল সবচেয়ে ভয়ংকার জেল। এক কথায় বলা যায়, মৃত্যু ফাঁদ।

ব্রিটিশ তাকে কালাপানি, আন্দামান, দ্বীপান্তর পাঠিয়েছে– এই কথাগুলো এক সময় মানুষের মনে প্রচণ্ড ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতো। কারণ এখানে গেলে কেউ আর কোনো দিন তার প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারতো না। কালাপানি, আন্দামান, দ্বীপান্তর এই তিনটি শব্দ দিয়ে মূলত: 'আন্দামান সেলুলার জেলকে' বুঝানো হয়েছে। এটা ছিল ব্রিটিশদের তৈরি করা দ্বিতীয় মৃত্যুকূপ। খোপ খোপ করা বিশাল এক কারাগার। দুর্ধর্ষ, সশস্ত্র বিপ্লববাদী বন্দীদের পিষে মারার জন্য এখানে পাঠানো হতো।

১৯২৪ সালে তিনি আন্দামান সেলুলার জেল থেকে মুক্তি পান। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরামর্শে দক্ষিণ কলকাতার জাতীয় স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই স্কুলের শিক্ষার্থীদেরকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতেন। একই সাথে বিপ্লবী দলের নেতা ও সংগঠক হিসেবে ভারতে বিভিন্ন এলাকায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। মাত্র তিন বছর যেতে না যেতে ১৯২৭ সালে তাকে আবারও ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে। এ সময় তাকে ব্রহ্মদেশের মন্দালয় জেলে পাঠানো করা হয়। তিনি বহু বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে কারাবাস করেন। তাঁদের মধ্যে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, পৃথি সিং, পুলিন বাবু, এম. পি নারাছু মেনন, গুরুমুখ শিং, পণ্ডিত পরমানন্দ, মোস্তফা আহমেদ উল্লেযোগ্য। ১৯২৮ সালে তাকে ভারতে এনে নোয়াখালি জেলার হাতিয়া দ্বীপে নজরবন্দী করে রাখা হয়। ওই বছরই মুক্তি পেয়ে তিনি উত্তর ভারতে যান এবং হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মিতে যোগ দেন। এরপর বিপ্লবী দল তাঁকে ব্রহ্মদেশে পাঠায় সেখানে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। তিনি বিপ্লবী ভাবধারায় বিশ্বাসী হলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে কাজ করতেন।

১৯২৯ সালে তিনি লাহোর কংগ্রেসে যোগদান করেন। এসময় হয়তো তিনি ভারতের সর্বত্র অবাধে ঘুরে বেড়িয়ে বিপ্লববাদী সশস্ত্র দলকে সংগঠিত করার জন্য কংগ্রেসের রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত হয়ে কাজ শুরু করেন। রাজশাহীতে অবস্থানকালে ১৯৩০ সালে তাকে আবারও ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে। এসময় তাকে একটানা ৮ বছর কারাবাস করতে হয়। এবার তাকে বিভিন্ন জেল ঘুরিয়ে কুখ্যাত বক্সার বন্দীশালায় রাখা হয়।

ভূটান সীমান্তে সিঞ্চুলা পাহাড়ের কোলঘেঁষে স্থাপিত হয়েছিল এ দুর্গটি। এ জেলে এক সময় রাজবন্দীদের বছরের পর বছর কয়েদ করে রাখা হয়েছিল। তাদের সে অত্যাচারের কাহিনী ঐতিহাসিক অনুষঙ্গে বিবৃত করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অসংখ্য সাহিত্যিকরা। এ জেলদুর্গে বন্দী থেকেছেন দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্রে নিবেদিত অসংখ্য বিপ্লবী। বক্সা জেলদুর্গটি ছিল গভীর অরণ্যবেষ্টিত। পাহাড়ের গায়ে লতাগুল্ম, শেওলার আস্তরণ। এ ভয়ঙ্কর পথ দিয়েই রাজবন্দীদের ব্রিটিশ সৈন্যরা জেলদুর্গে নিয়ে যেত। জনবিরল দুর্গম পাহাড়ি বক্সা দুর্গের সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল অনেক উঁচু করে। দুর্গের ভেতরে ছিল কয়েক দফায় কাঁটাতারের বেড়া। এর মধ্যেই বন্দীশালার অফিস, বন্দীদের জন্য নির্ধারিত ছোঁট-বড় লম্বা ব্যারাক। প্রতিটিতেই আছে কাঁটাতারের বেড়া, একেবারে নিম্ন থাকের খাড়ার শেষে অতল খাদ– সব ছাউনি আবর্জনার কুণ্ড। সব ঘিরে জঙ্গলের মধ্যে ছিল কাঁটাতারের আরও বেড়া। রাজবন্দীদের ওপর হঠাৎ করেই নেমে আসত নিপীড়নের চাবুক।

ব্রিটিশ শাসনের অবসানকল্পে তাদের বিরুদ্ধে ঠিকই ভারতবর্ষের মানুষ জেগে ওঠে। গঠন করে নানা বিপ্লবী সংগঠন। ব্রিটিশের পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনী যাদের এখানে বন্দী রেখেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ (অনুশীলন সমিতি), সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ (যুগান্তর), হেমচন্দ্র ঘোষ (বিভি), অমলেন্দু দাশগুপ্তসহ (থার্ড পার্টি) আরও অনেকে। ১৩৩৮ সালে বক্সা জেলদুর্গের রাজবন্দীরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের ৭০ বছর পূর্তি উৎসব পালন করেন বন্দীশালার মধ্যে।

১৯৩৮ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। ওই বছর তিনি সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে রামগড় কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা করেন।

১৯৪২ সালে তিনি 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেফতার হন। ১৯৪৬ সালে মুক্তি পেয়ে নোয়াখালীতে সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর তিনি ঢাকার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে সামরিক শাসন জারী ও শারিরীরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। সামরিক শাসন জারীর পর সামরিক জান্তা তার নির্বাচন বাতিল, রাজনৈতিক এমনকি সামাজিক কার্যকলাপেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এরপর তিনি নিজ গ্রামে জীবনযাপন করেন। ১৯৭০ সালে চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার পর ওই বছর ৯ আগস্ট বিপ্লবী চিরকুমার মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের সাধীনতা সংগ্রাম– মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, অনুশীলন ভবন ট্রাস্ট-বোর্ড, কলকাতা, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে-শ্রী দীনেশচন্দ্র ঘটক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১।

২. বাংলার মুক্তি সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টপাধ্যায় ও রাখী চট্টপাধ্যায়, প্রকাশকাল ২০০৫, কলকাতা।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রকাশকাল ১৯৯০, কলকাতা।

হাতেম আলী খান



কিংবদন্তি কৃষক নেতা হাতেম আলী খানের জন্ম ১৯০৪ সালের ২৪ নভেম্বর, টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার বেলুয়া গ্রামে। এ দেশের মেহনতি মানুষের প্রিয় নেতা মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও কিংবদন্তি কৃষক নেতা হাতেম আলী খান টাঙ্গাইল জেলার কৃতি সন্তান।

গোপালপুর উপজেলা টাঙ্গাইল জেলা সদর থেকে ৫৫ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত। এর উত্তরে ও পূর্বে ধনবাড়ী, মধুপুর এবং ঘাটাইল উপজেলা, দক্ষিণে ঘাটাইল এবং ভূঞাপুর উপজেলা, পশ্চিমে সরিষাবাড়ী ও জামালপুর উপজেলা। ঢাকা হতে প্রায় একশত কি. মি. দূরে অবস্থিত এ জেলার পূর্বে রয়েছে ময়মনসিংহ ও গাজীপুর, পশ্চিমে সিরাজগঞ্জ, উত্তরে জামালপুর, দক্ষিণে ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা।

কৃষক নেতা হাতেম আলী খানের পূর্বপুরুষের বসবাস ছিল সিরাজগঞ্জের তেবাড়িয়ায়। ১৮৫৩ সালে তার পিতামহ (দাদা) ঝোমর আলী খান সিরাজগঞ্জের তেবাড়িয়া ছেড়ে বেলুয়া টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলার বেলুয়া গ্রামে এসে বসবাস শুরু করনে। ৫/৬ বছর পর ওই গ্রামে ঝোমর আলী খান প্রায় একশ একর জমি ক্রয় করনে। ৯/১০ বছরের মধ্যে তিনি ওই গ্রামে নিজেকে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

হাতেম আলী খানের বাবা নায়েব আলী খান। তিনিও তার পিতা ঝোমর আলী খানের মতো বুদ্ধিমান ও বিত্তবান ছিলেন। তিনি তার পিতার পথ অনুসরণ করে জমিদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু সম্পত্তির মালিক হন। হাতেম আলী খানের সময় তাদের জমির পরিমান দাঁড়ায় চারশ' একর। জমিদারের সন্তান হাতেম আলী খান জন্মের পর থেকে ঐশ্বর্য আর প্রার্চুযের মধ্যে বড় হয়েছেন। তখনকার দিনে এসমস্ত পরিবারের সন্তানরাই নানাদিক থেকে অগ্রসর ছিল।

হাতেম আলী খান ছোটবেলা থেকে বাড়ির র্কমচারীদেরকে ভালোবাসতেন। তার মধ্যে কখনো জমিদারী অহংকার বাসা বাঁধেনি। এর মূল কারণ হাতেম আলী খানের পিতামহ ও পিতা নায়েব আলী খানের উদারতা। পরিবার থেকে হাতেম আলী খানকে কিছুটা মুক্ত শিক্ষা, সংস্কৃতিতে মানুষ করা হয়। মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তচিন্তার কারণে হাতেম আলী খান জমিদারের সন্তান হয়েও একর্পযায়ে শ্রমজীবী, কৃষকদের কাতারে চলে আসেন। জমিদার পিতার প্রজা শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী, কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেন। তাদেরকে

জমিদার পিতার দেয়া দাদন টাকা পরিশোধ করতে নিষেধ করেন। যে কারণে ১৯২৪ সালে তার পিতা নায়েব আলী খানের ৯০ হাজার টাকা (আসল টাকা) ও এই টাকার দাদন (সুদ) লক্ষাধিক টাকা ভেস্তে যায়।

তারপরও কথা থাকে, জমিদারী টিকিয়ে রাখতে হলে জমিদারকে প্রজার শ্রম শোষণ, উৎপাদিত ফসল দখল করতে হয়। তা না হলে জমিদারী টিকে থাকে না। যে কারণে তার পিতা নায়েব আলী খান জমিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য জীবনের শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন এবং ছেলেকে শ্রমজীবী, কৃষকদের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য নানাভাবে বুঝিয়েছেন।

জমিদারী টিকিয়ে রাখার জন্য ছেলেকে পড়াশুনার অযুহাতে কলতায় পাঠিয়ে দেন। যখন দেখলেন তাতেও কাজ হয় না, ছেলে মাঝে মাঝে বাড়ি এসে পিতার জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী-কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেন, তখন সংসারের অজুহাতে দেখিয়ে হাতেম আলী খানকে বিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না। কি করে হবে? ছেলে হাতেম আলী খান যে পিতার মত না হয়ে মানুষের মত মানুষ হয়েছিলেন। মানবতা ও মনুষ্যত্বের জন্য নিজেকে উৎর্সগ করার মন্ত্র অস্থিমজ্জায় ধারণ করেছিলেন।

হাতেম আলী খানের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। পিতার কাছে র্বণমালা শেখার পর পারিবারিক মক্তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রাথমিক পড়াশুনা শুরু হয়। ১৯১৪ সালে মক্তবের পড়াশুনা শেষ হয়। মক্তবের পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর তার বাবা নায়েব আলী খান তাকে হেমনগর হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পরে ওই বছর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ইউরোপের অনেকগুলো দেশ এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আমাদের ভারত উপমহাদেশে এই যুদ্ধের প্রভাব পড়ে। ভারত মিত্রশক্তিকে সহযোগিতার জন্য এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাই স্বাভাবিক কারণে ভারত সরকার সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য যুব সমাজকে আহ্বান করে।

১৯১৬ সালে সেনাবাহিনীতে যোগদানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাতেম আলী খান সেনাবাহিনীতে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। অবশেষ হেমনগর হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে বিরত রাখনে। এরপর শিক্ষকদের কথামত পড়াশুনায় মনোযোগ দেন। এই সময় হাতেম আলী খানের বড় ভাইয়ের এক বন্ধু মাখম চন্দ দেব তাকে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য হতে উৎসাহ দিলেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির সদস্য হলেন। পড়াশুনার পাশাপাশি প্রকৃত বিপ্লবী হয়ে উঠার জন্য বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করলেন। তিনি ১৯২০ সালে হেমনগর হাই স্কুল থেকে হাতেম আলী খান ম্যাট্রিক পাশের স্বীকৃতি অর্জন করেন।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি কলকাতার রিপন কলেজে আই এ ভর্তি হন। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে বিশ্ব রাজনীতিতে এক নব যুগের সূচনা ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের পতন ঘটতে শুরু করে। ওই সময় ব্রিটিশ শাসন-শোষণের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পৃথিবীর প্রায় ৪০/৫০টি রাষ্ট্র সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ধরে। ভারত উপমহাদেশও ১৯০২ সাল থেকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ধরে এগুতে থাকে। কিন্তু এ সশস্ত্র সংগ্রাম নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য র্নিধারণ করতে সক্ষম হয়নি। শুধু ব্রিটিশকে তাড়ানোই ছিল এ সংগ্রামের মূল লক্ষ্য।

এমন একটি রাজনৈতিক উত্তাল সময়ে হাতেম আলী খান কলকাতার রিপন কলেজে অধ্যয়নরত ছিলেন। ব্রিটিশবিরোধী উত্তাল সংগ্রাম তাকে শান্ত বালকের মতো বসে থাকতে

দেয়নি। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর বিপ্লবী আত্মত্যাগ সেই শৈশব থেকে তাকে আলোড়িত করে আসছিল। সকল বাস্তবতার আলোকে তিনি প্রতিনিয়ত এক নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। সবকিছু মিলিয়ে তিনি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় একটা সময় পড়াশুনা আর রাজনীতি হয়ে উঠে তার জীবন সঙ্গী।

১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতে হাতেম আলী খান রিপন কলেজে পড়াশুনাকালীন সময়ে প্রতিদিন কলেজ স্কোয়ার, বিডন স্কোয়ার, হারিস পার্ক, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সকল রাজনৈতিক সমাবেশে অংশ গ্রহণ করতেন। অসহযোগ আন্দোলনে তার সাথে পরিচয় ঘটে বাংলার বিভিন্ন বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সাথে। এসময় আব্দুল হালিম, আব্দুল্লাহ রসুল, সূর্য সেন, সত্যেন সেন, মুজাফফর আহম্মদ, কাজী নজরুল ইসলাম ও জিতেন ঘোষের মতো সংগ্রামী নেতৃত্বের সাথে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর তিনি এলাকায় এসে বিলেতি পণ্য বর্জন ও জমিদারী দাদন টাকা পরিশোধ না করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯১৪-৩০ পর্যন্ত বাংলায় সংগঠিত হয় প্রজা ও কৃষক আন্দোলন। ১৯২০ সাল থেকে হাতেম আলী খান এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রজা ও কৃষকদের সচেতন করে সংগঠিতকরণে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯২১ সালে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার পর তিনি বেলুয়ায় চলে আসেন। তিনি বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করে জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলেন। হাতেম আলী খানের নেতৃত্বে ওই এলাকার কৃষকরা জমিদারের খাজনা, মহাজনদের দাদন ও বর্গা জমির ফসল প্রদান করা বন্ধ করে দেন।

রিপন কলেজে পড়াশুনা করার সময় সিদ্ধান্ত নেন যে, সময় পেলেই নিজের এলাকায় গিয়ে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের উপর জমিদারের শোষণ-নির্যাতন বন্ধ করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ ছুটির সময় (১৯২২ সালে) কলকাতা থেকে নিজ এলাকায় চলে আসেন। বাড়িতে আসার পর বেশ কিছুদিন ধরে জমিদার বাবার বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করেন। জমিদার পিতা নায়েব আলী খান ছেলের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়াশুনার খরচের টাকা দেয়া বন্ধ করে দেন। কারণ যাতে করে হাতেম আলী খান পিতার বিরুদ্ধ আচরণ থেকে বিরত থাকেন। জমিদার পিতার ধারণা ও চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

তখন হাতেম আলী সিদ্ধান্ত নিলেন জমিদার পরিবার ছেড়ে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সাথে বসবাস করার। শুরু হয় জীবন যুদ্ধ। যে যুদ্ধের মধ্যে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকতে হয়। এ সময় হাতেম আলী খান নিজের চলা ও পড়াশুনার টাকা সংগ্রহের জন্য কাপড় বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। কাপড় বিক্রির কাজ আর পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে কৃষকদের সচেতন ও সংগঠিত করতে থাকেন। মাঝে মাঝে জমিদার পিতার পাইক-পেয়াদার সাথে জমির খাজনা, দাদন নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধে। পাইক-পেয়াদারা কৃষক ও শ্রমজীবীকে আঘাত করতে গেলে দেখে তাদের সাথে জমিদারের সন্তান। তাই কৃষকদের কাছ থেকে জমির খাজনা, দাদন নিতে ব্যর্থ হয় জমিদার। এভাবে চলতে থাকে বছরখানেক (১৯২৩)। তারপর তিনি কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের অনুরোধে কলকাতায় গিয়ে পুনরায় পড়াশুনায় মন দেন।

১৯২৪ সালে তিনি ইন্টারমেডিয়েট পাশের স্বীকৃতি অর্জন করেন। ওই বছরই তিনি বি. এ ভর্তি হন। ভর্তি হওয়ার অল্প কিছুদিন পরে আবার গ্রামে ফিরে আসেন। চলে যান কৃষকদের কাতারে। এসময়ও তিনি জমিদার পিতার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী, কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করেন। তাদেরকে জমিদার পিতার দেয়া দাদন টাকা পরিশোধ করতে নিষেধ করেন। কিছুদিন পর আবার তিনি কলকাতায় ফিরে গিয়ে পড়াশুনায় মন দেন।

হোস্টেলে উঠার পর তার সঙ্গে শান্তিপুরের নূর মোহাম্মদ, দিল্লির অতুল চন্দ্র ও মধ্যপ্রদেশের এ কে এম মাহমুদের সাথে ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক গড়ে ওঠে। মূলত: এদের সংর্স্পশে এসময় তিনি সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে বিপ্লবীরা সশস্ত্রভাবে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগঠিত হতে থাকেন। এসময় তিনি শান্তিপুরের নূর মোহাম্মদ ও দিল্লির অতুল চন্দ্র শীলের সাথে মিলে 'ন্যাশনাল লীগ' নামে একটি গুপ্ত সংগঠন (সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠন) গড়ে তোলেন। এই সংগঠনটি বছরখানেকের মধ্যে বেশ শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সংগঠনের কর্মীদের সশস্ত্র বিপ্লবী ভাবধারায় তৈরি করার জন্য হাতেম আলী খান ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠাগার ও ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠাগার ও ব্যায়ামাগারে বসে শরীর চর্চা, বিপ্লবী বই পড়ানো, অস্ত্র চালানো এবং বোমা বানানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হতো।

কিন্তু ব্রিটিশ বিতাড়িত হলেই কি শাসন-শোষণের যাঁতাকল বন্ধ হবে? বা ব্রিটিশকে উচ্ছেদ করে যাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হবে তারা কি শোষণ-র্নিযাতন করবে না? এসমস্ত রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কৌশল নির্ধারণ করতে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সকল রাষ্ট্রকে সে সময় সহযোগিতা করেছিল। প্রতিটি দেশে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও সেই শক্তিকে প্রগতিশীল ধারায় প্রতিস্থাপন করার মতো দূরহ কাজটিও সেই দিনগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছিল। যার কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বহু রাষ্ট্র মুক্ত হয় এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। যার ধারাবাহিকতায় ১৯২২-২৮ সালে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের চেতনায় ভারতে গড়ে উঠে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি– কমিউনিস্ট পার্টি। কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় গড়ে উঠে বিভিন্ন মার্কসবাদী গ্রুপ। কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের নেতৃত্বে ১৯২৬-২৮ সালে প্রথমে বাংলায় পরে বোম্বাই, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে শ্রমিক-কৃষক পার্টি গঠিত হয়। বাংলায় মুজাফ্ফর আহমেদ, ড. নরেশ সেন গুপ্ত, অতুল গুপ্ত, আব্দুল হালিম, হেমন্ত সরকারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শ্রমিক-কৃষক পার্টি গঠন করেন। শ্রমিক-কৃষক পার্টি গঠিত হওয়ার পর এতে অনুশীলন ও যুগান্তরের অসংখ্য বিপ্লবী যোগ দেন। এসময় অন্যান্য সশস্ত্র বিপ্লবীরা মার্কসবাদের রাজনৈতিক দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হন। এসময় মুজাফ্ফর আহমেদ হাতেম আলী খানকে এস এ ডাঙ্গেসহ কয়েকজন নেতৃত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এসকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসে হাতেম আলী খানের রাজনৈতিক চিন্তা প্রসার ও পরিবর্তন ঘটে। ফলে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেকে মার্কসবাদের রাজনৈতিক দর্শনে আকৃষ্ট হন এবং শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হন।

ইতোমধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবী হওয়ার খবর হাতেম আলী খানের জমিদার বাবার কাছে পৌছলে তিনি ছেলের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আবার পড়াশুনার খরচ বাবধ ১৭০ টাকা দেয়া বন্ধ করে দেন এবং তিনি সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠনের কাজ থেকে ফিরে আসার জন্য একের পর এক চাপ দিতে থাকেন। এসময় হাতেম আলী খান পিতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছুদিন

পড়াশুনায় মনযোগ দেন। তার পিতা সেই সুযোগে হাতেম আলী খানকে বিলেতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি ১৯২৬ সালে রিপন কলেজ থেকে বি. এ পাশের স্বীকৃত অর্জন করনে। বি. এ পাশ করার পর জমিদার পিতা তাকে সংসারী করার জন্য উদ্যোগ নিলেন। বি. এ পাশের আগে থেকে শুরু করে দীর্ঘ ৩ বছর চেষ্টার পর ছেলেকে বিয়েতে রাজি করাতে সক্ষম হন। ১৯২৭ সালে হাতেম আলী খান কসিমুন্নেসা খানমকে বিয়ে করেন। কসিমুন্নেসা ছিলেন আব্দুল করিম খানের মেয়ে। আব্দুল করিম খান কালিহাতী উপজেলার চিনামুড়া গ্রামে বসবাস করতেন। বিয়ের কিছুদিন পর তার পিতা নায়েব আলী খান মারা যান।

কয়েক মাস পর তিনি কলকাতায় গিয়ে এম. এ পড়াশুনায় মনোযোগ দেন। ১৯২৮ সালে তিনি রিপন কলেজ থেকে এম. এ পাশের স্বীকৃতি অর্জন করেন। পড়াশুনা শেষ করার পর তিনি কলকাতা থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেন। টাকার জন্য তিনি বাড়িতে এসে স্ত্রীকে না জানিয়ে ৭০ ভরি স্বর্ণ বিক্রি করেন এবং কলকাতায় গিয়ে 'সর্বহারা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। আই. এ পড়াশুনাকালীন সময় থেকেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদের সাথে হাতেম আলী খানের যোগাযোগ ছিল। তারাই পত্রিকার নাম ঠিক করে দিয়েছিলেন 'সর্বহারা'। তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার পরিস্ফুটনে এ দু'জনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই পত্রিকাটি ৬ মাস বের হওয়ার পর নানা কারণে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পর আবার হাতেম আলী খান পত্রিকা বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে এবার পত্রিকার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের কথা মানুষের মধ্যে প্রচার করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। 'চাষীমজুর' ও 'দিনমজুর' নামে দুটি পত্রিকা বের করলেন। কিছুদিন বের করার পর টাকার অভাবে এবারও পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর হাতেম আলী খান গ্রামের নিরক্ষর মানুষকে লেখাপড়া শিখানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি চিন্তা করলেন নিরক্ষর মানুষকে শিক্ষিত না করলে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মর্মবস্তু বুঝবনে না। সাধারণ মানুষকে যদি শিক্ষার মাধ্যমে সচেতন করে তোলা যায়, তাহলে তারা অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই-সংগ্রাম গড়ে তুলবে। এই ভাবনা থেকে ১৯৩৯ সালে ময়মনসিংহের ভালুকা থানার বাটাজোর গ্রামে স্থানীয়দের নিয়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ওই এলাকায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক না পাওয়ার কারণে তিনিই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন। পাশাপাশি শুরু করেন করেন কৃষক সংগঠন। ওই এলাকায় তিনি কৃষকদের সংগঠিত করে একটি কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৩৮ সালে রংপুর কৃষক সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি কৃষকদের সংগঠিতকরণে ভূমিকা রাখেন। ওই বছর নেত্রকোনায় সারা ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতেও তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে ৩ বছরের মধ্যে স্কুলটিকে মডেল হাইস্কুলে রূপান্তরিত করেন। এটি ১৯৪২ সালে বোর্ডের মঞ্জুরী পায়। স্কুলটি বোর্ডের মঞ্জুরী পেলে তিনি বেলুয়ার ভূয়াপুর স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বেলুয়াতেও তিনি 'জনতা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সাথে সাথে অব্যহত রাখেন কৃষক সংগঠনের কাজ। হাতেম আলী খান একে একে বলরামপুর, নলিন ও ধূবলিতে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলগুলোতে উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক না পাওয়ায় তিনি নিজেই একই সাথে ৩টি স্কুলের প্রধান

শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দরিদ্র ছাত্রদের পড়াশুনার খরচ তিনি বহন করতেন। পিছিয়ে পড়া ছাত্রদেরকে নিয়ে আলাদাভাবে কোচিং ক্লাশ করাতেন। অভিভাবকদেরকে ছেলে-মেয়ে যাতে স্কুলে পাঠান সে জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। অন্যদিকে তিনি কৃষক সমিতির সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলা অব্যাহত রাখেন। ১৯৪৩ সালে সুসং দূর্গাপুরে কৃষক সম্মেলন এবং ময়মনসিংহের নালিতাবাড়িতে প্রাদেশিক কৃষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সম্মেলনে কৃষকদের সংগঠিতকরণে তার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল।

১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলার মানুষের জীবনে নেমে আসে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয়। তখন দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ এবং অনাহারে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে বাঁচানোই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের প্রধান কাজ। এই দুর্ভিক্ষ ও বিপর্যয় মোকাবেলায় তিনি জীবনবাজী রেখে কাজ করেন।

তেভাগা আন্দোলন, টঙ্ক আন্দোলন, নানকার আন্দোলন, নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ এ সমস্ত আন্দোলন-সংগ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করতে হাতেম আলী খান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত তিনি ভূমিকা পালন করেন। তিনি ওই সময় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে টাঙ্গাইলে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে টাঙ্গাইলের গোপালপুর থেকে হাতেম আলী খান মুসলিম লীগের প্রার্থী প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁকে বিপুল ভোটে হারিয়ে দিয়ে জয় লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার সদস্য হন। ১৯৫৪ সালের ৩০ মে মুসলিম লীগ সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়। ১৯৫৪ সালের ৪ জুলাই ৯২(ক) জারী করে মুসলিম লীগ সরকার এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। এর মধ্যে কৃষক নেতা হাতেম আলী খানও ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভা গঠনের পর ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববাংলার জাতীয় নেতৃবৃন্দ ছাড়া পান।

সোহরাওয়ার্দীর বিদেশ নীতি নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। যার কারণে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কাগমারী সম্মেলনের ঘোষণা দেন। ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, ৮৯৬ জন প্রতিনিধি নিয়ে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কৃষক নেতা হাতেম আলী খান একজন সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে কৃষকদের নিয়ে ঢাকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ভাসানীর নেতৃত্বে প্রাদেশিক কৃষক সমিতি গঠন করা হয়েছিল। এ সময় হাতেম আলী খান কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ওই বছর ডিসেম্বর মাসে ভাসানীর নেতৃত্বে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি করে এবং হাতেম আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক করে কৃষক সমিতি পুনর্গঠন করা হয়।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সরকারের রোষাণলে পড়ে হাতেম আলী খান আত্মগোপনে যান। ১৯৬৩ সালের প্রথম দিকে তিনি প্রকাশ্যে আসেন। ওই বছর কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ জেল থেকে মুক্তি পান। জিতেন ঘোষ ও হাতেম আলী খান একত্রে মিলে ওসমান গনি রোডে কৃষক সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদ থেকে ইসলাম ধর্মের স্মৃতিচিহ্ন চুরি যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা ও খুলনাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। যার ফলে ওসমান গনি রোডে কৃষক সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পর একটি লিখা সাইক্লোস্টাইল প্রেস থেকে নিয়ে হাতেম আলী খান টাঙ্গাইল যাচ্ছিলেন। তখন গোয়েন্দা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ সদরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে। এসময় তাকে ৭ দিন নির্যাতন করা হয়। যার ফলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতা তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করতে হয়েছে।

ন্যাপ নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ১৯৬৬ সালে সোভিয়েতপন্থী ও চীনাপন্থী হিসেবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এমন পরিস্থিতিতে কুলাউড়ায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ২টি প্যানেল হয়। চীনাপন্থীরা ভাসানীকে সভাপতি ও আব্দুল হককে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে। সোভিয়েতপন্থীরা আমজাদ হোসেনকে সভাপতি ও হাতেম আলী খানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে। কৃষক সমিতি দ্বিধাবিভক্ত হয়। এতে কৃষক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হল। ব্যথীত হলেন হাতেম আলী খান। তবু হাল ছাড়লেন না। আবার শুরু করলেন কৃষকদের সংগঠিত করার কাজ। ১৯৬৭ সালে ঢাকায় কৃষক সমাবেশের আয়োজন করলেন। এই সমাবেশ থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দেয়। এসময় তাকে আড়াই বছর কারাগারে থাকতে হয়। ১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থানের সময় মুক্তি পান। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) প্রার্থী হিসেবে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি টাঙ্গাইলে ছিলেন। শারিরিক অসুস্থতা কারণে তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে পারেননি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তরুণদের উৎসাহ প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ, খাবার সংগ্রহের কাজ তিনি জীবনবাজী রেখেই করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি আবার পুরোদমে কৃষক সমিতির কাজ শুরু করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে নরসিংদীর বেলাবোতে এক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় লক্ষ কৃষকের সমাবেশ ঘটেছিল। এই সম্মলনে কমরেড মণি সিংহ সভাপতি ও হাতেম আলী খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি আমন্ত্রণে সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। ১৯৭৪ সালে দ্বিতীয় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হাবিবুর রহমান সভাপতি ও আমজাদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এ সময় হাতেম আলী খান সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। কারণ তার শরীরের অবস্থা তেমন একটা ভাল ছিল না। ১৯৭৪ সালে তৃতীয় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে হাতেম আলী খান সভাপতি ও ফজলুল হক খন্দকার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন লড়াই-সংগ্রাম শেষে ১৯৭৭ সালের ২৪ অক্টোবর তিনি মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

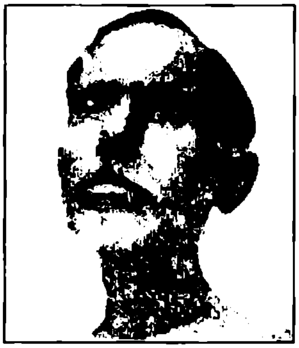
তথ্যসূত্র:

১. অগ্নিযুগের পাঁচ বিপ্লবী– উৎপল সাহা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রকাশকাল ২০১০।

২. www.biplobiderkotha.com

৩. জিতেন ঘোষ রচনা সমগ্র– সম্পাদনায়: আব্দুল হালিম ও দিলওয়ার হোসেন, প্রকাশক: রাজন ইসলাম, প্রকাশকাল ২০১০, ঢাকা।

উল্লাসকর দত্ত



বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ছিলেন অগ্নিযুগের উষালগ্নের সশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম বিপ্লবী। দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য জীবনবাজী রেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। যৌবনের শুরুতে সশস্ত্র বিপ্লববাদী দল যুগান্তরের সাথে যুক্ত হন। ব্রিটিশদের মোকাবিলা করার জন্য উল্লাসকর দত্তই বাংলায় প্রথম বোমা তৈরি করেন। যে বোমা ক্ষুদিরাম কিংসফোর্টের গাড়ি লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছিলেন।

১৯০৮ সাল। পহেলা মে, ওয়ার্নি স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হল ক্ষুদিরাম বসুকে। ব্রিটিশ প্রশাসনের হাই-কমান্ড কলকাতার পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর সাথে জড়িত সকলকে গ্রেফতার করার জন্য। ২মে কলকাতার ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিশ আটটি স্থানে খানা-তল্লাশি চালায়। কলকাতার মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত ও নলিনীকান্ত গুপ্তসহ ১৪ জনকে।

৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রিট থেকে শ্রী অরবিন্দসহ তিনজনকে, ১৩৪ নম্বর হ্যারিসন রোড থেকে ৫ জনকে, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট থেকে হেমচন্দ্র দাস কানুনগোকে, গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে কানাইলাল দত্তসহ দুইজনকে। ১৩৪ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়ি থেকে পুলিশ প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈরির মাল-মশলা ও সাজসরঞ্জামও উদ্ধার করতে সক্ষম হল। এ ছাড়াও পুলিশ ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ি থেকে মাটির তলায় পোঁতা কতিপয় ট্রাঙ্ক উদ্ধার করে। এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বোমা ষড়যন্ত্র ও রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা। এই মামলাটিরই নামকরণ হয়েছিল 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা'।

আলিপুর জজ আদালতে জেলা ও দায়রা জজ মি. চার্লস পোর্টেন বিচক্রফট্-এর আদালতে মুরারীপুকুর বোমা মামলার সূচনা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ১৯ অক্টোবর। মামলায় অরবিন্দ ঘোষের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। এই মামলা চিত্তরঞ্জন দাশ বিনা টাকায় লড়েন। আসামীদের বিরুদ্ধে এই মামলা চলে ১২৬ দিন। দু'শর বেশি সাক্ষীকে জেরা করা হয়। ৪০০০ কাগজপত্র এবং ৫০০ জিনিসপত্র প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ তার সওয়াল জওয়াবের পরিসমাপ্তি বক্তব্য দেন ৯ দিন ধরে। আলিপুর মামলার শুনানী শেষ হয় ১৯০৯ সালের ১৩ এপ্রিল এবং মামলার রায় ঘোষণা হয় ৬ মে। মামলার রায়ে ৩৬ জন আসামীর মধ্যে বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। অন্য ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে দ্বীপান্তর ও কারাদণ্ড প্রদান করে।

আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ১৩ মে এবং অন্য ১৭ জন ১৭ মে হাইকোর্টে আপীল করেন। আপিল মামলার বিচারক ছিলেন কার্নডফ ও জেনিকসন। ১৯০৯ সালের ২৩ আগস্ট হাইকোর্ট রায় ঘোষণা করে। উক্ত রায়ে বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ এবং বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের ফাঁসির আদেশ রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেয়া হয়। এ দুজন ছাড়া উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বহাল রাখা হয়। বিভূতিভূষণসহ অন্যান্য কয়েকজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর রদ করে ১০ বছর দ্বীপান্তর দেয়া হয় আর সুধীর চন্দ্র সরকার, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও পরেশ চন্দ্র মৌলিকের রায় রদ করে ৭ বছরের দ্বীপান্তর দেয়া হয়। শিশির কুমার ঘোষ ও নিরাপদ রায়ের রায় রদ করে ৫ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। একজন আসামীকে মুক্তি দেন এবং অন্য ৫ জন আসামীর রায় নিয়ে বিচারকদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। যার জন্যে তৃতীয় জজ রিচার্ড হ্যারিংটন উক্ত ৫ জনের পুনঃবিচার করেন। তিনি রায়ে ৩ জনের মুক্তি এবং ১ জনের ৭ বছর দ্বীপান্তর ও ১ জনের ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের শুরু হয় আন্দামান সেলুলার জেল জীবন। সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, যারা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ-শাসনকে উচ্ছেদ করতে চাইবে, তাদের মধ্য যারা ফাঁসিরকাষ্ঠ থেকে রেহাই পাবে তাদের সকলকে আন্দামানে পাঠিয়ে মারা হবে। এটা ছিল ব্রিটিশদের তৈরি করা সবচেয়ে ভয়ংকর জেল, যাকে বলা হত দ্বিতীয় মৃত্যুকূপ। আন্দামান সেলুলার জেল ছিল খোপ খোপ করা বিশাল এক কারাগার। দুর্ধর্ষ, সশস্ত্র বিপ্লববাদী বন্দীদের পিষে মারার জন্য এখানে পাঠানো হতো। এখানে গেলে কেউ আর কোনো দিন তার প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারতো না। কালাপানি, আন্দামান, দ্বীপান্তর এই তিনটি শব্দ দিয়ে মূলতঃ 'আন্দামান সেলুলার জেলকে' বুঝানো হয়েছে।

বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত জন্মেছিলেন ১৮৮৫ সালের ১৬ এপ্রিল। ত্রিপুরার (বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা) কালীকচ্ছ গ্রামে। তার পিতার নাম দ্বিজদাস। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী। দেশপ্রেম ও মানবদরদী পিতার যোগ্য উত্তসূরী হতে পেরেছিলেন উল্লাসকর দত্ত। পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর তিনি কলকাতার একটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। এরপর উল্লাসকর দত্ত ১৯০৩ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পাঠ্য বইয়ের বাইরেও তিনি প্রচুর বই পড়তেন। সঙ্গীতে এবং ক্যারিকেচারে তার ছিল দক্ষতা। এই কলেজে পড়াশুনাকালে ইংরেজ অধ্যাপক ড. রাসেলের এক অপমানকর উক্তির তিনি প্রতিবাদ করেন। এজন্য উল্লাসকরকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তখনই লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে। ১৯০৪ সালে শুরু হয় এক নতুন জীবন। এই সময়ে তিনি বিপ্লবীবাদী কর্মকাণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। যে কারণে তিনি অল্পদিনের মধ্যে বারীন্দ্র ঘোষের বিপ্লবী দলে যুক্ত হন। ধীরে ধীরে উল্লাসকর দত্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে ওঠেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে উল্লাসকর দত্ত এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বিলাতী পোষাক ছেড়ে ধুতি পরা সাধারণ বাঙালি জীবনে ফিরে আসেন। ১৯০৬ সালের দিকে তিনি বেশ কিছু যুবক নিয়ে এলাকায় গড়ে তোলেন এক বিপ্লবী দল। দলটির ঘাঁটি স্থাপন করেন নিজের গ্রামের বাড়িতে। বাড়িতেই রাখতেন পিস্তল বোমাসহ বিপ্লবীদের বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র।

এসময় একদিন উল্লাসকর দত্তের ছোট ভাই তার বিছানায় একটি বোমা পেয়ে তা বাড়ির সামনের বাগানে নিক্ষেপ করেন। ছোড়ামাত্র বিকট শব্দে বোমাটি ফেটে যায়। এই শব্দ অদূর গ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে শুরু হয় পুলিশী তৎপরতা। পুলিশী তৎপরতার কারণে উল্লাসকর দত্ত আত্মগোপন করে কলকাতার মানিকতলার মুরারীপুকুর পারের বাগানে চলে যান।

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের অনুপ্রেরণায় ও তার ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে কলকাতার ৩২নম্বর মুরারীপুকুরে তৈরি হয় সশস্ত্র বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি বা গুপ্ত সমিতি। বাড়িটি ছিল বারীন ঘোষদের পৈত্রিক সম্পত্তি। সশস্ত্র বিপ্লবী বারীন ঘোষ তার দলের আখড়া গড়েছিলেন এই মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িতে। এই বাগানবাড়ির মাঝখানে ছিল ছোট একটি পাকাবাড়ি। বাড়িটির চতুর্দিকে ছিল গাছপালা। দাদা অরবিন্দ ঘোষ এবং অপর দুই ভাই মনোমোহন ঘোষ ও বিনয় ঘোষ এই বাগানবাড়িতে বসবাস করতেন। অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বিপ্লবীদের শ্রদ্ধেয় তাত্ত্বিক নেতা ও স্বদেশি কাগজ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদক। তার সঙ্গে পরামর্শ করেই বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, হেমচন্দ্র ঘোষ, বাঘা যতীন, অবিনাশ ভট্টাচার্যর মতো বিপ্লবী নেতৃত্ব দলের নীতি নির্ধারণ করতেন। ১৯০৭ সালে ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িটি হয়ে উঠে সশস্ত্র বিপ্লবীদের মূল কেন্দ্র। এখানে বিপ্লবীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হত। কুস্তি শিক্ষা, লাঠি খেলা, ছোরা চালনা, পিস্তল চালনা, বোমা তৈরিসহ বোমা ফাটানোর শিক্ষা দেয়া হত। এ কেন্দ্রে সব সময়ই বেশ কয়েকজন বিপ্লবী কর্মী স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন।

ওই সময় বিপ্লবীরা ভাবলেন, যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সহজে বহন করা যায় এবং যা নিয়ে সহজে চলাফেরা করা যায় তা দিয়ে ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ করা সহজ হবে। তাই তারা বোমা ও পিস্তলকে বেছে নিল অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। কাজেই বিপ্লবীদের প্রচুর বোমার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর সেই বোমা তৈরির কারখানা করা হয় মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িতে। এসময় বেশ কয়েকজন বিপ্লবী বোমা তৈরির প্রচেষ্টা ও গবেষণা কাজে নিয়েজিত হয়। মূল দায়িত্বে ছিলেন উল্লাসকর দত্ত ও হেমচন্দ্র দাশ। তাদের একাজে সহযোগীতা করেন প্রফুল্ল চন্দ্র। অনেক চেষ্টার পর ১৯০৮ সালের শুরুর দিকে বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ও বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাশ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা তৈরি করতে সফল হন।

বোমা তৈরির পর এটিকে ফাটিয়ে পরীক্ষা করে দেখার পালা। একদিন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত বললেন, 'ইউরেকা! সব ঠিক হয়েছে, এবার পরীক্ষা করার পালা। একটি বোমা ফাটিয়ে দেখতে হবে তার কার্যক্ষমতা'। সিদ্ধান্ত হল দেওঘরের নিকট একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর নির্জন স্থানে বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হবে। ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বোমাটি সাথে নিয়ে ৫ জন বিপ্লবী দেওঘর পাহাড়ে পৌছলেন। উক্ত দলে ছিলেন বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, প্রফুল্ল চন্দ্র চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ সরকার ও নলিনীকান্ত গুপ্ত। দিঘিরিয়া পাহাড়ের একেবারে মাথায় একটা পাথরের গায়ে ছুঁড়ে বোমার পরীক্ষা করার জন্যে প্রস্তুত বিপ্লবীরা। পরিকল্পনা করা হয় পাহাড়ের গায়ে বোমা ছুড়বে বিপ্লবী প্রফুল্ল চন্দ্র চক্রবর্তী আর তার পাশে থাকবেন বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত। বোমা ছোঁড়ার সাথে সাথে বিকট শব্দ হয়ে তা ফেটে যায়। শব্দের সাথে সাথে জ্বলে উঠে আগুনের ফুলকী এবং কিছুটা ধোয়া। বেশ কিছু দূর থেকে অন্য ৩ জন বিপ্লবী বোমা ফাটানোর শব্দ শুনে এবং আগুন ও ধোঁয়াভাব দেখে সাকসেসফুল সাকসেসফুল বলে চিৎকার দিয়ে উঠেন। কিছুক্ষণের মধ্যে

তারা এগিয়ে এসে দেখেন প্রফুল্ল চন্দ্রের মৃতদেহ পড়ে আছে উল্লাসকর দত্তের বুকের ওপর। তার কপালের এক পাশ চৌচির হয়ে ঘিলু বের হয়ে পড়েছে। উল্লাসকর দত্তও আহত হয়েছেন। মৃত প্রফুল্লকে পাহাড়ে রেখে আহত উল্লাসকর দত্তকে নিয়ে বিপ্লবীরা চলে আসেন আস্তানায়। কলকাতায় বিপ্লবীদের একজন বিশ্বস্ত ডাক্তার ছিলেন ইন্দুমাধব মল্লিক। তার চিকিৎসায় দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন উল্লাসকর। বোমা তৈরির পর বিপ্লবীদের তৎপরতা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষার ৩/৪ মাস পর ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে মজফ্ফরপুরে পাঠানো হয় অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্যে। দুর্ভাগ্যক্রমে কিংসফোর্ডের বদলে কেনেডি নামক এক ইংরেজ আইনজীবির পত্নী ও কন্যা নিহত হয় বিপ্লবীদের বোমায়।

১৯০৮ সালের ১ মে, ওয়ার্নি স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হল ক্ষুদিরাম বসুকে। ২ মে মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িসহ কলকাতার অন্যান্য স্থান থেকে ৩৬ জনকে বিপ্লবীকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে। এদের নামে 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হয়। বিচারে প্রায় সবাইকে শাস্তি দেওয়া হয়। উল্লাসকর দত্ত ও বারীন্দ্র কুমার ঘোষকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয়।

দ্বীপান্তর হল আন্দামান সেলুলার জেলের আরেক নাম। ইংরেজ আমলে ভারতে বিশেষত বাংলার ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের আটক রাখার জন্য সবচেয়ে কুখ্যাত বন্দীশিবির। কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে যথাক্রমে ১২৫৫ এবং ১১৫১ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরের বুকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এটি অবস্থিত। ১৮৮৯ সালের ১২ জুন ভারতবর্ষের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এ জেলখানাটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অবশেষে ১৮৯৩ সালে এটি নির্মাণের কাজ হাতে নেয় ব্রিটিশ সরকার। মাত্র তিন বছরের মধ্যে প্রায় ৬শ কয়েদীর দিন-রাতের শ্রমে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

যারা সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ-শাসনকে উচ্ছেদ করতে চাইবে, তাদের মধ্য যারা ফাঁসিরকাষ্ঠ থেকে রেহাই পাবে তাদের সকলকে ব্রিটিশরাজ আন্দামানে পাঠায়। এখানে তাদেরকে নিয়ে এসে চালানো হতো অমানুষিক নির্যাতন। সেই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কেউ উন্মাদ হয়ে যেতেন, কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করতেন। আন্দামান সেলুলার জেলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে যেসব বিখ্যাত বিপ্লবী বন্দী জীবন-যাপন করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, উল্লাসকর দত্ত, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তার আজাদ হিন্দু ফৌজ নিয়ে ১৯৪৩ সালের ৭ নভেম্বর আন্দামান দ্বীপটিকে দখল করে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন। তিনি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম দেন শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ। অবশ্য এ ঘটনার দু'বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশ সরকার এ দ্বীপমালা পুনরায় দখল করে নেয়। তবে ততদিনে ভারতে ইংরেজ শাসনের সূর্য অস্তমিত হতে থাকে। তাই তারা আন্দামান সেলুলার জেলের সব বন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। বর্তমানে এই সেলুলার জেলটি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্মৃতিবিজড়িত জাদুঘরে পরিণত হয়েছে।

আন্দামান সেলুলার জেলে থাকাকালে সরষে পেষার ঘানিতে কাজ করা, প্রচণ্ড রোদে মাটি কেটে ইট বানানো, গাছকেটে লাকড়ি বানানোসহ আরো অনেক কাজ উল্লাসকর দত্তকে

করতে হতো। কাজ করার পর চলতো নানাধরনের নির্যাতন। চলত দু'হাত ওপরের দিকে তুলে দেওয়ালে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখার মতো জঘন্য অত্যাচার। এ সমস্ত কারণে উল্লাসকর দত্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তাকে মাদ্রাজের পাগলা গারদে নিয়ে আসা হয়। সুস্থ হয়ে উঠার পর সেখানে শাস্তির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। প্রতিদিন সকালে তার মাথা চট দিয়ে ঢেকে লোহার দণ্ড দিয়ে আঘাত করা হত। এই আঘাতের কারণে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। ১৯২০ সালে তিনি মুক্তি পান।

মুক্তির পাওয়ার পর আর তিনি আর সক্রিয় বিপ্লববাদী রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে পারেননি। তার মূল কারণ ছিল দীর্ঘ দিনের অত্যাচার-নির্যাতনে তিনি শারীরিক ও মানুষিকভাবে সুস্থ ছিলেন না। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে প্রায় এক দশক সময় চলে যায়। ১৯৩১ সালে আবারও তাকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাঁকে বিনাবিচারে ১৮ মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি আর রাজনীতিতে যুক্ত হননি। দ্বীপান্তরে যাওয়ার পূর্বেই বিপিন চন্দ্র পালের বিধবা মেয়ে লীলাদেবীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু আলিপুর মামলার রায়ের কারণে তাদের আর ঘর-সংসার হয়ে উঠেনি। ১৯৪৮ সালে ৬৩ বছর বয়সে ৫৮ বছরের লীলাদেবীকে নিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো কাঁটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন উল্লাসকর দত্ত। তাকে নিয়ে উঠলেন রামমোহন লাইব্রেরির বারান্দায়। কিছু দিন ছিলেন বৌ-বাজারের এক হোটেলে। স্বাধীন ভারত সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের জন্যে ভাতা মঞ্জুর করলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। তিন বছর পর ১৯৫১ সালে তারা শিলচরে আসেন। শেষ জীবনের ১৪টা বছর এ শহরেই কাটান। তখন তিনি আর বিপ্লবী নন। ব্রিটিশের নির্যাতনে মানসিক ভারসাম্য হারানো এক উদাসী। সঙ্গে তার পক্ষাঘাতে পঙ্গু স্ত্রী। শিলচরের মানুষই তখন তাঁদের থাকা-খাওয়া-চিকিৎসার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু ৬২ সালে লীলাদেবীর মৃত্যু হয়। তখন আর উল্লাসকর দত্তের কেউ থাকলো না। ১৯৬৫ সালের ১৭ মে তিনিও চলে গেলেন আমাদের স্মৃতির পাতায়।

উল্লাসকর দত্ত রচিত দুটি গ্রন্থ হল: 'দ্বীপান্তরের কথা' ও 'আমার কারাজীবন'।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. বৃটিশবিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা– তপন কুমার দে, জাগৃতি প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

২. অগ্নিযুগের ইতিহাস– ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন, মুক্তধারা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭৯।

৩. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা– হেমচন্দ্র কানুনগো, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল জুন ১৯২৮।

৪. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি, কলকাতা।

৫. বাংলার মুক্তি সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টপাধ্যায় ও রাখী চট্টপাধ্যায়, প্রকাশকাল ২০০৫, কলকাতা।

হেরাম্বলাল গুপ্ত



হেরাম্বলাল গুপ্ত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লবীদের একজন অন্যতম বিপ্লবী। রাসবিহারী বসুর মতো একজন মহাবিপ্লবী। দিল্লী-লাহোর ষড়যন্ত্র পরিকল্পনার অন্যতম নায়ক। ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য তিনি সারা জীবন বিভিন্ন দেশে হতে অস্ত্র সরবরাহ ও বিপ্লবী কর্মী তৈরির কর্মযজ্ঞে নিয়েজিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে প্রধান্য দিয়ে সমগ্র এশিয়ার মুক্তির জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিপ্লবী আদর্শ ও কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। ক্ষমতালাভ বা কোনো প্রকার ব্যক্তি স্বার্থের ধ্যান-ধারণা তার মধ্যে ছিল না। তিনি ছিলেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু, এম এন রায় প্রমুখের মতো জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনসত্ত্বার অধিকারী।

হেরাম্বলাল গুপ্ত জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালের ২৮ নভেম্বর। কলকাতার এক অভিজাত বংশে। তার বাবা ছিলেন মনেপ্রাণে স্বদেশি। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে কৃষিখামার গড়ে তোলেন। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিত্বের অধিকারী পিতা ছেলেকেও দেশপ্রেমী হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেন। তিনি ছেলেকে কিশোর বয়সেই ব্রিটিশ-খেদানো স্বদেশি আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে দেন। তিনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং আধুনিক কৃষির উন্নয়ন না ঘটলে ভারত যে পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হবে না এটা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তার খামার বাড়িতে মেধাবী তরুণদেরকে বিজ্ঞান ও কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে বৃত্তি দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। ছেলেকেও ভর্তি করে দিয়েছিলেন কলকাতার প্রসিদ্ধ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

হেরাম্বলাল গুপ্তর বয়স যখন চার বছর তখন তার মা মারা যায়। পিতা পুনরায় বিয়ে করেন। এ সংসারে এক ভাই ও এক বোন জন্ম নেয়। শিশু হেরাম্বলাল একদিন একটি ইংরেজ বালকের সাথে মারামারি করেছিলেন। ফলে সরকার নিযুক্ত কর্মচারীরা এসে হেরাম্বকে প্রচণ্ড মারধর করে চলে যায়। এই ঘটনার পর তার পিতা গৃহের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। শুরু হয় গৃহশিক্ষা। পিতা গৃহে ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিযুক্ত করেন।

এর কিছুদিন পর হেরাম্বলাল গুপ্ত উড়িষ্যা নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহপাচকের মাথার টিকি কেটে দেন। কলকাতার সমস্ত ব্রাহ্মণকুলকে অপমানিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয় তার বিরুদ্ধে। ব্রাহ্মণদের এই অগ্নিবিদ্রোহ দমনে পিতাকে নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণ

পুরোহিতদের আমন্ত্রিত করে বাড়িতে ভোজনের আয়োজনসহ ৭৫০ রুপী জরিমানা দিয়ে সমাজে মান-সম্মান বাঁচাতে হয়। তখনকার ভারতেবর্ষে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আচার-আচরণ ইংরেজদের চেয়ে কোনো অংশেই কম ছিল না।

একবছর পর একদিন দিনে দুপুরে তার পিতা ৪ জন সহযোগীসহ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এক সভায় যাওয়ার পথে অকস্মাৎ বিনা কারণে ব্রিটিশ প্রশাসকের চরদের দ্বারা আক্রান্ত হন। এই খবর শুনে হেরাম্বলাল গিয়ে দেখেন পিতা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। তার বুকে পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়েছে। দ্রুত তাকে বাড়িতে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। মারা যাওয়ার পূর্বে হেরাম্বলালকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, 'তোমার ভাইবোন এরা এখনও ছোট। তারা আরও বহুদিন দেশে থাকবে, তুমি বিদেশে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করো।' তার পিতার তখন মাত্র ৩৮ বছর বয়স হয়েছিল।

তার পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের জায়গাজমি, ধনসম্পত্তি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা দিয়ে দখল করে নেয়। কিশোর হেরাম্বলাল বিপদ বুঝে পিতার বন্ধু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় বিভিন্ন বাড়িতে লুকিয়ে থাকতেন। এইভাবে দু'বছর অতিবাহিত হওয়ার পর ১৯০২ সালে পিতার কয়েকজন বিপ্লবী বন্ধুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে। হেরাম্বলাল তাদের সঙ্গে বিদেশের উদ্দেশ্যে ভারতভূমি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। তখন তার বয়স মাত্র ১৪/১৫ বছর।

তিনি হংকং দ্বীপে প্রথম বিদেশ ভ্রমণে যান। এখানে ৩ দিন থাকার পর বুঝতে পারেন ব্রিটিশ পুলিশ ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্যাপারে খুবই তৎপর। ফলে তারা সাংহাই চলে যান। এখানেও ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় লোকদের কাজকর্ম করতে হয়। এখানে নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত নয়। এবার কবি রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়ে তার চিঠি নিয়ে জাপানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জাপানে তখন মেইজি যুগ (১৮৮৬-১৯১২)।

দীর্ঘসমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে দলটি জাপানের য়োকোহামা সমুদ্রবন্দরে এসে পৌঁছে। সেখান থেকে ট্রেনে করে রাজধানী টোকিওর কেন্দ্রস্থল শিমবাশি শহরে আসেন। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আকাসাকা শহরে এসে 'মিহারাশিকান' নামক অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ১৯০২ সালের হেমন্তকাল। এই বছরের জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখে জাপান ইংল্যান্ডের সাথে প্রথম পর্ব মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল পার্শ্ববর্তী শ্বেতাঙ্গ মহাশক্তি রাশিয়াকে প্রতিহত করা। কারণ এই সময় জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার রাজনৈতিক সঙ্কট চরমে। এই সংকটময় পরিস্থিতির মধ্যে হেরাম্বলাল পিতৃতুল্য কবি রবীন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হন ইম্পেরিয়াল সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল কাউন্ট নোগি মারেসুকে, জেনারেল ওওয়ামা এবং প্রভাবশালী গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন 'গেনয়োশা'র প্রধান পরিচালক মিৎসুরু তোয়ামার সঙ্গে। মিৎসুরু তোয়ামা এক সময় প্রায় এক বছর ভারতে ছিলেন। এ সময় তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জেনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ওকাকুরা তখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল। এক অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেন কিশোর হেরাম্বলাল গুপ্ত। এই চিঠি ৩ জন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাতে সহায়ক হয়েছিল। সাক্ষাৎকালে এশিয়ার প্রতি ৩ জনেরই আন্তরিকতা, ভারতের প্রতি সহমর্মিতার প্রকাশ দেখতে পেয়ে ভীষণ আন্দোলিত হন হেরাম্বরা।

১৯০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। তারা এই সময় ২ বছর জাপানে পলাতক জীবনের ইতি ঘটিয়ে বিলেতের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। সমুদ্রপথে ফ্রান্সের জাহাজে এই প্রথম হেরাম্বলাল মাংস খাওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রায় ১ মাস পর তারা লন্ডনে পৌঁছে ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা দেখে বিস্মিত হন! লন্ডনের উপশহরে একটি অতিথিশালায় আশ্রয় নিয়ে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে ভারতে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক নীতি নিয়ে মত বিনিময় করেন। ছাত্ররা হেরাম্বলালের দলকে উষ্ণ আতিথেয়তা প্রদান করেন। তারা ইতিমধ্যে এখানে 'ইন্ডিয়া হাউস' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। যা মূলতঃ ঐক্যবদ্ধভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে তরান্বিত করার জন্য। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিপ্লবী শ্যামজি কৃষ্ণভর্মা। একদিন দলের জনৈক সঙ্গী মুখার্জী হেরাম্বলালকে এখানকার বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার জন্য উৎসাহিত করে। তার জবাবে তিনি বলেন, 'আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাবার শেষ আদেশ মেনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে জীবন বিলিয়ে দেব, সেটাই হবে আমার পড়ালেখা।'

কিন্তু লন্ডনের জীবনযাত্রার সঙ্গে তারা সহজে মানিয়ে না নিতে পারার কারণে ৩ মাসের মধ্যেই জার্মানীতে চলে যান। সেখানে গিয়ে বিপ্লবী 'বার্লিন কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত হন। এটি গঠন করেছিলেন বিপ্লবী চম্পাকারামান পিল্লাই, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এখানে তারা ৫ বছর ছিলেন। এখানে কিছুদিন হেরাম্বলাল জার্মানী থেকে ভারতে অস্ত্র সরবরাহের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থেকে কাজ করেন।

কিছুদিন পর হেরাম্বলাল ফ্রান্সে যান। ফ্রান্সেও বেশিদিন থাকতে সক্ষম না হওয়াতে পার্শ্ববর্তী দেশ ইতালির রোমে গিয়ে ৬ মাস ছিলেন। সেখান থেকে তুরস্কের ইস্তামবুলে পাড়ি জমান। তুরস্ক থেকে বেরিয়ে শেষে গিয়ে ওঠেন আমেরিকার নিউইয়র্কে তারপর শিকাগো শহরে। সর্বত্রই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। প্রবাসী বিপ্লবী আন্দোলনকারীদের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগাযোগ মাধ্যম গড়ে উঠেছিল তখন। সেই সময় জাপানি ও চীনা জাহাজের মাধ্যমে বহু ভারতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক, ছাত্র, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী হিসেবে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেক স্বদেশি বিপ্লবী ছদ্মবেশে মিশে গিয়েছিলেন। জাপানেও বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব সময়ে জাপানি ক্যাডেট কলেজেগুলোতে কয়েকশ এশিয়ার তরুণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অনেক ভারতীয় ছিলেন বলে 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একাডেমী-জাপান' এর স্মারকগ্রন্থ থেকে জানা যায়। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু ও হেরাম্বলাল গুপ্ত এই ছাত্রদেরকে যথাক্রমে জাপানে ও চীনে সংগঠিত করেন।

শিকাগোতে গিয়ে হেরাম্বলাল স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও শোষণ তথা জাতিগত বৈষম্যের দেখে শিহরিত হন! শ্বেতাঙ্গদের ছিল অগ্রাধিকার, দুর্দান্ত দাপট। কৃষ্ণাঙ্গদের মানবিক অধিকার বলতে কোনো কিছুই নেই। এর মধ্যে একদিন লন্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের ধর্মঘট পালনের সংবাদ পান। এই সংবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে হেরাম্বলাল একাই লন্ডনে গিয়ে উপস্থিত হন ১৯০৪ সালে।

লন্ডনে একদিন তিনি প্রবাসী ছাত্রদের ছাত্রাবাসে গেলে পরে পুলিশ আগে থেকেই তার আগমনের বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে গ্রেফতার করার জন্য ওঁৎ পেতে বসেছিল। দেখা মাত্রই পুলিশ তাকে সন্ত্রাসী হিসেবে গ্রেফতার করে। দপ্তরে নিয়ে গিয়ে তার পিতার স্বদেশি আন্দোলনে সমর্থনদান সংক্রান্ত সংবাদ থেকে শুরু করে বিদেশের কোথায় কোথায় গিয়েছেন, কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সব তথ্যই তার সামনে তুলে ধরে। তার সঙ্গী দু'জন এখন কোথায় আছে তাদের ঠিকানা এবং তাকে ইংল্যান্ডে ২০০'র বেশি প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের নামধাম ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য প্রদানের জন্য প্রবল চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু হেরাম্বলাল কোনো বিষয়েই পুলিশের কাছে মুখ খোলেননি। প্রতিদিন তাকে একই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত, মানসিকভাবে চাপ দেয়া হত। অন্য ধাতুর গড়া হেরাম্বলাল তার অবস্থানে ছিলেন অটল। পুলিশও শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হয়। তারপর আদালতের রায়ে ৬ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি।

জেলের মধ্যে ৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ একদিন খাওয়া-নাওয়া ছেড়ে দিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে জপমালা নিয়ে মন্ত্র জপ করতে থাকেন। এভাবে ২০ দিন অতিবাহিত হলে পরে তার স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি ঘটে। তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে কর্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। প্রকৃতপক্ষে, এই ঘটনার মাধ্যমে জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার একটি পন্থা চিন্তা করছিলেন হেরাম্বলাল। ডাক্তার তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করার জন্য হাসপাতালের বাগানে হাঁটাহাঁটি করার অনুমতি দেন। ২/৩ দিন এভাবে মুক্ত হয়ে হাঁটাচলার পর একদিন পাগলের মতো আচরণ করতে শুরু করেন হেরাম্বলাল। কখনও অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন, কখনওবা সেবিকাদেরকে এটা ওটা খাবার নিয়ে আসার জন্য উত্যক্ত করেন। কাগজপত্র এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করেন। সেইসঙ্গে বারান্দায় দৌড়-ঝাঁপ তো আছেই। মোদ্দাকথা মানসিক অপ্রকৃতস্থ দেখানোর জন্য যা যা করার সবই করে দেখান। তাতে জেল কর্তৃপক্ষ ডাক্তারকে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলে দেন, 'হেরাম্বলাল মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। সে এখন বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া কিছু নয়!' ডাক্তারের কথা পুলিশ বিশ্বাস করে এবং ধীরে ধীরে তার ওপর থেকে নজরদারি উঠিয়ে নেয়। এক মাস পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন তার বন্ধু জনৈক ভারতীয় ছাত্রের বাড়িতে। পোশাক বদল করে সেখান থেকে সোজা আমেরিকায় পাড়ি দেন যেখানে তখনও তার আগের দুই সঙ্গী মুখার্জী ও ব্যানার্জী অবস্থান করছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পুরোনো সঙ্গীদের ডেরায় গিয়ে উপস্থিত হন। সেটা একটি বস্তি ছাড়া কিছুই নয়। সেখানে আরও বসবাস করছেন চীন, ব্রাজিল, কলাম্বিয়া প্রভৃতি দেশের দরিদ্র অভিবাসীরা।

আমেরিকায় বসে হেরাম্বলাল ভারতে এবং লন্ডনে কি ঘটছে তার খবরাখবর নিয়মিত রাখতেন। একদিন 'জাপান টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে জানতে পারেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চরমপন্থী নেতা, 'ব্রিটিশ সরকারের আতঙ্ক' নামে খ্যাত লালা লাজপৎ রায় আমেরিকায় অবস্থান করছেন। পাঞ্জাবের অন্যতম বিপ্লবী-নেতা লালা হরদয়ালও বিদেশে পলায়ন করেছেন বলে খবরে দেখেন। চরমপন্থী লালা লাজপৎ রায় যখন আমেরিকায় আছেন এটা জানতে পেরে হেরাম্বলাল ঠিকানা খুঁজে লালা লাজপতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান।

সাক্ষাৎ হল। কথা কথা হল। তিনি তাকে কিভাবে গুপ্তচরের কাজ এবং গোপন তথ্যের আদানপ্রদান করতে হয় সেই কলাকৌশল ও নীতি সম্পর্কে শিক্ষা দেন। হেরাম্বলাল গুরুর সকল আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য বলে গ্রহণ করে নেন। এরপর তিনি জাপান হয়ে ভারতে আসেন।

১৯১২ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে তিনি জাপান ত্যাগ করে মাঝপথে চীনের গুয়াংডন প্রদেশে নামেন। সেখানে তিনি বন্ধু করিমের সহযোগিতায় সাক্ষাৎ করতে চেষ্টা চালান চীনা জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা ড. সান-ইয়াৎ সেনের সঙ্গে। বন্ধু করিম তাকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ড. সেনের গুপ্ত আস্তানায় নিয়ে যান। জাতীয়তাবাদী নেতা বিপ্লবী ড. সান-ইয়াৎ সেন ছিলেন বরাবরই প্যান্-এশিয়াজিম তথা মহাএশিয়া মৈত্রী-বন্ধন মতবাদে বিশ্বাসী কাজেই হেরাম্বলালকে প্রথম দর্শনেই আপন করে নেন। ড. সেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ভালো করেই জানতেন।

এখানে ৯ বছর থাকার পর তিনি ফিরে ভারতে যান। এ সময় তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। সেই সময় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা এবং হুগলি জেলার চন্দননগর।

চন্দননগরকে গুপ্ত সশস্ত্র কর্মকাণ্ড, আগ্নেয়াস্ত্রের লেনদেন এবং বোমা তৈরির কেন্দ্রস্থল গড়ে তুলেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। তিনি ১৯০৬ সালে দিল্লীর অদূরে অবস্থিত দেরাদুন বন গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান সচিব হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। বাইরে তার বেশবাস সরকারি চাকরিজীবী ভদ্রলোকের মতো হলেও গোপনে তিনি ব্রিটিশদের নিদ্রাহরণকারী ভয়ানক বিপ্লবী ছিলেন। বিপ্লবী লালা হরদয়াল গোলাবারুদ সংগ্রহ এবং বোমা তৈরির কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হরদয়াল আমেরিকায় পলাতক হবার পর এইসব দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। এখানে থেকেই রাসবিহারী বসু দিল্লীতে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কে মারবে তাকে? এই সমস্যার সমাধান করেন হেরাম্বলাল গুপ্ত। তার প্রস্তাবে লটারির মাধ্যমে রাসবিহারী বসুর একান্ত অনুগত শিষ্য কিশোর বসন্তকুমার বিশ্বাস বোমা নিক্ষেপকারীর দায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু দিল্লী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। কয়েক মাস পর বসন্ত বিশ্বাসসহ ১০ জন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। ১৯১৫ সালের ১১ মে ব্রিটিশ সরকার এই মামলায় ৩ জনকে অবৈধভাবে গোলাবারুদ বহনের অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে।

এই ষড়যন্ত্রের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে মূল পরিকল্পক রাসবিহারী বসুকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতারি পরোয়ানা জারিসহ তার মাথার মূল্য ১২ হাজার রুপী পুরস্কার স্বরূপ ঘোষণা করে। অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ তাকে ধরতে ব্যর্থ হলে পরে পুরস্কারের অর্থের সঙ্গে আরও ৫ হাজার রুপী যোগ করা হয়। কিন্তু ধূর্ত রাসবিহারীকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারেনি। তিনি এই ঘটনার পর বারাণসী (বেনারস) শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে গুপ্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু তিনি বাইরে বেরুতে পারতেন না। কেননা তার ছবিসহ পোস্টার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সর্বত্র। রাসবিহারীর পরিবর্তে স্বেচ্ছায় বোমা তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করেন হেরাম্বলাল। তার ছবি কোথাও নেই, পুলিশও তাকে চেনে না। তিনি চলে গেলেন পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া বন্দরনগরে। সেখানে অন্যান্য জায়গা থেকে অনেকখানি নিরাপদ ছিল গুপ্ত তৎপরতার জন্য। ইতিমধ্যে পুলিশি তৎপরতা দেখা দেয় চন্দননগরে রাসবিহারী বসুর খোঁজে। বারাণসীও অনিরাপদ হয়ে ওঠে। ১৯১৩ সালের

২রা ফেব্রুয়ারি হেরাম্বলাল দূত পাঠিয়ে রাসবিহারীকে সন্ন্যাসীর বেশে সাজিয়ে গোয়াতে নিয়ে আসেন। তখন এখানে দু'জনে মিলিত হয়ে পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জ-হত্যা পরিকল্পনা ছিল বিপ্লবীদের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের পদক্ষেপ কিন্তু সেটা ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় সুযোগ তারা খুঁজে পেলেন লাহোরে। বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের গুপ্তদলের সঙ্গে যৌথভাবে ঐতিহাসিক 'লাহোর পরিকল্পনায়' লিপ্ত হন।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন রাসবিহারী বসুরা। গোপনে গোপনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। দেশ-বিদেশ থেকে বিপ্লবী গদার পার্টির ৪ হাজার সশস্ত্র সদস্যের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হয়। সংগ্রহ করা হয় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ। এই সশস্ত্র বিদ্রোহের কৌশলগত দিকে অবস্থান নেন দু'জনে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। বিদ্রোহ ঘটানোর দিন ধার্য করা হয় ২১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত। প্রধান লক্ষ্যস্থল পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর। সেই সঙ্গে বারাণসী ও জব্বলপুর সেনা ঘাঁটিও প্রস্তুতি নিয়ে অধীর অপেক্ষায়। রাসবিহারী এবং হেরাম্বলাল এই সশস্ত্র বিপ্লব বাহিনীর প্রধান গুপ্ত দপ্তর স্থাপন করেন লাহোর শহরের ৪টি গুপ্তস্থানে। অবাঙালি বিপ্লবী রামশরণ দাসের বাড়িতে বিদ্রোহের আদেশ প্রদানের সময়টুকুর প্রতীক্ষায় ছিলেন তারা। কিন্তু বিদ্রোহের ঠিক ৪ দিন পূর্বে এই ষড়যন্ত্রের খবর ফাঁস করে দেয় এই রামশরণ দাস লোকটি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে যেখানে যেখানে সম্ভব দেশীয় সৈন্যদেরকে অস্ত্রহীন করে এবং ১৯ তারিখে ৪ প্রধান দপ্তরের একটিতে অকস্মাৎ হামলা চালায়। তবু হেরাম্বলালের আদেশপ্রাপ্ত একটি দল ১৯ তারিখ সন্ধ্যেবেলায় লাহোরে নিযুক্ত ব্রিটিশ সেনানিবাসে হামলা চালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই সশস্ত্র হামলায় দুপক্ষের অনেক লোক মারা যায়। দ্রুত সমস্ত লাহোরব্যাপী এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসন সমস্ত শক্তি দিয়ে এই সশস্ত্র বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র দমন করতে সক্ষম হয়। এটাই ঐতিহাসিক 'লাহোর ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত।

এই লাহোর পরিকল্পনার ব্যর্থতায় অনেক বিপ্লবী গ্রেফতার এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুনরায় অনুরূপ ঘটনা ঘটানোর মতো লোকবল এবং অস্ত্রবল না থাকার কারণে অন্য কৌশল অবলম্বন করেন রাসবিহারী বসু এবং হেরাম্বলাল গুপ্ত। এরপর সশস্ত্র বিপ্লবকে সফল করার উদ্দেশ্যে বেছে নেন জাপান দেশটিকে।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসের দিকে দু'জনে টাকাকড়ি এবং টিকিট ছাড়া সন্ন্যাসীর বেশে কলকাতাগামী ট্রেনের যাত্রী। স্টেশনে স্টেশনে দু'জনের ছবিসহ পোস্টার লাগানো। রাসবিহারী বসু তার ছবি দেখে কিছুটা বিব্রত। কিন্তু হেরাম্বলালের ছবিটির সঙ্গে তার চেহারার মিল নেই দেখে কিছুটা নিরাপদ বোধ করছিলেন। এর মধ্যে একটি স্টেশন থেকে দু'জন অনুসন্ধানী পুলিশ উঠে যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করতে লাগল। টিকিটহীন দু'জনে অবস্থা বেগতিক দেখে পরস্পরের চোখ টিপে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণে কালবিলম্ব করলেন না। একটি সেতুর উপর ট্রেনটি চলে এলে নদীতে অকস্মাৎ ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন হেরাম্বলাল। পুলিশও সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নদীতে। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার দেখা পেল না। হেরাম্বলাল নদী তীরের ঘন কচুরিপানা-শ্যাওলা-লতাগুল্মের ঝোঁপে নাকটা শুধু ভাসিয়ে ঠাণ্ডা নোংরা জলের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন মধ্যরাত পর্যন্ত। পুলিশ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে চলে

যায়। হেরাম্বলাল গভীর রাতে অন্ধকারের মধ্যে গ্রামের এক বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গ্রামের মানুষ তার কথা শুনে তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তখন স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের প্রতি সাধারণ মানুষের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। তারা হেরাম্বলালকে শারীরিক ক্লান্তি ও অস্বস্তি দূর না হওয়া পর্যন্ত আরও কিছুদিন থেকে যেতে বলে। কিন্তু তিনি এখানে তার এই গুপ্ত আশ্রয়ের কথা জানাজানি হয়ে গেলে পরে এইসব নিরীহ গ্রামীণ মানুষদেরকে নানা রকম পুলিশী ঝামেলা পোহাতে হবে অহেতুক, সে কথা ভেবে ২ দিন পরেই গ্রাম ছেড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলতে শুরু করেন। হিমালয় পর্বত, দুর্গম বনজঙ্গল, খরস্রোতা নদ-নদী পেরিয়ে বার্মার (মিয়ানমার) দিকে চলে যান। রাতের বেলা জনমানবহীন গভীর বনের মধ্যে বড় কোনো বৃক্ষের শাখায় শরীরকে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে রাত কাটান। দিনের বেলা বনের ফলমূল আর পাখি শিকার করে পুড়িয়ে পেটের খিদে মেটান। এইভাবে কয়েক দিন পথচলার পর বার্মায় এসে পৌঁছান।

বার্মায় থেকে অনেক কষ্ট করে কয়লা বহনকারী শ্রমিকের বেশ ধরে জাপানের নাগাসাকি বন্দরে এসে পৌঁছান সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে। তখন তার বয়স ২৬ বছর। অন্যদিকে একই বছরের ৪/৫ মাস আগে রাসবিহারী বসু ভিন্নপথ অবলম্বন করে জাপানে পৌঁছান। ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের পত্রপত্রিকায় এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান ভ্রমণে যাচ্ছেন এরকম সংবাদ প্রকাশিত হলে পরে সেটা দেখে রাসবিহারী বসু জাপানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং রবীন্দ্রনাথের সচিব হিসেবে (মতান্তরে আত্মীয়) পি. এন ঠাকুর (প্রিয়নাথ ঠাকুর) নাম ধরে জাপানে প্রবেশ করেন।

অনেক দিন পর টোকিওতে ফিরে হেরাম্বলাল রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন জানতে পারেন যে, ড. সান-ইয়াৎ সেন জাপানে আছেন। তার সঙ্গে বিহারী বসু একদিন সাক্ষাৎ করেন। তারপর হেরাম্বলাল এলে পরে দুজনে মিলে ড. সান-ইয়াতের পরামর্শ অনুযায়ী আকাসাকা শহরের রেইনানজাকাস্থ 'গেনয়োশা' গুপ্ত সংস্থার কার্যালয়ে সংস্থার পরিচালক তোয়ামা মিৎসুরুর (১৮৫৫-১৯৪৪) সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য সহযোগিতা করার আবেদন জানান। ড. সান-ইয়াৎ সেনের সঙ্গে হেরাম্বলালের পুনরায় দেখা হলে পরে অনেক কথাবার্তা হয়। সান-ইয়াৎ সেন তাদের দুজনকে প্যান্-এশিয়ানিজম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন, বলেন যে, 'জাপান, চীন ও ভারত যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে তাহলে এশিয়া মহাদেশ সাম্রাজ্যবাদী দখল থেকে মুক্তি লাভ করবে।' হেরাম্বলাল সান-ইয়াৎ সেনের কথায় প্রভাবিত হয়ে তার আদেশ-উপদেশ মাফিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার প্রতীজ্ঞা করেন। ভেবে দেখেন, এতদিন পর্যন্ত তিনি কেবল ভারতের মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন এবার থেকে সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতার কথা ভাবতে হবে। এশিয়াবাসীর ভ্রাতৃত্ববোধকে সমুন্নত রাখতে হবে। সেদিন থেকে ড. সান-ইয়াৎ সেন এবং প্যান্-এশিয়ানিজমের অন্যতম প্রধান উদ্গাতা তোয়ামা মিৎসুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন দুজনেই। গুরু তোয়ামা এই দুজন তরুণ বিপ্লবীকে জাপানে আশ্রয় এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি 'গেনয়োশা' সংস্থার সদস্য ছাড়া আরও একটি গুপ্ত সমিতি 'কোকুরিউকাই' এর প্রধান পরিচালক কুজো য়োশিহিসা ও প্রধান কর্মকর্তা উচিদাকে রিয়োহেইকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের ওপর এই বিপ্লবীদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। সেদিন থেকে জাপান তথা বিদেশে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং হেরাম্বলাল গুপ্তের নতুন রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়।

জাপানে পালিয়ে আসার ৮ মাস পর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবের পুরোধা লালা লাজপৎ রায় আমেরিকা যাওয়ার পথে জাপানে উপস্থিত হন। টোকিওর অন্যতম প্রধান বৃহৎ বাণিজ্যনগর হিসেবে খ্যাত 'উয়েনো' এর বিখ্যাত সেইয়োকেন্ মিলনায়তনে ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬ টার সময়। প্রধান বক্তা লালা লাজপৎ রায় উপস্থিত অতিথিদের কাছে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে জাপানের সহযোগিতা এবং এশিয়াবাসীর হাত দিয়ে এশিয়া মহাদেশকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এরপর হেরাম্বলাল এবং রাসবিহারীর উপর নেমে আসে খাড়া বিপদ। অনুষ্ঠানে জাপানস্থ ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার ৪ জন চরকে পাঠানো হয়েছিল। তারা দু'জনের আসল পরিচয় খুঁজে পেয়ে ব্রিটিশ দূতাবাসকে অবহিত করে। পরের দিনই রাষ্ট্রদূতের বিশেষ দূত জাপানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসে অনুরোধ জানায় যে, দু'জন ভারতীয় বিপথগামী তরুণ শত্রু শক্তি জার্মানীর সাহায্যে ভারতের জনসাধাণরকে বিদ্রোহী করে তুলছে। সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করছে। তারা জাপান-ব্রিটিশ মৈত্রী সম্পর্কেরও শত্রু। সুতরাং তাদেরকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করো।

এই আবেদনের প্রেক্ষিতে জাপানি কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী দুজনকে ৫ দিনের মধ্যে জাপানত্যাগের আদেশ দেয়। বিপ্লবীরা যেন জানতেনই এমন ঘটনা ঘটবে এবং তাদেরকে রক্ষা করার জন্য প্রভাবশালী জাপানিরাও রয়েছেন। ব্রিটিশের কথায় জাপান নড়বে কেন? কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক, সাংবাদিক, শিক্ষক, উদার ও উগ্র জাতীয়তাবাদী নেতা ও দলের প্রধানরা পত্রপত্রিকা মাধ্যমে এই আদেশের তীব্র প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখ ছিল নির্ধারিত শেষ সময়সীমা তাও লঙ্ঘন করে তারা জাপানেই থেকে যান ফলে জারি হয় জাপান সরকারের গ্রেফতরি পরোয়ানা।

১৯১৬ সালে আমেরিকা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জাপান ত্যাগের সময় বন্ধু ওওকাওয়া হেরাম্বকে আমেরিকায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার জন্য উপদেশ দেন। কিন্তু পড়ালেখার প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তিনি বিভোর হয়ে স্বদেশের মুক্তির স্বপ্নে ডুবে থাকতেন। আমেরিকায় গিয়ে হেরাম্বলাল জাপানের মতো নিরাপদ থাকতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ২৭ বছর বয়সে পুনরায় জাপানে ফিরে আসেন। জাপানে ফিরে এসেও শান্তি ছিল না তার। পুলিশ তাকে পেলে গ্রেফতার করবে এ কথা তিনি ভালো করেই জানতেন। টোকিও নিরাপদ নয় ভেবে চলে যান বরফঢাকা হোক্কাইদো প্রদেশে। সেখানে আদিবাসী সম্প্রদায় 'আইনু'দের গ্রামে বসবাস করে আইনু বেশবাস পরে 'সাতো ববি' নাম ধারণ করেন। ২ মাস বিভিন্ন জায়গা ঘুরে টোকিওতে ফিরে আসেন।

নিগাতা-জেলা থেকে ফেরার পর সরাসরি হেরাম্বলাল তোয়ামার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ নেন। এরপর শিনজুকু শহরের নাকামুরায়াতে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে অনেকদিন পর রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রাসবিহারী ততদিনে তোয়ামা মিৎসুরুর তত্ত্বাবধানে এই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিকের বড় কন্যা সোমা তোশিকোকে বিয়ে করেছেন, সেই সঙ্গে অক্লান্তভাবে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে চলেছেন। হেরাম্বলাল এ পর্যন্ত ঘটিত ঘটনা সব খুলে বলেন তাকে। তারপর রাসবিহারীর কাছে কিছু অর্থ ধার চান, রাসবিহারী তাকে যথা সম্ভব সাহায্য করেন।

১৯২০ সালের বসন্তকালে, সুবিখ্যাত সেইরোকা খ্রিস্টান হাসপাতালের জনৈক সেবিকা কোবায়াশিকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর টোকিওস্থ ইউশিমা শহরের তেনজিন মন্দির সংলগ্ন স্থানে বাসা ভাড়া করেন। সংসার চালানোর জন্য তখন আমেরিকায় ছিল ছোটভাই তার মাধ্যমে মার্কিনী চলচ্চিত্রের ফিল্ম আনিয়ে টোকিওর তৎকালীন দেশি-বিদেশি সংস্কৃতির মক্কা আসাকুসা শহরের সিনেমা হলে প্রদর্শন করে অর্থ উপার্জন করেন। তাদের পরিবারে দুটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তার স্ত্রী অকালে মৃত্যুবরণ করেন।

ওই বছর 'জাপান-চীন-ভারত সমিতি' গঠনের পর হেরাম্বলাল চীনের সাংহাই শহরে যান। ১৯২৩ সালে মহাভূমিকম্প হয়। এই বিপর্যয়ে বহু দালান, বাড়িঘর ধ্বংস হয় এবং নিহত ও নিখোঁজ মানুষের সংখ্যা ১ লাখ ৫০০০ এর অধিক। অনেক ভারতীয়সহ বিদেশি এই ভূমিকম্পে মৃত্যুবরণ করেন।

হেরাম্বলাল বাড়ির কথা মনে হতে ছুটলেন স্টেশনের দিকে, সব ট্রেন তখন বন্ধ। বাসও থেমে আছে। শহরব্যাপী আগুন, বাড়িঘরের ধ্বংসস্তূপ, আহত মানুষের হাহাকার ঠেলে ট্রেন লাইন ধরে হেঁটে হেঁটে নিজ এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন। 'ইওয়াসাকি ভবনে'র বিশাল বাগানে নিজের পরিজনকে খুঁজে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে মাটিতেই ধপ্ করে বসে পড়েন।

১৯২৪ সালের ১ জুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মহিলা ভক্ত মাদাম তোমি কোরার আমন্ত্রণে আবার জাপান সফরে আসেন। এ সময় তার অভ্যর্থনা ও সেবাযত্নের জন্য তিনিও নির্বাচিত হন। কবিগুরু তাকে দেখতে পেয়ে তার কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'এত বড় হয়ে গেছ!' বলে সজল দৃষ্টিতে আনন্দ প্রকাশ করেন। তারপর চাপা কণ্ঠে বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতার জন্য আরও অনেক পথ হাঁটা বাকি। তবে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লক্ষ্য পূরণে লড়াই করে যেতে হবে। অনুরোধ রইল কিন্তু।' কবির এই কথায় হেরাম্বলাল নতুন করে উদ্দীপ্ত হন! তিনি প্রতীজ্ঞা করেন, 'ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে জীবন উৎসর্গ করবো।' ১৯২৫ সালের ২৩ মার্চ তারিখে ড. সান-ইয়াৎ সেন পিকিং মারা যান। তার মৃত্যু সংবাদ শুনে মাসনিকভাবে প্রচণ্ড আঘাত পান হেরাম্বলাল।

১৯২৬ সালের ১ আগস্ট মাসে নাগাসাকি শহরে রাজনৈতিক দল সেইয়ুকাই প্রধান সাংসদ ইমাজাতো জুনতারো এর উদ্যোগে প্রথম এশিয়া জাতিগোষ্ঠী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ওওকাওয়া শুমেই বিশেষ কারণে অনুপস্থিত ছিলেন, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা বিপ্লবী রাজামহেন্দ্র প্রতাপ পাসপোর্ট না থাকার কারণে জাপান প্রবেশের অনুমতি পাননি। তথাপি অনধিক সংখ্যক সদস্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়, তাতে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে রাসবিহারী বসু এবং হেরাম্বলাল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন জাপানে এশিয়ার শীর্ষনেতাদের প্রথম সম্মিলন হিসেবে পরিচিত।

১৯২৭ সালে জাপান সরকার ব্রিটিশের চাপে জাপানে আশ্রিত ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের উপর কড়া নজরদারি আরোপ করে। হেরাম্বলাল জাপানে ভারতীয়দের অবস্থা পর্যবেক্ষণে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় ছুটোছুটি করেন। জাপান সরকার ৩ মাসের মধ্যে হেরাম্বলালকে জাপানত্যাগের নির্দেশ দেয়। এ সময় নেতৃস্থানীয়রা 'জাপানে রাসবিহারী বসু আছে তুমি চীনে গিয়ে লড়াই কর তাতে আমাদের সহযোগিতা থাকবে' বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেন।

ওই বছর মার্চ মাসে ৩টি গাড়ি আর ৪টি অটোবাইকের কড়া প্রহরাধীনে পুলিশ তাকে য়োকোহামা বন্দরে নিয়ে যায়। তারপর ৪ জন গোয়েন্দা পুলিশ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে

জাহাজে গিয়ে ওঠেন। পেছন ফিরে দেখেন বেশ দূরে তার স্ত্রী ছোট ছেলেদের নিয়ে অবিরাম হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানাচ্ছে। ছেলেরাও ছোট ছোট হাত নেড়ে বাবাকে বিদায় জানাচ্ছে। জাহাজের ডেকে অশ্রুসজল চোখে যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় নিঃশব্দে তাই দেখে দেখে অশ্রুপাত করেন। সে এক হৃদয় বিদারক করুণ দৃশ্য! নিজেকে এর চেয়ে অসহায় আর কোনোদিন ভাবেননি চরমপন্থী বিপ্লবী দুঃসাহসী হেরাম্বলাল গুপ্ত। ৬ দিন পর সাংহাই বন্দরে পৌঁছান। ভারতের বিখ্যাত বিপ্লবী সাংহাইয়ে আসবেন বলে গত দু'মাস ধরে এখানকার জাপানি পর্যটক হোটেলে তার নামে ঘর ভাড়া কর রাখা হয়েছে।

১৯২৭ সালের ১ থেকে ৩ নভেম্বর সাংহাইয়ে দ্বিতীয় এশিয়া জাতিগোষ্ঠী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাপান, চীন, ভারত, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের একাধিক নেতা অংশগ্রহণ করেন। ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে হেরাম্বলাল নির্বাচিত হন। কিন্তু সেদিন ব্রিটিশ গোয়েন্দা পুলিশের কারণে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি মাঞ্চুরিয়ায় চলে যান। তার পরিবর্তে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন বিপ্লবী রাজামহেন্দ্র প্রতাপ।

১৯২৮ সালে যখন জাপান সরকার তাকে জাপান ত্যাগের আদেশ দিয়ে বের করে দেয় তখন ছোট ছেলেটি ছিল মায়ের গর্ভে। জন্মের পর পিতার মুখ দেখতে পায়নি। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তিন ভাই পত্রিকার হকারি থেকে শুরু করে নানা ধরনের কাজ করে নিজেদের সাধ্যমত পড়ালেখা চালিয়েছে। হেরাম্বলাল পিতা হিসেবে একটি পয়সাও সাহায্য করতে পারেননি, মাঝেমাঝে সাংসারিক খরচ ছাড়া। স্ত্রী ভরণপোষণের অভাবে আবার বিয়ে করেছেন জনৈক জাপানিকে। বৃদ্ধ বয়সে শাশুড়ি তিনটি ছেলেকে মানুষ করেছেন। ছোট ছেলেটিও কিশোর সৈনিক হিসেবে মিয়াজাকি-জেলায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। রাসবিহারী বসু সেই সংবাদ তাকে দিলেন। য়োকোহামাতে রেখে আসা মেয়ে দুটি অনেক বড় হয়ে গেছে, কী করছে কে জানে? এই দুঃসংবাদ পেয়ে হেরাম্বলাল বুঝতে পারেন দীর্ঘদিন কোনো খোঁজখবর না নেয়া ও খরচপাতি না পাঠানোর কারণে তার সংসার ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রচণ্ড দায়িত্বহীনতা ও অপরাধবোধ কাজ করতে থাকে তার মনের মধ্যে। ভীষণ অপরাধবোধে জ্বলতে থাকেন। মনে মনে ছেলেমেয়েদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর চোখের জলে একাকার হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

১৯৩২ সালে পুনরায় সাংহাইয়ে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সহকর্মীদেরকে জড়ো করে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। মাঞ্চুরিয়ায় প্রচুর পরিশ্রমের কারণে তার শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ ২ মাস হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে ভাল হয়েছিলেন। এসময় ব্রিটিশ তাকে নকল ডলার বানানো মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করতে চেয়েছিল। কিন্তু চীনা গোয়েন্দা পুলিশের করণে সফল হয়নি।

ইংরেজ-বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন ব্রিটিশদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠছে। এই আন্দোলনে জাপান প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, জাপান-চীন প্রবাসী হেরাম্বলাল গুপ্ত, রাজামহেন্দ্র প্রতাপ এবং আমেরিকা-ক্যানাডা প্রবাসীদের প্রতিষ্ঠিত গদর পার্টির সক্রিয় কর্মতৎপরতা ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের প্রধান প্রেরণাদাতা। কাজেই সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে পলাতক বিপ্লবী বিশেষ করে রাসবিহারী বসু, হেরাম্বলাল গুপ্তকে গ্রেফতার করা যায়। রাসবিহারী বসু জাপানে বিয়ে করে জাপানি নাগরিকত্ব গ্রহণ করার ফলে সে সুযোগ নস্যাৎ হয়ে গেছে। এখন হেরাম্বলাল ও রাজামহেন্দ্র প্রতাপকে গ্রেফতার করতে ব্রিটিশ সরকার সর্বদাই সচেষ্ট।

বিশেষ করে হেরাম্বলালের মাথার উপর ঝুলছে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বিরাট লোভনীয় টাকার পুরস্কার অর্থাৎ তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পারলে কয়েক লক্ষ ভারতীয় রুপী পাওয়া যাবে! তাই লোভী ব্রিটিশ এবং ভারতীয় গোয়েন্দা পুলিশও খুব তৎপর ছিল তাদের ধরিয়ে দিতে। সাংহাইস্থ ব্রিটিশ দূতাবাস নানকিং সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে হেরাম্বলালকে ব্রিটিশ দূতাবাসে যেতে বাধ্য করে এবং সেখানে তাকে গ্রেফতার করা হয়। রাখা হয় ইংরেজ ও ফরাসী কর্তৃক যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত 'ওয়াতারি' কারাগারে। এভাবে হাজতে আটকে রেখে ৪০ দিন পর তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু তিনি ব্রিটিশ জেলহাজত থেকে বেরিয়ে আসতেই আবার ফরাসি গোয়েন্দা পুলিশের হাতে বিনা নোটিশে গ্রেফতার হন। ফরাসি নিয়ন্ত্রিত 'লুকাবে' কারাগারে বন্দী করে রাখা হয় তাকে। মুক্তি লাভ করে সাংহাইয়ে অবস্থিত প্রতিটি ভারতীয়কে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে তাদেরকে বোঝাতে থাকেন। রাতদিন পরিশ্রম করেন। তাদেরকে ভারতের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎকে বোঝাতে গিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল হেরাম্বলালকে।

এরকম কর্মতৎপরতায় যখন ব্যস্ত তখন একদিন এক জাপানির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে পরে দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার সঙ্গে কথা বলে জাপানে রেখে আসা স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের মুখ মনে পড়ে যায়। গৃহকর্তাবিহীন কেমন আছে তারা? তার তো যাওয়ার উপায় নেই, তাই আবেগবশত তার পরিবার কেমন আছে দেখে আসার জন্য ওই জাপানিকে পাঠান। সেই জাপানি খোঁজাখুঁজি করে ৩ মাস পর তাকে জানান যে, হেরাম্বলালের দ্বিতীয় স্ত্রী'র অন্যঘরে বিয়ে হয়েছে, ৩টি সন্তান শাশুড়ির কাছে আছে আর য়োকোহামাতে রেখে আসা মেয়ে দুটি অনাথ আশ্রমে লালিত-পালিত হচ্ছে। য়োকোহামার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেছে।

১৯৩৩ সালে তিনি সাংহইয়ে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের কার্যালয় স্থাপন করেন। সাংহাইয়ে তখন প্রচুর ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলো থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে আন্দোলনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান। ১৯৩৭ সালে তিনি ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমিতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এই সময় জাপানে ৩টি শাখায় বিভক্ত ছিল স্বাধীনতা আন্দোলন। একটি রাজামহেন্দ্র প্রতাপের ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন, কোবে অবস্থিত এ. এম সাহাই কেন্দ্রিক কোকুমিন কিয়োকাই (ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন) এবং রাসবিহারী বসু কর্তৃক স্থাপিত ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ। তৎকালীন সময়ে রাসবিহারী বসু, হেরাম্বলাল গুপ্ত এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন অসাধারণ যুক্তিবাদী এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব বা অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাবে না।

১৯৪০ সালের ১১ জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় কোনোয়ে ফুমিমারো মন্ত্রীসভার আয়োজনে জাপানি সম্রাটের বংশানুক্রমিক ধারায় ২,৬০০ স্মারক বর্ষ পালিত হতে যাচ্ছে মহাএশিয়া সম্মেলনের মাধ্যমে। এই সুসংবাদ তার কাছে মনে হল স্বপ্নের মতো। সুদীর্ঘ ১৩ বছর পর টোকিয়োতে ফিরবেন, প্রিয় সন্তানদের মুখ দেখতে পারবেন, জাপানি বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে ভাবতেই কি আনন্দ তার! বড়দাতুল্য রাসবিহারী বসুকে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্মৃতিময় সেইয়োকেন্ মিলানায়তনে এসে পৌঁছুলে ছুটে এসে রাসবিহারী হেরাম্বলালকে আলিঙ্গন করেন। সম্মেলনে এশিয়ার একাধিক দেশের প্রধানরা বক্তৃতা

করেন। কিন্তু তাদের কথা শুনে তার মনে হয়, এশিয়ার মুক্তি এবং ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিকতা ও জনবলের সংকট বিদ্যমান।

তিনি মঞ্চে উঠে গিয়ে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন; উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, 'এশিয়া মহাদেশ এশিয়ানদের সাহসী সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ইউরোপ-আমেরিকার আগ্রাসন থেকে মুক্ত থাকা সক্ষম হবে। কাজেই এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্রকে পরস্পরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিৎ। এশিয়াবাসী হিসেবে পরস্পরের প্রতি আগ্রাসী হওয়া একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কাজেই এই প্রথম এশিয়ার ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলোকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। সকলে উঠে দাঁড়াও! এশিয়া জাতিগোষ্ঠীর সহযোগী ভায়েরা!'

তার বক্তৃতায় করতালিতে ফেটে পড়ে সম্মেলন কক্ষ। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের সমস্ত ব্যয়ভার জাপান সরকার বহন করে। পরের দিন ছেলেরা তার জন্য অতিথিশালায় অপেক্ষা করছিল। দ্রুত সম্মেলনের কাজ শেষে করে ফিরে আসেন তিনি। রাসবিহারী বসু তার ছেলেদের নিয়ে এসেছেন। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। ছেলেরা এত বড় হয়ে গেছে দেখে আনন্দে সজল হয়ে ওঠেন। পিতা হিসেবে এই পর্যন্ত কিছুই করতে পারেননি, এই দুঃখের শেষ নেই, মনে মনে ছেলেদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। কাছাকাছি একটি রেস্টুরেন্টে তাদের নিয়ে গিয়ে পছন্দানুযায়ী খাবার খাওয়ালেন পাশে বসে থেকে। ছেলেদেরকে দিগজ্ঞানশূন্য হয়ে একাগ্রচিত্তে খেতে দেখে হেরাম্বলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ভাবেন, আজ তার এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যে করেই হোক ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে, তারপর সন্তানদের নিয়ে স্বাধীন স্বদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। এই রকম আশাবাদ বুকে নিয়ে ছেলেদেরকে আবার দেখা হবে বলে প্রতীজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বিদায় জানান। বিদায় দিয়ে দোকান থেকে যেই বেরোতে যাবেন অমনি সম্মুখ ও পেছন থেকে দুজন অজ্ঞাত লোক তরোয়াল দিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়! অকস্মাৎ এই ঘটনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়া হেরাম্বলাল পাশে থাকা চেয়ার তুলে একজনকে ছুঁড়ে মারেন। অন্যজনের উদ্যত তরোয়ালকে দুহাতে আটকিয়ে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দেন। পাশে বসে থাকা কয়েকজন বাঙালি ও দোকানের মালিক পুলিশকে ফোন করে খবর দিলে তারা দ্রুত এসে দু'জনকে গ্রেফতার করে। তারপর রক্তাক্ত অবস্থায় হেরাম্বলালকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কয়েকটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু খালি না পেয়ে শেষে মুকোজিমার পার্শ্ববর্তী শহর আসাকুসার রাকুসানদো হাসপাতালে ভর্তি করান পুলিশ কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের ফটকে ঢুকতেই জনৈক ডাক্তার তাকে দেখে অবাক হয়ে বলে ওঠেন, 'আরে সাংহাইয়ের ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রেসিডেন্ট না? যে করেই হোক প্রাণ বাঁচাতে হবে আগে। ডাক্তার যতখানি সম্ভব তাড়াতাড়ি ওষুধ লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করেন। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সুস্থ হয়ে ওঠে তার জন্য নির্ধারিত আশ্রয়ে ফিরে যান।

রাজামহেন্দ্র প্রতাপ এবং রাসবিহারী বসু খবর পেয়ে দেখতে আসেন। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত শাশুড়ি এবং ছেলেমেয়েরা এসে তাকে সেবাযত্ন করেন। সাংহাই ফিরে যাওয়ার আগে শাশুড়ি এবং ছেলেমেয়েদের কাছে পিতা হিসেবে গুরুদায়িত্বসমূহ পালন করতে না পারার অক্ষমতার জন্য বারংবার ক্ষমা চান। তারপর যতখানি সম্ভব সংসার চালানোর খরচ দিয়ে বিদায় নেন।

১৯৩৯ সালে রাসবিহারী বসু সাংহাইয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজে গেলে হেরাম্বলালের ছোট মেয়ে সায়োকোকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বহুদিন পর পিতা ও কন্যার শুভমিলন এতই আনন্দদায়ক হয়েছিল যে হেরাম্বলাল বারংবার রাসবিহারীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তখন রাসবিহারী হেরাম্বলালকে বলেন যে, 'ভারতের স্বাধীনতা যে করেই হোক ভারতীয়দের শক্তিবলে অর্জন করতে হবে। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ জাপানিদের দখলে চলে গেলে এই আন্দোলন সম্পূর্ণই পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে একটি শুভ সংবাদ আছে, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুভাষচন্দ্র বসু এখন জার্মানীতে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। জাপান প্রবাসী ভারতীয় সহকর্মীরা তাকে জাপানে আহবান করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে চায় এই বিষয়ে আমি সমর্থন দিয়েছি, তুমি কি বলো?' এই প্রশ্নের জবাবে হেরাম্বলাল তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন, 'আমি অবশ্যই রাজি'।

রাসবিহারী বসু দু'বার সাংহাইয়ে কাজে গিয়েছিলেন। শেষবার যখন যান তখন হেরাম্বলাল তার মুখাবয়ব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন বড়দা সুস্থ নন। আসলেই রাসবিহারী বসু মরণব্যাধি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন জাপানে যক্ষ্মারোগের প্রকোপ ছিল খুব বেশি। অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করতেন। তার স্ত্রী তোশিকো বসু একই রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন ভোগে মারা যান (১৯২৫ সালের ৪ মার্চ মাত্র ২৬ বছর বয়সে)।

১৯৪১ সালে জাপান আমেরিকার হাওয়াইই দ্বীপে অবস্থিত নৌঘাঁটি আক্রমণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনও হঠাৎ করে নতুন গতি খুঁজে পায়, অবসান ঘটে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার। বহু বছরের পরাধীন ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষের মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাসবিহারী বসু বিশ্বস্ত এম এন রায়কে মাঞ্চুরিয়াতে দূত হিসেবে পাঠিয়ে ভারতীয়দেরকে সংগঠিত করার দায়িত্ব দেন। একই সময়ে হেরাম্বলালও একই কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করেন সাংহইয়ে, হংকং-এ।

যেদিন চীন-জাপান সংঘর্ষ বেঁধেছিল সেদিন থেকেই রাসবিহারী বসু ও হেরাম্বলাল গুপ্ত জাপান সরকারের প্রধান কর্মকর্তাদেরকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করে আসছিলেন, সেটা এবার ফলপ্রসূ হয়। ভারত তখনও ব্রিটিশের দখলে।

হংকং দখলের পর টোকিও তেৎসুদো হোটেলে রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে টোকিও, য়োকোহামা, ওসাকা, কোবে, নাগাসাকি প্রভৃতি জায়গায় বসবাসরত ৭০ জনেরও বেশি ভারতীয় জড়ো হয়ে 'ভারতীয় স্বাধীনতা লীগে'র মহাসভা আহবান এবং লীগের পতাকা উত্তোলন করেন। সাংহাইয়েও একই ঘটনা ঘটে হেরাম্বলালের নেতৃত্বে। এই সংবাদ ভারতে পৌঁছুলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় বিপ্লবীদের মধ্যে।

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে টোকিওতে 'ভারতীয় স্বাধীনতা লীগে'র আয়োজনে একটি মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শিরোনাম ছিল 'আমেরিকা-ব্রিটেন ধ্বংস করো।' এই সম্মেলন প্রধানমন্ত্রী তোজো হিদেকিসহ অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে আন্দোলিত করেছিল। সম্মেলনের পর রাসবিহারী বসু রাজকীয় সেনা বাহিনীর দপ্তরে উপস্থিত হয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উপায় হিসেবে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ জানান কর্তৃপক্ষকে। এই সভায় রাসবিহারী বসুর পাশে হেরাম্বলাল গুপ্তও উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য সাংহাইয়ে অবস্থিত হেরাম্বলাল গুপ্ত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে একইভাবে হংকংয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে ব্রিটিশ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সম্মেলনের আয়োজন করেন। তারপর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে গিয়ে জানতে

পারেন যে, সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয়ে আছেন। তিনি তাদেরকে মুক্ত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে সিঙ্গাপুর, সাংহাই ও হংকংয়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর অনুমতিক্রমে জাপানি সেনাবাহিনীর ছোট্ট একটি ইউনিট হিসেবে তাকে তার প্রধান করে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করেন যার সদস্য সংখ্যা ৩,০০০।

১৯৪৩ সালের মে মাসের ১৬ তারিখ সকালে সুভাষ চন্দ্র বসু জাপানের মাটিতে পা রাখেন। তার আগমনের আগে রাসবিহারী বসু ব্যাংকক সম্মেলন শেষে প্রধান সেনা দপ্তরের মেজর জেনারেল আরিয়োশিকে বলেন, 'সম্প্রতি আমার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না, বয়সও হয়েছে। নেতৃত্ব দেবার মতো শারীরিক অবস্থাও আমার নেই। জার্মানী প্রবাসী সুভাষ চন্দ্র বসুকে জাপানে আমন্ত্রণের অনুরোধ করতে চাই।'

উত্তরে আরিয়োশি অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে বলেন, 'সরাসরি জিজ্ঞেস করছি, যদি সুভাষ বসুকে জাপানে আমন্ত্রণ জানানো হয় আর তাকে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে প্রবাসীরা সম্মতি দেন তাহলে আপনার বর্তমান অবস্থান কি হবে?'

রাসবিহারী বসু দ্রুত এবং খুব সহজে উত্তর দেন, 'সুভাষচন্দ্র বসু যদি প্রেসিডেন্ট হতে সম্মত হন, তাহলে তার নিচে আমি সানন্দে কাজ করবো।' রাসবিহারী বসুর এই সরল স্বীকারোক্তিতে শুধু আরিয়োশি নন, আশ্চর্য হয়েছিলেন মেজর ফুজিওয়ারা, এফ-কিকান ইউনিট প্রধান ইওয়াকুরো হিদেও প্রমুখ। জার্মানী থেকে সুভাষ চন্দ্র বসুকে জাপানে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যবস্থা করেন বিহারী বসু। শেষ পর্যন্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর ব্যাপারে জার্মানী পক্ষের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে তাকে মুক্তি দিতে রাজি হয় জার্মানী সামরিক সরকার। তারপর তাকে জাপানে নিয়ে আসা হয় এক মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের অনস্বীকার্যতার বিষয়ে সুভাষ বসুর মতো একই মনোভাব পোষণ করতেন রাসবিহারী বসু, হেরাম্বলাল গুপ্ত। যে কারণে তাদের ওপর আস্থা রাখতে পেরেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৪৩ সালের ৪-৭ জুলাই সিঙ্গাপুরস্থ মহাএশিয়া মিলনায়তনে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের প্রধান নেতৃবৃন্দের মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট রাসবিহারী বসু দাঁড়িয়ে আজকের সভায় একজন চমৎকার নতুন অতিথি হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুকে পরিচয় করিয়ে দেন। সেইসঙ্গে লীগের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুভাষ বসুকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য নিজের ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি সকলকে অবহিত করেন যে, ইতিমধ্যে টোকিওতে আমাদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং তিনি দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতা এবং বার্ধক্যজনিত কারণে বর্তমান পদ তার পক্ষে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান। এই কথা বলার পর সভার সকল নেতৃবৃন্দ এবং সদস্য প্রাণবন্ত করতালি দিয়ে সুভাষ বসুকে স্বাগত জানায়। প্রবাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বমান্য সম্মানিত পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার কারণে রাসবিহারী বসু তখন তাকে 'নেতাজি' উপাধি ঘোষণা করেন। নেতাজি রাসবিহারী বসুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুঘন্টাব্যাপী এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। বলেন, 'সশস্ত্র আন্দোলন ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের আর কোনো পথ খোলা নেই। তার জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী সেনাবাহিনী। পৃথিবীতে অতীতে যতগুলো বিপ্লব ঘটেছে তার পেছনে ছিল সশস্ত্র সেনাদল। আমেরিকা, রাশিয়া, ইতালি,

তুরস্ক প্রভৃতি দেশে সার্থক বিপ্লব ঘটিয়েছে সুদক্ষ, দেশপ্রমিক, জাতীয়তাবোধে বলীয়ান সেনাবাহিনী। ঔপনিবেশিক ভারতে গত ২০০ বছরের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে এই প্রথম সশস্ত্র সেনা যুদ্ধে নেমেছে। বর্তমান অবস্থায় আমি তোমাদেরকে কী দেখাতে পারি, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু কিন্তু দিতে পারি একটি সুসংবদ্ধ জাতীয় সেনাবাহিনী এবং করতে পারি দেশমুক্তির প্রতীজ্ঞা এর বাইরে আর কিছু দেবার নেই। যদি তোমরা জন্ম-মৃত্যুকে সত্য জেনে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো তাহলে আমি কথা দিচ্ছি অবশ্যই তোমাদেরকে বিজয় এবং স্বাধীনতা উপহার দিতে পারবো। চলো দিল্লী।'

তার এই অনলবর্ষী বক্তৃতা শুনে হাজার হাজার ভারতীয় জাতীয় সেনা, প্রবাসী ভারতীয় এবং স্থানীয় সিঙ্গাপুর-মালয় অধিবাসীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে 'চলো দিল্লী', 'চলো দিল্লী' বলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাত উঁচিয়ে নেতাজিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

১৯৪৩ সালের শেষ দিকে 'স্বাধীন ভারত সরকার' যখন ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন ভারতীয় জাতীয় সৈন্য সংখ্যা ৭০ হাজার। হেরাম্বলাল তখন ভারতের স্বাধীনতা এই যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশা পোষণ করতে শুরু করেন। নেতাজির নেতৃত্বে লাভ করেন নতুন কর্মোদ্যম। তার কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হতে থাকে ক্রমশ। তিনি সাংসাইতে নিজের স্থায়ী ঠিকানা রেখে হংকং, সাইগন, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি জাপানি অধিকৃত অঞ্চলসমূহে অবিরাম জাপানি ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজ ছাড়াও গোপন তথ্যের আদান-প্রদানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত।

১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে হেরাম্বলাল গুপ্ত জাপানি ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে সংযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদানের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। ও সময় তিনি এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপানি সামরিক দপ্তর প্রধান জেনারেল তেরাউচি হিসাইচি, উত্তর বার্মাস্থ সদর দপ্তর প্রধান লে. কর্নেল মুতাগুচি রেনইয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মণিপুর প্রদেশের ইম্ফল অভিযানে ৭০ হাজার ভারতীয় সেনা ও স্বেচ্ছাসেবী সেনাকে সংযুক্ত করার অনুরোধ জানান।

১৯৪৫ সালে ১৫ আগস্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজকে ভেঙ্গে দিয়ে নেতাজি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কেউ জানে না কোথায় আছেন তিনি। তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তাকে ব্রিটিশ সরকার। এ সময় কর্নেল ভোঁসলে ঘোষণা করেন, নেতাজি না থাকলেও, জাপানিরা হেরে গেলেও আজাদ হিন্দ ফৌজ শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। কয়েক হাজার ভারতীয় সেনা নিহত হলেও কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর কোনো কোনো দল। ব্রিটিশদের আর কোনো শক্তি ছিল না ভারতীয়দেরকে দাবিয়ে রাখার। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসক পাক-ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে লেজ গুটায়।

১৯৫০ সালে হেরাম্বলালের বয়স তখন ৬১ বছর। ২৯ এপ্রিল তিনি জাপানি নারী কিনোশিতা শিজুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

১৯৫৬ সালের দিকে মাও জেদং এবং চুয়েন লাই এর তিনি সমালোচনা করেন এবং ন্যাশনালিস্ট ড. সান-ইয়াৎ সেনের মতবাদ চীনাদেরকে শেখানোর জন্য আহবান জানান। ফলে 'বিপ্লব পরিপন্থী' বলে তাকে কয়েকবার জেল হাজতে আটকে রাখা হয়। অবশেষে সরকার চীনদেশ ত্যাগের আদেশ ঘোষণা করলে তার পক্ষে আর সাংহাইয়ে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কমিউনিস্টদের সমালোচনার কারণে বারংবার তাকে জেলে আটক করে রেখেছে

কর্তৃপক্ষ। এবং প্রতিবারই স্ত্রী শিজুকে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়েছে। ১৯৮১ সালে ৯৩ বছর বয়সে আফগানিস্তানে মারা যান।

(অধিকাংশ তথ্যই হেরাম্বলালের শেষ জীবনের বন্ধু জনৈক অধ্যাপক কুসাবিরাকি জানজো (১৯২৮-) লিখিত 'রেকিশি নি অকিজারি নি সারেতা ইনদো দোকুরিৎসু নো হিৎসুওয়া' বা 'ইতিহাসের আড়ালে ঢাকা ভারতীয় স্বাধীনতার গুপ্তকথা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। স্বব্যয়ে প্রকাশিত, বিনামূল্যে প্রচারিত গ্রন্থটি বিপ্লবীর মৃত্যুর ৩২ বছর পর লিখিত ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার ধারাবাহিকতার অভাব এবং কিছু তথ্যের ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি বিদ্যমান। তথাপি যতখানি সম্ভব বাস্তবতার ভিত্তিতে তথ্য সন্নিবেশিত করে বিস্মৃত বিপ্লবী হেরাম্বলাল গুপ্তের জীবন ও কর্মকাণ্ড বাঙালি পাঠকের কাছে তুলে ধরার ইচ্ছেটাই এই প্রবন্ধ রচনার নামান্তর। ভবিষ্যতে আগ্রহী কেউ হয়ত আরও তথ্য আবিষ্কারের মাধ্যমে এই বিপ্লবীর জীবনেতিহাস রচনা করবেন বলে আশা করা যায়।)

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. অগ্নি বিপ্লবী হেরাম্বলাল গুপ্ত এবং ভারতের স্বাধীনতা– প্রবীর বিকাশ সরকার, 'উইকলি বেঙ্গলী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, প্রকাশকাল ২০০৯-২০১০।

২. হেরাম্বলালের শেষ জীবনের বন্ধু অধ্যাপক কুসাবিরাকি জানজো লিখিত 'রেকিশি নি অকিজারি নি সারেতা ইনদো দোকুরিৎসু নো হিৎসুওয়া' বা 'ইতিহাসের আড়ালে ঢাকা ভারতীয় স্বাধীনতার গুপ্তকথা' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৩. পাঁচ স্মরণীয় বিপ্লবী– সম্পাদনা দেবপ্রসাদ জানা, প্রকাশকাল ২০০৮ কলকাতা।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ



সন্দ্বীপ। বঙ্গোপসাগরের একটি দ্বীপের নাম। মেঘনা মোহনার সাগর সঙ্গমে এর অবস্থান। এটি তিন হাজার বছরের পুরানো। সন্দ্বীপ ব্রিটিশ আমলে (১৮৫৮ সালে থেকে) নোয়াখালি জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর ১৯৫৪ সালে সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম জেলার একটি থানা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই সন্দ্বীপে জন্মেছিলেন এক বিশ্ববরেণ্য বিপ্লবী। তার নাম মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। তিনি ভারত উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের পুরোধা। তার উত্তরসূরী নেতৃবৃন্দ তাকে কাকাবাবু বলে ডাকতেন। এই নামে তিনি বেশ পরিচিতি পেয়েছিলেন।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জন্ম ১৮৮৯ সালের ৫ আগস্ট। সন্দ্বীপের মুছাপুর গ্রামে। নিজের জন্ম তারিখ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, 'বাংলা ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসের কোন এক সোমবারে আমি এই দ্বীপের মুছাপুর গ্রামে জন্মেছি। আমাদের দরিদ্র পরিবারের কারুরই জন্মবার্ষিকী পালিত হত না। আমার জন্ম তারিখও কোনোদিন পালিত হয়নি। তাই জন্মের তারিখ আমার মনে নেই, মায়ের মুখে শুনে শুধু সাল, মাস ও বারের কথাই আমার মনে আটকে রয়েছে। ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসের ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ তারিখ সোমবার ছিল। খ্রিস্টীয় সনের হিসাবে এই তারিখগুলি ১৮৮৯ সালের ২২ জুলাই, ২৯ জুলাই, ৫ আগস্ট ও ১২ আগস্ট। এই চারটি তারিখের মধ্যে কোনটি ছিল আমার প্রকৃত জন্ম দিন তা জানার আর কোন সম্ভাবনা নেই। সাধারণত আগস্ট মাসকেই আমি আমার জন্মের মাস বলে থাকি'। পরে তিনি ৫ আগস্টকে নিজের জন্মদিন বলে মনস্থির করেন।

বাবা মুন্সি মনসুর আলি (১৮২৭-১৯০৫)। তিনি সন্দ্বীপের আদালতে আইন ব্যবসা করতেন। মা চুনা বিবি। চুনা বিবি মুন্সী মনসুর আলির দ্বিতীয় স্ত্রী। মনসুর আলির দুই পরিবারে ৪ টি ছেলে সন্তানের জন্ম হয়। দ্বিতীয় স্ত্রী চুনা বিবির ঘরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জন্ম। তিনি ছিলেন ভাইদের মধ্যে সবার ছোট। তার বড় ভাই মহব্বত আলি, মকবুল আলি ও খুরশিদ আলম।

বর্ণমালার হাতেখড়ি বাবার কাছে। তারপর মদন মোহন তর্কালঙ্কারের কাছে তার শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ শেষ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯৯ সালে প্রাইমারি পড়াশুনা সমাপ্ত করে তিনি হরিশপুর মডেল ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু এই স্কুলে দু'বছরের বেশি তিনি পড়াশুনা করতে পারেননি। স্কুলের বেতন বকেয়া পড়ার কারণে

তার নাম কাটা যায়। এ সময়ে তিনি কিছুদিন কোরান পাঠ শেখেন। পারিবারিকভাবে তিনি ফার্সি ভাষা জানতেন। কিছুদিন পর তিনি বামনির আখতারিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে পড়াশুনাকালে ১৬ বছর বয়েসের সময়; ১৯০৫ সালে তার বাবা মারা যায়। সংসারের অভাব অনটনের মধ্যে তার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পালা। এই সময় একদিন ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর উমেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মুজফ্ফর আহ্‌মদকে ইংরেজি পড়াশুনা করার জন্য উৎসাহ দিলেন। তিনি মুজফ্ফর আহ্‌মদকে আগে থেকেই চিনতেন। তার পরামর্শে তিনি বরিশালের বুড়িরচর গ্রামে যান। সেখানে তিনি এক কৃষক পরিবারে শিশুদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। উদ্দেশ্য, কিছু টাকাকড়ি সঞ্চয় করে বরিশালের কোন স্কুলে ভর্তি হওয়া। ইতোমধ্যে বড় ভাই মকবুল আলি খোঁজ-খবর নিয়ে বুড়িরচরে গিয়ে মুজফ্ফর আহ্‌মদকে সন্দ্বীপে ফিরিয়ে নিয়ে আনেন। দীর্ঘ ৫ বছর পর বড় ভাই তাকে সন্দ্বীপের স্কুলে ভর্তি করে দেন।

মুজফ্ফর আহ্‌মদের ভাষায়, '১৯০৬ সালের মার্চ মাসে আমি সন্দ্বীপের কার্গিল হাইস্কুলে নিচের ক্লাশে ভর্তি হলাম। আমার তখন ষোল-সতের বছর বয়স। ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেরা তা সত্ত্বেও আমাকে ক্লাশে বসতে দিল, তার কারণ আমি তাদের তুলনায় বাংলা অনেক ভালো জানতাম। মাদ্রাসায় পড়ার সময়েও আমি বাংলা চর্চা কখনও ছেড়ে দেইনি। তার মানে বাংলা বই পেলে আমি পড়তাম, বাংলা মাসিক বা সাপ্তাহিক কাগজ পেলে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত না পড়ে ছেড়ে দিতাম না। মাসিক কাগজে নানারকম প্রবন্ধ পড়া হতেই আমার মনে ইংরেজি শেখার আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। ইংরেজি ভাষা শিখে তাতে একজন পণ্ডিত হয়ে যাব এই উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমার একান্ত বাসনা ছিল ইংরেজি বই বুঝতে পারা।'

পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি লেখালেখি করার চেষ্টা করতেন। ১৯০৭ সালে কলকাতার সাপ্তাহিক 'সুলতান'-এ তার প্রথম একটা লেখা প্রকাশিত হয়। তিনি সন্দ্বীপে থাকাকালীন সময়ে ওই পত্রিকায় স্থানীয় খবর পাঠাতেন। সম্পাদক মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাকে লেখালেখি করার জন্য উৎসাহ দিতেন।'

১৯১০ সালে তিনি নোয়াখালি জেলা স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৩ সালে ২৩ বছর বয়সে তিনি এই স্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর তিনি হুগলি কলেজে আই. এ ভর্তি হন। তিনি ছাত্র পড়িয়ে নিজের খরচ ও পড়াশুনার খরচ যোগাতেন। এ ছাড়া তার বড় ভাই কিছু টাকা দিতেন। হুগলিতে পড়াশুনাকলীন সময়ে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতা চলে যান। তারপর তিনি কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজ থেকে আই. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আই. এ পড়াশুনাকালে তিনি কলকাতায় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভ্য হন। ১৯১৫ সালে সমিতির সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯১৬ সালে এক বছর ধরে এখানে ওখানে চাকরি করেন।

১৯১৭ সালে যোগ দেন বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেসের সহকারী স্টোরকিপার পদে। এ কাজে তিনি এক বছর ছিলেন। মাসিক বেতন ছিল ত্রিশ টাকা। এরপর তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে গভর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টে উর্দু থেকে বাংলা অনুবাদকের কাজ করেন। এখানে তিনি মাত্র একমাস কাজ করেছিলেন। এরপর একমাস তিনি কলকাতায় স্কুল পরিদর্শকের অফিসে কাজ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সার্বক্ষণিক কর্মী হন। তিনি উদ্যোগী হয়ে ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে ষাট টাকা ভাড়ায় সমিতির কার্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' বের হত। পত্রিকার যুগ্ম

সম্পাদক হিসাবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের নাম ছাপা হলেও সম্পাদকীয়র সব কাজ মুজফ্ফর আহ্মদই করতেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

নিজের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে মুজফ্ফর আহ্মদ সাহিত্য ও রাজনীতিকে এক সূত্রে গেথে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হল না।

তার ভাষায়, 'আমার জীবনের পেশা কি হবে– সাহিত্য না রাজনীতি এই নিয়ে আমি পুরো ১৯১৯ সাল ভেবেছি। সত্য কথা বলতে আমার মনের ভিতরে সাহিত্য ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব চলছিল। কবি আমি ছিলাম না। গল্প লেখক বা ঔপন্যাসিক হওয়ার স্বপ্ন আমি কোনোদিন দেখিনি। সেই ভাষা কোনদিন আমার আয়ত্ত্বে ছিল না। আমার প্রবল বাসনা ছিল যে, আমি একজন প্রবন্ধকার হব। আমার পরবর্তী জীবনেও অর্থাৎ রাজনীতিক জীবনে তা হওয়ার পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল বলে আমার মনে হয় না। তবুও আমি প্রবন্ধকারও হতে পারি-না। যদিও আমি খবরের কাগজ চালিয়েছি।.. আমার মনে যে সাহিত্য ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব চলেছিল তাতে শেষ পর্যন্ত জয় হল রাজনীতির। একটা কিছুতে নিজেকে যে বিলিয়ে দেব সে তো আগেই স্থির করেছিলাম। সেই জন্য তো আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সব সময়ের কর্মী হতে পেরেছিলাম। ১৯২০ সালের শুরুতে আমি স্থির করে ফেললাম যে, রাজনীতেই হবে আমার পেশা। আমি রাজনৈতিক সভা সমিতি ও মিছিলে যোগ দেওয়া শুরু করেছিলাম তো ১৯১৬ সাল থেকেই'।

কাজী নজরুল ইসলাম তখন বাঙালি রেজিমেন্টে ছিলেন। তার লেখা অনেক কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলামের সাথে মুজফ্ফর আহ্মদ-এর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ১৯২০ সালে কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতায় চলে আসেন এবং ওই সমিতিরি বাড়িতে ওঠেন। এসময় মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলাম দীর্ঘদিন একসাথে বসবাস করেন।

ওই সময়ে শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক ছিলেন কংগ্রেসে ও খেলাফতের একজন অন্যতম নেতা। মুজফ্ফর আহ্মদ তার কাছে একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব দেন। তিনি সম্মতি প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯২০ সালের ১২ জুলাই এ. কে ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এর যুগ্ম সম্পাদক হন মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলাম। আর একজন সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই পত্রিকায় মুজফ্ফর আহ্মদ শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। ওই বছর মুজফ্ফর আহ্মদ বঙ্গীয় খিলাফত কমিটির সদস্য মনোনীত হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রিটিশ বিরোধী লেখা প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ সরকার 'নবযুগ' পত্রিকার এক হাজার টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে। মুজফ্ফর আহ্মদ আবার ফজলুল হকের কাছে দু'হাজার টাকা নিয়ে জামানত দাখিল করেন। শুরুতে 'নবযুগ' চার হাজার কপি ছাপা হত। কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা'র জাগরণমূলক কবিতাগুলো এ পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'নবযুগ' কৃষক-মজুরের অধিকার আদায়ের দাবি সমর্থন করত। এ ব্যাপারে ফজলুল হকের কাছে কেউ বিরূপ মন্তব্য করতেন। ফলে সম্পাদকীয় নীতিমালা বেঁধে দিতে উদ্যত হন ফজলুল হক। যার কারণে ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথমে কাজী নজরুল ইসলাম ও পরে মুজফ্ফর আহ্মদ 'নবযুগ' ছেড়ে দেন। কিছুদিন পর পত্রিকাটিও বন্ধ হয়ে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে সারা পৃথিবীতে একটা নব জাগরণ সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব ভারতবর্ষেও পড়ে। এসময় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলকাতা টাউন হলে পরপর তিন দিন ছয় ঘন্টা করে বক্তৃতা করেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সেই বক্তৃতা শুনে প্রভাবিত হন। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয়, তাও তাকে প্রভাবিত করে। রুশ বিপ্লবের কিছু কিছু তথ্য প্রচারমূলক বই ও মার্কসবাদী সাহিত্য গোপন পথে এদেশে আসতে শুরু করে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তা পাঠ করে মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার মতাদর্শের সন্ধান পেয়ে তিনি সেই পথের অভিযাত্রী হয়ে যান।

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবরে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পর্টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন এম এন রায়। এই সময়েই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আন্তর্জাতিক কিমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং বিদেশ থেকে অনেক পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করতে থাকেন।

১৯২১ সালে এ পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টান্যাশনাল এর অনুমোদন পায়। এই প্রবাসী পার্টির কাজ জার্মানিতেও সম্প্রসারিত হয়। জার্মানি থেকে ১৯২২ সালে ১৫ মে পার্টির পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকা ডাকযোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে পাঠানো হত। এক সময় এ পত্রিকা পুলিশের হাতে পড়ে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তখন পত্রিকার নাম পরিবর্তনের জন্যে এম এন রায়কে লেখেন। এম এন রায় পত্রিকাটির নতুন নামকরণ করেন।

১৯২১ সালের শেষ দিকে কমিউনিস্ট সংগঠনের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। একই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় আরো কয়েকজন মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। তাদের সাথেও মুজফ্‌ফর আহমদের যোগাযোগ হয়। তারা হলেন, মুম্বাই-এর শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে, মস্কো থেকে কাবুলে আগত মোহাম্মদ আলি, পেশোয়ার ইসলামিক কলেজের অধ্যাপক গোলাম হোসেন প্রমুখ। এছাড়া ১৯২২ সালের শেষ দিকে মস্কো থেকে কলকাতায় প্রত্যাগত শওকত ওসমানির সাথেও মুজফ্‌ফর আহমদের পরিচয় হয়। এ সময় ভারতবর্ষে যারা কমিউনিজম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন তাদের সাথে মুজফ্‌ফর আহমদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যোগাযোগ করার কাজ শুরু করেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম মুদ্রিত ইশতেহার প্রচার করা হয়। আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক দিয়ে এই ইশতেহার রচিত হয়।

১৯২২ সালের শেষের দিকে আব্দুল হালিমের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদের দেখা হয়। দু'জনে মিলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজ শুরু করেন। প্রথম যুগে এদের সঙ্গে ছিলেন আব্দুর রেজ্জাক খান।

১৯২২ সালের ১৫ মে পার্টির প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নাম ছিল 'দি ভ্যানগার্ড অব দি ইন্ডয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স'। পুলিশের নজর পড়ায় নাম বদলে হয় 'অ্যাডভান্স গার্ড'। তারপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসেবে 'দি ভ্যানগার্ড' প্রকাশিত হয়। এই সময়কালেই নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বিশ্লেষণাত্মক রচনা লেখেন।

ভারতবর্ষের ভিতরে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদ বলেন, 'আগে পরে চার জায়গায় ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। উদ্যোক্তারা একত্রে মিলিত হয়ে আলোচনা করে যে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা নয়, প্রত্যেক জায়গায় পৃথক পৃথকভাবে উদ্যোক্তারা কাজ শুরু করেছিলেন। তাদের একজনের সঙ্গে আরেকজনের পরিচয় ছিল না। ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। প্রথম চারটি জায়গা হল কলকাতা, বোম্বে (মুম্বাই), লাহোর ও মাদ্রাজ। এক জায়গা হতে অন্য জায়গার দূরত্ব এক হাজার মাইলেরও অনেক বেশি। এত দূরে থেকেও আমরা সারা ভারতের পার্টি গড়ার কাজে নেমেছিলাম। কারণ কমিউনিস্ট আন্দোলন আন্তর্জাতিক। আমাদের সকলের মধ্য বিন্দু ছিল কমিউনিস্ট ইন্টান্যাশনাল। তার কেন্দ্র ছিল বহু হাজার মাইল দূরে মস্কোতে। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালই কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের একজনের সঙ্গে অপরের পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন'।

১৯২৩ সাল থেকে মুজফ্ফর আহ্মদ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন এবং বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। পূর্বে জড়িত হয়েছিলেন ইন্ডিয়ান সীমান্ত এসোসিয়েশনের সঙ্গে। তখন থেকেই গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা তার গতিবিধির উপর নজর রাখতে শুরু করে। ১৯২৩ সালের ১৭ মে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে রাজবন্দী হিসেবে কারাগার আটকে রাখে। ওই সময় ভারতবর্ষের পেশোয়ারে প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল। ওই মামলায় মুজফ্ফর আহ্মদকে জড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণাভাবে তা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কানপুর কমিউনিস্ট (বলশেভিক) ষড়যন্ত্র মামলার মুজফ্ফর আহ্মদ, শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে, শওকত ওসমানি ও নলিনী গুপ্তের চার বছর করে সাজা দেয়া হয়। যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ১৯২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তি পাওয়ার পর তিনি কৃষকদের মাঝে কাজ শুরু করেন। সংগঠিত করেন কৃষকদের। ১৯২৫ সালের পয়লা নভেম্বর কলকাতায় 'লেবার স্বরাজ পার্টি' গঠিত হয়। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত কৃষক সম্মেলন তার উদ্যোগে হয়েছিল। ওই সম্মেলনে 'মজুর-কৃষক পার্টি' গঠিত হয়। মজুর-কৃষক পার্টির পক্ষ থেকে প্রথমে 'লাঙল' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে ১৯২৬ সালের ১২ আগস্ট থেকে 'গণবাণী' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে মুজফ্ফর আহমদের ওপর।

১৯২৭ সালে কলকাতায় ডক-মজুর ধর্মঘট, মেথর ধর্মঘট, চটকল মজুর ধর্মঘট ইত্যাদিতে তিনি প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রমিকদের আন্দোলন জোরদার হয়। এসব আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি ও 'মজুর-কৃষক পার্টি' একযোগে কাজ করে।

১৯২৭ সালের ৩১ মে বোম্বেতে কমিউনিস্টদের এক সম্মেলনে মুজফ্ফর আহ্মদ যোগদান করেন। ১৯২৮ সালের ২২-২৩ ডিসেম্বর কলকাতায় সর্বভারতীয় ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। এর তিন দিন আগে ঝরিয়ায় অনুষ্ঠিত এ আইটিইউসি'র অধিবেশনে প্রতিনিধিদের ভোটে মুজফ্ফর আহ্মদসহ তিনজন কমিউনিস্ট সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯২৯ সালের ২০ মার্চ ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন এলাকা থেকে কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেফতার করে। এসময় মুজফ্ফর আহ্মদকেও গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে 'মীরাট কমিউনিস্ট

ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হয়। এই মামলায় অভিযুক্ত হন ৩১ জন। ৪ বছর ধরে চলে এ মামলা। ১৯৩৩ সালে ৯ জানুয়ারি মামলার রায় বের হয়। মুজফ্ফর আহ্মদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে আপিলে এ সাজা কমিয়ে ৩ বছর করা হয়। এই তিন বছর তিনি মীরাট, নৈনি, আলজোড়া, দার্জিলিং, বর্ধমান এবং ফরিদপুর জেলে ছিলেন।

জেল থেকে মুক্ত হবার পর তাকে নজরবন্দীতে রাখা হয়। প্রথমে ফরিদপুর, পরে নিজের গ্রামের বাড়ি সন্দ্বীপে ও মেদিনীপুরের এক গ্রামে তাকে অন্তরীণ রাখা হয়। ব্রিটিশ সরকার সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের দমনের জন্য 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' আইন চালু করেছিল, সে আইনে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের ২৫ জুন তিনি মুক্তি পান।

মুক্তি পাওয়ার পর পার্টিকে সংগঠিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। যে সব বিপ্লবী কর্মী কারামুক্ত হয়ে আসেন, তিনি তাদের সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন জেলায় পার্টি গঠনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে যুক্তবঙ্গের ২৮টি জেলাতেই কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। এতটুকু সময়ের মধ্যে পার্টির সভ্য সংখ্যা আড়াই থেকে তিন হাজারে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার আবারও কমিউনিস্টদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে। এ সময় কলকাতায় শ্রমিকদের মাঝে মুজফ্ফর আহমদের খুব প্রভাব ছিল। যার কারণে সরকার ওই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে কলকাতা ছেড়ে যাবার আদেশ দেয়। আদেশ অমান্য করায় তার এক মাসের জেল হয়। মুক্তি লাভের পর আবারও তাকে কলকাতা ছাড়ার আদেশ দেওয়া হয়। এবার তিনি প্রকাশ্যে কলকাতা ত্যাগ করে চলে যান। কিন্তু ২৩ জুন (১৯৪০) গোপনে কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন থেকে ১৯৪২ সালের ২৩ আগস্ট পর্যন্ত গোপনে পার্টির কাজ চালিয়ে যান।

১৯৪৫ সালে ময়মনসিংহের নেত্রকোনায় নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী এ সম্মেলনে মুজফ্ফর আহ্মদ সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস ছাড়া (কারণ দেশভাগের পর তথাকথিত পূর্বপাকিস্তানের নেতারা তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে) প্রত্যেকটি পার্টি কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হন। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি বঙ্গীয় পার্টির সম্পাদক ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। এই সম্মেলনে ভারত ও পাকিস্তানি কমিউনিস্ট পার্টি আলাদা আলাদা ভাবে কাজ চালানো সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৪৮ সালের ২৫ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে ভারত সরকার এই আইনে মুজফ্ফর আহ্মদকে গ্রেফতার করে। ১৯৫১ সালের ২৭ এপ্রিল তিনি মুক্তি পান। ওই বছর তিনি রাজ্য পার্টির সম্পাদক হন। ১৯৫৭ সালে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে পার্টির সম্পাদক পদ ছেড়ে দেন। তখন জ্যোতিবসু সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

ওই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মতভেদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর প্রভাব পড়ে। যার ফলে ১৯৬৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মুজফ্ফর আহমদের নেতৃত্বাধীন অংশের নাম দেওয়া হয় সিপিআই (এম) বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। এরা ছিল সোভিয়েত পন্থী।

১৯৬৯ সালে সশস্ত্র কৃষক অভ্যূত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ঘোষণা দিয়ে গঠিত হয় সিপিই (এম-এল) বা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)। এরা প্রধানত

মাও সে তুং (মাও জে ডং) ও চীনের লাইনের অনুসারী। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এই সময়েও মস্কো ও পিকিং-এর অন্ধ অনুসরণের বিরোধীতা করেন।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সিপিআই (এম) পূর্ণ সমর্থন দেয়। ওই দিনগুলোতে পার্টির মুখপত্র 'গণশক্তি'র দৈনন্দিন সংবাদ সমালোচনা ও সম্পাদকীয়তে তার স্বাক্ষর মেলে। মুজফ্‌ফর আহমদের ভাষায়, 'পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচার হতে মুক্ত হবার জন্য বাংলাদেশের মানুষেরা যেভাবে সংগ্রাম চালিয়েছেন, তার তুলনা দুনিয়ার ইতিহাসে কম। আমি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমি একজন অক্ষম অসমর্থ বৃদ্ধ, যদি আমার শরীরে শক্তি থাকত, তা হলে আমিও বাংলাদেশের মুক্তি ফৌজে যোগ দিতাম'।

১৯২১ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৫২ বছর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কর্মীদের মার্কসবাদী সাহিত্য অধ্যয়ন, প্রকাশ ও প্রচারের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৩৬ সালে 'গণশক্তি'র পুনঃপ্রকাশ, তারপর 'আগে চলো' পত্রিকা প্রকাশ, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে দৈনিক 'স্বাধীনতা' প্রকাশ, হিন্দি 'স্বাধীনতা', সাপ্তাহিক 'মতামত' ১৯৬৩ সালে কারামুক্তির পর সাপ্তাহিক 'গণশক্তি'র পুনঃপ্রকাশ ও পরবর্তী সময়ে দৈনিক 'গণশক্তি' প্রকাশিত এই সমস্ত বিষয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। ১৯৩৯ সালে সুরেন দত্তের সহায়তায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রকাশনাকে পার্টির আওতায় আনেন। সুনীল বসু (কাটু) প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৪২ সাল থেকে ন্যাশনাল বুক এজেন্সিকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার কাজে তার নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। গোপন ছাপাখানার কর্মী কালী চৌধুরী ও সমীর দাশগুপ্তকে নিয়ে তিনি ১৯৫২ সালে গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রতিষ্ঠা করেন।

মুজফ্‌ফর আহমদের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে পার্টি অফিসে, কারাগারে কিংবা গোপন আস্তানায়। এ ছাড়া পার্টির ভাড়া করা ঘরে অথবা কর্মস্থলে। নিজের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে কিছু তিনি করেন নি। জীবনের শেষ দিনগুলোতে পার্টি কর্তৃক নিয়োজিত একজন কর্মী তার দেখাশুনা করতেন। মৃত্যুর আগে প্রায় সাত মাস তিনি কলকাতার একটি নার্সিং হোমে ভর্তি ছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. আমার জীবন ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি– মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

২. আমাদের পূর্বসূরিরা– সম্পাদক-তন্ময় ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশকাল মার্চ ২০০৮।

৩. বৃটিশবিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা– তপন কুমার দে, জাগৃতি প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

৪. মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (ছোটদের জীবনী)– দীপংকর চক্রবর্তী।

মণি সিংহ



স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কমরেড মণি সিংহ'কে তার বসতভিটা ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এর উত্তরে কমরেড মণি সিংহ বলেছিলেন, 'টঙ্ক আন্দোলন ও বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবং তাদের বাড়ি ঘর উচ্ছেদ হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই দেশের প্রতিটি মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা ও কর্মসংস্থান না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমার বসতভিটা ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে না। যে দিন সবার ব্যবস্থা হবে সেদিন আমারও ব্যবস্থা হবে।'

বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের শোষণমুক্তির লড়াই-সংগ্রামের পুরোধা– কমরেড মণি সিংহ। যে নামটির সঙ্গে জড়িত বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ও ঐতিহ্য। কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদতুল্য বিপ্লবী কমরেড। তিনি কেবল ব্যক্তি বা নাম নন, রীতিমতো এক প্রতিষ্ঠান। মণি সিংহ এখন জীবনদর্শন আর জীবনাদর্শের প্রতিশব্দ। তিনি এখন সংগঠন ও সংগ্রামের প্রতীকী রূপ। উপমহাদেশের শোষণমুক্তি ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রামেরও অন্যতম কিংবদন্তী তিনি । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে তিনি ছিলেন অন্যতম বিপ্লবী। পাকিস্তানের স্বৈর-শাসন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের অন্যতম মহানায়কও তিনি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষণের অবসান ঘটিয়ে একটি সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেছিলেন।

দীর্ঘ সাত দশক ধরে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য, শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে এবং মানুষের চূড়ান্ত মুক্তির জন্য কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে অবদান তিনি রেখে গেছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

মার্ক্সবাদী জীবনাদর্শই তাকে পথ দেখিয়েছে একজন বড় মাপের মানুষ হিসেবে তার পরিচয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে যেতে। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'বিপ্লবী মানবতাবাদ হচ্ছে কমিউনিস্ট আদর্শের মর্মকথা। আমরা লড়াই করছি কেবল একটি শ্রেণউর মুক্তির জন্য নয়, সার্বিকভাবে মানবমুক্তির জন্যও আমাদের সংগ্রাম। ঐতিহাসিক বিচারে তাই মানুষই আমাদের সাধনার কেন্দ্রবিন্দু। সেই মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মানবপ্রেমকেই বিপ্লবী ধারায় সমাজে সর্বজনীন করে তুলতে হবে'।

কমরেড মণি সিংহের জন্ম ১৯০১ সালের ২৮ জুলাই। কলকাতা শহরে। বাবা কালীকুমার সিংহ ছিলেন পূর্বধলার জমিদারের সন্তান। তিনি বিয়ে করেন সুসং রাজবংশে। সেই সূত্রে কমরেড মণি সিংহ ছিলেন সুসং রাজবংশের ভাগ্নে। মণি সিংহের বয়স যখন আড়াই বছর তখন তার বাবা মারা যান। এ সময় তারা কিছুদিন ঢাকায় তার মামা ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন সিংহের বাড়িতে থাকেন।

মা ছিলেন তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রোকোনা মহাকুমার সুসং-দুর্গাপুরের জমিদার বংশের মেয়ে। তিনি সুসং-দুর্গাপুরে কিছু ভূ-সম্পত্তি, বার্ষিক খোরাকি ও শরীক হিসাবে কিছু মাসোহারা পেতেন। মণি সিংহের বয়স যখন ৭ বছর সেই সময় থেকে তারা সুসং-দুর্গাপুরে বসবাস শুরু করেন। এখানেই মণি সিংহ প্রাথমিক পড়াশুনা শুরু ও শেষ করেন। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কলকাতায় যান। ওই সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ জমে যায় তার চেতনায়। ১৯১৪ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে ব্রিটিশকে উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র বিপ্লববাদী দল অনুশীলনের সাথে যুক্ত হন। ধীরে ধীরে নিজের সাহস ও দৃঢ়তা দিয়ে সাংগঠনিকভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে দক্ষতার পরিচয় দেন।

১৯২১ সালের অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের ব্যাপকতা তাকে এক সংগ্রামী মানুষে পরিণত করে। এ সময় তিনি ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র জাতীয় সংগ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য নিজ জেলায় কৃষকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন। বঞ্চিত হাজং কৃষকদের সন্তানদের জন্য একাধিক স্থানে তিনি পাঠশালা তৈরি করে দেন। ১৯২৫ সালে রুশবিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী ও মার্ক্সবাদী বিপ্লবী গোপেন চক্রবর্তীর সাথে কমরেড মণি সিংহের সাক্ষাৎ হয়। দিনে দিনে দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে মার্ক্সবাদী চেতনার সম্পর্ক। এ সময় তিনি মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের রাজনীতি, দর্শন ও আদর্শে নিজেকে নির্মাণ করেন।

১৯২৬ সালের শেষের দিকে মণি সিংহ কলকাতায় ক্লাইভ স্ট্রিটের গুপ্ত ম্যানশনে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে 'ওরিয়েন্টাল ট্রেডিং' নাম দিয়ে একটি অফিস খুলেন। শ্রমিক আন্দোলনের উপায় খুঁজে বের করার জন্য এই প্রচেষ্টা। এখানে দেখা হল গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, নীরোদ চক্রবর্তী, নলীন্দ্র সেনসহ আরো অনেক কমিউনিস্ট বিপ্লবীর সঙ্গে। এ সময় তিনি প্রতিদিন কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদের হ্যারিসন রোডের অফিসে গিয়ে 'গণবাণী' পত্রিকা পড়তেন।

১৯২৮ সালের প্রথম দিকে গোপেন চক্রবর্তী মণি সিংহকে জানালেন শ্রমিক আন্দোলনের সুবর্ণ সুযোগ এখন। কেসি মিত্র রেলওয়ে ধর্মঘট করেছেন। সেখানে কর্মী প্রয়োজন। এ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে। পরদিন মণি সিংহ লিলুয়া রেলওয়ে গেলেন। মেটিয়াবুরুজের কেশোরাম টেক্সটাইল মিলে গিয়ে ধর্মঘটে অংশ নেন। সেখানেই শুরু করেন শ্রমিক আন্দোলন।

১৯৩০ সালে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার দখলের ঘটনায় ব্রিটিশ শাসক পাগলা কুকুরের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে নির্বিচারে গ্রেফতারের হিড়িক চালায়। শত শত বিপ্লবীকে গ্রেফতার করে। ৯ মে কলকাতায় গ্রেফতার হন মণি সিংহ। টানা ৫ বছর বিভিন্ন জেল-ক্যাম্প ঘুরিয়ে এনে ১৯৩৫ সালে সুসং-এ নিজ গ্রামের বাড়িতে তাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। এ সময় মাতুল বংশের সাথে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মণি সিংহের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তিনি সাধারণ প্রজাদের পক্ষে দাঁড়ান। তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে আন্দোলন গড়ে

তোলেন। যার কারণে মণি সিংহকে তিন বছরের কারাদণ্ডে যেতে হয়। আপিলে করলে এ সাজা দেড় বছর কমে আসে।

মণি সিংহ 'জীবন-সংগ্রাম' বইয়ে পার্টির সদস্যপদ প্রাপ্তি বিষয়ে লিখেছেন, '১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে অর্থাৎ মার্ক্সবাদ-লেলিনবাদ দীক্ষা নিয়ে ১৯২৮ সাল থেকে সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যাই। তখন পার্টিতে সভ্যপদ খুবই সংকীর্ণ ভিত্তিতে দেয়া হত। কাজেই আমি শ্রমিক আন্দোলনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করলেও পার্টির সভ্যপদ তখনও পাইনি। তবে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ আমাকে ওয়ার্কাস এন্ড পিজেন্টস পার্টিতে নিয়ে নেন ১৯২৮ সালে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কথা তিনি ঘৃণাক্ষরেও বলেননি। জেল থেকে বের হয়ে এলে আমি পার্টির সভ্য বলে আমাকে জানানো হয়। তখন ১৯৩৭ সাল।'

মণি সিংহ 'জীবন-সংগ্রাম'-এ আরো লিখেছেন, 'আমি ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি করিমপুর থানা, নদীয়ার জেল থেকে মুক্তি পাই। আমি মুক্তি পেয়ে কলকাতায় গেলাম কিন্তু বন্ধু কমিউনিস্টদের কারও দেখা পেলাম না। ওই সময়ে কলকাতা ছাড়া আর কোথাও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। সেই কমিউনিস্ট পার্টিও ছিল আত্মগোপনে। আমার কাছে যে রেলওয়ে পাস ছিল- ওই পাস নিয়ে ওই দিনই- আমার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম- মায়ের সাথে দেখা করার জন্য। গ্রামে আসার ২/৩ দিনের মধ্যেই মুসলিম কৃষকরা আমার সাথে দেখা করতে এলেন। ৮/১০ জন বয়স্ক মুসলিম কৃষক আমার বাড়িতে এসে বললেন, 'খোদার রহমতে আপনে খালাস পাইছেন- আমরা খুব খুশি হইছি। এহন আপনে টঙ্কটা লইয়া লাগুইন। আমরা আর টঙ্কের জ্বালায় বাঁচতাছি না'। আমি তাদের বললাম, 'আমি কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলন করি, মাকে দেখার উদ্দেশ্যে সাতদিনের জন্য বাড়ি এসেছি, কাজেই আমি ফিরে যাবো'। তারা বললেন, 'এডা হয় না। দেশের ছাওয়াল দেশে থাকিয়া টঙ্ক লাইয়া লাগুইন। আমরা যাতে বাঁচি তার চেষ্টা করুইন। খোদা আপনার ভালা করব।' আমি তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রতিদিন তারা এসে আমাকে টঙ্ক আন্দোলন করার জন্য অনুরোধ করতে থাকলেন।

চার পাঁচদিন পর- একদিন রাত্রিবেলায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করলাম যে, আমি কি ট্রেড ইউনিয়ন কাজের জন্য কলকাতা যেতে উদগ্রীব? ওই সময়ে মেটিয়াবুরুজে একটি ট্রেড ইউনিয়নের বেস সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ আমরা প্রতিটি শ্রমিক সংগ্রামে জয়লাভ করেছিলাম। এখানে টঙ্ক আন্দোলন করা জটিল ও কঠিন ব্যাপার। কারণ যাদের বিরুদ্ধে টঙ্ক আন্দোলন করতে হবে, তারা সবাই আমার আত্মীয়। কেবল তাই নয়, আমার নিজ পরিবারেও টঙ্ক জমি আছে। কাজেই সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। হয়ত এই সব কারণে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। এই কথা যখন আমার মনে উদয় হল, তখন আমার মধ্যে এক দ্বন্দ্ব হল। ট্রেড ইউনিয়ন না টঙ্ক আন্দোলন?'

টঙ্ক মানে ধান কড়ারী খাজনা। হোক বা না হোক কড়ার মত ধান দিতে হবে। টঙ্ক জমির ওপর কৃষকদের কোন স্বত্ব ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে কলমাকান্দা, সুসং-দূর্গাপুর, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, শ্রীবর্দি থানায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে সুসং-জমিদারি এলাকায় এর প্রচলন ছিল ব্যাপক। কেন টঙ্ক নাম হল তা' জানা যায় না, এটা স্থানীয় নাম। এই প্রথা বিভিন্ন নামে ওই সময়ের পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, যেমন চুক্তিবর্গা, ফুরণ প্রভৃতি। ওই সময়ে পশ্চিবঙ্গেও ওই প্রথা প্রচলিত ছিল। সুসং জমিদার এলাকার যে টঙ্ক ব্যবস্থা ছিল তা ছিল খুবই কঠোর। সোয়া একর জমির জন্য বছরে ধান দিতে হত সাত থেকে পনের

মণ। অথচ ওই সময়ে জোত জমির খাজনা ছিল সোয়া একরে পাঁচ থেকে সাত টাকা মাত্র। ওই সময়ে ধানের দর ছিল প্রতিমণ সোয়া দুই টাকা ফলে প্রতি সোয়া একরে বাড়তি খাজনা দিতে হত এগার টাকা থেকে প্রায় সতের টাকা। এই প্রথা শুধু জমিদারদের ছিল তা নয়; মধ্যবিত্ত ও মহাজনরাও টঙ্ক প্রথায় লাভবান হতেন। একমাত্র সুসং-জমিদাররাই টঙ্ক প্রথায় দুই লক্ষ মণ ধান আদায় করতেন। এটা ছিল এক জঘন্যতম সামন্ততান্ত্রিক শোষণ।

সুসং-জমিদাররা গারো পাহাড়ের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে মনে হয় এই প্রথা প্রবর্তন করেন। জোত স্বত্বের জমির বন্দোবস্ত নিতে হলে প্রতি সোয়া একরে একশ টাকা থেকে দুইশ টাকা নজরানা দিতে হত। গরীব কৃষক ওই নজরানার টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ ছিলেন না। টঙ্ক প্রথায় কোন নজরানা লাগত না। কাজেই গরীব কৃষকের পক্ষে টঙ্ক নেওয়াই ছিল সুবিধাজনক। টঙ্কের হার প্রথমে এত বেশি ছিল না। কৃষকরা যখন টঙ্ক জমি নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসলেন, তখন প্রতি বছর ওই সব জমির হার নিলামে ডাক হত। ফলে হার ক্রমে বেড়ে যায়। যে কৃষক বেশি ধান দিতে কবুল করত তাদেরই অর্থাৎ পূর্বত বেশি ডাককারী কৃষকের নিকট থেকে জমি ছাড়িয়ে হস্তন্তর করা হত। এইভাবে নিলাম ডাক বেড়ে গিয়ে ১৯৩৭ সাল থেকে হার সোয়া একরে পনের মণ পর্যন্ত উঠে যায়।

'আমি ভাবতে লাগলাম আমি যদি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী হই, যদি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করে থাকি, তবে সেখানে আমার এবং আমার পরিবারের স্বার্থ নিহিত রয়েছে-প্রয়োজনে ও আদর্শের জন্য তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা আমার কর্তব্য। যা অন্যায়, যা সামন্ততান্ত্রিক অবশেষে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত। সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চেতনা উদ্দীপিত করা ও তাদের সংগঠিত করা একান্ত প্রয়োজন এবং এইভাবেই দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর করে নেয়া সম্ভব। এটা আমার আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ। এখানে আমার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থ নিহিত আছে বলে আমি ওই আন্দোলন হতে কখনোই নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। আমার স্বার্থ আছে বলেই আমাকে কৃষকদের নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কৃষকদের এই সংগ্রামে সাথী হয়ে যদি এই সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারি, তবেই আমার সঠিক পথে যাত্রা শুরু হবে। এটা আমার জীবনের মূল পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। এই দ্বন্দ্ব আমার মধ্যে চলতে লাগল; যার সাথে পরামর্শ করতে পারি এমন কোন বন্ধুও তখন ছিল না। আমার মন ও মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী আদর্শই ছিল আমার বড় বন্ধু। আমার দুই দাদা ছিলেন ভিন্ন চেতনা ও চিন্তার মানুষ। তাদের সাথে পরামর্শ করার প্রশ্নই ছিল না। সমগ্র ময়মনসিংহ জেলায় এমন একজন কেউ ছিল না যার সাথে পরামর্শ করা যেতে পারত।'

'আমার যতটুকু মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞান ছিল, আর যেটুকু শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাকেই ভিত্তি করে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, টঙ্ক আন্দোলনে আমি সর্বতোভাবে শরিক হবো'। এভাবে মণি সিংহ টঙ্ক আন্দোলনের সাথে জড়িত হলেন এবং কালক্রমে এ আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতায় পরিণত হলেন।

আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে ১৯৪০ সালে সরকার সার্ভে করে টঙ্কের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। ওই বছর নভেম্বর মাসে কৃষকদের নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি তাদের জমিদারী টঙ্কপ্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি নিজ বংশ থেকে সম্পর্কচ্যুত হন। দীর্ঘদিন এ আন্দোলন চলছিল। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে গভর্নর টঙ্ক এলাকার অবস্থা সচক্ষে দেখতে এলে পূর্বাহ্নে কয়েকজন সহকর্মীসহ মণি সিংহকে গ্রেফতার করে ১৫ দিন

আটক রাখে। ছাড়া পেয়ে পরিস্থিতি বুঝে তিনি আত্মগোপন করেন। ওই বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও এই যুদ্ধেরকালে কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ বিরোধী 'জনযুদ্ধের' নীতি গ্রহণ করায় টঙ্ক আন্দোলন কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকে। এক পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার টঙ্ক প্রথার সংস্কার করলেও প্রথাটি একবারে উচ্ছেদ হল না। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন কৃষক সভা 'টঙ্ক' প্রথার পুরোপুরি উচ্ছেদ চাইলো।

১৯৪৪ সালে মণি সিংহ সারা বাংলার কৃষাণ সভার প্রেসিডেয়ামের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষাণ সভার ঐতিহাসিক সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মণি সিংহ ছিলেন সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক। এ সম্মেলনে নেত্রকোনা শহরের নাগড়ার মাঠে এক লক্ষ লোকের সামবেশ ঘটে। এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমরেড মুজফ্ফর আহ্‌মদ, পিসি যোসিসহ ভারত বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের সাধারণ নির্বাচনে তিনি নেত্রকোনো জেলার নিজ এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও টঙ্ক আন্দোলন চলতে থাকে এবং সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। সে সময়ে প্রচলিত গল্প ছিল যে, কমরেড মণি সিংহ একটি সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে টঙ্কের পরিবর্তে টাকায় খাজনা প্রবর্তিত হয় এবং জমিতে কৃষকের স্বত্ব স্বীকৃত হয়। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে এই টঙ্ক আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নারী-পুরুষ-শিশুসহ ৬০ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। কৃষকদের শতশত বাড়ি ধুলিসাৎ ও গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করা হয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এলাকায় কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী তৃণমূল সংগঠনও গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানে প্রথম মুসলিম লীগ সরকার মণি সিংহের বাড়ি ভেঙ্গে ভিটায় হালচাষ করায় এবং তার স্থাবর সম্পত্তি নিলাম করে দেয়।

'১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পূর্ণ গণতন্ত্র ও শোষণমুক্ত সমাজের আদর্শকে যাঁরা সামনে এনেছেন মণি সিংহ তাদের একজন। বাংলার মেহনতী মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি সংগ্রামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক প্রিয় নেতাকে কায়েমী স্বার্থের রক্ষকেরা দমন করার সব রকম চেষ্টাই করেছেন'।– সত্যেন সেন।

পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে ষাটের দশকের শেষ পর্যন্ত টানা ২০ বছর তাকে বাধ্য হয়ে আত্মগোপনে থাকতে হয়। এ সময় আইয়ুব সরকার তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা পুরষ্কার ঘোষণা করে। ১৯৫৫ সালে আবু হোসেন সরকারের সময় মাত্র ১ মাস প্রকাশ্যে থাকতে পেরেছিলেন। জেলে থাকা অবস্থায় তিনি ১৯৬৮ সালে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত পার্টির চতুর্থ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে জাতীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে স্বৈরাচার সকারের পুলিশ বাহিনী। এদের মধ্য কমরেড মণি সিংহ ছিলেন। ঐতিহাসিক গণঅভ্যুথানের পর ছাত্র জনতার প্রবল চাপে ২২ ফেব্রুয়ারি সকলের সাথে তিনিও মুক্তি পান।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে কমরেড মণি সিংহের অবদান নিঃসন্দেহে অনিস্বীকার্য। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি জেলে বন্দী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বন্দীরা রাজশাহী কারাগার ভেঙ্গে তাকে মুক্ত করে। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ভারতে যান। মুক্তিযুদ্ধের সময় মণি সিংহ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের

উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। তার প্রচেষ্ঠায় গড়ে উঠেছিল ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনী। যে বাহিনীই মূলত যুদ্ধের কৌশলী বাহিনী ছিল। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক শক্তির সমর্থন আদায়ে তিনিই ছিলেন মূল ব্যক্তি। তার কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের রাজনৈতিক, কুটনৈতিক সমর্থন, সাহায্য সহযোগিতা আদায়ে কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান ছিল অবিসম্বাদিত। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগোর্ণী আন্তর্জাতিক নেতাদের মধ্যে সর্ব প্রথম এক চিঠিতে পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের আহ্বান জানান। পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকা সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন মণি সিংহের দেশ বাংলাদেশের পক্ষে অষ্টম নৌবহর প্রেরণ করার প্রস্তুতি নিলে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা লেজগুটিয়ে পালায়। কমরেড মণি সিংহ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সম্মিলিত মুক্তি বাহিনী সংগঠিত করার কাজে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। যুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন মণি সিংহ।

কমরেড মনিসিংহ ছিলেন পূর্ববঙ্গের সকলের প্রিয় বড় ভাই। ১৯২৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯২৮ সাল থেকে পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী হয়ে যান। ১৯৩৭ সালে তিনি পার্টির সদস্যপদ পান। ১৯৪২ সালে তিনি পার্টির ময়মনসিংহ জেলার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত পার্টির প্রথম সম্মেলনে পার্টির ময়মনসিংহ জেলা থেকে দু'জন অংশগ্রহণ করেন, তার মধ্যে তিনি ছিলেন। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় সম্মেলনে তিনি পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেলে থাকা অবস্থায় পার্টির চতুর্থ সম্মেলনে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ও ১৯৮০ সালের তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কমিউনিস্ট পার্টি আবারও বে-আইনী ঘোষিত হয়। ওই সময়ে আজীবন সংগ্রামী এ নেতা আবার রাজনৈতিকভাবে নির্যাতনের শিকার হন ও কারাবরণ করেন। জিয়াউর রহমান সরকার ১৯৭৭ সালের মাঝামাঝি সময় একদিন কমরেড মণি সিংহকে গ্রেফতার করে বিনা বিচারে ছয় (৬) মাস অন্তরীণ রাখে। সে সময়ে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

ব্যক্তিগত জীবনে কমরেড মণি সিংহ ছিলেন অনাড়ম্বর সাদামাটা জীবনের অধীকারী। কমরেড অণিমা সিংহ ছিলেন মণি সিংহের সহধর্মিনী। তরুণ বয়সে সিলেটে মেডিকেল স্কুলের ছাত্রী থাকা অবস্থায় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি কৃষক নেত্রী ছিলেন। টঙ্ক আন্দোলনের সময় তিনি ওই আন্দোলনে যোগদান করেন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে তিনি কমরেড মণি সিংহের সাথে আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। আত্মগোপন থাকাকালীন অবস্থায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ ডিগ্রি অর্জন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি কৃষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক

সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালের ১ জুলাই মাত্র ৫২ বছর বয়সে এক সড়ক দুর্ঘটনায় অণিমা সিংহ মারা যান।

১৯৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কমরেড মণি সিংহ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন থেকে দীর্ঘ ৬ বছর অসুস্থ থাকার পর ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার পতনের পর ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১০টা ৫০ মিনিটে মারা যান।

জয়তু কমরেড মণি সিংহ।

এই মহান নেতা আর তার এই আত্মত্যাগের কথা আমরা কতটুকু মনে রাখতে পেরেছি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রয়াত কমরেড মণি সিংহকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০০৪ (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

'শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজপ্রগতির সংগ্রামে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রী সুদৃঢ়করণে অবদানের জন্য মণি সিংহকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকার 'অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ অব পিপলস' পদকে ভূষিত করা হয়। ('মণি সিংহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ডার অব ফ্রেন্ডশিপ অব পিপলস-এ ভূষিত', সাপ্তাহিক একতা, ঢাকা, ১-৭ আগস্ট ১৯৮০) কেবল সোভিয়েত ইউনিয়ন নয় বুলগেরিয়া (ডিমিট্রিভ পদক) এবং চেকোস্লোভাকিয়া সরকারও তাকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করে।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. কমরেড মণি সিংহ স্মারকগ্রন্থ– সম্পাদনা: এম এম আকাশ, এ এন রাশেদা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০৯।

২. জীবন-সংগ্রাম– কমরেড মণি সিংহ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল ২৮ জুলাই ১৯৮৩।

৩. জননেতা কমরেড মণি সিংহ– মণি সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনী, গ্রন্থনা: কমরেড মণি সিংহ মেলা উদযাপন কমিটি, ২৬ ডিসেম্বর ২০০২। (বি.দ্র: এই পুস্তিকাটি তৈরি করা হয়েছে: বজলুর রহমান লিখিত 'শেখ মুজিব ও মণি সিংহের ঐতিহাসিক বৈঠক (সংবাদ ২৮ জুলাই ২০০১), সত্যেন সেন রচিত জননেতা কমরেড মণি সিংহ (জানুয়ারি ১৯৬৯) ও কমরেড মণি সিংহের লিখিত জীবন সংগ্রাম বই থেকে সংকলিত।)

৪. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশকাল ২০০৯।

ছবির তথ্যসূত্র: কমরেড মণি সিংহ স্মারকগ্রন্থ।

ইলা মিত্র



রাজশাহী আদালতে ইলা মিত্র ইংরেজিতে লিখিত যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন তা থেকে তার ওপর যে অত্যাচার হয়েছে সে বিষয়ে জানা যায়। তিনি তার জবানবন্দীতে বলেন, 'বিগত ০৭ জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখে আমি রোহনপুর থেকে গ্রেফতার হই এবং পরদিন আমাকে নাচোল থানা হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়। কিন্তু পথে পাহারাদার পুলিশরা আমার ওপর অত্যাচার করে। নাচোলে ওরা আমাকে একটা সেলের মধ্যে রাখে। সেখানে একজন পুলিশের দারোগা আমাকে এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, আমি যদি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি না করি, তাহলে ওরা আমাকে উলঙ্গ করবে। আমার যেহেতু বলার মত কিছু ছিল না, কাজেই তারা আমার পরনের সমস্ত কাপড় চোপড় খুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় সেলের মধ্যে আটকে রাখে।

আমাকে কোন খাবার দেওয়া হয়নি। এমন কি এক বিন্দু জলও না। ওই সন্ধ্যায় স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এসআইএ'র উপস্থিতিতে সিপাইরা এসে বন্দুকের বাট দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। সে সময় আমার নাক দিয়ে প্রচুর রক্ত পড়তে থাকে। এরপর ওরা আমার পরনের কাপড় চোপড় ফেরত দেয়। রাত প্রায় বারোটার সময় আমাকে বের করে সম্ভবত এসআইএ'র কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য এ ব্যাপারে আমি খুব বেশি নিশ্চিত ছিলাম না। আমাকে যে কামরায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে আমার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য ওরা নৃশংস ধরনের পন্থা অবলম্বন করে। আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে ওরা আমার পা দুটোকে লাঠির মধ্যে রেখে ক্রমাগতভাবে চাপ দিতে শুরু করে। ওদের ভাষায় আমার বিরুদ্ধে 'পাকিস্তানি ইনজেকশন' পন্থায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল। এ ধরনের অত্যাচার চলার সময় ওরা রুমাল দিয়ে আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল এবং আমার চুল ধরেও টান দিচ্ছিল। কিন্তু আমাকে দিয়ে জোরপূর্বক কিছুই বলাতে সক্ষম হয়নি। এতসব অত্যাচারের দরুণ আমার পক্ষে আর হেঁটে যওয়া সম্ভব ছিল না। সিপাইরা আমাকে ধরাধরি করে সেলে নিয়ে গেল। এবার পুলিশের সেই দারোগা সিপাহীদের ৪টা গরম ডিম আনার নির্দেশ দিয়ে বলল যে, এবার মেয়েটাকে কথা বলতেই হবে। তারপর শুরু হল নতুন ধরনের অত্যাচার। ৪/৫ জন সিপাহী মিলে জোর করে আমাকে চিৎ হয়ে শুতে বাধ্য করল এবং ওদের একজন আমার গোপন অঙ্গ দিয়ে একটা ডিম ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। সে এক ভয়াবহ জ্বালা। প্রতিটি

মুহূর্তে অনুভব করলাম, আমার ভিতরটা আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ১৯৫০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সকালে আমার জ্ঞান ফিরে এলো। একটু পরে জনাকয়েক পুলিশ সঙ্গে করে আবার সেই দারোগার আগমন ঘটে। সেলে ঢুকেই সে আমার তলপেটে বুট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারে। আমি দারুণ ব্যথায় কুঁকড়ে গেলাম। এরপর ওরা জোর করে আমার ডান পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটা লোহার পেরেক ঢুকিয়ে দিল। আমি তখন অর্ধ-চৈতন্য অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছি। কোন রকম স্বীকারোক্তি না পেয়ে দারোগা তখন রাগে অগ্নিশর্মা। যাওয়ার আগে বলে গেল, আমরা আবার রাতে আসব। তখন তুমি স্বীকারোক্তি না দিলে, একের পর এক সিপাহী তোমাকে ধর্ষণ করবে। গভীর রাতে দারোগা আর সিপাহীরা আবার এলো এবং আবারো হুমকি দিল স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য। কিন্তু আমি তখনও কিছু বলতে অস্বীকার করলাম। এবার দু জন মিলে আমাকে মেঝেতে ফেলে ধরে রাখল এবং একজন সেপাহী আমাকে রীতিমত ধর্ষণ করতে শুরু করল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম...।" (সূত্র: ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ, মুক্তিমঞ্চে নারী, প্রিপ ট্রাস্ট, ১৯৯৯, ঢাকা)।

ইলা মিত্রের জন্ম ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায়। জন্মের পর তার নাম রাখা হয় ইলা সেন। রমেন্দ্র মিত্রের সাথে বিবাহ হওয়ায় তার নাম হয় ইলা মিত্র। এই নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের অধীন বাংলার একাউনটেন্ট জেনারেল। ইলা মিত্রের আদি বসত ছিল ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে। বাবার চাকুরির কারণে তারা কলকাতায় বসবাস করতেন। কলকাতা শহরেই ইলার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের অনেকটা সময় কাটে। লেখাপড়া হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজে। কলেজ শেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ভর্তি হন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এম এ ডিগ্রি অর্জন করেন।

পড়াশুনার পাশাপাশি তিনি খেলাধুলায়ও তুখোড় ছিলেন। ১৯৩৫-৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্য জুনিয়র এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ন। সাঁতার, বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলায়ও তিনি ছিলেন বেশ পারদর্শী। তিনিই প্রথম বাঙালি মেয়ে যিনি ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হন। যুদ্ধের জন্য অলিম্পিক বাতিল হয়ে যায়। খেলাধুলা ছাড়াও গান, অভিনয়সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। ১৯৩৬-৪২ সালের মধ্যে ইলা মিত্রের নাম সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইলা মিত্র বেথুন কলেজে পড়াশুনা করার সময়ে নারী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলকাতা মহিলা সমিতির সদস্য হন। হিন্দু কোড বিল এর বিরুদ্ধে মহিলা সমিতির আন্দোলনে তিনি একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নারী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকাবস্থায় তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

১৯৪৫ সালে ইলা মিত্রের বিয়ে হয় বিপ্লবী কমিউনিস্ট নেতা রমেন্দ্র মিত্রের সাথে। বিয়ের পর কলকাতা ছেড়ে চলে এলেন শ্বশুরবাড়ি রামচন্দ্রপুর হাটে। রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের নিয়মানুসারে অন্দরমহলেই থাকতেন ইলা মিত্র। এই সময় রমেন্দ্র মিত্রের বন্ধু আলতাফ মিয়া কৃষ্ণগোবিন্দপুর হাটে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খুলেন। রমেন্দ্র মিত্রের কাছে গ্রামের

সবাই দাবি জানালেন তাদের নিরক্ষর মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব নিতে হবে বধূমাতা ইলা মিত্রকে। অনুমতি পেল ইলা মিত্র। মাত্র তিনজন ছাত্রী নিয়ে স্কুলটি শুরু হল। তিনমাসের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০/৫০ জনে।

স্বামী রমেন্দ্র মিত্রের কাছে তিনি জমিদার ও জোতদারের হাতে বাংলার চাষীদের নিদারুণ বঞ্চনা, শোষণ এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলনের কাহিনী শোনেন। অনেক পূর্বে কমিউনিস্ট রমেন্দ্র মিত্র জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে পারিবারিক ঐতিহ্য ও মোহ ত্যাগ করে কৃষকের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রমেন্দ্র মিত্র ইলা মিত্রকে এসব কাজে উৎসাহ দেন। ১৯৪৬-৫০ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ইলা মিত্র।

কৃষক জমির মালিক নয়, তাই উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দিতে হতো জোতদারদের হাতে। এ ব্যবস্থাকে বলা হতো 'আধিয়ারী'। জোতদারি ও জমিদারি প্রথা ক্ষুদ্র কৃষকদের শোষণের সুযোগ করে দেয়। খাজনা আদায়ের জন্য জোতদাররা এদেরকে দাসের মতো ব্যবহার করে। চালাত নিপিড়ন, নির্যাতন। অনেক সময় খাজনা না দিলে কৃষকদের মেয়ে-বউ ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে মৃত্যুমুখে ছেড়ে দিত। খাজনা পরিশোধ করার জন্য কৃষকেরা মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হতো। যার ফলে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে আধিয়ার আর ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়।

এ শোষণ কৃষকের মনে বিক্ষোভের জন্ম দেয়। যার ফলে ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় 'সর্ব ভারতীয় কৃষক সমিতি'। ১৯৪০ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার উদ্যোগে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব দেয় 'ফাউন্ড কমিশন'। এই কমিশনের সুপারিশ ছিল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে চাষিদের সরাসরি সরকারের প্রজা করা এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুইভাগের মালিকানা প্রদান করা। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। চল্লিশের দশকে এসব আন্দোলনে ইলা মিত্র নেতৃত্ব দেন। ১৯৪২ সালে সমগ্র বাংলায় দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এ সময় কৃষকের ওপর শোষণের মাত্রা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তিনভাগের দুইভাগ ফসল, কৃষকের এই দাবি নিয়ে বেগবান হতে থাকে তেভাগা আন্দোলন। ১৯৪৬-৪৭ সালে দিনাজপুরে কমরেড হাজী দানেশের প্রচেষ্টায় সংগঠিত হয় যুগান্তকারী তেভাগা আন্দোলন। কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সমিতি চাষিদের সংগঠিত করে আন্দোলনকে জোরদার করতে থাকে। পার্টি থেকে রমেন্দ্র মিত্র ও ইলা মিত্রকে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কৃষক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়ে তেভাগা আন্দোলনকে জোরদার করতে বলা হয়। ১৯৪৬ সালে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হলে কমিউনিস্ট পার্টি দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকায় সেবা ও পুনর্বাসনের কাজ করতে এগিয়ে আসে। এসময় ইলা মিত্র নোয়াখালীর দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রাম হাসনাবাদে পুনর্বাসনের কাজে চলে যান।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর মিত্র পরিবারের জমিদারি অঞ্চল রামচন্দ্রপুর হাট পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান হবার পরও তেভাগা আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পূর্ব-পাকিস্তানের অনেক স্থানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন হয়। মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের এই আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করে। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করে। পার্টির শীর্ষ নেতারা আত্মগোপন করে কাজ করতে থাকেন। ইলা মিত্র ও রমেন্দ্র মিত্র নাচোলের চণ্ডীপুর গ্রামে আত্মগোপন করেন। আত্মগোপন অবস্থায় তারা চণ্ডীপুর গ্রামে এক শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯৪৮ সাল। ইলা মিত্র অন্তঃসত্ত্বা। সন্তান প্রসবের জন্য তিনি গোপনে কলকাতায় যান। পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এক মাস বয়সের ছেলেকে শাশুড়ির কাছে রামচন্দ্রপুর হাটে রেখে তিনি আবার ফিরে আসেন নাচোলে। ১৯৪৯ সালে তার নেতৃত্বে হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষক সংগঠিত হয়। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে জোতদার, মহাজনদের দল। ওই বছর কৃষকের ধান জোতদারদের না দিয়ে সরাসরি কৃষক সমিতির উঠোনে তোলা হয়। ফলে সংঘর্ষ বাঁধে। নাচোলে সাঁওতাল ও ভূমিহীনদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক শক্তিশালী তীরন্দাজ ও লাঠিয়াল বাহিনী। এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন মাতলা মাঝি। এভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন ইলা মিত্র ও রমেন্দ্র মিত্র। নাচোল অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনের বাস্তব রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন তারা। ১৯৫০ সালে জোতদার ও ভূমি মালিকেরা নাচোলের ভিতর এবং আশেপাশে তেভাগা কার্যকর করতে বাধ্য হয়। সরকারের পুলিশ বাহিনী গ্রামে গ্রামে অভিযান চালিয়ে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করে। ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি পুলিশ বাহিনী চণ্ডীপুর গ্রামে আসে। গ্রামবাসী সংগঠিত হয়ে পুলিশ বাহিনীকে পাল্টা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করতে থাকে। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে উত্তেজিত গ্রামবাসী ওই পুলিশ কর্মকর্তা ও পাঁচ জন পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করে। এই ঘটনার দু'দিন পর ৭ জানুয়ারি শুরু হল পুলিশের প্রতিশোধ। দুই হাজার সেনা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযান শুরু করে। বারোটি গ্রাম ঘেরাও করে তছনছ করে। ঘরবাড়ি ধ্বংস করে। গুলি চালিয়ে হত্যা করে অসংখ্য গ্রামবাসীকে। নারীদের ধর্ষণ করে। শিশুদের চালায় যৌন নির্যাতন। আন্দোলনকারী নেতা-কর্মীরা যে যার মতো আত্মগোপনে চলে যায়। ইলা মিত্র ৭ জানুয়ারি সাঁওতাল বেশ ধারণ করে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ভারত সীমানা পার হওয়ার সময় তিনিসহ আরো অনেক নেতা-কর্মী রোহনপুর রেলওয়ে স্টেশনে ধরা পড়ে যান। তাদের ধরে আনা হয় নাচোল স্টেশনে। পুলিশ তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। এই অত্যাচারে ইলা মিত্রর সাথীদের মধ্যে আনুমানিক ৮০/৯০ জন মারা যায়।

কমরেড ইলা মিত্রের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হল। পুলিশ অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে তার স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করে। টানা চার দিন অত্যাচারের পর নাচোল স্টেশন থেকে ইলা মিত্রকে নবাবগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে আনা হয়। সে সময় তার শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। গায়ে ছিল প্রচণ্ড জ্বর। ইলা মিত্রের ওপর বাঁশকল, শরীরের নাজুক অংশে বুটের আঘাত, বিবস্ত্র করে প্রহার, অনাহারে রাখা, ধর্ষণ ইত্যাদি ধরণের অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়।

এরপর ইলা মিত্র, রমেন্দ্র মিত্র ও মাতলা মাঝিকে প্রধান আসামী করে এবং শতাধিক সাঁওতাল কৃষকের বিরুদ্ধে পুলিশ হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি রাজশাহী কোর্টে উঠে। এটাই কুখ্যাত 'নাচোল হত্যা মামলা'।

নাচোল হত্যা মামলা কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী না থাকায় রাজশাহীর তৎকালীন দায়রা জজ প্রধান তিন আসামীকে দোষী প্রমাণ করে যাবজ্জীবন ও ১০৭ জন কৃষককে হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতার দায়ে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়। ইলা মিত্রকে রাজশাহী জেলে পাঠায়। এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করা হলে শাস্তির মেয়াদ ১০ বছর কমিয়ে দেয়া হয়।

১৯৫৩ সালে তাকে ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর করা হয়। কমরেড ইলা মিত্র ও তার সহযোদ্ধারা তখন ছাত্র জনতার চোখে অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। সাধারণ মানুষ তাকে ছেড়ে

দেয়ার দাবি করে রাজপথে নেমে আসে। ১৯৫৪ সালে কমরেড ইলা মিত্রকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে আনা হয়। ওই বছর যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হলে মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের নির্দেশে ইলা মিত্রের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। এই টিমের সুপারিশে বলা হয়, 'ইলা মিত্র নানা ধরণের দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত। মুখ্যমন্ত্রী এই সুপারিশের ভিত্তিতে নির্দেশ দেন, 'নাচোল হত্যা মামলার অন্যতম সাজাপ্রাপ্ত আসামী ইলা মিত্রকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেয়া হোক'।

চিকিৎসা হল। সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি। তখন থেকেই শুরু হয় জীবনের নতুন অধ্যায়। সুস্থ হয়ে তিনি কলকাতা সিটি কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত হন। ১৯৮৯ সালে তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ইলা মিত্র পশ্চিমবঙ্গের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির জেলা ও প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি চারবার মানিকতলা নির্বাচনী এলাকা থেকে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৬৭-৭২ সালে বিধান সভায় কমিউনিস্ট ডেপুটি লিডার ছিলেন। ১৯৬২-০২ পর্যন্ত শিক্ষক প্রতিনিধি হিসেবে তিনি পাঁচবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন আন্দোলনের জন্য ১৯৬২, ৭০, ৭১ ও ৭২ সালে কারাগারে যেতে হয়েছে তাকে। ইলা মিত্র ভারতের মহিলা ফেডারেশনের জাতীয় পরিষদ সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির সহ-সভানেত্রী এবং ভারত ও সোভিয়েত সাংস্কৃতিক সমিতির সহ-সভানেত্রী ছিলেন। বাংলাদেশের মানুষের জন্য তার ছিল বিশেষ আন্তরিকতা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন।

ইলা মিত্র কলকাতায় স্বামী রমেন্দ্র মিত্র, একমাত্র পুত্র রণেন মিত্র, পুত্রবধু ও নাতি-নাতনিকে নিয়ে জীবনের শেষ সময় কাটিয়েছেন। উপমহাদেশে নারী জাগরণ ও কৃষক আন্দোলনের এই কিংবদন্তি নেত্রী ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. ইলামিত্র– মালেকা বেগম।

২. তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী– পিটার কাস্টার্স, অনুবাদ: কৃষ্ণা নিয়োগী, প্রকাশক: নুরুল আনোয়ার, গণ সাহিত্য প্রকাশনী, ৩১/এফ তোপখানা রোড ঢাকা–১০০০, প্রকাশকাল ১ মে ১৯৯২।

৩. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশকাল ২০০৯।

৪. বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা– তপন কুমার দে; প্রকাশ কাল: ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।

নেপাল নাগ



১৯৩০ সালের কথা। ঢাকায় পুলিশের এক ইনফর্মার যুগান্তর দলের কর্মীদের ওপর অযথা উৎপাত শুরু করে। ঘটনা গড়াতে গড়াতে এমন অবস্থায় পৌঁছায়, যদি ওকে নিশ্চিহ্ন করা না হয় তবে যুগান্তর দলের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীর জীবননাশ অনিবার্য হয়ে পড়বে। ইনফর্মারটি অত্যন্ত হুঁশিয়ার ও দুর্দান্ত ছিল। গেন্ডারিয়া থেকে বহুদূরে ওই ইনফর্মার বাড়ি ও ঘাঁটিতেই তাকে ঘায়েল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যুগান্তর দলের কর্মীরা। বেশ কয়েকদিন চেষ্টার পর একদিন তাকে বাগে পাওয়া গেল। পাগল সেজে সত্যভূষণ গুহবিশ্বাস তাকে অনুসরণ করে চলছে।

অন্যদিকে রাতের অন্ধকারে খালি গায়ে নেপাল নাগের নেতৃত্বে অন্যেরা অপেক্ষা করছে ইনফর্মারটির বাড়ির দরজায়। ইনফর্মারটি যখন বাড়ির সামনে এসে নিজেকে অত্যন্ত নিরাপদ মনে করে সতর্কতায় হাল ছেড়ে দিয়েছে ঠিক তখনই তাকে শেষ করা হল। নেপাল নাগই প্রথম আঘাত হেনে তাকে ধরাশায়ী করে। তারপর বুলু (অপূর্ব রায়) চরম আঘাত হেনে একেবারে শেষ করে দেয়।

ঘটনার পর সরে যাবার পালা। অন্যান্যরা অন্য দিকে চলে গেছেন। বাকি তিনজন নেপাল নাগ, রমণী রায় ও বঙ্গেশ্বর রায়। তাদের যেতে হবে প্রায় আড়াই মাইল দূরে। সবারই খালি পা, জামা কোমরে বাঁধা, যেন ওপাড়ারই ছেলে। ওয়ারি এলাকার মধ্য এসে পথচারিদের বিভ্রান্তির জন্য বেশ সরবে দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু করল তারা। নেপাল নাগ প্রথম দৌড় শুরু করেন উঁচু গলায় এই বলে, 'আচ্ছা কে দৌড়ে আগে যেতে পারে'। পথচারীরা ভাবলেন, পাড়ার ছেলেরা হয়তো নিজেদের মধ্যে দৌড়ঝাঁপ করছে। পথচারীরা বুঝতেই পারেনি সদ্য হত্যাকাণ্ডের পর তারা দৌড় প্রতিযোগিতার ছলে ঘটনাস্থল থেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে বহুদূরে চলে যাচ্ছে।

'১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার বুকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিনয়-বাদল-দীনেশের 'শত্রু নিধন' ও আত্মদানের দুর্দান্ত ঘটনার পর যুগান্তর ও অনুশীলন দলের কারুর পক্ষে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা সম্ভব ছিল না। নেপাল নাগসহ প্রায় সবাই আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হয়। পাকা আশ্রয়স্থল তৈরির আয়োজন তখন চলছে, সম্পূর্ণ হয়নি। গেন্ডারিয়া পাড়াতেই একটি পরিবারের আশ্রয়ে যুগান্তর দলের এক কর্মীকে অন্যায়ভাবে মেরেছে অনুশীলন দলের কর্মীরা। ফলে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের দু'পক্ষেই তোড়জোড় চলছে এবং একটা বড়

রকমের মারপিট রক্তারক্তি কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটে যেতে পারে। খবর পেতেই নেপাল নাগ আমাদের নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লেন। সোজা চলে গেলেন গেন্ডারিয়ার এক বৃহৎ আমবাগানে, যেখানে উত্তেজিত অনুশীলন দলের কর্মীরা জড় হয়েছেন। আমাদের কিশোর কর্মীটাকেও ওখানে নিয়ে আসা হল। নেপালদা তাকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন ঘন অন্ধকারে অনুশীলন কর্মীদের ভিড়ের মধ্যে। হঠাৎ নেপালদাকে দেখে তারা অনেকেই অবাক হলেন। কোন কথা না বাড়িয়ে নেপালদা তাদের সরাসরি বললেন, আমাদের কর্মীটিই অন্যায় করেছে। ও নিজে এবং আমরাও ওই অন্যায়ের জন্য নিঃসঙ্কোচে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

অনুশীলন দলের কর্মীরা অবাক। তারা নেপালদাকে যথেষ্ট চেনেন। এই ব্যক্তিটি যে মারপিটে সিদ্ধহস্ত তাও তাদের ভাল করেই জানা। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন নিজেদের অপরাধ অসঙ্কোচে স্বীকার করে ক্ষমা চাইছেন তখন তাদের আর বলার কিছু ছিল না। হাত মিলিয়ে হাসিমুখে তারা ফিরে গেলেন। আমরাও বিজয়ী হয়ে ফিরে এলাম। কারণ, 'ব্রিটিশ শত্রুর বিরুদ্ধে যেটুকু শক্তি সঞ্চিত আছে তার বিন্দুমাত্র অপচয় করব না' এই ছিল সে সময় আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত। নেপালদা সেই লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হতে দেননি। নিজের প্রৌঢ়া মাকেও নেপালদা টেনে এনেছিলেন গোপন বিপ্লবী কাজে, দাদাও বাদ যাননি সহায়ক হতে। মৃত্যু-পরোয়ানা মাথায় নিয়ে যারা সেসময়ে আত্মগোপন করে আছেন অথবা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাবার গুরু দায়িত্বভার বহন করছিলেন, নেপালদার মা'র আটপৌরে চালচলতি ও গৃহস্থালির আড়ালে তৈরি আস্তানাগুলোতে তাদের সেদিন নিরাপদ আশ্রয় ছিল'– বঙ্গেশ্বর রায় (কমরেড নেপাল নাগের সহযোদ্ধা)।

১৯৩০ সালের আরেকটি ঘটনা। ঢাকার সারস্বত সমাজে জমায়েত তিন-চারশ শিক্ষক পণ্ডিতের মাঝ থেকে সরকারি টাকা ছিনিয়ে নেয়ার নায়ক নেপাল নাগ। ততকালীন গভর্নর বাহাদুর বছরে একবার পণ্ডিত শিক্ষকদের পাঁচ-সাত টাকা করে উপহার দিতেন। পরেশ রায় ওই খবর এনে দিল যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের কাছে। তখন যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের অস্ত্র কেনার জন্য টাকার খুব প্রয়োজন ছিল। গভর্নরের বাড়িটি দোতলা। নিচে প্রায় তিনশ ও ওপরের তলায় প্রায় একশ'র মতো শিক্ষক জমায়েত হয়েছে। টাকাটা আছে ওপরতলায়। বাড়ির গেট, সিঁড়ি, একতলা এবং দোতলায় ছ'জন সশস্ত্র অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ডিউটিতে রয়েছে। ওপর তলায় তিনজন, নেপাল নাগ, বিনয় বোস ও বঙ্গেশ্বর রায়। এই অ্যাকশনে তাদের 'এক নম্বর' সহকর্মী সুকুমার দত্তকে বাদ দেয়া হয়েছিল। কারণ, ঘটনাস্থলটি তার বাসস্থানের অত্যন্ত নিকটে ছিল। সিঁড়িতে রয়েছেন অসিত ঘোষ এবং নিচে সুবোধ মল্লিক ও শান্তি বোস। প্ল্যান ছিল, দোতলায় নেপাল নাগ ও বঙ্গেশ্বর রায় টাকাটা ছিনিয়ে নিয়ে অসিত ঘোষের হাতে দেবে এবং অসিত ঘোষ ওটা নিয়ে নিচতলায় যারা আছেন তাদের হাতে তুলে দেবেন। তারা সবাই চলে যাবেন। তারপর নেপাল নাগ ও বঙ্গেশ্বর রায় তাদের পিছু পিছু যাবেন। এই প্লান কার্যকর না হলে অন্য প্লান।

আর তা হল বিনয় বোস তার পিস্তলটি ওপরে সিলিং-এর দিকে তাক করে এক রাউন্ড গুলি ছুঁড়বে এবং তারপর নেপাল নাগ ও বঙ্গেশ্বর রায় টাকাটা নিয়ে অসিত ঘোষের হাতে তুলে দেবে। তারপর তিন জন নেমে সারস্বত সমাজের দেউড়ি পার হয়ে সরে পড়বেন। (ওই পিস্তলটি ছিল ২৮০ বোরের) ছোট ছোট গুলি। একদা ইলেকশন কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারি প্রয়াত সুকুমার সেন আইপিএস-এর এই পিস্তলটি তার ছোট ভাই অশোক

সেন (ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী) সরিয়ে এনে ঢাকার যুগান্তর দলের অস্ত্রভাণ্ডারে জমা দিয়েছিলেন। ঠিক প্ল্যানমতো বিনয় পিস্তলের আওয়াজ করতেই ঘরভর্তি লোক বাইরের বারান্দার দিকে সরে গেল। তখন নেপাল নাগ ও বঙ্গেশ্বর রায় টাকাটা দখল করল এবং অসিত ঘোষের হাতে তুলে দিল। বিপ্লবীরা চলে যাচ্ছেন। এমন সময়ে নেপাল নাগ জোরগলায় বলছেন, এই টাকা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ব্যয় হবে। যদি সরকার আপনাদের প্রাপ্য টাকা না দেয় তবে নিশ্চিত থাকুন দেশ স্বাধীন হলে পর কড়ায় গণ্ডায় এ টাকা আমরা আপনাদের ফেরত দেব।

নেপাল নাগ জন্মেছিলেন ১৯০৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। ঢাকা শহরের গেণ্ডারিয়ায়। দীর্ঘ পাতলা গড়নের কমরেড নেপাল নাগ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন ডানপিঠে। তার ভাল নাম ছিল শৈলেশ নাগ। স্কুলের লেখাপড়ায় কমরেড নেপাল নাগের আকর্ষণ ছিল কম। পাঠ্য বই নয়, বাইরের বই পড়ার প্রতি তার অধিক মনোযোগ ছিল। যে কারণে সহপাঠীদের চেয়েই বহু বিষয়ে তার জানাশোনা ছিল। স্কুলে পড়াশুনাকালে অনিল রায়ের নেতৃত্বাধীন ঢাকার গোপন বিপ্লবী দল শ্রীসংঘের সাথে যুক্ত হন। স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই তাকে বাছাই করা হয়েছিল গোপন বিপ্লবী দলের চরম সাহসী কাজের জন্য।

বাবা ছিলেন প্রকৌশলী। তিনি মধ্যপ্রদেশে ঠিকাদারি করতেন। ছোট বয়সেই উপার্জনের জন্য (সুচারু নেপাল নাগের বড় ভাই) চলে গেলেন বাবার কাজে সাহায্য করতে। পিতার দেয়া সামান্য টাকায় সংসার চালাতেন মা। অস্বচ্ছল সংসারের অভাব অনটনের মধ্যে কঠিন বাস্তবতার মাঝে বেড়ে উঠেছেন তিনি। মার প্রতি ছিল তার ছিল গভীর শ্রদ্ধা-ভালবাসা।

ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন পরোপকারী ও প্রতিবাদী স্বভাবের। পাড়ার কারও অসুখ হলে স্বেচ্ছায় ছুটে যেতেন সেবা করার জন্য। তিনি অন্যান্য সহপাঠীকে নিয়ে রোগীদের সেবা করার ভার নিতেন। কোথাও অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করতেন। জেলে থাকাবস্থায় তিনি বন্দী রোগীদের সেবা করতেন। এই বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত হয়েছিল দেশপ্রেম। ব্রিটিশের হাত থেকে দেশমাতাকে মুক্ত করার জন্য যুক্ত হয়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলে। জীবনবাজী রেখে সংগঠিত করেছেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড।

নেপাল নাগ কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলো উৎসর্গ করেছিলেন সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে। ১৯৩০ সালে নেপাল নাগ পলাতক জীবন যাপন করেন। গোপনে গোপনে বিপ্লবী কর্মী তৈরি করেন ও তাদের নিয়ে সিনিয়রদের কাছে পৌছে দেন। ব্রিটিশরাজকে উৎচ্ছেদের জন্য নানাবিদ কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৩১ সালে ঢাকায় বেশ কয়েকটি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয়। এসব কর্মকাণ্ডে তিনি যুক্ত ছিলেন। হঠাৎ একদিন, ঢাকা শহরে এক গোপন আস্তানা থেকে ব্রিটিশ পুলিশ কমরেড নেপাল নাগকে গ্রেফতার করে। তখন তার বয়স হয়েছিল ২২ বছর। এক সহকর্মীর বেইমানির ফলে ওই সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করতে পারেনি। তাই তাকে বিনা-বিচারে রাজস্থানের দেউলী বন্দীশিবিরে সাত বছর আটক রাখা হয়।

এই বন্দীশিবিরে তখন অসংখ্য সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা বন্দী ছিলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা রেবতী বর্মণ। কমরেড রেবতী বর্মণ ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ইংরেজি সাহিত্যে এবং মার্কসবাদে তার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এককথায় বলতে গেলে নেপাল নাগ ছিলেন তার অন্যতম উপযুক্ত শিষ্য। তার সঙ্গে নেপাল

নাগের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কমরেড বর্মণের শিক্ষা বেশ কয়েকজন রাজবন্দীকে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণে সাহায্য করে। পরবর্তীতে পণ্ডিত রেবতী বর্মন ও নেপাল নাগের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অনেক বিপ্লবী মার্কসবাদী কমিউনিস্ট মতাদর্শের পথ গ্রহণ করেন। দেউলী বন্দীনিবাসে 'কমিউনিস্ট কনসলিডেশন'-এ যোগ দিয়ে স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

দীর্ঘ সাত বছর কারাগারে থাকার পর নেপাল নাগ ২৯ বছর বয়সে ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। কারাগারে বসেই তিনি কমিউনিস্ট হয়েছেন। মার্কসবাদ-লেলিনবাদকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

মুক্তি পেয়ে তিনি বাড়িতে না এসে কলকাতায় যে ঘরে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, আবদুল হালিম থাকতেন সেখানে ওঠেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ (কাকাবাবু) তাকে বিহারে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তৈরি করার জন্য পাঠিয়ে দেন। সেখানে সাফল্যের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করে ফিরে এলে কাকাবাবু তাকে নিজের জেলায় অর্থাৎ ঢাকায় সূতাকল শ্রমিকদের মাঝে সংগঠন তৈরি করার পরামর্শ দেন।

তখন নেপাল নাগ চলে এলেন ঢাকায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা শাখার গোপন দপ্তরে কাজ শুরু করেন। নিজেদের বাড়িতে না উঠে ডেরা বাঁধলেন কমিউনিস্ট কর্মীদের কর্মকেন্দ্রে। নারিন্দা এলাকায় একটা একতলা দালানের সস্তা হোটেলের সামনের দিকের একচিলতে ঘরে। হোটেলের ছ'পয়সা দু'আনার ডালভাত তরকারি এবং কলতলা ও বারোয়ারি শৌচাগার– এ হল জীবন ধারণের একমাত্র ব্যবস্থা। একচিলতে ঘরে টেবিলের পাশে চাটাই-এর ওপর ছিল তার রাতের বিছানা। দিনের বেলায় বিছানা গুটিয়ে টেবিলের তলায় রাখতেন। টেবিলে স্তূপীকৃত ছিল তার জেল জীবনের একমাত্র সংগৃহীত দেশ-বিদেশ থেকে আনা মার্কসীয় তত্ত্বের বই। যাতে দেউলী বন্দীশিবিরের ছাপ মারা ছিল।

নারায়নগঞ্জে বৃহত্তর সূতা ও বস্ত্রকল অঞ্চলে শ্রমিক ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দায়িত্বে নিজেকে নিয়েজিত করেন। মিল-মালিক, ভাড়াটে গুণ্ডা, পুলিশ-গোয়েন্দার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত সূতাকল এলাকায় বলিষ্ঠ আন্দোলন, বিশাল ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তোলেন।

কয়েকমাস পরেই দক্ষিণ মৈশণ্ডীর জোড়পুল লেনে পার্টির জন্য একটা ছোট বাসা নেওয়া হয়। সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা শ্রমিক ইউনিয়ন, কমিউনিস্ট সংগঠন এবং রাজনৈতিক সংগঠনের মিটিং। বন্দী শিবিরের সাথী দীর্ঘকালের বিপ্লবী জ্ঞান চক্রবর্তীও ঢাকার বাসা ছেড়ে জোড়পুল লেনের বাসায় এসে ওঠেন। রাতে কমরেড নেপাল নাগ ও কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী পার্টি অফিসে থাকেন। ঢাকার শ্রমিকনেতা কমরেড সুধীর কর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা রমেশ রায়ও ছিলেন এই ডেরাতে। জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকেও অনবরত কমরেডরা এসে অতিথি হতেন। জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন একেবারেই কম কথা বলার লোক। আর নেপাল নাগ ছিলেন চরম আলাপী। জ্ঞান চক্রবর্তী ঢাকা জেলার গ্রামীণ মানুষদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছিলেন। আর নেপাল নাগ প্রধানত যোগাযোগ করতেন শ্রমিকদের সঙ্গে। এই দু'জনের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা ছিল। দু'জনেই অবশ্য ছিলেন দু'জনের পরিপূরক। দু'জনেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে অনেকের একজন হয়ে কাজ করার সহজাত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। পড়াশুনার দিকে তার ঝোঁক ছিল বেশি। প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যেও সামান্য একটু সময় পেলেও পড়ে নিতেন।

জোড়পুলে লেনের এই বাসা থেকেই ১৯৩৯-৪০ সালে নেপাল নাগ নারায়ণগঞ্জের আশেপাশের সূতাকল অঞ্চলের শ্রমিক সংগঠন গড়ার জন্য যাতায়াতকারী কমিউনিস্ট কর্মীদের যে গ্রুপ গঠিত হয়েছিল তার সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল মানুষ ও নেতা হয়ে ওঠেন। এ সময়ে তার খাওয়া-দাওয়ার চরম অনিয়ম ঘটেছিল। জোড়পুল লেনের বাসাতেই খেতে আসতেন কখনও কখনও বিকেল চারটায়। এভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্রমিক আন্দোলন, শ্রমিক সংগঠন এবং শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলেছেন।

১৯৪০ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। এপ্রিল মাসে ঢাকার কমিউনিস্ট কর্মীরা সারা উপমহাদেশের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করে। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনের উপর ১৪৪ ধারা জারি করে। সেদিন কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। কমরেড নেপাল নাগ ও নরেশ গুহ, বঙ্গেশ্বর, ফণী গুহ, প্রমথ নন্দী, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রশান্ত সেন, জ্ঞান চক্রবর্তী, সুশীল সরকার, নলীন্দ্র সেন, ব্রজেন দাস, কালীপদ গাঙ্গুলী, গোপাল বসাক, বিনয় বসু, জিতেন ঘোষ এই সম্মেলনের নেতৃত্বে দেন। এরা প্রত্যেকেই ছিলেন অগ্নিযুগের বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য।

যার ফলে ১৯৪০ সালের জুনে ব্রিটিশ পুলিশ নেপাল নাগসহ ঢাকা জেলার ১৫/১৬ জন প্রধান কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে গ্রেফতার করে। এই কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন বেআইনী বলে বিচারের নামে এক প্রহসনের নাটক শুরু হয়। নেপাল নাগকে প্রথমে এক বছর, পরে কমিয়ে ছ'মাসের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে তিনি মুক্তি পান। এরপর পুলিশ তাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখে। নেপাল নাগ দু'চার দিনের মধ্যেই অন্তরীণের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে চলে যান তার পুরনো ঘাঁটি নারায়নগঞ্জের সূতা ও বস্ত্রকল এলাকায়। সেখানে বিভিন্ন শ্রমিক পরিবারের আশ্রয়ে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত দেড় বছরের বেশি সময় ধরে আত্মগোপন থেকে শ্রমিক ও কমিউনিস্ট পার্টির জন্য কাজ করেন।

১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে যোগদান করার পথে সোমেন চন্দ শহীদ হন। সূত্রাপুর অঞ্চলের কমরেড দীনেশ দত্তের মতো কমিউনিস্টদের গড়া গণভিত্তির ওপর ভরসা করে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের মূলশক্তি যুগিয়েছিলেন নারায়নগঞ্জ সূতাকল এলাকায় শ্রমিকরা। যারা ১২/১৩ মাইল পায়ে হেঁটে যোগ দিতে এসেছিলেন এবং সম্মেলনকে হাঙ্গামা থেকে রক্ষা করে সম্পন্ন করার কাজে সহায়তা করেছিলেন। আর এই শ্রমিকদের তিলে তিলে সংগঠিত করেছিলেন নেপাল নাগ। এ সময়ে তিনি নারায়নঞ্জের সূতাকল অঞ্চলে আত্মগোপনে ছিলেন। আত্মগোপকালে তিনি কালো লম্বা দাড়ি, মালাধারী প্রবীণ পুরোহিত সেজে লাঠি হাতে নিয়ে ঠুকতে ঠুকতে চলতেন। তখন ব্রিটিশ পুলিশ হন্যে হয়ে তাকে খুঁজছে। পুরস্কার ঘোষণা করা হয় তাকে ধরিয়ে দেবার জন্য। ঢাকার ঘটনার পরের দিন ৯ মার্চ তিনি ঢাকা শহরে উপস্থিত হন। বিভিন্ন কমরেডের বাড়িতে ছদ্মবেশে অবস্থান করে সংকট সমাধানে পার্টিকে সহযোগীতা করেন। তারপর মিল এলাকায় এসে কমরেড নাগ সহযোগী হিসেবে পেলেন কমরেড অনিল মুখার্জি এবং বারীণ দত্তকে। এসময় নেপাল নাগ পরেশ ও দাশু নামে পরিচিত ছিলেন। নেপাল নাগ প্রায় ছয় ফুটের মতো লম্বা ও সুদর্শন ছিলেন। চল্লিশের দশকে কমরেড নেপাল নাগ ও অনিল মুখার্জি শ্রমিকদের কাছে থেকে 'মানিকজোড়' আখ্যা পেয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে যুক্তবাংলার প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পার্টির প্রাদেশিক শাখার সদস্য নির্বাচিত হন নেপাল নাগ। এ সময় তাকে পার্টির পক্ষ থেকে কলকাতা ও শহরতলীতে সূতাকল শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়া হয়। 'কমরেড নেপাল নাগের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৪২ সালের শেষের দিকে। তখন সবে আমি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য পদ পেয়েছি। আমাদের দুইজনেরই বন্ধু কমরেড নিরঞ্জন গুপ্ত আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৪৩ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে কমরেড নিরঞ্জন গুপ্ত সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমরেড গোপাল বসাক, জ্ঞান চক্রবর্তী, অনিল মুখার্জি, নেপাল নাগ, নলিন্দ্র সেন, নরেশ গুহ প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে পার্টির ঢাকা জেলা কমিটি সংগঠিত হয়। তখন নানা প্রকাশ্য বড় বড় সভায় নেপাল নাগের অনবদ্য বক্তৃতা শুনতাম। গোপন অবস্থায় থাকার সময় তিনি এবং কমরেড অনিল মুখার্জি সূতাকল শ্রমিক সংগঠন গড়ার দায়িত্বে ছিলেন। কমরেড নাগের কথা শুনলে মনে হতো, তিনি নিজেই যেন একজন তাঁত শ্রমিক। তাঁতের কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।'- নিবেদিতা নাগ।

নিবেদিতা নাগ ছিলেন ঢাকার বিশিষ্ট মহিলা কমিউনিস্ট কর্মী। তিনি ছিলেন নারায়নগঞ্জ তোলারাম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। বিয়ের কিছুদিন পর তিনি সব ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে পার্টিতে যুক্ত হন। উল্লেখ্য কমরেড নেপাল নাগ ও নিবেদিতা নাগের বিয়ের রেজিস্ট্রি হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন- কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, ভবানী সেন, আব্দুল হালিম, আব্দুল্লা রসুল, গোপেন চক্রবর্তী, সৈয়দ হাবিবুল্লা প্রমুখ।

১৯৪৩ সালে যুক্তবাংলায় ঢাকা-নারায়নঞ্জের সূতাকল শ্রমিকরা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় ঐক্যসাধনের রাজনীতি, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সমাবেশ গঠনের কার্যক্রমের অগ্রভাগে ছিলেন। ঢাকাতেও সূতাকল শ্রমিকরা শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন করেছিলেন। কমরেড নেপাল নাগকে এই জন্যে একই সঙ্গে কলকাতা এবং ঢাকায় যাতায়াত করতে হতো।

অগ্নিবর্ষী বক্তা ছিলেন কমরেড নেপাল নাগ। সেই সময় কমিউনিস্ট আন্দোলনে বক্তা হিসেবে জীবন্ত কিংবদন্তী ছিলেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী। শুধু নারায়নঞ্জের পার্টির লোকজনই নয়, যারা তার বক্তব্য শুনেছে তারা সবাই বলেছেন বঙ্কিম মুখার্জীর পরই যার নাম বলতে হয় তিনি হলেন নেপাল নাগ। বর্ষীয়ান জননেতা ন্যাপ প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ একবার বলেছিলেন, নেপাল নাগ বক্তৃতা দিতে উঠলে মরা মানুষও লাফ দিয়ে উঠত।

১৯৪৪-৪৭ সাল পর্যন্ত পার্টির প্রচণ্ড কাজের চাপ মাথায় নিয়েও দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশভাগের চক্রান্ত, অবশেষে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, এ সমস্ত দুর্দৈবের বিরুদ্ধে পার্টি তার সীমিত শক্তি নিয়ে প্রাণপণে লড়াই করেছিল। সেই লড়াইয়ে নেপাল নাগ ছিলেন অন্যতম। এছাড়াও তিনি এই দিনগুলোতে হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগনায় শ্রমিক সংগঠনের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন।

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে চটকল শ্রমিক এলাকা থেকে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জীকে বিধানসভায় নির্বাচনের জন্য দাঁড় করানো হয়। নির্বাচনী ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নেপাল নাগ। ওই সময় একদিন বিকাল বেলা কংগ্রেসী গুণ্ডারা ক্যাম্প আক্রমণ করে। অন্যরা পালিয়ে বাঁচলেও তিনি ক্যাম্প ছাড়েননি। চারদিক থেকে বর্ষিত ইট তাঁকে ক্ষত বিক্ষত, অবশেষে অজ্ঞান করে ফেলে। একটিমাত্র লাঠির সাহায্যে মাথাটাকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। বাঁ হাতের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল।

দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব-পাকিস্তানকেই নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নেন। ১৯৪৯-৬২ সাল পর্যন্ত তিনি 'রহমান ভাই' নাম গ্রহণ করে দীর্ঘকাল আত্মগোপন অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করেন। এই ১৪ বছরে তিনি প্রকাশ্য আসতে পারেননি। এ ছাড়াও তিনি কোনো সময় রহমান ভাই, কোনো সময় পরেশ দা, কোনো সময় দাসু দা নামে পরিচিত ছিলেন।

১৯৪৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে রেল ধর্মঘট প্রয়াস, ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার দাবিতে ছাত্র-জনতার বিপ্লবী অভ্যুদয় এবং ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ক্ষেত্রে নেপাল নাগের উদ্যোগ, কাজ ও ভূমিকা স্মরণীয়। ১৯৫৫ সালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৬ সালে আত্মগোপনে থেকেই আবার তিনি ভাঙ্গা শরীর নিয়ে পূর্ণোদ্যমে পার্টির কাজ শুরু করেন। ১৯৬০ সালে তিনি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ব কমিউনিস্ট মহাসম্মেলনে (৮১ পার্টি সম্মেলনে) যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অবস্থান করেন এবং কমরেড হো চি মিন, কমরেড মিকোয়ান, কমরেড চৌ এন লাই এবং কমরেড আইদিতের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করেন। ফেরার পথে তিনি লন্ডনে গিয়ে কমরেড রজনী পাম দত্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দেশে আসেন ১৯৬২ সালে। দুরারোগ্য ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৬২ সালে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য দেউলী বন্দীনিবাসের সময় থেকে ডায়েবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে তা মৃত্যু পূর্বক্ষণ পর্যন্ত বহন করেছিলেন নেপাল নাগ। তার জীবন ঢাকা শহরের গোপন আস্তানাগুলোতে ভয়ঙ্কর বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। সেখানকার পার্টির নেতারা অবিলম্বে গোপন পথে তাকে ভারতে পাঠান এবং হঠাৎ তার ফুসফুসে গভীর টিউবারকুলার ক্ষত ধরা পড়ে। তারপর অনেক দিন রোগে ভুগেছেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও তিনি পার্টি কাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। যতটুক কাজ করতে পেরেছেন, তা করেছেন। অবশেষে ১৯৭৮ সালের ৫ অক্টোবর তিনি মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. কমরেড নেপাল নাগ জন্ম শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলী– সম্পাদনায়: শাহরিয়ার কবির, প্রকাশকাল ২০০৮।

২. দীক্ষাগুরু বিপ্লবী নেপাল নাগ স্মরণে– বঙ্গেশ্বর রায় (কমরেড নেপাল নাগ জন্ম শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলী) প্রকাশিত।

৩. বিপ্লবী সাথী নেপাল নাগ– রণেশ দাশগুপ্ত (কমরেড নেপাল নাগ জন্ম শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলী) প্রকাশিত।

৪. আমাদের জীবন– নিবেদিতা নাগ (কমরেড নেপাল নাগ জন্ম শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলী) প্রকাশিত।

৫. সাপ্তাহিক একতা, ৩ অক্টোবর ১৯৮৩

৬. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম/তপন কুমার দে, প্রকাশকাল ২০০৯।

মণিকৃষ্ণ সেন



রংপুর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সংগঠক, ঐতিহ্যবাহী তেভাগা আন্দোলনের নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন। ৮৮ বছর জীবনের ১৯ বছর ৬ মাস জেল খেটেছেন। নিজগৃহে অন্তরীণ থেকেছেন প্রায় ৩ বছর। আত্মগোপনে ছিলেন ৭ বছর।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিযুগে অবিভক্ত বঙ্গভূমিতে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। এ আন্দোলন, সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় বঙ্গভূমির বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। রংপুরেও সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। এই মাটিতে, যেমন বিপ্লবীর জন্ম হয়েছে তেমনি অসংখ্য কর্মীও তৈরি হয়েছে এখানে। কিংবদন্তী বিপ্লবী, কমিউনিস্ট নেতা মণিকৃষ্ণ সেন এই রংপুরের সন্তান। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও মানবমুক্তির জন্য তিনি যুক্ত হয়েছিলেন রাজনীতিতে। সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ ছিল তার রাজনৈতিক দর্শন। শোষণমুক্তির লড়াই-সংগ্রামের সাথে ছিলেন অবিচ্ছেদ্য। এজন্যে জীবনের অধিকাংশ সময় তাকে জেলে অথবা আত্মগোপনে কাটাতে হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে সেই যুগসন্ধিক্ষণে ১৯০৩ সালের ১ নভেম্বরে মণিকৃষ্ণ সেন-এর জন্ম হয়। ফরিদপুরের (বর্তমান রাজবাড়ী জেলা) বেরাদী গ্রামে। বাবা বেণীমাধব সেন। মা প্রোমদা সুন্দরী সেন। তার বাবা পীরগঞ্জের কাবিলপুরের জমিদারের সেরেস্তা ছিলেন। তার কাকা চন্দ্রকান্ত সেনও আরেক জমিদারের সেরেস্তা ছিলেন। জয়পুরহাটে তার বাবার কিছু সম্পত্তি ছিল। সেখানে তাদের চাউলের ব্যবসা ছিল।

১৯১১ সালে মণিকৃষ্ণ সেনের বয়স যখন আট বছর তখন তার বাবা মারা যান। মণিকৃষ্ণ সেনরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও চার বোন। বড় ভাইকে তিনি দেখেননি। ভাইদের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। তার মেঝ ভাই শিবকৃষ্ণ সেন। তিনি কাবিলপুরের বিষয়সম্পত্তি দেখাশুনা করতেন। মণিকৃষ্ণ সেনের জীবন গড়ে উঠেছে ভাই শিবকৃষ্ণ সেনের কাছে। কনিষ্ঠ ভাই ডাক্তার ছিলেন। তিনি ১৯৭৬ সালে মারা যান। তার চার বোনের মধ্যে এক বোন বিয়ের আগে মারা যান। বড় বোনের মৃত্যু হয় কলকাতায় এবং অপর দুই বোনের মৃত্যু হয় রংপুর শহরে। তারা ছিলেন বৈদ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। কবিরাজী ছিল তাদের বংশগত পেশা। তার মা কবিরাজী চিকিৎসা জানতেন।

মণিকৃষ্ণ সেনের বাবার বাড়ি ছিল রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার কাবিলাপুর গ্রামে। তার বয়স যখন ৬ (ছয়) মাস তখন তার মা কাবিলপুরে আসেন। কাবিলপুরে অতিবাহিত হয় তার শৈশব জীবন।

পড়াশুনার হতেখড়ি পরিবারে। মা-বাবার কাছে। তারপর তাকে ভর্তি করানো হয় কাবিলপুর মাইনর স্কুলে। এই স্কুল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। ফরিদপুরের রাজবাড়িতে বিয়ে হয়েছিল তার বড় বোনের। ওই বোনের বাড়িতে থেকে তিনি রাজবাড়ি হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এই স্কুলে হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার সময় তিনি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। ম্যালেরিয়া সে সময় ছিল দুরারোগ্য ব্যাধি। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯১৮ সালে তিনি রংপুরে চলে আসেন। তখন তারা বসবাস করতেন মূলাটোলের বাসভবনে। এ সময় তিনি শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ কৈলাসরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন।

স্কুল জীবনেই তিনি রাজনীতিতে হাতেখড়ি নেন। ১৯২০ সালে ১৭ বছর বয়সের সময় ভারত ছাড় আন্দোলনে যুক্ত হন। শপথ নেন দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার। এই বিদ্যালয় থেকে ১৯২১ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ভর্তি হন কারমাইকেল কলেজে। ওই সময় যুগান্তর দলের বিপ্লবীরা প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের নামের আড়ালে তারা বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করতেন। ১৯২১ সালে মণিকৃষ্ণ সেন জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। তিনি ছিলেন গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক ও যুব ভলান্টিয়ারদের প্রধান। কারমাইকেল কলেজ থেকে ১৯২৫ সালে বি. এ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে তিনি এম. এ এবং বি. এল পাশের স্বীকৃতি পান।

শরীর সুস্থ রাখার জন্য শরীর চর্চার প্রতি তার ছিল অধীর আগ্রহ। ভর্তি হয়েছিলেন জিমনেসিয়ামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় তিনি নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। শরীরচর্চার মধ্যে ব্যায়ামে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কলকাতার শ্রেষ্ঠ চারজন ব্যায়ামবীরের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। শরীরচর্চা প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করতেন। দুর্ভাগ্যবশত শরীরচর্চার সর্বশেষ প্রতিযোগিতায় তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কারণ তিনি ওই সময়ে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পুরো তেষট্টি দিন পর তিনি সুস্থ হয়েছিলেন।

পড়াশুনা শেষে কলকাতা থেকে ফিরে আসেন রংপুরে। যুক্ত হন আইনজীবী পেশায়। তবে এই পেশার প্রতি তার তেমন আগ্রহ ছিলনা। মাঝে মধ্যে তিনি কোর্টে যেতেন।

১৯২১-২২ সালের কথা। সারা দেশের মতো রংপুরেও বিপ্লবীবাদীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। ওই সময় রংপুরের ইংরেজ পুলিশ সুপারিনটেডেন্ট বিপ্লবীদের আক্রমণের শিকার হন। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে যান। সশস্ত্র হামলা পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে অনাথ গুহ নামে একজন বিপ্লবীর কথা মণিকৃষ্ণ সেন জানতে পেরেছিলেন।

১৯২৭ সাল। মা-বাবা বিয়ের পাত্রী ঠিক করে ফেলেছেন। বিয়ের সবকিছু ঠিকঠাক। আত্মীয়-স্বজন জোর করে বিয়ের পিঁড়িতে বসালেন। বিয়ের পিঁড়ি থেকে জোরাজুরি করে উঠে এল ২৪ বছরের যুবক মণিকৃষ্ণ। সন্ত্রাসবাদী মণির বেশ ভাল জানা ছিল যে কোনদিন, যে কোনো সময়ে, যে কোনো স্থানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে তার মৃত্যু হতে পারে। একটি মেয়েকে ঘরে এনে বিধবা করে কি লাভ হবে– একথা স্বজনকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন। আর বিয়ে করা হল না তার।

১৯২৮ সালে মণিকৃষ্ণ সেন, যুগান্তর দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেসে যোগদান করেন। মণিকৃষ্ণ সেন বিপ্লববাদে বিশ্বাসী হলেও জনগণবিচ্ছিন্ন দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বুঝতেন জনগণকে বাদ দিয়ে বিছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের দ্বারা পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বদেশকে মুক্ত করা যাবে না। তাই মণিকৃষ্ণসহ অসংখ্য বিপ্লবীরা কংগ্রেসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

১৯২৯ সালে বিপ্লবীরা রাজশাহীর পুঠিয়ায় মেইল ট্রেন ডাকাতির প্রচেষ্টা চালায়। বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু এতে ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয় ইংরেজ সরকার। রংপুরে যুগান্তর দলের নেতা ছিলেন সুশীল দাশগুপ্ত এবং অনুশীলন দলের নেতা ধরণী বিশ্বাস ছিলেন মেইল ট্রেন ডাকাতি মামলার প্রধান আসামী। মেইল ট্রেন ডাকাতি মামলায় তাদের সাত বছর করে জেল হয়েছিল। এই মামলায় মণিকৃষ্ণ সেনও অভিযুক্ত হয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ি কাবিলপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জেল হাজতে তাকে থাকতে হয়েছিল ৪ মাস।

যেসব বিপ্লবীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে আসেন মণিকৃষ্ণ সেন, তাদের অন্যতম হলেন সুশীল দাশগুপ্ত। সুশীল দাশগুপ্ত পরবর্তী সময়ে কলকাতার মেছোবাজার বোমা মামলায় জড়িত হন। তাকে সাজা দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ফিরে তিনি কমিউটিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কলকাতায় তিনি শান্তি মিছিল বের করেন। পার্ক সার্কাসে শান্তি মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় ঘাতকরা সুশীল দাশগুপ্তকে ছুরিকাঘাত করে হত্য করে।

১৯৩০ সালে রংপুর জেলার আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের পক্ষ থেকে মণিকৃষ্ণ সেনকে 'ডিরেক্টর' মনোনীত করে। সে সময় কংগ্রেস ছিল নিষিদ্ধ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার সুযোগ ছিল না। এজন্য একজন 'ডিরেক্টর' গ্রেফতার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকজনকে মনোনীত করা হতো। ওই বছর আইন অমান্য আন্দোলনের এক পর্যায়ে মণিকৃষ্ণ সেনকে ব্রিটিশ গ্রেফতার করে। এ সময় তিনি রাজশাহী ও বহরমপুর জেলে ছয়মাস কারাভোগ করেন।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। মেদিনীপুরের হিজলী স্পেশাল ক্যাম্পে তিন মাস রাখার পর তাকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয় দেউলী বন্দীশিবিরে। দেউলী রাজপুতনার মরুভূমির নির্জন স্থানে অবস্থিত। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য পাঁচ বছরের বেশি সাজাপ্রাপ্তদের পাঠানো হতো আন্দামানে। অন্যান্যদের পাঠানো হতো দেউলীতে।

'আমি কারাদণ্ড ভোগ করেছিলাম সুদীর্ঘ ছ'বছর। ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকালে অন্যান্য রাজবন্দীদের সাথে আমি মুক্তি লাভ করি। দেউলী বন্দীশিবিরে আটকের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার শেষ পর্যায়ে বাঁকুড়ায় তিন মাস থানার হেফাজতে এবং এরপর ছয় মাস রাখা হয় যশোরের অভয়নগরে। এই কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর রংপুরের মূলাটোলের শিবকৃষ্ণ বাসভবনে আমাকে অন্তরীণ রাখা হয় সকাল-সন্ধ্যা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যাতায়াত করতে পারতাম।'

১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন মণিকৃষ্ণ সেন। একই সময় কমরেড মণিকৃষ্ণ সেনকে জেলা কংগ্রেস নেতা ও সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে হয়। ১৯৩৯-৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি রংপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর বৃহত্তর রংপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড শচীন ঘোষ, মণিকৃষ্ণ সেন, শিবদাস লাহিড়ী, রথীন গাঙ্গুলি, বিভূতি লাহিড়ী, রবি মজুমদার ও সুধীর মুখার্জীকে নিয়ে গঠিত হয় রংপুর জেলা কমিটি।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩ সাল) অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দেয় মহামারী। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে বসন্ত রোগ। পীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন মণিকৃষ্ণ সেন। ত্রাণকাজে মণিকৃষ্ণ সেনের কথা প্রসঙ্গে কমরেড শংকর বসু বলেন, 'দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়িত মানুষকে বাঁচানোর জন্য সে সময়ে পার্টি ও তার (মণিকৃষ্ণ সেন) নেতৃত্বে পরিচালিত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ সারা জেলায় দারুণ প্রভাব ফেলেছিল এবং রংপুরে কমিউনিস্ট পার্টির ব্যাপক গণভিত্তি সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল।'

১৯৪৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস। কংগ্রেসে রংপুর জেলা থেকে ডেলিগেট হিসেবে কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন এবং কৃষক কমরেড যোগেশ সিকদারকে নির্বাচিত করা হয়।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অবিভক্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনের দায়িত্বে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন মণিকৃষ্ণ সেন।

তেভাগা সংগ্রামের মূল দাবি ছিল উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ কৃষকের এবং একভাগ জোতদারের। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে ও রংপুরে সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা কৃষকের তেভাগা সংগ্রামে কমরেড মণিকৃষ্ণ সেনের ভূমিকা অনন্য।

'তেভাগার প্রস্তুতিপর্বে স্থানীয় পার্টি ও কৃষক সমিতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমাকে ও কমরেড মোকসেদকে জেলা কমিটির নির্দেশমালাসহ ডিমলা (রংপুরের প্রধান তেভাগা অঞ্চল) পাঠান হয়'। তেভাগা সংগ্রাম চলাকালে অস্ত্রসজ্জিত জোতদারের লোকদের হামলায় গুরুতর আহত হন মণিকৃষ্ণ সেন।

১৯৪৮ সালের ২২-২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এতে তিনি রংপুরের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৫০ সালে পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মণিকৃষ্ণ সেন আত্মগোপন চলে যান। তিনি রংপুর জেলার কালীগঞ্জের (বর্তমানে লালমনিরহাট জেলা) কমলবাড়ি গ্রামে আত্মোগোপনে ছিলেন। কিছুদিন যেতে না যেতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে মরিয়া হয়ে উঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি।

১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা- কর্মীরা ব্যাপকহারে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। ওপার বাংলায় জীবনের নিরাপত্তা ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মণিকৃষ্ণ সেন মাটি আর মানুষ ছেড়ে যাননি। ১৯৫১ সালে তিনি জেলা পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

জেলা পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মণিকৃষ্ণ সেন ঢাকায় আত্মগোপনে থেকে ভাষা আন্দোলনে কাজ করেন। এ সময় তিনি পার্টির প্রাদেশিক কমিটির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সাথেও যুক্ত ছিলেন। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় শুধু রংপুরে নয় খুলনা ও চট্টগ্রামে গিয়েও পার্টির সদস্য ও কর্মীদের রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে রংপুর জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির দুজন প্রার্থী ছিলেন অভয় বর্মণ ও অমর রায়। অপর একজন প্রার্থী কান্তেশ্বর বর্মণকে পার্টি সমর্থন প্রদান করেছিল। তিনজন প্রার্থীই নির্বাচিত হন। প্রার্থীদের নির্বাচন পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন মণিকৃষ্ণ

সেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৫৬ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কৃষক সমিতিকে পুনর্গঠিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে রংপুরের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নেতৃত্ব দান করেন মণিকৃষ্ণ সেন।

১৯৫৭ সালে রংপুরে ব্যাপকহারে দেখা দেয় গুটিবসন্ত। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এ মহামারী। এ সময় মণিকৃষ্ণ সেন আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন। ১৯৪৩ সালের অভিজ্ঞতা কাজে লাগান।

১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ গঠিত হওয়ার সময় কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়ায় শুধু রংপুর জেলা কিংবা পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপেরই নয় পাকিস্তান ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি।

১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর পাকিস্তান পুলিশ মণিকৃষ্ণ সেন ও শিবেন মুখার্জীকে গ্রেফতার করে। মণিকৃষ্ণ সেনকে প্রথমে রাজশাহী জেলে ও পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। ১৯৬৩ সালে উভয়ই মুক্তি পান।

১৯৬৪ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান পুলিশ মণিকৃষ্ণ সেনকে আবারো গ্রেফতার করে। এ সময় তিনি প্রথমে রংপুর ও পরে ঢাকায় কারাবন্দী ছিলেন।

১৯৬৮ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস। এ সময়ে কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন ছিলেন কারান্তরালে। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিবর রহমান, জননেতা কমরেড মণি সিংহসহ আরো অনেকের সঙ্গে তিনি মুক্তি পান।

১৯৭০ সালের শ্যামপুর চিনি কলে ধর্মঘট হয় আখচাষীদের। রংপুর টাউনহলে কৃষকদের সম্মেলন আহূত হয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কৃষকেরা সম্মেলনে যোগদান করেন। এই আন্দোলন তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে মণিকৃষ্ণ সেনের ভূমিকা অসাধারণ। তার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কুচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'ঝড়-তুফান' পত্রিকা-সম্পাদক জীবন দে বলেন '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামে কমরেড সেন (মণিকৃষ্ণ সেন) ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের এক বড় সহায়। তুফানগঞ্জে, কুচবিহার দিনহাটা থেকে শীতলকুচি কলকাতায় তিনি ছিলেন সদা তৎপর।' কুচবিহারের তুফানগঞ্জেও মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল একটি শিবির। এই শিবিরও পরিচালনা করতেন মণিকৃষ্ণ সেন।

১৯৭১ সালের অক্টোবর মাস। জনগণের সহায়তায় রংপুর জেলের গরাদ ভেঙ্গে অসংখ্য কারাবন্দী মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। তারা যোগাযোগ করেন মণিকৃষ্ণ সেনের সঙ্গে।'

১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কর্মসূচি গ্রহণ করে কমিউনিস্ট পার্টি। মণিকৃষ্ণ সেনের নেতৃত্বে পুনর্বাসন কর্মসূচি বাস্তাবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পার্টির নেতা ও কর্মীগণ।

১৯৭৩ সালের ৪-৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এ কংগ্রেসেও তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ওই বছর দুর্ভিক্ষ নেমে আসে বাংলার বুকে। চারদিকে শুরু হয় মৃত্যুর বিভীষিকা। দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এগিয়ে আসে কমিউনিস্ট পার্টি। এতে নেতৃত্ব প্রদান করেন মণিকৃষ্ণ সেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর মণিকৃষ্ণ সেন কলকাতায় যান। এবং সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি দীর্ঘ অসুস্থ থাকার পর ১৯৭৯ সালে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে আসেন।

১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির সভাপতি পদে কমরেড মণি সিংহ ও সম্পাদক পদে কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদ নির্বাচিত হন। এ সময় কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন নির্বাচিত হন অন্যতম সদস্য। ১৯৮১ সালে আবারো কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়। মণিকৃষ্ণ সেনকে সামরিক গুণ্ডা বাহিনী গ্রেফতার করে। দুমাস রংপুর কারাগারে থাকায় তিনি স্ট্রোক করেন। চিকিৎসার জন্য তাকে কলকাতায় পাঠানো হয়। কলকাতা থেকে ফিরে এসে তিনি রংপুর শহরের নিকটবর্তী রাজেন্দ্রপুর গ্রামে আত্মগোপন করেন।

১৯৮৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর মণিকৃষ্ণ সেন তার স্বর্গীয়া মাতার নামে প্রতিষ্ঠা করেন প্রমোদা সুন্দরী সেন কল্যাণ ট্রাস্ট। ওই বছরই বিষ্ণুপুর হাইস্কুল তিনি তার প্রয়াত পিতার নামে নামকরণ করেন।

১৯৮৭ সালের ৭-১১ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন কমিউনিস্ট পার্টির কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৯১ সালের ২৮ অক্টোবরে তিনি মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন জীবন ও সংগ্রাম– মোতাহার হোসেন সুফী।

২. কমরেড মণিকৃষ্ণ সেনের সাক্ষাৎকার– সাপ্তাহিক একতা।

৩. তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাস– ধনঞ্জয় রায়।

৪. কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস– আমজাদ হোসেন।

লীলা নাগ



উপমহাদেশের স্বাধীনতা ও নারী জাগরণের পথিকৃৎ লীলা নাগ। তিনি জন্মেছিলেন ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর। আসামের গোয়ালপাড়ায়। তার বাবা গিরিশচন্দ্র নাগ তৎকালীন আসাম সরকারের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। মা কুঞ্জলতা ছিলেন একজন সাধারণ গৃহিণী। লীলা নাগের বাবার বাড়ি মৌলভীবাজার রাজনগর উপজেলা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার উত্তরে, পাঁচগাওতে।

লীলা নাগের বর্ণমালা ও প্রাথমিক পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। বিশেষ করে পিতার কাছে। তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের শুরু হয় দেওগরে। তারপর কোলকাতার ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে। এরপর ১৯১১-১৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকার ইডেন হাইস্কুলে পড়াশুনা করেন। এই স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে তার পিতা অবসর গ্রহণ করার পর তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসাম থেকে ঢাকায় আসেন।

লীলা নাগ ১৯১৭ সালে কোলকাতার বেথুন কলেজে আই. এ ভর্তি হন। পড়াশোনায় তার খুব গভীর মনোযোগ ছিল। তিনি খেলাধুলায়ও উৎসাহী ছিলেন। নিয়মিত টেনিস, ব্যাডমিন্টন, হাডুডু চর্চা করতেন। কলেজের সকল অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। বহুমূখী প্রতিভার কারণে সবাই তাকে পছন্দ করতো। শিক্ষকদের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় ছাত্রী। কলেজ জীবনে জনপ্রিয়তার কারণেই তিনি কলেজের 'সিনিওর স্টুডেন্ট' নির্বাচিত হন।

কলেজের রি-ইউনিয়নের উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনি। 'লোকমান্য তিলকের' মৃত্যুদিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে কলেজ অধ্যক্ষার সাথে তার সংঘাত বাঁধে। ফলে তিনি ছাত্র-ধর্মঘটের আহ্বান জানান। বড়লাটের পক্ষে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানোর প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রামেও তিনি নেতৃত্ব দেন।

১৯২১ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি. এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক পান। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিলনা। কিন্তু লীলার অনমনীয় দৃঢ়তা, স্বচ্ছ একাগ্রতা দেখে উপচার্য ড. হার্টগ তাকে মাস্টারর্স ক্লাশে ভর্তির সুযোগ করে দেন। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এম. এ ভর্তি হন। এরপর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা চালু হয়। ওই বছর তিনি 'নিখিলবঙ্গ নারী ভোটাধিকার কমিটি'র

সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। নারীদের ভোটাধিকারের দাবি, আর্তত্রাণ ও অন্যান্য সমানাধিকারের দাবিতেও লীলা নাগ সোচ্চার ছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি এম. এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. এ ডিগ্রিধারী।

এম. এ পাশ করার পর লীলা রায় বাংলার নারী সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন অভিশপ্ত জীবনে জ্ঞানের আলো বিস্তারের জন্য ১২ সংগ্রামী সাথীকে নিয়ে 'দীপালি সংঘ' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। লীলা নাগসহ এদের মধ্যে অনেকেই 'দীপালি সংঘ' গঠনের পূর্বেই গোপন বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন। ১২ জনের মধ্যে ছিলেন ঠাকুর পরিবারের এনা রায়, ব্যারিস্টার পি. কে. বসুর কন্যা কমলা বসু, মনোরমা বসু, ব্রাহ্ম সমাজের ডা. নেপাল রায়ের দুই কন্যা লতিকা রায় ও লীলা রায়, সিলেট মুরারী চাঁদ কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ অপূর্ব চন্দ্র দত্তের কন্যা বীণা দত্ত এবং সরোজ বসু। ছাত্রী থাকাকালীন অবস্থায় লীলা নাগ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ও ঋষি রামানন্দের সান্নিধ্যে আসেন।

দীপালি সংঘ স্থাপনের পর তিনি এই সংঘের কার্যক্রম বিস্তৃত করার দিকে মনোযোগ দেন। পাড়ায় পাড়ায় এর শাখা স্থাপনের কাজ শুরু করেন। গড়ে তুলেন স্ট্যাডি সার্কেল। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ও লীলা রায়ের আপ্রাণ চেষ্টায় গড়ে ওঠে 'নারী শিক্ষা মন্দির'সহ ১২টি অবৈতানিক প্রাথমিক স্কুল এবং শিল্প শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র।

১৯২৪ থেকে শুরু হয় দীপালি প্রদর্শনী। এ প্রদর্শনী বাংলার নারী সমাজকে নারীমুক্তি সংগ্রামের এক নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে। ১৯২৬ সালে লীলা গঠন করেন 'দীপালি ছাত্রী সংঘ'। এর মধ্য দিয়ে ছাত্রীরা জাগরিত হয়। ওই বছর তিনি গঠন করেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। এখানে বিপ্লবী পুলিন দাসের তত্ত্বাবধানে মেয়েরা অস্ত্র চালনা প্রশিক্ষণ ও লাঠি খেলা শেখেন।

১৯২৫ সালে তিনি ঢাকার শ্রীসংঘ-এর সাথে যুক্ত হন। 'শ্রীসংঘ' ছিল তখনকার ঢাকার একটি বিপ্লবী দল। সশস্ত্র বিপ্লববাদী যুগান্তর ও অনুশীলন দলকে নিষিদ্ধ করার পর উভয় দলের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতেন। যে কারণে এই সশস্ত্র বিপ্লববাদীরা তখন 'শ্রীসংঘ' নামে একটি সংগঠন দাঁড় করিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আর দীপালী সংঘ ছিল 'শ্রীসংঘ'-এর মহিলা শাখা সংগঠন।

১৯২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় দীপালি সংঘের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বক্তৃতায় বলেন 'এশিয়ায় এতো বড় মহিলা সমাবেশ আর কখনও দেখি নাই'। রবীন্দ্রনাথ লীলা নাগকে শান্তি নিকেতনে কাজের ভার নিতে বলেন। কিন্তু লীলা নাগ কবিগুরুর অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি। তার পথ আলাদা। তিনি মেয়েদের প্রতি অন্যায় অবিচার, অসম্মানের বিরুদ্ধে এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ লড়ে যাওয়ার সংকল্প নেন। এ সময় দীপালি সংঘের কার্যক্রম আসাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

১৯২৮ সালে কোলকাতা কংগ্রেস ও বাংলার বিপ্লবী দলগুলো সুভাষ চন্দ্রের সংস্পর্শে সংঘঠিত হতে থাকে। সহকর্মীদের সাথে অনিল রায় ও লীলা নাগ সেখানে উপস্থিত হন। লীলা নাগ তখনও বিপ্লবী দলের নেপথ্যে কাজ করেন। 'নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনে' 'বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস' উপস্থাপন করেন লীলা নাগ। কয়েক বছরের মধ্যে দীপালি সংঘের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে। দলে দলে মেয়েরা এর পতাকা তলে সমবেত হতে থাকেন। বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগের কাছে দলের ছেলেরাও আসেন নানা আলোচনার বিষয়

নিয়ে। নেত্রী হিসেবে তার সঙ্গে গণ আন্দোলনের সম্পর্ক ছিল। দীপালি সংঘ ছাড়াও তিনি যুক্ত ছিলেন অনিল রায়ের শ্রীসংঘের সাথে। শ্রীসংঘে যোগদানের পর বিপ্লবী আন্দোলনেও তিনি অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যান প্রথম সারিতে। এ দুই প্রকৃতির আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে তিনি এগিয়ে চলেন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য। শহীদ যতীন দাসের লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনে আত্মহুতির সশ্রদ্ধ স্মরণে, কোলকাতার মনুমেন্টের পাদদেশে সুভাষ চন্দ্রের ওপর লাঠি চার্যের প্রতিবাদে, লীলা নাগের নেতৃত্বে ঢাকায় জন সমুদ্রের শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। যা ছিল সেদিনকার ভারতবর্ষের অতুলনীয় ইতিহাস।

১৯২৭-২৮ সালে নির্যাতিত, অবহেলতি ও নিগ্রীহিত নারীদের আশ্রয় ও সাহায্যার্থে 'নারী আত্মরক্ষা ফান্ড' খোলেন। এখানে মহিলাদের আত্মরক্ষামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে লীলা নাগের সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' নামক একটি পত্রিকা বের হয়। এটিতে নারীমুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলন প্রধান্য পেত।

১৯৩০ সালে লীলা নাগের নেতৃত্বে গঠিত 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি'র উদ্যোগে ঢাকার নারীরা 'লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে' যোগ দেন। এ আন্দোলনে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আশালতা সেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে প্রকাশ্য গণসংগ্রামের আড়ালে লীলা নাগ বৈপ্লবিক সংগ্রামের দায়িত্বে নিয়েজিত ছিলেন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের মত দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক অভিযানের পর বাংলার সকল বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয়দের ইংরেজ সরকার গ্রেফতার করে। এ সময় শ্রীসংঘের নেতা অনিল রায় ও তার এক সহকর্মীরা গ্রেফতার হন। কেউ কেউ আবার আত্মগোপনে চল যান। তখন শ্রীসংঘের সর্বময় নেতৃত্বের দায়িত্ব নেন লীলা নাগ।

নারীশিক্ষা মন্দিরের ঊষারায় লীলা নাগের সহযোগী ছিলেন। তার ওপরও এই শ্রীসংঘের কাজের দায়িত্ব চলে আসে। লীলা নাগ ও ঊষারায়ের কাজের সহায়ক ছিলেন দুই আত্মযোগপনকারী সহকর্মী। শহীদ অনিল দাস ও অনিল ঘোষ।

লীলা নাগ দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার পর দলে দলে দীপালি সংঘের মেয়েরা শ্রীসংঘে আসতে শুরু করেন। ঢাকার ইডেন স্কুল ও কলেজ এবং কোলকাতার ১১, গোয়াবাগানে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রীসংঘ এবং ছাত্রীভবনই ছিল শ্রীসংঘের মেয়ে সদস্য পাওয়ার উৎস ভূমি। এ মেয়েরাই পরে শ্রীসংঘের সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। এদের মধ্যে রেনুসেন, সুশীলা দাশ গুপ্ত, লাবণ্য দাশগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত, সুরমা দাশ, হেলেনা দত্ত, অশ্রুলতা সেন, আশা রায়, উমা দেবী, ছায়াগুহ, প্রভা চৌধুরী, গৌরী সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লীলা নাগ অন্তরীণ থাকেন। এসময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন রমা সেন, সুলতা ঘোষ, মাধুরী বসু, যুঁথিকা মিত্র, কুলু চৌধুরী, শান্তি বসু, সাগরিকা ঘোষ, উমা সেন, বাসনা মুখার্জি, বীণা সেন গুপ্ত, অমিতা চৌধুরী, সুলেখা ঘোষ, অঞ্জলি রায়, হাসিকতা রায়, অরতি গুপ্ত, সতীদত্ত গুপ্ত, বাসনা ঘোষ, চন্দ্রাবসু, অনিমা সেন, মিলন সেন, পুস্পরেনু বসু, সুহাসিনী সেন, নীলিমা মিত্র, লতা সেনগুপ্ত, লীলা সেন, বন্দনা গুপ্ত, অলকা চৌধুরী, দীপ্তি চৌধুরী, বিউটি ঘোষ, শান্তি চক্রবর্তী, শান্তনা দাশ শর্মা প্রমুখ।

শ্রীসংঘের এসস্ত সদস্যরা সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনা করার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা তৈরি করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন অনার্সের ছাত্র অনিল দাস (পরে শহীদ হন) ও শৈলেশ রায় (পরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ রসায়ন বিভাগের প্রধান) বোমার ফর্মুলা

নিয়ে কাজ করেছেন। ক্ষীতিশ রায় করেছেন সহায়তা। বোমার খোল তৈরি করেন বীরেন পোদ্দার। বোমার খোলের ভাল নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন অনিল রায়। বোমার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করতেন লীলা নাগ। বোমার ফর্মুলার প্রয়োগের সাথে যুক্ত ছিলেন সঙ্গত টোলার সুবেশ কর, বঙ্গেশ্বর রায়, ছোট বিনয় বসু, অমল রায়, রেনু সেন ও নৃপেন চক্রবর্তী। এদের নিয়ে অস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে লীলা নাগ নিজেও বার বার কোলকাতা আসা যাওয়া করতেন।

ছাত্রীভবনের মাসিমা কুমুদিনী সিংহের যুগীপাড়া বাইলেনের বাড়িটি বিপ্লবীদের মিলন ক্ষেত্র ছিল। শ্রীসংঘের সদস্য-সমর্থকরা যোগাযোগ রক্ষার্থে এ বাড়িটি ব্যবহার করতেন। ছাত্রীভবনের সদস্যরা অস্ত্র সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলার জন্য লীলা নাগ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের ইন্দুমতি সিংহকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে দেন। সূর্যসেনের পরামর্শে অবিভক্ত ভারতের প্রথম নারী বিপ্লবী প্রীতিলতা দীপালি সংঘের সদস্য হয়ে বিপ্লবী জীবনের পাঠ নিয়েছিলেন লীলা নাগের কাছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দলের বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্রের দাবি নিয়ে হাজির হতেন লীলা নাগের কাছে। এসময় বড়লাট লর্ড ইউলিংডনের ট্রেনে বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা করেন অতীশ বসু ও তার সহযোগীরা। বোমার ফর্মুলার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট বন্ধুরা। একই সাথে অ্যাকশনের পরিকল্পনা করেন কমলাকান্ত ঘোষ। শুরু হয় ব্রিটিশ কর্মকর্তা নিধনের প্রস্তুতি পর্ব।

ঢাকার বিভিন্ন পল্লীতে অস্ত্রের ঘাঁটির রক্ষক ছিলেন মেয়েরা। ঢাকার বক্সীবাজার, চাঁদনিঘাট, আজিমপুর, কায়েতটুলী, টিকাটুলি, ওয়ারী, ঠাটারিবাজার, বনগ্রাম, তাঁতিবাজার, সঙ্গতটোলা, বাংলাবাজার, গেন্ডারিয়া, ফরাসগঞ্জ, লক্ষ্মীবাজার, সিদ্ধেশ্বরী ছিল বিপ্লবীদের অস্ত্রের ঘাঁটি। এখান থেকে পূর্ববাংলার সর্বত্র অস্ত্র সরবরাহ করা হতো। কোলকাতার সরবরাহ কেন্দ্র ছিল ছাত্রী ভবন এবং ৩১, কানাইধর লেন। কানাইধর লেনে শ্রীসংঘের সদস্যদের পরস্পরের মিলন কেন্দ্র ছিল। শ্রীসংঘ দ্বিধাবিভক্তির পর দলের যারা বি. ভি'তে যোগ দিয়ে বৈপ্লবিক কর্মে জড়িত ছিলেন তাদের অনেকেই এ বাড়িতে অস্ত্র বিনিময় ও সহযোগিতার জন্যে আসতেন।

শ্রীসংঘের নেপাল নাগ, অশোক সেন (পরে ভারতের আইন মন্ত্রী) সত্যভূষণ গুহ বিশ্বাস, বিধুভূষণ গুহ বিশ্বাস, অসিত ঘোষ, জ্যোৎস্না সরকার এ ঘাটিতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। বি. ভি'র আসতেন সুপতিরায়, মনোরঞ্জন সেন, শশাঙ্ক দাশগুপ্ত প্রমুখ বিপ্লবীরা।

১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুরনোর উপর গুলিবর্ষণের মামলায় গ্রেফতার হন সুনীল দাস। দু'মাস পর তিনি কারা মুক্ত হন। কারামুক্তির পর লীলা নাগের নির্দেশে তিনি কোলকাতায় দলের সাংগঠনিক কাজ তদারক করতে আসেন। কোলকাতায় আসার পর একটি আগ্নেয়াস্ত্র ঢাকা নিয়ে যাবার জন্য লীলা নাগের নির্দেশে অস্ত্রটি অশোক সেনের হাতে তুলে দেন সুনীল। ওই সময় যুগান্তর এবং অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহযোগে কোলকাতায় একটি গোপন কো-অর্ডিনেশন বোর্ড তৈরি হয়। এ বোর্ড গঠনে লীলা নাগ যথেষ্ট সহায়তা করেন। তারই নির্দেশে সেই বোর্ডের সদস্য হিসেবে শ্রীসংঘের কান্তি ঘোষ মনোনয়ন পান।

১৯৩১ সালে ঢাকা শহরে ডুরনোর ওপর দিনের বেলায় গুলিবর্ষণের অভিযোগে ৩৩টি বাড়িতে পুলিশের অভিযান ও সন্ত্রাস চলে। ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কোটাম, লীলা

নাগের বাড়ি পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেন। লীলা নাগ এসময় অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের কাজে কোলকাতায় ছিলেন।

১৯৩০ সালে ৮ ডিসেম্বর বিনয়-বাদল দীনেশের দুর্ধর্ষ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের পর বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আরো জোরদার হয়। ১৯৩১ সালের এপ্রিলে বি. ভি'র সদস্যদের গুলিতে পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং আলিপুরের জেলা জজ গার্লিক ও কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সর নিহত হন।

১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর দীপালির প্রদর্শনীর কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পর লীলা নাগকে গ্রেফতার করা হয়। লীলা নাগ ভারতবর্ষে বিনা বিচারে আটক প্রথম নারী রাজবন্দী। লীলা নাগের গ্রেফতারের পর তার অনেক নারী সহকর্মী গ্রেফতার ও বন্দী হন। জেলে গিয়ে লীলা নাগ দলীয় কর্মীদের দলের সাংগঠনিক সংহতিকে বৈপ্লবিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে এ্যাকশন ওরিয়েন্টেট করার নির্দেশ পাঠান। নেত্রীর নির্দেশে, এ কাজের দায়িত্ব কাঁধে নেন অনিল দাস। তাকে সহায়তা করেন অনিল ঘোষ। আর্থিক অনটন ঘোচানোর জন্য অনিল দাস বন্ধুদের নিয়ে ঢাকার নবকুমার স্কুলে একটি গোপন বৈঠক করেন। এ বৈঠকে ঠিক হয় ভৈরববাজার হতে নারায়নগঞ্জের ট্রেনে যে পাটের ব্যবসায়ীর টাকা আসে, দিনের বেলা ট্রেন থামিয়ে সেই টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হবে। প্রথম অভিযান ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় অভিযানের দিন ধার্য হয় ১৩ মে ১৯৩২। অনিল দাস নির্বিঘ্নে কাজ সমাধা করে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যান। ওই বছর ৬ জুন তালতলা স্টিমার স্টেশনে পুলিশ অনিল দাসকে গ্রেফতার করে। প্রায় আড়াই বছরের আত্মগোপনকারী দুর্ধর্ষ বিপ্লবী অনিল দাসের ওপর চলে পুলিশের বর্বর নির্যাতন। গ্রেফতারের ১১ দিন পর পুলিশের নৃশংস অত্যাচারে তিনি মারা যান।

১৯৩১ সালেন ২০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৭ সালের ৮ অক্টোবর পর্যন্ত লীলা নাগ ঢাকা, রাজশাহী, সিউড়ী, মেদেনীপুর জেল ও হিজলী মহিলা বন্দীশালায় আটক ছিলেন। ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি জেলে অনশন করেন। অনশনের কারণে তাকে শাস্তি দিয়ে হিজলী বন্দীশালায় পাঠানো হয়। ১৯৩৬ সালের ২৮ এপ্রিল হিজলী বন্দীশালায় দ্বিতীয়বার অনশন শুরু করলে তাকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তর করা হয়। এখানে তাকে নির্জন সেলে রাখা হয়। ১৯৩৬ সালের ৪ মে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯৩৭ সালের ৮ অক্টোবর তিনি কারামুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে সিলেটের বিশাল নারী সম্মেলনে লীলা নাগ সম্বর্ধিত হন। কারামুক্তির পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গৌরীপুর লজ থেকে একটি চিঠি লেখেন তাকে।

১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে কোলকাতার ২২ সি অশ্বিনী দত্ত রোড থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে 'জয়শ্রী' প্রকাশিত হয়, যেটি ব্রিটিশ ১৯৩৫ সালে নিষিদ্ধ করেছিল। রেনু সেনের উদ্যোগে ঢাকা থেকে কোলকাতায় 'জয়শ্রী'র দপ্তর বদল করেন লীলা নাগ। 'জয়শ্রী' প্রকাশিত হলে কবিগুরু আশীর্বাদ জানান, মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও/নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।' আরো অভিনন্দন জানান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, হাজরা বেগম, কাকাবাবু এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু।

১৯৩৮ সালের ৩ আগস্ট অনিল রায় মুক্তি পান। স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের জন্য এগিয়ে যেতে হবে এ লক্ষ্যে অনিল রায় ও লীলা নাগের নেতৃত্বে 'শ্রীসংঘ' রূপান্তরিত হয়। আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে। এ গোষ্ঠীকে নিয়ে তারা কংগ্রেসে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যে

রাজনৈতিক সংগ্রামে সুভাষ চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে পরিচিত হন তারা। রাজনীতিতে লীলা নাগের প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালেও নারীমুক্তি সংগ্রাম, শিক্ষাবিস্তার এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজের দিকে তার দৃষ্টি ছিল সবসময়। ঢাকায় 'নারী শিক্ষা মন্দির' (বর্তমানে শেরেবাংলা স্কুল ও কলেজ) শিক্ষাভবন পুনর্গঠিত হয়। অনিল রায়ের মাতুলালয়ে মানিকগঞ্জের রায়রা গ্রামে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক সন্তানদের জন্য একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন তারা।

লীলা নাগ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' স্থাপনের প্রস্তাব আনেন। এ প্রস্তাব সমর্থন করেন সুভাষ চন্দ্র। দলমত নির্বিশেষে বাংলায় সব নারীকর্মী এ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হন। জাতীয় সংগ্রামের সাথে নারী সমাজকে সংহত করার নেতৃত্বে ছিলেন লীলা নাগ। পরবর্তীকালে এ উদ্যোগের অনুসরণেই জন্মলাভ করে কংগ্রেস মহিলা সাব-কমিটিগুলো। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারিতে ত্রিপুরা কংগ্রেসের পূর্বে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনে জাতীয় দাবি সম্পর্কিত 'চরমপত্র' প্রস্তাবের উত্থাপক সুভাষ চন্দ্র এবং সমর্থক ছিলেন লীলা নাগ।

১৯৩৯ সালের ১৩ মে লীলা নাগ ও অনিল রায়ের বিবাহ হয়। বিয়ের পর সামাজিক প্রথানুসারে লীলা নাগের নাম হয় লীলা রায়। ওই মাসে তারা দু'জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরূপে ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। সুভাষ চন্দ্রকে নিয়ে ঢাকা, মানিকগঞ্জ সফর করেন তারা। ১৯৪০ সালের ২৭ জুন নাগপুরে ফরোয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন সুভাষ চন্দ্র। মূল প্রস্তাব উত্থাপক ছিলেন লীলা রায়। প্রস্তাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান ছিল। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ছিল হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করা।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে ১৯৪০ সালের ২ জুলাই পুলিশ সুভাষ চন্দ্রকে, ৯ জুলাই অনিল রায়কে এবং ১০ জুলাই লীলা রায়কে পুলিশ গ্রেফতার করে। ওই বছর ২৯ আগস্ট স্বামী ও স্ত্রী মুক্তি পান। জেল থেকে সুভাষ চন্দ্রের অনুরোধ পেয়ে সুভাষ বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সম্পাদনার ভার নেন লীলা রায়।

সুভাষ চন্দ্র মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৪১ সালের ১২ জানুয়ারি সাথে অনিল রায় ও লীলা রায়ের শেষ সাক্ষাৎ হয়। অন্তর্ধানের পূর্বে সুভাষ তাদেরকে উত্তর ভারতে সংগঠন ও বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের জন্য কাজ করতে বলেন। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার 'শিক্ষাভবন স্কুলভবন' স্কুল প্রাঙ্গনে 'দীপালি সংঘের' অনুসরণে লীলা রায় একটি মহিলা সংগঠন 'নাইনটিন ফরটিওয়ান ক্লাব ও যুগদাবি চক্র' স্থাপন করেন। ওই বছর ১১ ডিসেম্বর ভারতরক্ষা আইনে শরৎচন্দ্র বসু বন্দী হন। তার এ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হাজরা পার্কে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় লীলা রায় ও অনিল রায় বক্তৃতায় তীব্র নিন্দা জানান। এ অপরাধে তাদেরকে রাজবন্দীরূপে ১৯৪৬ সালের জুন পর্যন্ত আটক থাকতে হয়।

মুক্তি পাওয়ার পর ওই বছর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় বিপন্নদের উদ্ধারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লীলা রায় ও অনিল রায় বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেন। নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মৌলভী আশরাফ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরীকে পার্কসার্কাস থেকে উদ্ধার করে তারা তাদের ৪৭ এ রাসবিহারী এভেন্যুর বাড়িতে এনে রাখেন।

১৯৪৬-এর অক্টোবরে নোয়াখালির দাঙ্গার পর সেখানকার সবচাইতে বিপর্যস্ত এলাকা রামগঞ্জ থানায় গান্ধীজীর আগে লীলা রায় ও অনিল রায় তাদের কর্মীবাহিনী নিয়ে পৌছেন। ক্যাম্প খুলে ৬ দিনে ৯০ মাইল ঘুরে অবরুদ্ধ নারীদের উদ্ধার করেন। নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলে 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট' নামে ১৭ টি ক্যাম্প খুলে দীর্ঘদিন সেবা ও সাহয্যের ব্যবস্থা করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় লীলা রায় অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দুঃখ বঞ্চনার অংশীদার হয়ে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মুসলিম লীগ শাসকেরা লীলা রায় ও অনিল রায়ের জীবন দূর্বিসহ করে তোলে। ১৯৪৮ সালে তাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়।

১৯৪৯-৫১ সাল পর্যন্ত লীলা রায় সংখ্যালঘু হিন্দু, মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু হন তাদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫০ সালে লীলা রায় ও তার সহকর্মীরা সীমান্তবর্তী এলাকায় 'পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ কমিটির' পক্ষ থেকে আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৫১ সালে উদ্বাস্তু উচ্ছেদের বিল আনেন সরকার। এ বিলের প্রতিবাদে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গ্রেফতার হন লীলা রায় ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিলের উপযুক্ত পরিবর্তন করেন।

১৯৫২ সালে লীলা রায়ের স্বামী অনিল রায় ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন। জীবন সাথীকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হয় পড়েন তিনি। কিছুদিন পর তিনি আবার সমাজ বিপ্লবের সংগ্রামকে জোরদার করার কাজ শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের সমাজবাদী শিবিরে যোগদান করেন। সমাজবাদী শিবিরের সর্বভারতীয় সম্মেলনে লীলা রায় জাতীয় কর্ম পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে সারা আসামের উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরে দ্ব্যর্থহীনভাবে বাঙালি বিদ্বেষের সমালোচনা করেন।

১৯৬৪ সালের ২৫ মার্চ 'পূর্ববাংলা বাঁচাও কমিটি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সময় আইনভঙ্গ করার অপরাধে কোলকাতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৬ সাল থেকে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে পি. পি হাসপতালে ভর্তি করা হয়। ২৩ দিন পর সংজ্ঞা ফিরে এলেও তার বাকশক্তি ফিরে আসেনা। ডানদিক সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। আড়াই বছর সংজ্ঞাহীন থাকার পর ১৯৭০ সালের ১১ জুন তিনি মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. মুক্তি মঞ্চে নারী– ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্ত, রচনাকাল ১৯৯৪-৯৭ সাল।

২. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশকাল ২০০৯।

৩. বাংলার মুক্তি সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টপাধ্যায়, রাখী চট্টপাধ্যায়, প্রকাশকাল ২০০৫, কলকাতা।

৪. বাংলাপিডিয়া।

৫. দৈনিক আমার দেশ, ৩০ জুন ২০০৭।

কল্পনা দত্ত



১৯২৯ সালের মে মাস। তখন মাষ্টার'দা সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের উদ্যোগে সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন, যুব সম্মেলন, ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলন ও নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মাষ্টার'দা সূর্যসেন ও তার সহযোগীদের পরিচালনায় চট্টগ্রাম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু। এই সম্মেলনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী নেতা অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ। এ সম্মেলনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের যুব শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেন।

নারী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন লতিকা সেন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের নারীরা স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের পাশে থাকা ও সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

ছাত্র-ছাত্রী সম্মেলনের মাধ্যমে চট্টগ্রামের ছাত্র সংগঠন 'অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' (বিপ্লবী অনুশীলন দল দ্বারা প্রভাবিত) ও 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন' (বিপ্লবী যুগান্তর দল দ্বারা প্রভাবিত) ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তারা প্রয়োজনে জীবনবাজী রেখে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন।

এই সম্মেলনগুলোতে ওই সময়ে চট্টগ্রামের স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবিকার দায়িত্ব পালন করেন। বিশেষ করে নারী সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবিকার দায়িত্ব পালন করার মধ্যে দিয়ে কল্পনা দত্তের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। স্কুলজীবনের প্রারম্ভ থেকেই তিনি ক্ষুদিরাম, কানাইলালের জীবনী, পথের দাবি প্রভৃতি স্বদেশি বই পড়তে শুরু করেন। এই বইগুলি তার অন্তরে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা তৈরি করেছিল। যে কারণে চট্টগ্রাম জেলা সম্মেলনের পর তিনি সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য কাজ শুরু করেন।

ভারত উপমহাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনেক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সঙ্গে ঘরে ঘরে মা, বোন, মাসিমা, কাকিমা, দিদি, বৌদিরা যুক্ত ছিলেন। তারা

গোপনে গোপনে বিপ্লবী দলের কাজ করতেন। অনেক পরিবারের মা-বোনরা বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে রাখতেন। আবার অনেকে টাকা-কড়ি, সোনা-গহনা দিয়ে বিপ্লবী দলকে সহযোগীতা করতেন। অগ্নিযুগের প্রথম পর্বে স্বর্ণ কুমারী দেবী, সরলা দেবী, আশালতা সেন, সরোজিনী নাইডু, ননী বালা, দুকড়ি বালা, পরবর্তীকালে ইন্দুমতি দেবী, (অনন্ত সিংহের দিদি) লীলা রায়, পটিয়া ধলঘাটের সাবিত্রী দেবী প্রমুখ দেশপ্রেমিক নারী বিপ্লবী দলে যুক্ত ছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় অগ্নিযুগের অগ্নিকন্যা, বীরকন্যা প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তের আবির্ভাব। ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে কল্পনা দত্ত একটি অবিস্মরণীয় নাম।

'বীর কন্যা কল্পনা দত্তের জন্ম হয় ১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই চট্টগ্রামের বোয়ালখালী থানার শ্রীপুর খরণদ্বীপ ইউনিয়নের শান্ত, সবুজ, পাহাড়ঘেরা শ্রীপুরে। গ্রামের বাড়ি বোয়ালখালী হলেও তার শৈশব ও ছাত্রজীবন সূচিত হয় চট্টগ্রাম শহরে। বাবা বাংলাদেশ রেলওয়ে সাব রেজিস্টার বিনোদবিহারী দত্ত, মা সুভনা দত্ত ছিলেন গৃহিণী। শহরের প্রাণ কেন্দ্র আন্দরকিল্লায় তাদের বিশাল বাড়ি ছিল। তার দাদু ছিলেন শহরের নামকরা ডাক্তার রায় বাহাদুর দুর্গাদাস দত্ত'– পূর্নেন্দু দস্তিদার।

কল্পনা দত্তের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক লেখাপড়া শেষে তাকে ডা. খাস্তগীর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন তার বাবা। বীরকন্যা প্রীতিলতাও এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। কল্পনা দত্ত প্রীতিলতার এক ক্লাসের ছোট ছিলেন। ডা. খাস্তগীর উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় ওই সময়ের অন্যতম নারী শিক্ষালয়। এই নামকরা স্কুলে প্রতিটি শ্রেণিতে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত প্রথম কিংবা দ্বিতীয় ছিলেন। যে কারণে তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ ছিল।

ডা. খাস্তগীর স্কুলের শিক্ষিকা উষাদি ছাত্রীদের সাথে গল্প করতেন। তাদেরকে দেশ-বিদেশের গল্প শুনাতেন। একদিন তিনিই তার ছাত্রীদের সাথে সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তীর মামলার কথা নিয়ে আলোচনা করেন। এই আসরে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত ছিলেন। উষাদি হেসে বললেন দোষ করেছে, মানে ডাকাতি করেছে। অপরাধ করেছে এই কথাতো? কিন্তু দোষ কার? কে শাস্তি দিবে? সেই বিচার কে করবে? এই যে আমাদের স্বদেশ, এখানে আমরা এভাবে আছি কেন? আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ না খেয়ে থাকে, শিক্ষা পায় না, রোগে ঔষধ পায় না। তারা অবাক হয়ে তার কথা শুনছিলেন। প্রীতিলতা (রানী) ও কল্পনা দত্ত এই উষাদির সংস্পর্শে এসে ক্ষুদিরাম, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই, কানাইলালের জীবনী, পথের দাবি প্রভৃতি স্বদেশি বই পড়তে শুরু করেন। উষাদি ছিলেন স্বদেশিদের গোপন বিপ্লবী সহযোগী। তিনি মূলত দু'জনের চেতনায় দেশপ্রেম ও বিপ্লবী রাজনীতির বীজমন্ত্র বুনে দেন।

১৯২৯ সালে কল্পনা দত্ত চট্টগ্রমের ডা. খাস্তগীর স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন। পরীক্ষা শেষ হলে তিনি উত্তাল চট্টগ্রামের নানা ঘটনার দিকে মন দেন। এসময়কালে বিপ্লবী ধারার কয়েকটি বই পড়েন। পাড়া-প্রতিবেশির কাছ থেকে বিপ্লবী রাজনীতি, স্বদেশি ডাকাতির কিংবদন্তী ঘটনা শুনেন। কিছুদিন পর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়। কল্পনা দত্ত গণিত ও সংস্কৃতে লেটারসহ চতুর্থ স্থান পেয়ে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভাল ফলাফল করার জন্য সরকার তাকে মাসে ১৫ টাকা বৃত্তি প্রদান করে। পূর্ব থেকেই তার পরিবার মেয়েকে কলকাতায় পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কল্পনাও রাজী ছিলেন। ওই বছরই তিনি আই. এস. সি'তে কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন।

বেথুন কলেজে ভর্তি হওয়ার কয়েক দিন পর প্রীতিলতার সাথে পরিচয় ঘটে। যাকে কল্পনা শিক্ষিকা উষাদি'র আলোচনা আড্ডায় প্রায়ই দেখতেন। কলেজে পড়াশুনার সময় সেই স্কুল জীবনের সুপ্ত দেশপ্রেমের বীজ কল্পনা দত্তের চেতনায় অঙ্কুরিত হয়। প্রীতিলতার আন্তরিকতা সাংগঠনিক দক্ষতা ও ব্যবহারে মেয়েদের খুব আপন করে নিতে পারতেন। প্রীতিলতা তখন ওই একই কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে বি. এ পড়ছেন। থাকেন ছাত্রীনিবাসে। এখানে মাষ্টারদার নির্দেশে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন। গড়ে তুলেন এক বিপ্লবী চক্র। এই বিপ্লবীচক্রে অনেক মেয়ে সদস্য যোগ দেন। বিপ্লবীচক্রে কল্পনাও যুক্ত হলেন। এই চক্রের মূল কাজই ছিল বিপ্লবীকর্মী তৈরির পাশাপাশি অর্থ সংগ্রহ করা। অর্থ সংগ্রহ করে প্রীতিলতা চট্টগ্রামে পাঠাতেন।

একই সময় কল্পনা দত্ত কল্যাণী দাসের 'ছাত্রীসংঘে' যুক্ত ছিলেন। এ সময় বেথুন কলেজে হরতাল পালন এবং অন্যান্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

দেশের মুক্তি সংগ্রাম। মাতৃভূমির স্বাধীনতা। নারীদের মর্যাদা রক্ষার জন্য বীর সন্তানের আত্মত্যাগ তাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। প্রীতিলতার ২ বছরের ছোট কল্পনা দত্তকে বিশেষ করে ভাবিয়ে তোলে। তিনি প্রীতিলতার সাথে যুক্ত থেকে বিপ্লবী ধারার কাজ করতে করতে নিজেই বিপ্লবী কর্মী হয়ে যান। আর বিপ্লবী মনে মাষ্টার'দা সূর্যসেনের প্রতিষ্ঠিত তরুণ ও ছাত্রদের বিপ্লবী যুগান্তর দলে যোগ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে ওঠেন কল্পনা দত্ত। দেখা করতে চান সর্বাধিনায়ক সূর্যসেনের সাথে। অতঃপর দেখা করে অনুমতি চাইবেন মেয়েদের বিপ্লবে অংশগ্রহণের।

ওই একই সময় তিনি বিপ্লবী নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সংস্পর্শে আসেন, যিনি ছিলেন মাষ্টারদা সূর্য সেনের একান্ত অনুগামী। পূর্ণেন্দু দস্তিদার ও প্রীতিলতার প্রভাবেই কল্পনা দত্ত বিপ্লবী দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ওই বছর মে মাসে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলা রাজনৈতিক সম্মেলন, যুব সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন ও নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবিকার দায়িত্বের মধ্যে দিয়ে কল্পনা দত্তের বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়।

সম্মেলনের পর প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত কলকাতায় চলে যান। ওই সময় কলকাতায় বিপ্লবীদের এক গোপন কারখানায় তৈরি হত বোমার খোল। মাষ্টারদার নির্দেশ অনুযায়ী সে বোমার খোল সংগ্রহ করেন প্রীতিলতা। ওই বছরের শেষের দিকে পুঁজার ছুটিতে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, সরোজিনি পাল, নলিনী পাল, কুমুদিনী রক্ষিতকে নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন। মাষ্টারদার নির্দেশে বোমার খোলগুলো পৌছে দেন বিপ্লবীদের হাতে। অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারও তখন প্রীতিলতাকে নিতে হয়। কলকাতায় যে বিপ্লবী চক্র গঠন করা হয়েছে, তাদের সকল প্রকার প্রশিক্ষণও প্রীতিলতাকে দিতে হতো।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাষ্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮ এপ্রিল যুব বিদ্রোহ বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনাকে 'ভারতের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। যা ছিল দেড়শত বছরের ইতিহাসের মধ্যে ইংরেজদের জন্য খুবই অপমানজনক ঘটনা। এটা ছিল ইংরেজ বাহিনীর কাছে প্রথম পরাজয়। ১৮ থেকে ২১ এপ্রিল এই চারদিন চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসন কার্যত অচল ছিল। পরাধীন জাতির ইতিহাসে বিপ্লবীদের এ বিজয় ছিল গৌরবগাঁথা। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের

অস্ত্রাগার দখল এবং ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধের ঘটনায় তিনি এতটাই অনুপ্রাণিত হন যে ছুটিতে চট্টগ্রাম এসে আর কলকাতায় ফেরেন নি। তখনও মাষ্টারদার সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ বা কথা হয়নি। অবশ্য এই ঘটনার পূর্বে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনগুলোতে দেখেছিলেন।

জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দায়ে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বলসহ আরও অনেক নেতাকে গ্রেফতার করে। মাষ্টারদা সূর্যসেন চলে যান আত্মগোপনে। মে মাসের প্রথম দিকে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে বিপ্লবে অংশ নিতে চলে আসেন। অনেক কষ্টে তারা মাষ্টারদার সাথে দেখা করতে সক্ষম হন। তারা উভয়েই মাষ্টারদার কাছে সশস্ত্র বিপ্লবে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। মাষ্টারদা তাদেরকে বিপ্লবী দলের শপথ বাক্য পাঠ করান। তখন থেকে তারা বিপ্লবী দলের অধিনায়ক সূর্যসেনের নির্দেশ মতো কাজ করে যান। এসময় প্রীতিলতা চট্টগ্রাম নন্দনকানন বালিকা মধ্য ইংরেজি স্কুলে (বর্তমানে অপর্ণাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) শিক্ষয়িত্রী হিসেবে চাকুরি নেন। আর কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম কলেজে বিএসসিতে ভর্তি হন। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে গোপনে গোপনে চলতে থাকে বিপ্লবী দলের কার্যক্রম।

'এই সময় বিশেষ করে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল অস্ত্রাগার দখল, জালালাবাদ সম্মুখ সমর, কালারপোল, ফেনী, ঢাকা, কুমিল্লা, চন্দননগর ও ধলঘাটের বীরোচিত সংগ্রামের অধ্যায়গুলো মুক্তিকামী বিদ্রোহীদের নতুন প্রেরণা যুগিয়েছিল।

ধলঘাটের সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন হত্যাকাণ্ডের পর সারা চট্টগ্রাম নিস্তব্ধ হয়ে যায়। মিলিটারি ও পুলিশ নির্যাতন শুরু হয় গ্রামে-গঞ্জে শহরে। তখন কল্পনা দত্ত পুরুষের পোশাকে তাদের আন্দরকিল্লার বাসা থেকে গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র কাট্টলী যাওয়ার পথে আটকা পড়েন। পাহাড়তলী স্টেশনের পাশে ভেলুয়ার দীঘির কোণায় কিছু গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলের সহায়তায় পুলিশের হাতে বিপ্লবী কল্পনা দত্তের রাজনৈতিক কারাজীবন শুরু হয়। সাথে গ্রেফতার হয় ছোট বিপ্লবী বুলবুল। কারামুক্ত হয়ে পরের বছর (১৯৩১) মে মাসে কলকাতা থেকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য কৌশলে নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয় কল্পনা দত্তকে। কল্পনা দত্তের পরিকল্পনা ছিল ডিনামাইট ফিউজ দিয়ে চট্টগ্রাম আদালত ভবন ও কারাগার উড়িয়ে দিয়ে বিচারাধীন বিপ্লবীদের মুক্ত করা'– পূর্ণেন্দু দস্তিদার।

১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে এক বিশেষ আদালতে (ট্রাইব্যুনালে) আরম্ভ হয় রাজদ্রোহ মামলায় অভিযুক্ত ৩২ জন বন্দীর বিচার (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল)। মাষ্টারদা বন্দীদের মুক্ত করার জন্য এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি মাইন ব্যবহার করে জেলের প্রাচীর উড়িয়ে দিয়ে বন্দীদের মুক্ত করা এবং একই সাথে আদালত ভবন ধ্বংস করার উদ্যোগ নেন। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন কল্পনা দত্ত। হামলার দিন ধার্য করা হয় ৩ জুন, ১৯৩১ সাল। সব প্রস্তুতিও গোপনে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সর্বশেষ মাইনটি বসানোর সময় পুলিশের নজরে পড়ে যাওয়ায় গোটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

রায়বাহাদুর দুর্গাদাসের বাড়ির মেয়ের উপর পুলিশের এতদিন সন্দেহ না হলেও এই ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ কল্পনা দত্তকে সন্দেহ করে গৃহবন্দী করে। সন্দেহভাজন রূপেই পুলিশ তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার আদেশ দেয়। তাকে শুধু চট্টগ্রাম কলেজে গিয়ে বি. এস. সি পড়বার অনুমতি দেওয়া হয়। পুলিশের এই কড়া নজরদারির

মধ্যেও কল্পনা প্রায়ই গভীর রাতে সূর্যসেন, নির্মল সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করতে তাদের গোপন আস্তানায় যেতেন এবং সেখানে বিপ্লবী কাজের প্রশিক্ষণ নিতেন। এখানে তিনি এবং তার সতীর্থ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার নিয়মিত রিভলবার চালানোও শিখতেন। একদিন দুজনকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবার সিদ্ধান্ত নেন মাষ্টারদা। ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে যৌথ নেতৃত্ব দেবার কথা ছিল তাদের দুজনের। কিন্তু তার পূর্বেই পুলিশ কল্পনাকে গ্রেফতার করে, পুরুষের ছদ্মবেশে সহকর্মী নির্মল সেনের সঙ্গে মাষ্টারদার কাছে দেখা করতে যাবার সময়। দুই মাস জেলে থাকার পর প্রমাণাভাবে তিনি জামিনে মুক্ত হন। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ১০৯ ধারায় অর্থাৎ 'ভবঘুরে' বলে মামলা দায়ের করেছিল। কিন্তু পুলিশের সন্দেহদৃষ্টি এড়াতে তাকে আত্মগোপনের নির্দেশ দেন মাষ্টারদা। এরপর কল্পনা মাষ্টারদার নির্দেশে আত্মগোপন করেন এবং তারই সঙ্গে গৈরালাতে ক্ষীরোদ প্রভাব বিশ্বাসের বাড়িতে আশ্রয় নেন। গোপন অবস্থাতেই কল্পনা দলের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

১৯৩২ সালে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্য দুইবার ব্যর্থ বিপ্লবী শৈলশ্বর চক্রবর্তীর আত্মহত্যার পর মাষ্টারদা নারী বিপ্লবী প্রীতিলতাকে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের ভার অর্পণ করেন। এই কারণে সূর্যসেন কাট্টলীর গোপন ক্যাম্পে আসেন। প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত দেখা করতে দক্ষিণ কাট্টলী গ্রামে আলাপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রীতিলতা নিরাপদে গোপন কেন্দ্রে পৌঁছে গেলেও পুরুষবেশি কল্পনা দত্ত ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে ধরা পড়েন। মাস্টার দা সূর্যসেন সে খবর পেয়ে অনুমতি দেন প্রীতিলতাকে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২। জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর আবার আত্মগোপন করেন কল্পনা দত্ত। এবার অবশ্য চট্টগ্রাম কলেজের পশ্চিমে দেব পাহাড়ে। তিনি তখন বি. এস. সি'র ছাত্রী। তার সহপাঠী ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের তৎকালীন পালি শিক্ষক মাইম বড়ুয়ার মেয়ে। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি সমুদ্রতীরবর্তী গৈরালা গ্রামে ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষে মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গী ছিলেন কল্পনা। পরে মাস্টারদা ও ব্রজেন সেন পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও কল্পনা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু তিন মাস পর ১৯ মে গৈরালা গ্রামে এক সশস্ত্র সংঘর্ষের পর কল্পনা এবং তার সতীর্থ কয়েকজন বিপ্লবী ধরা পড়েন।

ওই বছর ১৪ আগস্ট একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সূর্যসেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসি এবং অন্যদেরকে যাবজ্জীবন আন্দামান সেলুলার জেল দেয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলার ('চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি কেস') দ্বিতীয় বিচার পর্বে কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। জেলে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে তিনি পড়াশোনা করতেন। প্রায় ৬ বছর কারাভোগের পর এই বিপ্লবী নেত্রী ১৯৩৯ সালে কারামুক্তি পান। ইতোমধ্যে তার মামলা চালাতে গিয়ে বাবা সহায় সম্বলহীন হয়ে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালের উত্তরে যে বড় দোতলা বাড়ি (রায় বাহাদুর ডা. দুর্গাদাস দত্তের বাড়ি) ছিল তাও হারাতে হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চট্টগ্রাম গিয়ে দেখেন প্রাক্তন বিপ্লবীরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টি যে পথে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, সেই পথই ঠিক মনে হওয়ায় কল্পনা দত্তও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসেবে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় চট্টগ্রামে থেকে তিনি কাজ করেছেন। সেই সময় তার বহু রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে পিপলস ওয়ার পত্রিকায়। ১৯৪০

সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ তাকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখে। এরপর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নেন। ১৯৪০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। ওই বছর মুম্বাইতে এক সম্মেলনে কল্পনা দত্ত চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানেই পি. সি যোশীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ১৯৪৪ সালে যোশীর সঙ্গে কল্পনার বিয়ে হয়। পি. সি যোশী তদানীন্তন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক ছিলেন। এরপর তিনি চট্টগ্রামে ফিরে যান এবং দলের মহিলা ও কৃষক সংগঠনকে গড়ে তোলেন। সেই পশ্চাৎপদ যুগের হয়েও কল্পনা দত্ত অনুভব করেছিলেন, নারী সমাজেরই অর্ধ-অঙ্গ। নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসেই কাটবে অমানিশা, আসবে মুক্তি। ১৯৪৬ সালে আইনসভার নির্বাচনের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে প্রার্থী হিসেবে ছিলেন কল্পনা দত্ত, চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আর কংগ্রেস থেকে দাঁড়িয়েছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনের স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তা।

দেশ ভাগ হওয়ার পরও অনেকদিন তিনি চট্টগ্রামেই থেকে যান। ১৯৫০ সালে ইন্ডিয়ান স্ট্যাস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে চাকুরি নেন এবং পরবর্তী সময়ে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি নানাবিদ কাজের সাথে যুক্ত হন। তিনি এসময় বেশ কয়েকটি ভাষা শিখেছিলেন। এর মধ্যে রুশ ভাষাও শেখেন। ভাষাবিদ হিসেবেও তিনি পরিচিতি লাভ করেন। রুশ ভাষায় শিক্ষকতা করেন এবং নতুন দিল্লির রুশ ভাষা কেন্দ্রের চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ভারতের নারী আন্দোলনে তিনি ভূমিকা রাখেন। কল্পনা দত্ত নারী সমিতির সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারতের মৈত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ-এর সাধারণ সম্পাদিকাও ছিলেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় কল্পনা দত্ত নানাভাবে সহযোগিতা করেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অর্থ ও খাবার সংগ্রহ করণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে অন্যান্য বিপ্লবী কমরেডদের সাথে কল্পনা দত্তও চট্টগ্রাম আসেন। সেখানে, মিউনিসিপ্যাল স্কুল প্রাঙ্গণে বিপ্লবী দলকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কল্পনা দত্ত লেখা বইয়ের নাম- 'চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান'। তিনি ১৯৯৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম– পূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রকাশকাল ১৩৭৪ বাংলা, প্রকাশক: চট্টগ্রাম বই ঘর।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রকাশকাল ১৯৯০, কলকাতা।

৩. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহাফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

৪. বাংলার মুক্তি সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টপাধ্যায়/রাখী চট্টপাধ্যায়, প্রকাশকাল ২০০৫, কলকাতা।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার



পূর্ণেন্দু দস্তিদার। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। সশস্ত্র বিপ্লবী। কিংবদন্তি বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী সহযোদ্ধা। তিনি ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেনের বিপ্লবী স্টুডেন্ট ক্যাডারও। তার কাজ ছিল তরুণ যুবক ও ছাত্রদেরকে বিপ্লবী দলে এনে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষিত করা। এমনকি নিজ দলের বিপ্লবীদেরকেও তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন কলা-কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে পূর্ণেন্দু দস্তিদারই প্রথম নারীদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তখনকার দিনে সশস্ত্র বিপ্লবী দলে নারীদেরকে নানা কারণে নেয়া হতো না। তার মধ্যে একটা অন্যতম কারণ ছিল; বিপ্লবীরা নারী সংস্পর্শে এলে বিপ্লবী পথে-মতে জীবন উৎসর্গ করতে দিধা-দ্বন্দ্ব ভুগবে। তিনি এ ধারণা পাল্টে দেন। বিপ্লবী দলে তিনি কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতাসহ আরো অনেক নারীকে সংগঠিত করেন। সূর্যসেন প্রথম দিকে বিপ্লবী দলে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পূর্ণেন্দু দস্তিদারের কথা মেনে নেন।

১৯৩০ সালের মাস্টার দা সূর্য সেনের নেতৃত্বে পরিচালিত যুব বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে কলকাতায় গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। জীবনের দীর্ঘ সময় তাকে কাটাতে হয় জেলে। আর জেলে বসে তিনি রচনা করেন তার বেশির ভাগ গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে তিনি তুলে আনেন ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও ত্যাগের কথা। তিনি বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যুক্ত করেন সাহিত্যের এক নতুন ধারা, বিপ্লবী রাজনৈতিক সাহিত্য।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার। একজন বিপ্লবী রাজনীতিক ও কথাশিল্পী। ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবীর নাম সর্বজন স্বীকৃত তাদের মধ্যে পূর্ণেন্দু দস্তিদার একজন অন্যতম বিপ্লবী।

পূর্ণেন্দু দস্তিদারের জন্ম ১৯০৯ সালের ২০ জুন। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়ার ধলঘাট গ্রামে। তার বাবা চন্দ্রকুমার দস্তিদার। দস্তিদার সুলতানী আমলের পদবী, বিচার কাজের সাথে যুক্ত দলিল-দস্তাবেজের যারা রক্ষক তাদেরকে সাধারণত 'দস্তিদার' বলা হত। বংশসূত্রে তারা ছিলেন দাশগুপ্ত। কিন্তু কালক্রমে পদবীই হয়ে উঠল বংশ পরিচয়। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বাবা চন্দ্রকুমার দস্তিদার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করার পর

চট্টগ্রাম আদালতের আইনজীবী হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। তার মা কুমুদিনী দস্তিদার। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমী নারী। তার উদারতা ও দেশপ্রেম প্রতিটি সন্তানের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে।

পূর্ণেন্দু দস্তিদার ছিলেন সাত ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্ধেন্দু দস্তিদার, তিনি জালালাবাদ পাহাড়ের সশস্ত্র শহীদ। তৃতীয় সুখেন্দু দস্তিদার, ছদ্মনাম বশীর ভাই। তিনি আজীবন বাম রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। চতুর্থ অমলেন্দু (হেমেন্দু দস্তিদার) জালালাবাদ যুদ্ধের অগ্রসেনানী, দেশভাগের সময় চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যান। তিনি ডিব্রুগড়ে রেলে কাজ করতেন। পঞ্চম বিমলেন্দু দস্তিদার, তিনি ছিলেন শিক্ষক। ষষ্ঠ শুভেন্দু দস্তিদার ও সপ্তম কৃষ্ণেন্দু দস্তিদার উভয়ে আসামে রেলে কাজ করতেন। তাদের কোনো বোন ছিলনা। 'বস্তুত ধলঘাট দস্তিদার পরিবারের ইতিহাস ছাড়া উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হওয়া অসম্ভব। সকল বিতর্কের উর্ধ্বে পূর্ণেন্দু দস্তিদার এখনো সসম্মানে স্ব-আসনে দেদীপ্যমান। সে যুগে আমাদের কাছেও তিনি তাই ছিলেন।'– অরুণ বিকাশ দত্ত।

পূর্ণেন্দু দস্তিদারের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে, মামা ও বাবার কাছে। শৈশবে তার শিক্ষা জীবন চট্টগ্রামেই শুরু হয়। প্রথমে তিনি সরকারি এম. ই স্কুল এবং পরে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করেন। অল্প বয়সে তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। দুরন্ত চঞ্চল মেধাবী এই বালক মাস্টার দা সূর্য সেনের সংস্পর্শে ভারতমাতাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যই মূলত রাজনীতির সাথে যুক্ত হন।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় পূর্ণেন্দু দস্তিদার এম. ই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশুনা করেন। ঠিক ওই সময় মাস্টারদা সূর্যসেন পড়াশুনা জীবনের ইতি ঘটিয়ে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে মাস্টারি শুরু করেছেন। ওই বছর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ অসহযোগ আন্দোলনের কাজে চট্টগ্রাম আসেন। এ উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা হয়। এই জনসভায় চট্টগ্রামের স্কুল-কলেজের ছাত্ররা যোগ দেন। এতে পূর্ণেন্দু দস্তিদার ছিলেন।

এই জনসভায় বসে চট্টগ্রামের প্রায় সকল দেশপ্রেমিক শিক্ষক, রাজনীতিক, সংগঠক, যারা ব্রিটিশ সরকারের অধিনে চাকুরিরত ছিলেন, তারা চাকুরি ছেড়ে দিয়ে অসযোগ আন্দোলনে যুক্ত হন। এই সময় মাস্টার দা সরকারি স্কুলের চাকুরি ছেড়ে দেন।

ওই বছর অসহযোগ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। তখন সূর্যসেন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। এটি উমাতারা স্কুল নামে পরিচিত হয়। এই সময় তিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত হতে থাকেন। তিনি ছাত্রদেরকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয় জয় করতেন। আর তাই ছাত্ররাও তাকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। এক সময় এই স্কুলই তার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ছাত্রদের সামনে তিনি তুলে ধরতেন স্বাধীনতার আহ্বান– 'তোমাদের বিদ্যার্জন, তোমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণ, তোমাদের ভাবী জীবনের স্বপ্ন ও চিন্তার মধ্যে সবকিছুর উর্ধ্বে মনে একটি কথাকে কি প্রোজ্জ্বল করে রাখতে পারবে– পরাধীনতার অভিশাপ থেকে, ইংরেজের পরাধীনতার পীড়ন থেকে এই দেশকে মুক্ত করাই তোমাদের ব্রত– আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য?' (সূর্যসেন স্মৃতি– বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতিসংস্থা, কলকাতা)।

১৯২১-২৪ সাল পর্যন্ত অসযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে মাস্টারদা চট্টগ্রামের প্রায় সকল ছাত্রদের কাছে প্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠেছেন। এই অসংখ্য ছাত্রদের মধ্যে আবার হাতে গোনা

কয়েকজন তার বিপ্লবী দলের সাথে পরিচিত ছিলেন। এদের মধ্যে পূর্ণেন্দু দস্তিদার ছিলেন অন্যতম। ১৯২৩ সালে তিনি মাস্টারদা'র সংস্পর্শে এসে বিপ্লববাদী দলে যুক্ত হন। দেশের স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়চিত্তে শুরু করেন বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ড। পড়াশুনা আর রাজনীতির অধ্যয়ন ছিল তার ছাত্র জীবনের একমাত্র কাজ। ১৯২৪ সালে পূর্ণেন্দু দস্তিদার দশম শ্রেণির ছাত্র। তখন বিপ্লবী দলের সাথে তার গড়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এত অল্পবয়সে তিনি হয়ে উঠেছেন বিপ্লবী দলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এক সদস্য। কিন্তু মজার বিষয় হল তার আচরণ ও কথাবার্তায় বুঝার কোনো উপায় নেই যে, তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য। শুধু বিপ্লবী দলের সদস্যরাই জানতেন।

১৯২৪ সাল। ভারত উপমহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। সর্বত্র সংগঠিত হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠন। চট্টগ্রামে রেলওয়ে ডাকাতি, বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক ডাকাতি ও বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র কার্যকলাপের কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ব্রিটিশ 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল 'রাজনৈতিক কার্জকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা'। এই আইন পাশ হওয়ার পর ব্রিটিশ সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের গ্রেফতার করা শুরু করে।

১৯২৫ সালে একবার পুলিশ সূর্যসেনকে ধরার জন্য দেওয়ান বাজারে তার শ্বশুর বাড়ি ঘেরাও করে। সূর্যসেন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে চট্টগ্রাম কলেজের মেধাবী ছাত্রের বাসায় উঠেন। এই মেধাবী ছাত্রটি হল পূর্ণেন্দু দস্তিদার। তিনি শহরের ছাত্র-যুব বিপ্লবীচক্রের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। প্রীতিলতার খুড়তুত ভাই। এই তরুণ বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের পলাতক জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের যেসব গোপন বই-পত্র ছিল তা রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল এই তরুণ যুবকটির উপর। 'ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, দেশের কথা, ও সরকারি রাউলাট কমিশন' ইত্যাদি বই।

১৯২৫ সালে সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলের সাথে যুক্ত অবস্থায় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সালে সূর্যসেনকে কলকাতা থেকে গ্রেফতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। সূর্যসেন গ্রেফতার হওয়ার পর বিপ্লবী কাজের দায়িত্ব পড়ে তরুণ নেতৃত্বের উপর। তরুণদের মধ্যে পূর্ণেন্দু দস্তিদার বিপ্লবী দলে নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করার ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। তিনি প্রথম বিপ্লবী দলে প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্তকে অন্তর্ভূক্ত করেন।

১৯২৭ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হন। ১৯২৮ সালে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা মুক্তি পান। এসময় পূর্ণেন্দু দস্তিদার কলকাতায় চলে আসেন কলকাতায়। এখানে তিনি বিপ্লবী দলের সাথে রিভলবার, পিস্তল কেনা, বিস্ফোরকের জন্য পিকরিক এসিড সংগ্রহ, গান কটন তৈরি করা, বোমার খোল বিভিন্ন জেলে পৌছে দেয়ার কাজ করতেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি কলকাতাস্থ চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের একজন প্রধান সদস্যে পরিণত হন। এই দলটি কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার স্যার চালস টেগার্টকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু দলের এক সদস্যের কারণে এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। কলকাতায় তিনি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন-এর প্রাদেশিক সম্পাদক হয়েছিলেন। এই সময় কলকাতায় প্রীতিলতা ও কল্পনাদত্ত পড়াশুনা করতেন। ১৯২৯ সালে পূর্ণেন্দু দস্তিদার কল্পনা দত্তকে সহযোগী সদস্য হিসেবে বিপ্লবী দলে অন্তর্ভূক্ত করে নেন।

আর খুড়তুত বোন প্রীতিলতার সাথে তার যোগাযোগ ছোটবেলা থেকেই ছিল। যে কারণে প্রীতিলতা তার সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী বই-পুস্তক পড়ে বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের যেসব গোপন বই-পত্র ছিল তা রক্ষা করার দায়িত্ব পূর্ণেন্দু দস্তিদারের উপর। 'ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, কানাইলাল, দেশের কথা, ও সরকারি রাউলাট কমিশন' ইত্যাদি বই। 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স'-এ নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর পূর্ণেন্দু দস্তিদার এই বইগুলো কাগজে মুড়িয়ে প্রীতিলতার কাছে রেখেছিলেন। বইগুলো প্রীতিলতা মাসখানেকের মধ্যে পড়ে প্রায় শেষ করেছিল।

১৯২৯ সাল। তখন সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক। পূর্ণেন্দু দস্তিদার একদিন বিকেল বেলা বিপ্লবীদের গোপন বৈঠকে উপস্থিত হল। বৈঠক শেষে জেলা কংগ্রেসের কার্যলয়ে তিনি মাস্টার দা সূর্যসেনকে প্রীতিলতার মনের কথাগুলো বললেন। মাস্টার দা সূর্যসেন সবকিছু শুনে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে বললেন, আজ থেকে আমরা প্রীতিলতাকে আমাদের দলের সদস্য করে নিলাম। কিন্তু এই কথা আপাতত আমরা তিনজন ছাড়া অন্য কাউকে জানানো যাবে না। প্রীতিলতাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে এসো। কিন্তু মজার বিষয় হল বিপ্লবী দলে মেয়েদের অন্তর্ভূক্ত করার কথা শুধু সূর্যসেন ও পূর্ণেন্দু দস্তিদার জানতেন। অন্য সদস্যরা জানতেন না।

'আমাদের বিপ্লবী দলে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত ও অন্যান্য মেয়েরা ছিল। আমরা তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতাম না। যখন ১৯৩০ সালে আমাদের বিরুদ্ধে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নাম দিয়ে সরকার মামলা চালাচ্ছিল, তখন আমি প্রথম প্রীতিলতা ও কল্পনা দত্ত সম্বন্ধে শুনতে পাই'– অনন্ত সিংহ। (অনন্ত সিংহ চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সদস্য, তিনি অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম গ্রন্থে এই কথাগুলো লিখেছেন)।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল সূর্যসেন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৮ এপ্রিল যুববিদ্রোহ বা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনাকে 'ভারতের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে সাহসিকতাপূর্ণ কাজ' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। 'যা ছিল দেড়শত বছরের ইতিহাসের মধ্যে ইংরেজ জন্য খুবই অপমানজনক ঘটনা। ইংরেজ বাহিনী এদেশের মানুষের কাছে প্রথম পরাজয়'।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করার পূর্ব প্রস্তুতি পর্বের সকল কাজের সাথে পূর্ণেন্দু দস্তিদার যুক্ত ছিলেন। সূর্যসেন তাকে কলকাতা থেকে কাজ করার জন্য নির্দেশ দেন। তাই পূর্ণেন্দু দস্তিদার শত ইচ্ছা থাকলেও সরাসরি অস্ত্রাগার দখলের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে থাকতে পারেননি। সূর্য সেনের পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী তিনি কলকাতার খ্যাতিমান সাহিত্যিক নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বাসায় আত্মগোপন করেন। ১০ দিন পরে সে বাসা থেকে অন্য এক বাসায় আত্মগোপন করেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করার পর ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেফতার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। চট্টগ্রামের অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষ, আনন্দগুহ, মাখম ঘোষালসহ কয়েক জন বিপ্লবী কলকাতায় এসে আত্মগোপনে যান। সেখানে পূর্ণেন্দু দস্তিদার ছিলেন। ওই বছর (১৯৩০) ডিসেম্বর মাসে পূর্ণেন্দু দস্তিদারকে যুব বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে। শুরু হয় জেল জীবন। দীর্ঘ সময় ধরে জেলে থাকার কারণে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনা শেষ করতে পারেননি। ১৯৩৪ সালে তিনি দেউলি জেল থেকে

ডিস্টিংশনসহ বি. এ পাসের স্বীকৃতি অর্জন করেন। এরপর তিনি এক পর্যায়ে জেলে থাকাবস্থায়ই বি. এল ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম হন। দীর্ঘ ৮ বছর কারাবাসের পর ১৯৩৮ সালে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পরেও ১৯৩৮-১৯৪০ সাল পর্যন্ত অন্তরীণ ছিলেন।

অবশেষে ১৯৪০ সালে তিনি বিপ্লবী রাজনীতির পাশাপাশি চট্টগ্রাম আদালতে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এ সময় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ওই বছর তিনি তার এক কাকার মেয়ে শান্তি দস্তিদারকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর শান্তি দস্তিদার সংসারের হাল ধরতে স্কুলে চাকুরি নেন। শান্তি দস্তিদারও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার দুই পুত্র ও এক কন্যার পিতা হয়েছিলেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধার্থ দস্তিদার ও দ্বিতীয় পুত্র সুজিত দস্তিদার এবং কন্যা মঞ্জু দস্তিদার।

১৯৪৩ সালের সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। ইতিহাসে এটা মন্বান্তরের সন হিসেবে পরিচিত। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশব্যাপী লঙ্গরখানা খুলে বুভুক্ষু মানুষকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এই দুর্ভিক্ষ থেকে মানুষকে বাঁচাতে পূর্ণেন্দু দস্তিদার অমানুষিক পরিশ্রম করেন। ১৯৪২ থেকে ৪৭ পর্যন্ত তিনি প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে চট্টগ্রামে পার্টির শক্তিশালী ভিত গড়ে তোলেন।

১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে তিনি জীবনবাজী রেখে অসীম সাহসীকতার সাথে এই দাঙ্গা মোকাবেলা করেন। পাকিস্তান আমলের পুরাটা সময় কেটেছে তার জেল আর আত্মগোপনে। আত্মগোপনে থাকাবস্থায় তিনি বিভিন্ন স্থানে পার্টি গড়ে তোলেন।

১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ নবগঠিত পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান শাখার সদস্য নির্বাচিত হন। একই বছর বিপ্লবী রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে পাকিস্তান পুলিশ পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জেলে আটক থাকা অবস্থাতেই তিনি চট্টগ্রাম জেলার হিন্দু আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বিনোদবিহারী দত্তকে পরাজিত করে তিনি পূর্ববঙ্গ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫৫ সালের ৯ জুন জেল থেকে মুক্তি পান। পূর্ববঙ্গ পরিষদে তৎকর্তৃক চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের (১৮ এপ্রিল ১৯৩০) স্মারকস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয় ১৯৫৬ সালে। ১৯৫৭ সালের ২৬ জুলাই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে তিনি ন্যাপের রাজনীতিতে যুক্ত হন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। এ সময় তাকে আবারো গ্রেফতার করে পাকিস্তান পুলিশ। ১৯৬২ সালে তিনি মুক্তি পান। ওই বছর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির চট্টগ্রাম শহর কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে আরেকবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণ-আন্দোলনের চাপে অন্যান্য তরুণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে তিনিও মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি মস্কোপন্থী ন্যাপের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭০ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১১ আসন থেকে ন্যাপের মনোনয়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রার্থী সুলতান আহমদের ভোট ডাকাতির কারণে তিনি পরাজিত হন।

১৯৭১ সালের ৯ মে পূর্ণেন্দু দস্তিদার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত রওনা হন। দেমাগিরি বর্ডার দিয়ে সীমান্ত পার হবার পর তিনি অজ্ঞাত কারণে মারা যান। যদিও তার মৃত্যু নিয়ে অনেকে সন্দেহ করেন যে, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

প্রকাশিত গ্রন্থ: কবিয়াল রমেশ শীল (১৯৬৩), স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম (১৩৭৪), বীরকন্যা প্রীতিলতা (১৩৭৭)। অনূদিত গ্রন্থ: শেকভের গল্প (১৯৭০), মোপাশাঁর গল্প।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. জীবনী গ্রন্থমালা– পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সম্পাদনাঃ মফিদুল হক, বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল জুন ১৯৯৫।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম– পূর্ণেন্দু দস্তিদার, চট্টগ্রাম বই ঘর, প্রকাশকাল ১৩৭৪ বাংলা।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রকাশকাল ১৯৯০ সাল, কলকাতা।

৪. বীর কন্যা প্রীতিলতা– পূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রকাশকাল ১৩৭৯ বাংলা।

৫. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম/তপন কুমার দে, প্রকাশকাল ২০০৯।

সতীশ পাকড়াশী



১৯০৫-০৬ সাল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে উদ্বেলিত সারা বাঙলা। ঢাকা জেলার হাই স্কুলগুলোতে সেই আন্দোলনের ঢেউ উপচে পড়ছে। ছাত্ররা এই আন্দোলনে প্রভাবিত হল। বালক সতীশ এই আন্দোলনে যুক্ত হলেন। 'চিনিসপুর' কালীবাড়িতে হাজার হাজার মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে শপথ নিলেন বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রতিরোধ আন্দোলন করে যাব। জীবন দিয়েও এর প্রতিবিধান করব। বিলাতি জিনিস বয়কট করব আর স্বদেশি জিনিস ব্যবহার করব।

এই স্বদেশি আন্দোলনের সময় সতীশ বসু, ব্যারিস্টার পি মিত্র, পুলিন দাস প্রমুখ 'অনুশীলন সমিতি' নামে ঢাকায় একটি গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯০৭ সালে বাংলায় অনুশীলন সমিতি এবং মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লববাদী কার্যকলাপ শুরু হয়। শরীর চর্চা, ব্যায়াম, লাঠি খেলা, ছোঁরা খেলা, কুস্তি ইত্যাদির আড়ালে রাজনৈতিক শিক্ষা, বিপ্লবাত্মক প্রচার ও বিপ্লবী কর্মী তৈরি করা। উদ্দেশ্য ভারতমাতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত থেকে মুক্ত করা।

সতীশ তখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ওই সময় তাদের পাড়া গ্রামেও অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই সমিতির উদ্দেশ্য। সতীশের স্কুলের প্রায় অর্ধেক ছাত্র অনুশীলন সমিতির সভ্য। তার উপরের ক্লাসের ছাত্র ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, (যিনি পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিপ্লবী)। সহপাঠী তার সংস্পর্শে সতীশ এই সমিতির সভ্য হন।

'সমিতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই সমিতি হতে বিচ্ছিন্ন হব না। সর্বদা সমিতির পরিচালকের আদেশ মানিয়া চলিব'। এই অগ্নি শপথ করলেন বালক সতীশ।

সতীশ জঙ্গলাকীর্ণ আম-কাঁঠাল বাঁশ বাগানে বন্ধুদের সঙ্গে লাঠিখেলা ও কুচকাওয়াজ করতেন। আর স্কুল ছুটির পরে অতি সংগোপনে নোট বইয়ে লিখে রাখা লাঠি খেলার সাংকেতিক ফরমূলা (সংকেতশব্দ) মুখস্থ করতেন। কিন্তু সে লাঠি আসলে লাঠি নয়, তলোয়ার। আর বড় লাঠি হল বন্দুক ও বেয়নেট। প্রকাশ্যে লাঠি ও ছুরি খেলার পিছনে তলোয়ার ও বন্দুকের লড়াই প্রশিক্ষণ দেয়া হত।

ভারত উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবী রয়েছেন, তাদের মধ্যে ঢাকার সতীশ পাকড়াশী অন্যতম। অগ্নিযুগের বিপ্লবী

আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে তিনি শৈশবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য তিনি সারা জীবন বিপ্লবী কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত ছিলেন। ক্ষমতালাভ বা কোনো প্রকার ব্যক্তি স্বার্থের ধ্যান-ধারণা তার মধ্যে ছিল না। আদর্শের রাজনীতি বাস্তবায়নের জন্য কিভাবে লড়াই করতে হয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। সতীশ পাকড়াশী জীবনের ৩২টি বছর জেলে কাটিয়েছেন এবং ১১ বছর ছিলেন আত্মগোপনে।

সতীশ পাকড়াশীর পুরো নাম সতীশ চন্দ্র পাকড়াশী। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৯১ সালে। নরসিংদি জেলার মাধবদি গ্রামে। তার বাবা জগদীশ চন্দ্র পাকড়াশী আর মা মৃণালিনী পাকড়াশী। পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে, বাবার কাছে। তারপর প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে ঢাকার সাটিরপাড়া হাইস্কুলে ভর্তি হন।

এই স্কুলে পড়াশুনাকালীন কিশোর বয়সেই ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের বিপদ সঙ্কুল পথ বেছে নেন। ১৯১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে অনুশীলন দলের নেতা নরেন সেন প্রায় দশ মাইল দূরে থেকে ৪৫০ বোরের রিভলবার, কার্তুজ নিয়ে আসার জন্য সতীশকে দায়িত্ব দেন। সেগুলো আনতে গিয়ে সতীশ ধরা পড়ে যান। তখন তার বয়স সতের বছর। এসময় তার এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জাঙ্গিয়া-কুর্তাপড়া, গলায় হাঁসুলী ও কাঠের তকতি এবং হাতে লোহার বালা ও পায়ে লোহার মল নিয়ে তাকে জেল প্রেসে কাজ করতে হত। তাকে জেলে উঠান, ঘর ঝাড় দেয়া, বালতি করে জল তোলা, বস্তা বাঁধা, দু'মণের বস্তা টানার কাজও করতে হয়।

১৯১২ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মাধবদিতে নিজ গ্রামের বাড়িতে আসেন। সেখান থেকে গুপ্ত সমিতি তাকে মাদারিপুর মহকুমায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য পাঠায়। তিনি পালং থানার ভড্ডাগ্রামে ইংরাজি স্কুলের শিক্ষকরূপে যোগদান করেন। এই স্কুলে চাকুরি নেওয়ার পিছনে তার আসল উদ্দেশ্য ছিল গোপনে গোপনে বিপ্লবী দলে সদস্য রিক্রুট করা। মাদারিপুর মহকুমায় বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার পর ১৯১৩ সালে তাকে ঢাকা থেকে নাটোরে পাঠানো হয়। সেখানেও তিনি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। এরপর তাকে রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার সংগঠকের দায়িত্ব দেয়া হয়। কুড়িগ্রাম থেকে তাকে কলকাতার সংগঠনের দায়িত্বে পাঠানো হয়।

১৯১৩ সালে রাজাবাজার বোমার মামলায় ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে তার ও আরো কয়েকজন বিপ্লবীর নামে ওয়ারেন্ট বের হয়। এসময় তারা বরানগরে আশ্রয় নেন। এখানে আত্মগোপনকালে তিনি রাসবিহারী বসুর সান্নিধ্যে আসেন। তিনি বরানগরে গোপনে বিপ্লবী দলের সাথে মিলিত হন। ওই সময়ে তিনি খুব কষ্টে দিন কাটাতেন। একটি রুটি কিনে খেয়ে সারাদিন কাটিয়েছেন। অনেক দিন না খেয়েও বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন। খাবারের অনিয়মের কারণে তিনি এ সময় প্রবল ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। একটু সুস্থ হওয়ার পর তাকে দিনাজপুরের বিপ্লবী সংগঠনের কাজে পাঠানো হয়। ওই সময় অসুস্থ মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সাথে তিনি পুরী, ভুবনেশ্বরে গিয়ে চিকিৎসা নেন। ভুবনেশ্বরে থাকার সময় ১৯১৪ সালের ৪ আগস্ট বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এই সংবাদ শুনে তারা সেখান থেকে দিনাজপুরে ফিরে আসেন। সতীশ পাকড়াশী উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরে বিপ্লবী কাজ শুরু করেন। এরপর দিনাজপুর থেকে তাকে মালদহে দলের কাজে পাঠানো হয়।

১৯১৪ সালে বিপ্লবী দলের একটি 'এ্যাকশন'-এ যোগদানের জন্য তিনি কলকাতা মুসলমানপাড়া লেনে যান। সতীশ পাকড়াশীসহ বিপ্লবী দলের ৪/৫ সদস্য ২৫ নভেম্বর আইবি পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্টকে হত্যা করার দায়িত্ব নেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুপারিন্টেডেন্টের বৈঠকখানায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু একটু ভুলের কারণে তাদের নিক্ষিপ্ত বোমায় তারা নিজেরাই আহত হন। সতীশ পাকড়াশী প্রচণ্ডভাবে আহত হন। রাজশাহী সায়েন্স কলেজের ছাত্ররা তাকে তাদের হোস্টেলে আশ্রয় দেন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তার নামে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতারী ওয়ারেন্ট জারি করে।

১৯১৫ সালে বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে স্বদেশিরা ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা চালায়। সতীশ পাকড়াশীসহ বিপ্লবী দলের সদস্যরা নাটোর মহকুমার ধারাইল গ্রামে ধনী সুদখোর মহাজনের বাড়ি থেকে ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। একে একে কলকাতার কর্পোরেশন স্ট্রিট, নদিয়ার শিবপুর, গার্গপুর, ত্রিপুরার হরিপুর ও বারতলা, ময়মনসিংহের চন্দ্রকণা, রংপুরের কুরুল (১৯১৫), ত্রিপুরার গণ্ডোয়া ও নাটঘর, ফরিদপুরের ধাত্রুকটি, ময়মনসিংহের সাইদল (১৯১৬), ঢাকার আবদুল্লাপুর (১৯১৭), ত্রিপুরার ললিতেশ্বর (১৯১৬) ইত্যাদি স্থানে স্বদেশিরা ডাকাতি সংগঠিত করে।

স্বদেশি ও সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের দমন করার জন্য ১৯১৭ সালে হাজার হাজার যুবককে ইংরেজ সরকার ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার করে। দেশব্যাপী খানাতল্লাসি ও গ্রেফতার চলতে থাকে অব্যাহতভাবে। উত্তরবঙ্গের গোপন ডেরা থেকে সতীশ পাকড়াশী ও তার সঙ্গীরা আসামের গৌহাটিতে গোপন আস্তানা গড়ে তোলেন। গৌহাটি শহরের আটগাঁও ফ্যান্সিবাজারের গোপন আস্তানায় ও আরনক্যাই পাহাড়ে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সাধারণ ব্যবসায়ীরূপে বাস করতে থাকেন। কিন্তু গোয়েন্দারা খবর পেয়ে যায়। পুলিশ আই জি ফেয়ারওয়েদায়ের সশস্ত্রবাহিনী বাড়ি ঘিরে ফেলে। পুলিশ ও বিপ্লবীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। পুলিশ ও বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে গেলে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়। বিপ্লবীরা পিস্তলের বাট দিয়ে পুলিশদের আঘাত করে। ওই সময় বিপ্লবী নলিনী বাগচী, সতীশ পাকড়াশী, প্রবোধ দাশগুপ্ত পুলিশ বেষ্টনি ভেদ করে সরে পড়তে সক্ষম হন। নলিনী বিহারে এবং সতীশ পাকড়াশী কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় আত্মগোপন অবস্থায় তার চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। নলিনী বাগচী বিহার থেকে কলকাতায় এলেন মহামারী রোগ বসন্তে আক্রান্ত হয়ে। মুমূর্ষু অবস্থায় নলিনী আশ্রয়হীন হয়ে কলকাতার গড়ের মাঠে ধুঁকছিলেন। সেকালে শহরের মধ্যস্থলে সুবিস্তীর্ণ গড়ের মাঠ ছিল বিপ্লবীদের আশ্রয়ভূমি। সতীশ পাকড়াশী নলিনীকে সেখান থেকে উদ্ধার করে সুস্থ করে তোলেন এবং নলিনী ঢাকায় দলের দায়িত্বভার নিয়ে চলে আসেন। ঢাকাতে ১৯১৮ সালের জুন মাসে কলতা বাজারের সংঘর্ষে বিপ্লবী তারিণী মজুমদার নিহত হন। সশস্ত্র পুলিশের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে মারাত্মক আহত হন নলিনী বাগচী। তিনি একদিন পরে মারা যান। অন্যদিকে ফেরারী বিপ্লবীরা কলকাতার বরানগরে বাড়ি ভাড়া করেন কিন্তু পুলিশের নজরে পড়ায় সতীশ পাকড়াশীসহ তার সঙ্গীরা বাগবাজারের কুলি বস্তিতে মজুর সেজে বসবাস করেন।

আত্মগোপনে থাকার পর সতীশ পাকড়াশী ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা হাইকোর্টের সামনে ধরা পড়েন। তাকে গ্রেফতার করার পর ইলিসিয়াম রো স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে এনে নির্যাতন করা হয়। তার জামা-কাপড় ইত্যাদি খুলে নিয়ে নেংটি পড়িয়ে ৪/৫

দিন শুধু একটি চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয় এবং তন্দ্রা এলেই চুলের মুঠি ধরে উল্টোদিকে হেঁচকা টান মারা হত। ইতর ভাষায় গালাগালি, বুকে বুটের লাথি মারা হয়। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে তাকে বিনাবিচারে প্রেসিডেন্সি জেলের চুয়াল্লিশ নম্বর সেলে আবদ্ধ করা হয়। তালাবদ্ধ নির্জন কক্ষ। পড়াশুনা করার জন্য এই সেলে আলো ছিল না। তখনও দেশমাতৃকার স্বাধীনতার চিন্তায় কেটেছে তার সময়।

কিছুদিন পর ১৯১৮ সালের তিন রেগুলেশন অনুযায়ী তাকে রাজশাহী জেলে আনা হয়। ৩ বছর পর ১৯২১ সালের জানুয়ারিতে তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর ১৯২১ সালে বরিশাল জেলা কংগ্রেসের কাজে যুক্ত হন। কিন্তু যখন অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাস করার নীতি স্বীকার করে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার জন্য নির্দেশ এল তিনি তখন কংগ্রেস ত্যাগ করেন। এই সময় বিপ্লবী পার্টিগুলো সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশ করে। 'শঙ্খ', 'বিজল', 'স্বরাজ্য', 'সারথি' পত্রিকাগুলো ছিল বিপ্লবীদের পরিচালিত প্রগতিশীল পত্রিকা। সতীশ পাকড়াশী তাদের পার্টির মুখপত্র 'শঙ্খ'তে প্রায়ই প্রবন্ধ লিখতেন।

১৯২৩ সালে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে আগত অবনী মুখার্জীর সাথে তাকে অনুশীলন পার্টি রাশিয়ায় পাঠানোর জন্য ঠিক করে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং স্টেট প্রিজনার হিসেবে পাঁচ বছর জেল খাটেন। এই সময় তিনি আলিপুর, মেদিনীপুর, ঢাকা, মহারাষ্ট্র'র যারবেদা এবং কর্ণাটকের বেলগাঁও জেলে আটক থাকেন।

মেদিনীপুর জেলে তার সাথে ছিলেন বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, নিরঞ্জন সেন। নিরঞ্জন সেন বহরমপুর কলেজ থেকে গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের সময় কলেজের ছাত্ররা তাদের প্রিয় নেতাকে ফুলের মালা দিয়ে বিদায় অভিনন্দন দেয়। জেলে এসেই ফুলের মালাটি সতীশ পাকড়াশীর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেন 'এ মালা আপনারই প্রাপ্য'। তার সাথে মেদিনীপুর জেলে ছিলেন অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী। বাঙলার আইবি পুলিশের সুপারিন্টেনডেন্ট ভূপেন চট্টোপাধ্যায় প্রায়ই জেলে এসে বিপ্লবীদের উত্যক্ত করতেন। এই খবর শুনে বিপ্লবী দলের অনন্ত ও প্রমোদ সুযোগ বুঝে পুলিশের সুপারিন্টেনডেন্ট ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে খুন করে। ফলে তাঁদের দুজনেরই ফাঁসি হয়। জেলে বসে সতীশ পাকড়াশী 'আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' লেখেন। কিন্তু বইটির ৭০০ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি পরবর্তীকালে বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে যায়।

মেদিনীপুর জেলে থাকাকালীন সময়ে তার সাথে ছিলেন বিপ্লবী সূর্যসেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সতীশ পাকড়াশী ঢাকা জেলা স্বাধীনতা সংঘের সম্পাদক হন। তিনি, নিরঞ্জন সেন প্রমুখ অনুশীলন সমিতিতে 'রিভোল্ট গ্রুপ' বলে পরিচিত ছিলেন। এই রিভোল্ট গ্রুপ রংপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী, অম্বিকা চক্রবর্তী, যতীন দাস, বিনয় রায় এই পাঁচ জন বিপ্লবী মিলে বিদ্রোহের ছক আঁকেন। স্থির হয় ঢাকা, কলকাতা ও চট্টগ্রামে তিনটি জায়গায় অস্ত্রাগার দখল করা হবে। একমাত্র চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অভ্যুত্থান সফল হয়। অন্য দুটি সংঘটিত করা যায় নি।

১৯২৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর ২২/৩ মেছুয়া বাজার স্ট্রিটের বাড়িতে সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন প্রমুখ বোমা বানাবার সাজ-সরঞ্জাম ও ফর্মুলাসহ ধরা পড়েন। সুধাংশু দাশগুপ্তও ওই বাড়িতে এসে ধরা পড়েন। মোট ৩২ জনের নামে মেছুয়া বাজার ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সতীশ পাকড়াশীর ৭ বছর, সুধাংশু দাশগুপ্তদের ৫ বছর সাজা হয়।

আলিপুর জেলে তাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হয়। আলিপুর জেল থেকে সতীশ পাকড়াশীকে রাজশাহী জেল এবং পরে হাজারিবাগ জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। হাজারিবাগ জেল থেকে তাকে আন্দামান দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। হাতে হাতকড়া, পায়ে পাঁচ সের ওজনের বেড়ি পরে তিনি, নিরঞ্জন সেন, ডাক্তার নারায়ণ রায় ও উনিশ বছরের ছেলে হরেকৃষ্ণ কোঙার 'মহারাজা' স্টিমারে আন্দামান সেলুলার জেলে পৌছান।

'আন্দামান সেলুলার জেল'। এটা ছিল ব্রিটিশদের তৈরি করা দ্বিতীয় মৃত্যুকূপ। খোপ খোপ করা বিশাল এক কারাগার। দুর্ধর্ষ, সশস্ত্র বিপ্লববাদী বন্দীদের পিষে মারার জন্য এখানে পাঠানো হতো। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারত উপমহাদেশের মানুষকে শাসন করার জন্য শুরু থেকেই নানারকমের দমননীতির আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে জেলখানাগুলো ছিল তাদের এই দমননীতির প্রধান হাতিয়ার। আর আন্দামান সেলুলার জেল ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর জেল। এক কথায় বলা যায়, মৃত্যু ফাঁদ।

১৯৩৫ সালের ২৬ এপ্রিল সেলুলার জেলে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠিত হয়। ১ মে, মে দিবসের কর্মসূচিতে ওই কনসলিডেশন ৩৫ জন যুক্ত হয়। ১৯৩৬ সালে আন্দামান থেকে সুধীন্দ্র রায় (খোকাদা), রবি নিয়োগীসহ আরো কয়েক জন দেশে ফিরে যান।

কমিউনিস্ট কনসলিডেশন আন্দামান সেলুলার জেলের রাজবন্দীদের নিয়ে বিপ্লবী নিকেতন গড়ে তোলে। সেলুলার জেলকে বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য শুরু হয় পড়াশুনা। সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এবং বেলা ১টা থেকে ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পড়াশুনার নিয়মিত ক্লাস শুরু হল। সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হত। কার্ল মার্কসের সাম্যবাদের ইশতেহার, লেনিনের পার্টিতত্ত্ব, স্টালিনের লেখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিপ্লবীরা জ্ঞান অর্জন করে। স্ট্যালিনের লেখা 'লেনিনবাদের ভিত্তি'র উপর ক্লাস নিতেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। আন্দামানে সতীশ পাকড়াশী কমিউনিস্ট কনসলিডেশনের সভ্য হন।

১৯৩৮ সালের ২৫ জুলাই আমরণ অনশন শুরু হয়। বার বার অনশন এবং প্রথম অনশনের জন্য ৩ জন বিপ্লবীর মৃত্যুর ফলে কিছু দাবিদাওয়া পূরণ হয়। বন্দীরা পড়াশুনার সুযোগ পেলেন। 'বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করে তারা পড়াশুনায় গভীর মনোযোগ দিলেন। এই আমরণ অনশনে যুক্ত ছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিপ্লবীরা। এই অনশনের মূল দাবি ছিল আন্দামান সেসুলার জেলের সকল বন্দীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সকলকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিতে হবে। এক পর্যায়ে এই অনশনে সকল বন্দীরা যোগ দেন।

অন্যদিকে অনশনকারীদের সমর্থনে ভারতব্যাপী উত্তাল আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল যুগান্তর, অনুশীলন ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। ফলে ১৯৩৮ সালের ১৯ জানুয়ারি ব্রিটিশ সরকার চাপের মুখে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। এই মৃত্যু ফাঁদের সকল সহযাত্রীর সাথে সতীশ পাকড়াশী একদিন দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লড়াই-সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি করা প্রসঙ্গে বলতেন:

'আমার প্রথম জীবনে দেশের দুঃখ ও দাসত্ব মোচনের জন্য বোমা পিস্তল নিয়ে পথে বের হয়েছিলাম, সেদিন মৃত্যুর গর্জন শুনেছিলাম সঙ্গীতের মতো। 'দেশের দুঃখ মোচন' কথাটার

কোনো সংজ্ঞা ছিল না। মৃত্যুবরণ করারও কোনো সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল না। একজন বীরপনার রোমান্স দিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন আর একজন হয়তো গভীর প্রেরণা মানবতার অনুরাগে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। একজন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানেই সকল দুঃখ-সমস্যার অবসান হবে বলে মনে করতেন। অন্যজন মনে করতেন দেশের সকল লোকের সুখ-সাচ্ছন্দ্য, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ভিতর দুঃখ মোচন নিহিত। সুস্পষ্ট কোনো আদর্শ-দর্শন না থাকায় বিভিন্ন বিপ্লবী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শের ছাঁচে নিজেকে চালিত করতেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অবশ্যই এই লড়াই করার প্রবল বাসনা সকলেরই ছিল। কিন্তু সে লড়াই কারা করবে? কাদের শক্তি সংহত করে আমরা বিজয়ী হবো? কারা শেষাবধি সংগ্রামের পথে অবিচল থাকবে? এসকল প্রশ্ন আমরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা ভাবিনি। কাজেই আনন্দেই কাজ করে চলেছিলাম। জেলে দোতলা তেতলায় বসে অদূরে ওই সাগর-তরঙ্গের সাথে আমাদের মনের বিপ্লব তরঙ্গও দোল খেত। স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব কাদের বা কোন শ্রেণীর হাতে যাবে, তাও ভাবিনি। ভেবেছিলাম শুধু স্বাধীনতা লাভ করলেই সব দুঃখ-অভাবের অবসান হয়ে যাবে। শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে সমাজের উপরতলা সঙ্গে নিচেরতলার বিরোধ বাধবেই– তা না বুঝার জন্যই তো শ্রেণী-সমন্বয়ের বুর্জোয়া নীতিতে বিশ্বাসী ছিলাম'– সতীশ পাকড়াশী।

১৯৪১ সালে ঢাকায় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা স্থাপিত হয়। যারা প্রগতি লেখক সংঘের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে তরুণ বয়সী ছিলেন, যেমন সোমেন চন্দ, যার বয়স তখন আঠারো আর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন অগ্নিযুগের সতীশ পাকড়াশী।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের (১৯৪৩ সাল) অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দেয় মহামারী। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে বসন্ত রোগ। পীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন সতীশ পাকড়াশী।

১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে অবিভক্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেফতার করে বিনাবিচারে আটক রাখে। এই সময় সতীশ পাকড়াশীকেও আটক রাখা হয়। দু'বছর পরে জনগণের আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠী এসমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেয়। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে সতীশ পাকড়াশীও মুক্তি পান।

১৯৪৮ সালের ২২-২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে তিনি আত্মগোপন অবস্থায় কাজ করেন। তেভাগার প্রস্তুতিপর্বে পার্টি ও কৃষক সমিতিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করেছেন।

১৯৫০ সালে তিনি পার্টির সিদ্ধান্তে আত্মগোপনে চলে যান। আত্মোগোপনে থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবেলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। ১৯৫৪ সালে ২৪ পরগনা জেলা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হলে তিনি ওই কমিটির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। এসময় তিনি উদ্বাস্তু সংগঠন ইউসিআরসি'র সহ-সভাপতি ছিলেন।

১৯৬৪ সালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য হন। তিনি পিপলস রিলিফ কমিটির দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৭৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর সকাল ৬টার সময় এসএসকেএম হাসপাতালে ৮১ বছর বয়সে মারা যান। তার বিখ্যাত রচনা 'অগ্নিযুগের কথা'। তিনি আমৃত্যু 'বাংলাদেশ শহীদ স্মৃতি কমিটির' সভাপতি ছিলেন।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. আমাদের পূর্বসূরিরা– সম্পাদক-তন্ময় ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশকাল মার্চ ২০০৮।

২. বৃটিশবিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা– তপন কুমার দে, জাগৃতি প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০০৫।

৩. অগ্নিযুগের ইতিহাস– ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন, মুক্তধারা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭৯।

৪. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা– হেমচন্দ্র কানুনগো, চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল জুন ১৯২৮।

৫. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি কলকাতা।

৬. বাংলার মুক্তি সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টপাধ্যায় ও রাখী চট্টপাধ্যায়, প্রকাশকাল ২০০৫, কলকাতা।

মুকুল সেন



অদম্য উদ্যম আর প্রচণ্ড সাহস বুকে ধারণ করে ভারতমাতাকে স্বাধীন করার জন্য সেই অগ্নিযুগে কিছু মুক্তি-পাগল মানুষ 'জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে সেদিন সামিল হয়েছিলেন বরিশালের মুকুল সেন। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারতমাতা স্বাধীন হয়, সেই ইতিহাসে যে সকল বিপ্লবী রয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও মুকুল সেন অন্যতম।

শুধু অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লববাদী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনই নয়, ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পরে, ৭১'র ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির সংগঠকদের মধ্যেও তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার কাজে গণমানুষের মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন আমৃত্যু।

বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের শোষণমুক্তির লড়াই-সংগ্রামে তার অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য, শোষণ-বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে এবং মানুষের চূড়ান্ত মুক্তির জন্য কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে অবদান তিনি রেখে গেছেন, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

মুকুল সেন, যে নামটির সঙ্গে জড়িত বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে তিনি প্রবাদতুল্য বিপ্লবী কমরেড। তিনি এখন আর কেবল ব্যক্তি বা নাম নয়, রীতিমতো একটি আদর্শের প্রতীক বা প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তানের স্বৈর-শাসন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের অন্যতম নক্ষত্র ছিলেন তিনি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি শোষণের অবসান ঘটিয়ে একটি সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেছিলেন।

প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুকুল সেন ছিলেন একজন দৃঢ় মনোবল সম্পূর্ণ ছাক্কা কমিউনিস্ট। রাজনৈতিক জীবনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত মাফিক পদক্ষেপ, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, মার্ক্সবাদী রাজনীতিতে স্বঘোষিত সমর্থক, কাজের মধ্যদিয়ে পার্টি সভ্য পদ লাভ, কর্মী থেকে পার্টি নেতৃত্ব সর্বোপরি মার্ক্সীয় দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ ও ঘটনাই যেন তাকে একজন বিজ্ঞ কমিউনিস্ট হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

মুকুল সেন জন্মেছিলেন ১৩১৫ বঙ্গাব্দের (১৯০৮ খ্রি.) ৭ই আষাঢ়। 'আজ হৃদয়ের কোন গভীর তলদেশ থেকে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে আমার জন্মভূমি সেই ছোট্ট গৈলা গ্রামখানির ছবি। ১৩১৫ (১৯০৮ খ্রি.) ৭ই আষাঢ় ওই গ্রামেই প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছি। মাত্র ছ'মাস পরেই আমাদের ওই গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হয় বরিশাল শহরের রাজা বাহাদূরের হাভেলীতে। পশ্চিম দিকে জর্ডন কোয়ার্টার, পূর্বে কাঠপট্টি, দক্ষিণে রাজাবাহাদূরের সেই বিশাল হাভেলী, মাঝখানে মাঠ। অনতিদূরে প্রশস্ত নদী। এই পরিবেশেই আমার শৈশব, বাল্য ও কিশোরকাল অতিবাহিত হয়েছে; সেখানকার শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ আমায় যেন এক অচেনাকে চেনার জন্য আহ্বান জানাত। অজানাকে জানার আনন্দে আমি যেন হারিয়ে যেতাম সেই পরিবেশের মাঝে'।

স্কুলজীবন শুরু হলো বরিশালে টাউন স্কুলে। 'আমার জ্যাঠামশাই নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ছিলেন ব্রাহ্ম। আমার জেঠিমা ছিলেন কবি জীবনানন্দের মায়ের সহোদরা। আমি মাঝে-মাঝেই চলে যেতাম জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে। সেখানে আসত 'ব্রহ্মবোধি' পত্রিকা। পরাধীনতায় যে অবমাননা ও আত্মগ্লানি আছে তা এই পত্রিকা পড়েই প্রথম উপলব্ধি করলাম। পড়লাম বিবেকানন্দের বই। এক নূতন আলোকধারা যেন আমার সামনে উন্মোচিত হল। শুরু হল সমাজ সেবার কাজ। মুষ্টি-ভিক্ষা ও নরনরাছু সেবার মধ্য দিয়েই সমাজ সেবার ক্ষেত্রে আমার প্রথম পদক্ষেপ সূচিত হয়।' এই মুষ্টিভিক্ষা তুলতে তুলতেই হয়তো তিনি শুনতে পেয়েছিলেন গ্রামের বৈরাগীদের কণ্ঠে অমর শহীদ ক্ষুদিরামের স্মারকগান 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।'

'ওই গান আর চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান শুনতে আমার খুব ভাল লগত।' এইসব গান আরও অনেকের সঙ্গে তাকেও প্রভাবান্বিত করেছিল, টেনে এনেছিল বৃটিশের বিরুদ্ধে বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের স্রোতে।

'নিজেকে সমাজচেতনার মধ্যে নিহিত করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। কিন্তু চৈতন্য বিদ্যালয় ছেড়ে মডেল স্কুলে যাওয়ার একটা কারণ ঘটল। আমরা চৈতন্য বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের প্রস্তাব করি এবং ধর্মঘট করি। টাউন হলের সভায় একটি প্রস্তাবে এই উদ্দেশ্যে চারজনকে নিয়ে একটি ডেপুটেশন তৈরি হয় ওই চারজনের মধ্যে আমিও ছিলাম। বিদ্যালয়টিকে জাতীয়করণের দাবি নিয়ে আমরা সেক্রেটারির কাছে যাই। তখন সরকার সাময়িকভাবে এই স্কুলটি বন্ধ করে দেয়। পরে এই স্কুল থেকেই আমি ম্যাট্রিক পাশ করি।'

'রাজাবাহাদূরের হাভেলীতে একটি সভায় ফজলুল হক জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ দেন এবং আমি ওই বক্তৃতা শুনি। বৃটিশ সরকারের এই সকল ঘৃণ্য কার্যকলাপ আমার কিশোর মনের উপর এক গভীর ছাপ ফেলেছিল। বিদেশি বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার জন্য স্কুলের পড়াশুনা স্থগিত রেখে আন্দোলনে শামিল হই।'

'১৯২০ সালে বরিশালে একটি প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে আমি একজন দর্শক ছিলাম। সেখানে অশ্বিনী দত্তের কাছ থেকেই শুনেছিলাম দেশ সেবার কথা, জনগণের জন্য কাজ করার ও নিরক্ষরকে শিক্ষিত করার বাণী।' অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিতে ছিল মদের দোকানে পিকেটিং, বিলাতী কাপড় পোড়ানো, বিদেশি দ্রব্য বর্জন ইত্যাদি। কিশোর মুকুল সেন এইসব কার্যকলাপে সক্রিয় অংশ নেন।

'আমার বাবা ও জ্যাঠামশাই সরকারি কাজ করতেন। তাই ওরা ভয় পেয়ে আমাকে বরিশাল থেকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দেন। মামাবাড়ির আবহাওয়া পুরাপুরি স্বদেশি। আমার পক্ষে সেখানে যাওয়াটা শাপেবর হয়ে ওঠে। '১৯২২ সালে সুশীল দাস, নয়নাঞ্জন দাশগুপ্ত ও আমি যুগান্তর (শঙ্কর মঠ) দলের সঙ্গে যুক্ত হই।' এই সময় মুকুল সেনের বয়স মাত্র ১৪ বছর।

'এই সময় বরিশাল টেকনিক্যাল স্কুলের শিক্ষক শৈলেন দাশগুপ্তের (রুনুদা) সঙ্গে আমি ও নয়নাঞ্জন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। তার প্রতিষ্ঠিত তরুণ সংঘ পাঠাগারে বিপ্লবী ও সাম্যবাদী পত্রিকা পড়ার নেশায় আমরা প্রত্যহ যেতাম। তখন নরেণ সেন নামে এক প্রগতিশীল ব্যক্তির সাথে আমাদের পরিচয় হয়। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তার সঙ্গে রুশ বিপ্লব, মে দিবস, নভেম্বর দিবস নিয়ে নানারকম আলোচনা হ'ত।'

১৯২৩ সালে মুকুল সেন গোপীনাথ সাহার সংস্পর্শে আসেন। গোপীনাথ সাহা যুগান্তরের সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনি টেগার্ট সাহেবকে গুলি করতে গিয়ে ভুলক্রমে অন্য এক সাহেবকে গুলি করেন। বিচারে তার ফাঁসি হয়।

১৯২৫ সালে অনন্ত চক্রবর্তী ও ভোলানাথ বাবু দলের কাজে বরিশালে আসেন। তখন চক্রবর্তী ও ভোলানাথ বাবু বোমা বানানোর ফর্মুলা মুকুল সেনকে দিয়ে যান। কলকাতার শোভাবাজারে বোমা বানানোর সময় ভোলানাথ বাবু পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তার যাবৎজীবন কারাদণ্ড হয়। প্রথমে রেঙ্গুনে পরে আন্দামান।

১৯২৬ সালে পটুয়াখালী জেলায় ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনে মুকুল সেন যুক্ত হন। এই আন্দোলনের চাপে সরকার সকল দাবি মেনে নেয়। এই আন্দোলন বরিশালের লাউকাঠি আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। ওই বছর মুকুল সেন ও যুগান্তর দলের নেতারা বরিশালের কয়লাঘাটায় 'সবুজ সম্মিলনী' নামে একটি ক্লাব গঠন করেন। এই ক্লাবে একটি জিমনেসিয়াম ও পাঠাগার গড়ে ওঠে। এখানে রাজনৈতিক আলোচনা এবং সভা অনুষ্ঠিত হত। ক্লাব থেকে একটি হাতে লেখা পোস্টার বের হত। এসবকিছুর মূলে ছিলেন মুকুল সেন। ১৯৩০ সালে পুলিশের অত্যাচারে এই ক্লাবটি বন্ধ হয়ে যায়।

মুকুল সেনরা ছিলেন পাঁচ ভাই-বোন। তিনি ছিলেন সবার বড়। বি. এ পাশ করার পর থেকে মুকুল সেনকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হয়। কারণ ওই সময় তার বাবা অসুস্থ ছিলেন। তাই তিনি বিপ্লবী দলের কাজের পাশাপাশি মাদারীপুরের মিঠাপুর স্কুলে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত হন। বছর দুই পরে তার বাবা মারা যান। এরপর সংসারের সকল দায়িত্ব তার উপর এসে পড়ে। কিছুদিন পর তিনি বরিশালে কালেক্টর পদে একটি সরকারি চাকুরি পেয়ে যান। পারিবারিক কারণে সরকারি চাকুরি নিতে বাধ্য হলেও তিনি কখনো দেশের কাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেননি। তিনি সবসময় পরিবারের চেয়ে দেশকে বড় করে দেখেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজও করেছেন।

ওই সময়ে বরিশালের বিপ্লবী দলগুলো দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। যুগান্তর দলও দুইভাগে বিভক্ত হয়। যুগান্তর ও তরুণ সংঘ। যুগান্তরের নেতা মনোরঞ্জন গুপ্ত ও অরুণ গুহ। তরুণ সংঘের নেতা সতীন সেন। মুকুল সেন যুগান্তরের নেতা হলেও তরুণ সংঘ ও অনুশীলন সমিতির সাথে যোগাযোগ রেখে চলতেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, লক্ষ্য যেখানে এক, সেখানে দলীয় কোন্দলে শত্রুপক্ষেরই লাভ হবে।

১৯২৭ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় কমিউনিস্ট সদস্য সাপুরোজী শাকলাতওয়ালা বলেন, 'শ্রমিকরা যদি সমাজ বিপ্লবের নেতৃত্ব না নেয় তবে সে বিপ্লব সফল হতে পারে না। ওই বছর পার্কসার্কাসের কংগ্রেস অধিবেশনে ৩০,০০০ শ্রমিক যোগ দেয়। তাদের মুখে স্লোগান ছিল–'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। এই দুটি বিষয় মুকুল সেন লক্ষ্য করেন এবং মনে মনে ভাবতে থাকেন তাহলে মুক্তি কোন পথে?

১৯২৭-২৮ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে জহরলাল নেহেরু কর্তৃক উত্থাপিত ও কমিউনিস্ট নেতা খোগলেকর দ্বারা সমর্থিত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি অনায়াসে পাস হয়। ওই অধিবেশনে গান্ধীজী ছিলেন না। তিনি এই প্রস্তাবে বিরক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা জানতেন এইসব আবেদন নিবেদন করে দেশের স্বাধীনতা আসবে না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চাই অসংখ্য আত্মবলিদান ও অসীম আত্মত্যাগ। তাই কংগ্রেসের সাথে তাদের কার্যক্রমের পদ্ধতি কখনো মেলেনি। তারা বিপ্লববাদী পথেই দৃঢ় রয়েছেন। এসময় বিপ্লববাদী তরুণদের সাথে প্রবীণ কংগ্রেস পন্থীদের বিরোধ দানা বেঁধে উঠে।

১৯২৯ সালে ভারতবর্ষ আন্দোলনে উত্তাল। কংগ্রেস 'খাজনা বন্ধ' আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধে 'Go back Simon' ধ্বনিতে আসমুদ্র-হিমাচল মুখরিত। পুলিশের লাঠির আঘাতে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু, এই সময়ের আন্দোলনের উপর প্রতিক্রিয়ায় পুলিশ অত্যাচারের অন্যতম নায়ক রক্তপিপাসু স্যান্ডারস বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়। স্যান্ডারস হত্যাকে কেন্দ্র করে আরম্ভ হয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলায় অভিযুক্ত ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেব ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হন। রাজবন্দীদের মর্যাদা দানের দাবিতে ৬৩ দিন অনশনের ফলে ১৯২৯-এর ১৩ সেপ্টেম্বর যতীন দাস শহীদ হন। যতীন দাসের এই আত্মাহুতি বাংলার বিপ্লবীদের এক নতুন উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করে। বরিশালে এই সময় সকল আন্দোলনে সংগঠকদের অন্যতম ছিলেন মুকুল সেন।

অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঠিক হয় যে রাজশাহী শহরে বাসে যে ডাকের টাকা আনা হয় তা লুট করতে হবে। এই পরিকল্পনায় মুকুল সেন সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯২৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কয়েকজন সহকর্মীর সাথে পুটিয়াতে (নাটোর) পূর্ব পরিকল্পনা মতো তিনি মিলিত হলেন। ডাকের গাড়ি এগিয়ে এল, বিপ্লবীরা ওই বাসে উঠে পড়েন। কিছুক্ষণ বাসটি চলার পর 'ঘড়ি পড়ে গেছে' এই অজুহাতে বিপ্লবীরা বাস থেকে নেমে বাসের টায়ার লক্ষ্য করে গুলি চালায়। কিন্তু গুলি উপেক্ষা করেই গাড়িটি চলতে আরম্ভ করে। বাসের মধ্যে তখনও একজন বিপ্লবী রয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অনন্যোপায় হয়ে বাস থেকে লাফিয়ে পড়েন এবং গুরুতর আঘাত পান। তাকে নিয়ে সরে যাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সবাইর ধরা পরা এড়াতে আহত বন্ধুকে রেখেই সরে আসতে বাধ্য হন। আহত বিপ্লবী (সুশীল দাশ গুপ্ত) ধরা পড়েন। অন্য বিপ্লবীরা রাতের অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে শেষ পর্যন্ত রেলওয়ে স্টেশনে পৌছে নানা দিকে চলে যান। মুকুল সেন কোলকাতায় চলে আসেন। 'পুটিয়া ডাকাতি মামলা' শুরু হয়। সুশীল দাশগুপ্ত ও ধরণী বিশ্বাসের ছয় বছর কারাদণ্ড হয়। পরে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করার অপরাধে আরও দুই বছর করে কারাদণ্ড হয়। মুকুল সেন তখন সরকারি চাকুরি করতেন। পুটিয়া ডাকাতিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এটা পুলিশের সন্দেহে ছিল। উপরন্তু যুগান্তর দলের সঙ্গেও তিনি জড়িত এটাও পুলিশ জানতে পেরেছিল। তাই ভয় দেখানো আরম্ভ হল যে তিনি যদি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন তবে তাকে

চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। তিনি যাতে চোখের আড়াল না হতে পারেন তাই পুলিশের পরামর্শে পূজার ছুটিতেও তাকে অফিস করার আদেশ দেওয়া হয়।
'আমি বুঝতে পারি আর হয়তো বেশিদিন এদের চোখে ধুলো দেওয়া যাবে না। সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। বুঝতে পারি নিরাপদ স্থান হিসাবে আমার অফিসের ড্রয়ারও আর নিরাপদ নয়। ওখানে রাখা বোমার ফর্মুলা ও রিভলবার ছুটির পর গোপনে অফিসে গিয়ে সরিয়ে ফেলি।'
শুরু হল মুকুল সেনের জীবনের আর এক অধ্যায়। 'পুলিশ আমার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে, আমি এখন ফেরারী। আমাদের সংসার তখন আমার চাকুরির মুখাপেক্ষী। একদিকে সংসারের দায়িত্ব, অপর দিকে আমার দেশ। 'ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে' দেশই আমাদের বিপ্লবীদের বৃহত্তর সংসার।'
আরম্ভ হয় মুকুল সেনের পলাতক জীবন। গৈলা থেকে মাহিলারা, মাহিলারা থেকে নলচিড়া, নলচিড়া থেকে বাটাজোর, অবশেষে সেখান থেকে কোলকাতা। কোলকাতায় তখন ধরপাকড় আরম্ভ হয়েছে। ১৯১৯-এর ১৯ ডিসেম্বর মেছুয়াবাজার থেকে নিরঞ্জন সেন ও সতীশ পাকড়াশীকে বোমার ফর্মুলা সমেত পুলিশ গ্রেফতার করে। এই ঘটনাই মেছুয়াবাজার বোমা মামলা নামে পরিচিত।
কোলকাতার বিভিন্ন শেল্টারে ঘুরে অবশেষে ১৯৩০ সালের ২৫ জানুয়ারি মুকুল সেন, শচীনকরগুপ্ত ও আরও কয়েকজন গ্রেফতার হলেন। গ্রেফতারের পর যথারীতি কুখ্যাত লর্ড সিনহা রোডে নিয়ে তাদের জেরার পর জেরা করা হয়। জেরা মানে শুধুই প্রশ্ন নয় নানারকম দৈহিক পীড়ণও করা হয় কিন্তু কোনও গুপ্ত সংবাদ না পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কয়েকদিন পর তাদের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 'আমাদের যেদিন জেলে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য লোক দাঁড়িয়ে আমাদের অভিনন্দিত করে।'
যখন বাইরে বিপ্লবীদের দ্বারা চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী ঘটেছিল তখন জেলের মধ্যে বিপ্লবী বন্দীদের আরম্ভ হয়েছে আত্মবিশ্লেষণ। জেলে আসার আগে মুকুল সেনের চিন্তাজগতে কিছু প্রশ্ন, কিছু পরিবর্তনের ঢেউ লাগতে শুরু করেছিল। তিনি তার স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, 'জেলে আসার আগে Road to Freedom বইটা পড়ি। ওই বইটা পড়েই আমি প্রথম 'সমাজতন্ত্র' কথাটার সঙ্গে পরিচিত হই। কথাটা মনে গভীর রেখাপাত করলেও স্বাধীনতা লাভই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য বলে মনে হয়েছিল। চিন্তাটা ছিল এইরকম, আগে স্বাধীনতা লাভ করি তারপর ভাবা যাবে।' জেলে আসার পর তার চিন্তাভাবনা সুসংহত রূপ নিতে থাকে।
১৯৩০-এর জুন মাসে মেছুয়াবাজার বোমা মামলার রায় দেওয়া হল। নিরঞ্জন ১০ বছর, মুকুল সেন ও অন্যান্যদের ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জেল জীবন শুরু। 'প্রথম যখন এই বইগুলি পড়তে আরম্ভ করলাম, তখন অনেকটাই বুঝতে পারিনি। ক্রমে ক্রমে মার্ক্সবাদ আমাকে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৩১ সালের শেষের দিকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমি নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করি।'
রাজশাহী জেলে থাকার সময় সুপারের খারাপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করার শাস্তিস্বরূপ মুকুল সেনকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে অবনমিত করা হয়। পরে আলিপুর জেলে থাকাকালীন শুধুমাত্র একবার অনুরোধ করলেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য হওয়ার সুযোগ পেতেন। কিন্তু সে রকম অনুরোধ তিনি করেননি। নিজের জন্য একটু আরাম, একটু নিশ্চয়তার কথা ভাবা তার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালেও তার এই স্বভাব গুণটির পরিচয় আমরা পেয়েছি। তার স্মৃতিচারণা থেকে আমরা জানতে পারি আলিপুর সেন্ট্রাল

জোগে তাকে 'পানিশমেন্ট সেলে' রাখা হয়েছিল। এতে একটি মাত্র দরজা, তাতে আবার একটি মাত্র ফুটো। ওই সেলেই খাওয়া, শোয়া, পায়খানা সব। অন্য কোন বন্দীর সাথে যোগযোগহীন, সম্পূর্ণ একা। কেমন করে কেটেছিল তার এই সেলে থাকাকালীন দিনগুলি? তিনি তার স্মৃতিচারণে বলেন 'বন্দী জীবনের এই কষ্ট, লাঞ্ছনা আমার সহনশীলতাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। চিন্তা করতাম আমাদের সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, গৃহহীন, কপর্দকশূণ্য মানুষদের কথা। এর প্রতিকার না করতে পারার এক অসহ্য যন্ত্রণায় আমি দগ্ধে দগ্ধে মরে যাচ্ছিলাম। অবশেষে ১৯৩২-এর ২৫ আগস্ট আরও ২৩ জন বন্দীসহ মুকুল সেনকে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। এই ২৩ জনের মধ্যে ছিলেন গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, রমেশ চ্যাটার্জী প্রমুখ।

'আমাদের পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী, হাতে হাতকড়া বহু পুলিশ ও সার্জেন্ট বেষ্টিত হয়ে আমরা মহারাজা জাহাজে উঠে দ্বীপান্তরের দিকে যাত্রা করি। জাহাজে ডেকের নিচে অন্ধকার দুটো স্যাঁতসেতে ঘরে আমাদের ঢুকানো হয়। এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই ভেবে যাতে আমরা সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে না যাই। আমরা ভেসে চলেছি সমুদ্রের দোলায় দুলতে দুলতে আন্দামান দ্বীপের দিকে।'

১৯৩৪ সালে আন্দামান থেকে বাংলার জেলে ফিরে আসার পর ওই বছর ১৩ জুন মুকুল সেনকে ৬ মাসের জন্য প্যারোলে মুক্তি দেয়া হয়। শেষ হয় মুকুল সেনের সশস্ত্র বিপ্লবী জীবন। শুরু হয় আর এক অধ্যায়, কমিউনিস্ট মুকুল সেনের অধ্যায়। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন। প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার পর মনে মনে পার্টি গড়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। তাই প্রচণ্ড অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি বরিশালে পার্টি গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত রাখেন। পুরানো বন্ধু-বান্ধব ও নতুন কিছু কর্মী সংগ্রহ করলেন। তাদেরকে মার্ক্সবাদ ও মার্ক্সবাদী বই-পুস্তক পড়াশুনা করাতেন। এই বইগুলো তিনি জেলখানা থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তরুণ-তরুণী দল নিয়ে পাঠচক্রে বসতেন। দিনের পর দিন তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে কর্মীদের মার্ক্সবাদ বোঝাতেন। কর্মীরাও তার পিছু ছাড়তেন না। অসুস্থ অবস্থায় তিনি মার্ক্সবাদে দীক্ষিত কয়েকজনের সাথে পার্টি গড়ে তোলার কথা বললেন। তারাও উৎসাহ নিয়ে তাকে সমর্থন করলেন।

দীর্ঘ ৫ মাস পর ১৯৩৪ সালের ৭ নভেম্বর ১০ জন সদস্যকে নিয়ে বরিশাল কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হল। সদস্যরা হলেন- নির্মল দাশগুপ্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, জুঁইফুল বসু, জ্যোতি দাশগুপ্ত, বীরেন রায়, দেবেন্দ্র বিজয় সেনগুপ্ত, সুশীল গুপ্ত, অমিয় দাশগুপ্ত ও মুকুল সেন। কমিউনিস্ট পার্টি তখন অবৈধ ছিল। সেজন্য সংগঠনটির নাম রাখা হল 'সোসালিস্ট লীগ'। 'সোসালিস্ট লীগ' প্রথম সভাতেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্ফুলিঙ্গ নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করে। যেটি কমরেডদের আত্মশিক্ষার বাহন ছিল। আর 'সোসালিস্ট লীগ'-এর পক্ষ থেকে একটি ইশতেহার বের করা হয়। এই কার্যক্রমের উদ্যোক্তা ছিলেন মুকুল সেন। ১৯৩৫ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি আন্দামান ফেরত সুধাংশু দাশগুপ্ত বরিশালে এসে মুকুল সেনের সাথে পার্টির কাজে যুক্ত হন। এসময় মুকুল সেন পার্টির তৃতীয় আর্ন্তজাতিক সম্মেলনের দলিল-পত্র সংগ্রহ করে পার্টি কমরেডদের নিয়ে অধ্যয়ন করেন। একপর্যায়ে বরিশালে পার্টি আত্মপ্রকাশ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শুরু হয় সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ। ১৯৩৬ সালে নিত্যানন্দ চৌধুরীর উপস্থিতিতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক অনুমোদিত কমিউনিস্ট পার্টির শাখারূপে বরিশাল জেলা কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করে। তখনকার পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৫ জন সদস্য নিয়ে বরিশাল জেলা

পার্টি গঠিত হয়। জ্যোতি দাশগুপ্ত এই কমিটির সম্পাদক হন। তখনও মুকুল সেন ছিলেন প্যারোলে। তাই তাকে কমিটিতে রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু পার্টির সকল কাজ তারই যুক্তি-পরামর্শে হত।

১৯৩৭ সালে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সকল প্রদেশে আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় বানারীপাড়া থেকে এক কৃষক পরিবারের সন্তান ফজলুল হক (অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উদীয়মান আইনজীবী) তার নিজের গঠিত কৃষক-প্রজা পার্টি পুরাদমে নির্বাচনী প্রচারণা চালায় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কৃষক-প্রজা পার্টির দাবিসনদের মধ্যে ছিল কৃষকদের দূর্দশা দূর করার জন্য প্রজাসত্ত্ব আইন বাতিল এবং ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণ মওকুফ করা। এই দাবি নিয়ে ফজলুল হক ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে পটুয়াখালী থেকে মুসলিম লীগের খাজামুদ্দিনকে পরাজিত করে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং মুসলিম লীগের সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করনে। এই নির্বাচনে পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল কংগ্রের পক্ষে কাজ করা। কিন্তু বরিশালের পার্টি মুকুল সেনের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টিকে সমার্থন করে।

১৯৩৭-৩৯'র মধ্যে বরিশাল কমিউনিস্ট পার্টি কয়েকবার রদবদল হয়। কারণ, তখন আন্দামান বন্দীসহ অন্যান্য বন্দীরা একের পর এক মুক্তি পেতে শুরু করে। তারা আন্দামানে থাকাকালীন সময়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন। যারা মুক্তি পাওয়ার পর অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হয়। বরিশালের বিপ্লবীরা মুক্তি পাওয়ার পর বরিশালে এসে মুকুল সেনের মাধ্যমে পার্টিতে যুক্ত হন।

মুকুল সেন ১৯৩৬ সাল থেকে পার্টি গঠনের পরপরই কৃষক, ছাত্র ও মহিলা সংগঠন গড়ে তোলার দিকে নজর দেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে তিনি এই সংগঠনগুলো গড়ে তুলতে শুরু করেন। প্রথমে তিনি নিজ গ্রাম গৈলাতে কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তী এই কৃষক সংগঠন ও আন্দোলন বরিশালের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। ১৯৩৭ সালে ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বরিশালে ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়। ওই বছর মহিলা সংগঠনেরও কাজ শুরু হয়। মনোরমা বসু, সরযূ সেন নারী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

১৯৩৮ সালে আন্দামান থেকে নিয়ে আসা মরণব্যাধী যক্ষ্মা রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পান। ওই বছর তার প্যারোলের মেয়াদ শেষ হয়। ১৯৩৯ সাল থেকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেকে পার্টির সার্বক্ষণিক হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি বরাবরই পার্টিকর্মীদের পড়াশুনার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মার্ক্সবাদ সম্পর্কে প্রত্যেককে প্রশিক্ষিত হিসেবে গড়ে তোলার কাজ অব্যহত রাখতেন। এই কর্মীরা যাতে করে গণমানুষের মধ্যে গণআন্দোলন তৈরি করতে পারে। আর যখনই গণআন্দোলন তেরি হবে তখন পার্টি-সংগঠনে নতুন নতুন কর্মী যুক্ত হতে থাকবে। এভাবে মুকুল সেন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অক্লান্ত কাজের ফলে পার্টি বড় হতে থাকে। ১৯৩৯-৪১ সাল পর্যন্ত বরিশাল কৃষক সমিতির বেশ কয়েকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর ব্রিটিশ সরকার আবারও কমিউনিস্টদের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে। এ সময় বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টি গোপনে কাজ চালিয়ে যায়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯৪৩ সালে বাংলার বুকে নেমে আসে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। এই সনটি ইতিহাসে মন্বান্তরের সন হিসেবে পরিচিত। এই সময় ইংরেজ শাসকদের অবহেলার কারণে সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। গ্রাম-বাংলার আনাহারী মানুষ খাবারের জন্য ছুটছে কলকাতার দিকে। অলিতে-গলিতে, রাজপথে-ফুটপাতে অগণিত মানুষ ক্ষুধার তাড়নায়-

যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কাক ও কুকুরের সঙ্গে বুভুক্ষু মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খুঁজে ফিরছে ডাস্টবিনে-নর্দমায়। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশব্যাপী লঙ্গরখানা খুলে বুভুক্ষু মানুষকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এই দুর্ভিক্ষ থেকে মানুষকে বাঁচাতে কমরেড মুকুল সেন, নীরেন ঘোষ, মনোরমা বসু, মণিকুন্তলা সেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অমানুষিক পরিশ্রম করে বৃহত্তর বরিশালের দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ান। সমস্ত বরিশালে কমিটি করে ৪০/৪৫ টি লঙ্গরখানা চালু করেন। মনোরমা বসুর নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা কমিটি সেই মন্বান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এই দুর্ভিক্ষে ৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

১৯৪৪ সালে মহিলা আত্মরক্ষা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালে ভূমি সংস্কারের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে বরিশালের সাতলা বাগধায় বাঁধ রক্ষার জন্য বা নতুন করে নির্মাণের জন্য কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠে। এই আন্দোলনের ফলে একসময়ে বৃহত্তর বরিশালে বাঁধ নির্মাণ ও সুইচগেট তৈরি হয়। এই আন্দোলনের মূলব্যক্তি ছিলেন মুকুল সেন। গণসংগঠন থেকে শুরু করে পার্টির প্রতিটি লড়াই-সংগ্রামের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক নেতা ছিলেন তিনি।

১৯৪২-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ভারত জুড়ে চলছিল অরাজক পরিস্থিতি। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হল। কংগ্রেস নেতারা মুক্তি পেল। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের মুক্তি দেয়া হল না। তখন কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন ও অন্যান্য গণসংগঠন বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তির দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। যে কারণে ব্রিটিশ বন্দীদের মুক্তি দেয়। মুকুল সেনের নেতৃত্বে এই আন্দোলনে বরিশাল কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৬ সালে বরিশাল জেলা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অমিয় দাশগুপ্ত সম্পাদক হন ও মুকুল সেনকে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য করা হয়। মুকুল সেনকে প্রাদেশিক সম্মেলন ও পার্টি কংগ্রেসে বরিশাল জেলার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় মুকুল সেন পার্টির কাজে মুলাদীতে ছিলেন।

১৯৪৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে বরিশাল জেলার প্রতিনিধি ছিলেন মুকুল সেন। এই কংগ্রেসে মুকুল সেন পাকিস্তান প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। মুসলীম লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়তে শুরু করে। তখন বরিশালের কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তে মনোরমা বসু মাসিমার নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির এক গণডেপুটেশন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যায়। তখন ম্যাজিস্ট্রেট দেখা না করে পুলিশ পাঠিয়ে ছাত্রকর্মী ও নারীকর্মীদের উপর অমানবিক লাঠিচার্জ করে। এসময় মনোরমা বসু, শোভা সেন, বিভা দাশগুপ্ত ও অনুসূয়া রায়সহ আরো অনেককে গ্রেফতার করে। ওই বছর শেষের দিকে পাকিস্তান সরকার (মুসলীম লীগ) কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের উপর দমন-পীড়ন চালায় এবং গণহারে গ্রেফতার করতে শুরু করে। তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব আত্মগোপনে চলে যায়। আবার শুরু হয় মুকুল সেনের আত্মগোপন জীবনের পালা।

১৯৫০ সালে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায়। দাঙ্গা বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুললো কমিউনিস্ট পার্টি। এ সময় বরিশালের প্রায় সকল কমিউনিস্ট নেতাকে সরকার গ্রেফতার করে। মুকুল সেন ও জগদীশ আইচকে গ্রেফতার করতে সরকার

ব্যর্থ হয়। মুকুল সেন আত্মগোপন থেকে দাঙ্গা নিরসনে কাজ করে যান। তার পর তিনি পার্টির কাজে কলকাতায় যান। ১৯৫১ সালে পাকিস্তান পুলিশ মুকুল সেনকে গ্রেফতার করে। প্রথমে বরিশাল জেলে পরে ঢাকা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। মুকুল সেন ঢাকা জেলে থাকা অবস্থাতে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বকে পাক-পুলিশ জেলে নিয়ে আসে। তখন জেলে বসে তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শ বিস্তারে ও পার্টি সভ্য করার কাজে ব্যস্ত থাকেন। ১৯৫৬ সালে মুকুল সেন জেল থেকে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর বরিশালে এসে পার্টির কাজে যুক্ত হন এবং কৃষক সমিতি সংগঠিত করার দায়িত্ব নেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি আবার একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি নেন। ১৯৫৬-৬৯'র গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত তিনি বৃহত্তর বরিশালে কমিউনিস্ট পার্টি এবং মেহনতি মানুষের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। অবশ্য এ কাজে তাঁকে খোকা রায়, নলিনী দাস, নূরুল ইসলাম মুনিসহ আরো অনেকে সহয়তা করেন।

আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন ওই অঞ্চলের আতঙ্ক। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে তিনি বরিশালের ছাত্রদেরকে সংগঠিত করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৬৭ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটু সুস্থ হয়ে পার্টির কাজে চলে যান। ১৯৬৮ সালে পার্টির প্রথম গোপন কংগ্রেস ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে তিনি পার্টি লাইন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে তিনি বরিশালের ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। ৭০'এ স্বরূপকাঠীর ব্যাসকাঠীর কৃষক সম্মেলনের সকল আয়োজন তিনি করেন। এই সম্মেলনে প্রখ্যাত কৃষক নেতা জীতেন ঘোষ, হাতেম আলী খান ও মহিউদ্দিন আহম্মেদ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে মুকুল সেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বরিশাল জেলার অন্যতম সংগঠক তিনি। তরুণ ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক ও কৃষকদের রিক্রুট, ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি এবং কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর যোদ্ধাদের অন্যতম পরিচালক ও সংগঠক ছিলেন তিনি।

৭৩'র নির্বাচনে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেন। ৭৪'র দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। ৭৫'র বাকশালে যোগদানের বিরোধীতা করেন। ১৫ আগস্টের পর রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য পার্টির সিদ্ধান্তে আত্মগোপনে যান। আত্মগোপনে থেকে তিনি খেলাঘর, ছাত্র ইউনিয়ন, কৃষক সমিতি, ক্ষেতমজুর সমিতি ও উদীচীসহ আরো অনেক গণসংগঠনের কাজে যুক্ত থেকে ওই সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। ৮২'র মার্শাল ল' জারির প্রতিবাদের জন্য জনমত গঠন করেন। ৮৬'র ও ৯১'র নির্বাচনে পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করেন। ৮৭'র কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ৯০'র গণআন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ।

১৯৯২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান।

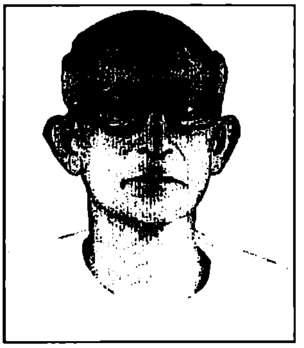
লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. চিরঞ্জীব কমরেড মুকুল সেন– সুনীল সেনগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৯৭।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল– হীরালাল দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৭।

জীতেন ঘোষ



'পদ্মা পাড়ের মানুষ জীতেন ঘোষ। কিশোর বয়সে পদ্মার উত্তাল ঢেউয়ের মত ছিল তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' 'চিত্ত ভাবনাহীন' এই পণ করিয়া সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের গণআন্দোলনের প্রথম যুগে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্মী। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক দিক-নির্ণয়ের পরিপূর্ণতা পাননি। সবশেষে জনগণের একমাত্র শোষণমুক্তির পথ মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক পরিপূর্ণতা আসে।

নিরন্ন বুভুক্ষু কৃষকদের সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্ম করিয়া তুলিলেন। একটি অবহেলিত গরীব মুসলিম গৃহে হইল তার বাসস্থান। কত হিন্দু-মুসলমান মেহনতি কৃষককে তিনি প্রেরণা দিয়াছেন, উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন কে তার হিসাব রাখে! আজিকার সামাজিক পরিবর্তনে কৃষক আন্দোলনের ও সংগঠনের অসীম গুরুত্ব উপলব্দি করিয়া তিনি সর্বশেষ জীবন পর্যন্ত কৃষক সংগঠন গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক আর কৃষক সংগঠনের প্রাণশক্তি।

চরম আত্মত্যাগ, শত লাঞ্ছনা, দুঃখ, ক্লেশ, জুলুম-অত্যাচারের মধ্যেও তিনি ছিলেন হিমালয়ের মত অটল। আদর্শের উপরে ছিল তার ইস্পাতের ন্যায় দৃঢ়তা। তাই অনেক উত্থান পতনের মধ্যেও তার সংকল্প ছিল অটুট। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাদের কাছে অতি প্রিয় নাম জিতেনদা, অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক বিপ্লবী চরিত্র। তাকে আগামী দিনের বংশধরদের নিকট চির ভাস্কর করিয়া রাখিবার দায়িত্ব তার সাথী ও সহকর্মীদের'– কমরেড মণি সিংহ

প্রখ্যাত কৃষক নেতা জীতেন ঘোষ জন্মেছিলেন ১৯০১ সালে। মুন্সিগঞ্জ জেলার কুমারভোগ গ্রামে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিক্রমপুরের স্থান ছিল অনন্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্বে মোঘল সম্রাটাদের বিরুদ্ধে বার ভূঞাদের সংগ্রামের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল এই বিক্রমপুর। প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যগত কারণে বিক্রমপুরের যুবকদের একটা অংশ সংগ্রামী হয়ে উঠতেন। এখানে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য দেশপ্রেমিক বিপ্লবী, যারা দেশে-বিদেশে তাদের ত্যাগ ও বীরত্বের অপূর্ব নিদর্শন রেখেছেন।

মা, বাবা, ভাই-বোনের সাধারণ পরিবারে জিতেন ঘোষ ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। বাল্যকাল সম্পর্কে তিনি লিখেছেন– 'রাজনীতিতে তখনও নাম লিখাইনি। কিন্তু মনে মনে

এদেশে ইংরেজ রাজত্ব পছন্দ করতাম না। একটু অপমান ও লজ্জা বোধ করতাম ইংরেজদের অধীনে আছি বলে' (জেল থেকে জেলে-পৃষ্ঠাঃ ১)। কৈশোরের প্রথম থেকেই তিনি গীতা, চণ্ডী পাঠ করে আত্মিকশক্তি ও সংগ্রামী মনোভাবকে উদ্দীপ্ত করে সাধারণ মানুষকে সেবা করার জন্য সেবাশ্রম ও লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। এখান থেকে তিনি দেশপ্রেমের ভাবধারাকে সহপাঠী তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাকে বিপ্লবীদের একজন মনে করে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। কয়েক দিন আটক রেখে মারধর ও জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়। আগুনে ঘৃতাহুতির মতো, একারণে জিতেন ঘোষের মনে স্বাধীনতার আগুন জ্বলে উঠে।

প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ করার পর তাকে কাজিরপাগলা অভয়কুমার তালুকদার হাই স্কুলে ভর্তি করানো হয়। স্কুলে পড়াশুনাকালীন সময়ে তিনি বিপ্লববাদী দল যুগান্তরের সাথে যুক্ত হন। বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রদেরকে নিয়ে বিপ্লবী গ্রুপ গঠন করেন। ১৯১৭ সালে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর আই. এ ভর্তি হন। এসময়েও তিনি বিপ্লবী দলে কলেজ ছাত্রদের টেনে আনার কাজে যুক্ত থাকেন। ১৯১৯ সালে আই. এ পাশ করার পর ১৯২০ সালে বি. এ ভর্তি হন। ১৯২১ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে কলেজ ত্যাগ করে ওই আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন এবং স্কুল-কলেজের শত শত ছাত্রকে এই অসহযোগ আন্দোলনে শামিল করেন। এই আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে দেড় বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে ঢাকা জেলহাজতে পাঠায়।

তখন জেলখানাগুলোতে দেশপ্রেমিক কয়েদীদের উপর ব্রিটিশ সীমাহীন নির্যাতন চালাত। কয়েদীদের ঘানি টানানো হতো। দুর্গন্ধযুক্ত, পাথর মিশানো ভাত, জঙ্গলের তরিতরকারী ও ছোবলাসহ ডাল ছিল কয়েদীদের খাবার। আর কথায় কথায় দৈহিক নির্যাতন তো রয়েছেই। কিন্তু এর কোনোকিছুই জিতেন ঘোষকে দুর্বল করতে পারেনি। তিনি ইংরেজ জেলের নিয়ম-কানুন পরোয়া করতেন না। এজন্য তাকে বহুবার বেদমভাবে মারধর করা হয়েছে। তবু তার একই কথা তিনি ইংরেজ জেলের নিয়ম-কানুন মানেন না। একদিন তাকে ঘানি টানার জন্য নেয়া হল। তিনি প্রথম থেকেই একাজ করতে অস্বীকৃতি জানান। জেলের কর্মকর্তা তাকে প্রচণ্ড মারধর শুরু করেন। জিতেন ঘোষও হাতের কাছে যা পান তা দিয়ে মার প্রতিরোধ শুরু করলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ পাগলাঘন্টি বাজালো। ততক্ষণাৎ লাঠি, বন্দুকধারী সিপাহীসহ সকলেই মরতে শুরু করে। তার নিজের বিবরণ থেকে বুঝা যাবে সে মারের রূপ কি ছিল।

'চলল মার। উঃ কি দারুণ সে মার'। আমার গা দিয়ে রক্ত বেরুল। নাক দিয়ে রক্ত ছুটল। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে নিয়ে ডিক্রিতে বন্ধ করে দেওয়া হল। আমি মেঝেতেই পড়ে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর জেগে দেখি পানির কলসিটাও নেই। সরানো হয়ে গেছে। একটু পানিও খেতে পেলাম না। ডাক্তার আসাতো দূরের কথা, একফোটা ঔষধও পেলাম না। পানির অভাবে নাক-মুখের রক্তও ধোয়া গেল না। কম্বলটা বেশ করে বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম' (জেল থেকে জেলে, পৃষ্ঠাঃ ১৩)।

এত অত্যাচারের পরও তিনি জেলের নিয়ম-শৃঙ্খলা মানলেন না। এর ফলে সদাসন্ত্রস্ত কয়েদীদের কাছে তিনি হয়ে উঠেন এক অসাধারণ মানুষ এবং দুর্ধর্ষ কয়েদীরা এসে তাকে সেলাম দিতে শুরু করে। কারাগারে একজন কয়েদীর এ ধরণের প্রতিবাদ, দ্রোহ দেখে

সবাই একটু একটু প্রতিবাদী হয়ে উঠতে শুরু করে। এই বৈশিষ্ট্য না থাকলে বন্দীদের জেল জীবনের সম্মান রক্ষার লড়াই করা সম্ভব হতো না।

দেড় বছর কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার পর ছ'মাস পরেই তিনি মুক্তি পান। কিন্তু দুই মাস যেতে না যেতে দু'বছরের সাজা নিয়ে আবার জেলে। এই জেলে তিনি সাক্ষাৎ পান মাদারীপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণদাসের। জেলের ভিতরে বসে ১৯২৩ সালে এম.এন. রায় সম্পাদিত কয়কেটি গোপন পত্রিকা পড়ার সুযোগ পান। তাতে তিনি সমাজতন্ত্রের ধারণা পান। তখন থেকে তার মনে নানাপ্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে। ওই বছর শেষের দিকে তিনি জেল থেকে মুক্তি পান। তারপর ঢাকা শহরে কিছুদিন কাটিয়ে কলকাতা যান। তখন অসহযোগ আন্দোলন গান্ধীজীর নির্দেশে বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষের মনে হতাশা চলে আসলো। একমাত্র কংগ্রেস নেত্রী হেমপ্রভা কিছু কর্মীকে নিয়ে পিকেটিং চালিয়ে যাচ্ছেন। জীতেন ঘোষ এদলে যুক্ত হয়ে ছ'মাসের কারাদণ্ড নিয়ে হুগলি জেলে গেলেন। এখানে তিনি দেখা পেলেন বিপ্লবী যতীন দাসের। যতীন দাস জেলখানার অবিচারের বিরুদ্ধে ৬১ দিন অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন। তার ধারাবাহিকতায় একসময় জীতেন ঘোষ জেলখানার অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। যার ফলে তাকে আবারও নির্মম-নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হল। 'উ: সে কি মার! যেমন অমানুষিক তেমন নির্মম। ঢাকা জেলের মার এর কাছে তুচ্ছ। সুপারিন্টেনডেন সাহেব স্বয়ং সবুট কিক করতে লাগলেন, আমরা যে একটা ফুটবল।.. এসময় ৪/৫ দিনে ডাক্তারের দেখা মিলল না। না পাওয়া গেল এক ফোটা ঔষধ, না একটু ব্যান্ডেজের কাপড়' (জেল থেকে জেলে, পৃষ্ঠা: ৫৮)। 'তারপর আমাকে যে ডিগ্রীতে নেওয়া হল, তা যেমন ছেড়াঁ ছিল তেমনি শেওলাধরা স্যাঁতস্যাঁতে। কম্বল বিছালে তা পর্যন্ত ভিজে যায়। ডিগ্রীতে পা ফেলতেই মনে হয় যেন পানি ঢেলে ভিজিয়ে রেখেছে। রোদ বাতাস কিছুই ঢুকত না। এমন অন্ধকার যে দিনেও কিছু দেখা যেত না।' (জেল থেকে জেলে, পৃষ্ঠা: ৫৯)।

১৯২৪ সালে তিনি মুক্তি পেয়ে কলকাতায় কিছু দিন থাকার পর ঢাকায় চলে আসেন। এর কিছুদিন পর তিনি গ্রামে চলে যান। গ্রামে গেলেও পুলিশের নজরদারি তার উপর ছিল। ফলে বিপ্লবী তৎপরতা চালানো সম্ভব না। আর অন্য দিকে জেলে বসে পচে মরার কোনো মানে দাঁড়ায় না। তাই তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন বার্মায় চলে যাওয়ার, তিনি সেখানে কাজ করবেন। ১৯২৪ সালের শেষের দিকে বিপ্লবী পার্টির সংগঠক হিসেবে বার্মা যান। সেখানে তিনি রেলওয়ের একাউন্টসে চাকুরি নেন। তখন বার্মার অধিবাসী বাঙালিদের ভিতরে গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠে। তিনি সেই বিপ্লবী সংগঠনের শুরু থেকেই একজন উদ্যোগী কর্মী। তারপর তিনিই সেখানকার ওই বিপ্লবী গ্রুপটিকে শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলেন। বার্মার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি হলেন অন্যতম। এছাড়াও তিনি বার্মা অবস্থানকালে বাংলাদেশের বিপ্লবী গ্রুপগুলোর কোনো কোনটার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে সক্ষম হন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সাথে বার্মার বিপ্লবী দলের ভাল সম্পর্ক ছিল। বার্মার এই বিপ্লবী দলটি বহু ত্যাগী ও সাহসী কর্মীর জন্ম দেয়। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শহীদ হন।

১৯৩০ সালে বার্মায় এক কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। এই কৃষক বিদ্রোহে জীতেন ঘোষের বিপ্লবী দল সমর্থন জানায়। বার্মা সরকার এসময় অর্ডিনেন্স জারি করে জীতেন ঘোষসহ কয়েকজন বাঙালি যুবককে গ্রেফতার করে ইনসিন জেলে পাঠায়। কিছুদিন পর তাকে

রেঙগুনের একটি ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠিয়ে দেয়। এখানে তার সাথে দেখা হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী হরিনারায়ন চন্দ্রের সাথে। যিনি ২০ বছর সাজা নিয়ে পাঁচ বছর জেলে রয়েছেন। এ জেলে থাকাবস্থায় বন্ধুদের কাছে জরুরি খবর পেলেন তার একবার ইনসিন জেলে যাওয়া দরকার। কিন্তু গুরুতর অসুস্থতা ছাড়া যাওয়ার উপায় নাই। তাই তিনি নিজেকে প্রচণ্ড অসুস্থ করে তোলেন। কয়েকদিনের মধ্যে রক্ত আমশা, জ্বর, বিছানা ছেড়ে আর উঠতে পারেন না। জেল কর্তৃপক্ষ অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে চিকিৎসার জন্য ইনসিন জেলে পাঠায়। এই স্বেচ্ছাকৃত অসুখ তঁকে মৃত্যু পর্যন্ত বহন করতে হয়েছে। জেলখানার মধ্যে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে আন্দোলন করে মরা শ্রেয়। তাই ইনসিন জেলের অধিকাংশ সহবন্দীদের সাথে আলোচনা করে অনশন শুরু করেন। বেশ কয়েক দিন অনশনের ফলে অনেকে প্রচণ্ডভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারমধ্যে জীতেন ঘোষসহ আরো দু-একজনের বাঁচার কোনো আশা নাই দেখে জেল কর্তৃপক্ষ তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। পনের দিন পর ১৯৩১ সালে তিনি মুক্তি পান।

মুক্তির চারমাস পর তাকে কলকাতা থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ পুলিশ আবার গ্রেফতার করে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠায়। প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পীঠস্থান। এখানে তাকে বিনাবিচারে রাজবন্দী হিসাবে আটক রাখা হয়। এ জেলেই তিনি যুগান্তর, অনুশীলন ও কমিউনিস্ট মতাদর্শের অসংখ্য বিপ্লবীদের সাক্ষাৎ পান। তিনিও ছিলেন যুগান্তর দলের সদস্য। এই জেলে অবস্থানকালে তিনি পুরোপুরি কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করেন। সাত বছর বিনা বিচারে আটক থাকার পর ১৯৩৮ সালে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার ওই বছরই তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন। তারপর তিনি নিজ গ্রামে কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য, কৃষকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিক্রমপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী অনেকেই তখন জীতেন ঘোষের মাধ্যমে কৃষক সংগঠনে যুক্ত হলেন। তারপর তিনি ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠিত করার জন্য কাজ করেন। এসময় তিনি কৃষকদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ সালে পার্টির পূর্ণ সদস্যপদ পান।

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঢাকার কমিউনিস্ট কর্মীরা সারা উপমহাদেশের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করেন। ব্রিটিশ সরকার এই কংগ্রেস কর্মী সম্মেলনের উপর ১৪৪ ধারা জারি করে। সেদিন কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীরা ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে। কমরেড নেপাল নাগ ও নরেশ গুহ, বঙ্গেশ্বর, ফী গুহ, প্রমথ নন্দী, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, জ্ঞান চক্রবর্তী, সুশীল সরকার, জীতেন ঘোষ প্রমুখ এই সম্মেলনের নেতৃত্ব দেন। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন অগ্নিযুগের বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য। এসময় ১৭ জন কমিউনিস্ট নেতার সাথে পুলিশ আবার তাকে গ্রেফতার করে। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে মুক্তি পান। মুক্তির পর তিনি মুন্সিগঞ্জ মহকুমায় ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪২ সালে পুনরায় গ্রেফতার এবং প্রায় এক বছর পর মুক্তি লাভ করেন।

১৯৪৩ সাল ইতিহাসে মন্বান্তর হিসেবে পরিচিত। এই সময় ইংরেজ শাসকদের অবহেলার কারণে সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ মহামারী আকারে দেখা দেয়। গ্রাম-বাংলার আনাহারী মানুষ খাবারের জন্য কলকাতার দিকে ছুটতে থাকে। ওলিতে-গলিতে, রাজপথে-ফুটপাথে অগণিত

মানুষ ক্ষুধার তাড়নায়-যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কাক ও কুকুরের সঙ্গে বুভুক্ষু মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খুঁজে ফিরছে ডাস্টবিনে-নর্দমায়। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টি সারা দেশব্যাপী লঙ্গরখানা খুলে বুভুক্ষু মানুষকে বাঁচানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এই দুর্ভিক্ষ থেকে বিক্রমপুরের মানুষকে বাঁচাতে জীতেন ঘোষ অমানুষিক পরিশ্রম করেন। তিনি দুর্ভিক্ষের সময়ে চাঁদা তুলে বিক্রমপুরে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমপুর তাঁতি ও জেলেদের মধ্যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি গড়ে তোলার ব্যাপারে তার উদ্যোগ ও শ্রম তুলনাহীন।

১৯৪৭ সালে জীতেন ঘোষ ঢাকা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে পাক-পুলিশ তাকে পুনরায় গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। আর কি করার! বরাবরের মতে জেলে নিম্নকর্মচারী ও সহবন্দীদের নিয়ে রাজনৈতিক পড়াশুনার স্কুল চালু করলেন। মানুষের মুক্তি কিসে, কিভাবে এবং এক্ষেত্রে কার কি করণীয় এসব বিষয় নিয়ে নিয়মিত পড়াশুনা হত। জেলের সাধারণ কয়েদীরা তার সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শ গ্রহণ করেন। যারা জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হন। ১৯৫৩ সালের শেষ ভাগে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। এরপর তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যান। সেখানে প্রায় তিন বছর ছিলেন। এখানে তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে মাঝে মধ্যে পার্টির কাজে, কৃষকদের কাজে বের হয়ে পড়তেন। ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্বপাকিস্তান কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে তিনি ঢাকা জেলার শত শত কৃষক প্রতিনিধি দল নিয়ে যোগ দেন। সম্মেলনের পর ঢাকা জেলার কৃষক সমিতি গঠিত হয়। ওই বছর সেপ্টেম্বরে ঢাকায় এক কৃষক সমাবেশের আহ্বান জানায় পূর্বপাকিস্তান কৃষক সমিতি। এই সমাবেশের মাধ্যমে কৃষক সমিতির কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি হন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও সম্পাদক হন জীতেন ঘোষ। অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে গণহারে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকান। এসময় জীতেন ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়। এবার জেলের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু পাক-সরকার তাকে মুক্তি দেয়নি। অবশেষে ১৯৬২ সালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক সংগঠনের কাজে যুক্ত হন। মুন্সিগঞ্জ, বিক্রমপুর, নারায়নগঞ্জ, টুঙ্গিপাড়া, কাপাসিয়াতে বড় বড় কৃষক সম্মেলন সংগঠিত করেন। ১৯৬৩ সালে জীতেন ঘোষ ও হাতেম আলী খান একসঙ্গে ওসমান গনি রোডে কৃষক সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করেন। জীতেন ঘোষ থাকতেন ঢাকা জেলা কৃষক সমিতির অফিসে (১৫৪/এ রেবতী মোহন দাস রোড, সুত্রাপুর)। সন্তোষ গুপ্তও মাঝে মাঝে ঢাকায় এলে কোনো কোনো সময় জীতেনদার সাথে থাকতেন।

১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হযরতবাল মসজিদ থেকে ইসলাম ধর্মের স্মৃতিচিহ্ন চুরি হয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঢাকা ও খুলনাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। যার ফলে ওসমান গনি রোডে কৃষক সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদিন পর তিনি বিক্রমপুরে চলে যান। সেখানে তিনি কৃষকদের নিয়ে রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দাঙ্গা মোকাবেলা করেন। ১৯৬৫ সালের মধ্যে তিনি ঢাকা জেলায় একটি শক্তিশালী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলেন। ওই বছর সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় তাকে আবারও গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৭ সালে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার কিছু দিন পর আবার তাকে জেলে যেতে হয়। কারণ পাকিস্তান সরকার তাকে জেলের বাইরে রেখে স্বস্তি পাচ্ছিল না। ১৯৬৯ সালে গণ অভ্যুত্থানের সময় মুক্তি পান। একই বছর ১৪ এপ্রিল এক প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ঢাকা ও কুমিল্লা জেলায় শত শত লোক মারা যায় এবং ঘরবাড়ি ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শুধু ডেমরাতে ৮০০ লোক মারা যায়। এসময় জীতেন ঘোষ তার কৃষক কর্মীবাহিনী নিয়ে দুর্গতদের মাঝে সাহায্য সামগ্রী নিয়ে চলে যান। দিনের পর দিন মানুষের কাছে খাবার, অর্থ তুলে দুর্গতদের মাঝে বিতরণ করেন। অসংখ্য গৃহহীন মানুষকে গৃহ নির্মাণ করে দেন। এতে করে ওই সমস্ত এলাকায় তার বেশ পরিচিতি গড়ে উঠে। যার ধারাবাহিকতায় তিনি ওই এলাকাগুলোতে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। তার কাজের ফলে ১৯৭০ সালের প্রথমভাগে কতগুলো দাবি নিয়ে সর্বকালের বৃহত্তম শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। আড়াই মাইলব্যাপী এই শোভাযাত্রা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে বস্ত্র, টাকা ও খাদ্য সংগ্রহ করেন। ১৯৭৫ সালে রেকর্ড বর্গার অধীনস্থ আন্দোলন শুরু করেন। হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে এই আন্দোলনে জয়যুক্ত হলে দেশের ১৫ হাজার কৃষক জমির পূর্ণ মালিকানা লাভ করে। এ সময়ে বেশ কিছুদিন তিনি অন্তরালের জীবন যাপন করেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হলে এই সংগঠনের জাতীয় কৃষক লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। জীতেন ঘোষ ছিলেন চিরকুমার। তিনি সারা জীবন কৃষক ও মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন। জেল খেটেছেন যুগের পর যুগ। তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- গারোদের আড়াল থেকে, অগ্নিদিনের বর্মা, জেল থেকে জেলে। জীতেন ঘোষ ১৯৭৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

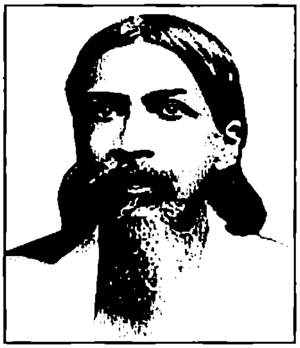
১. কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ– জ্ঞান চক্রবর্তী, প্রকাশক জিতেন ঘোষ কল্যাণ ট্রাষ্টের পক্ষে কাজী আকরাম হোসেন, প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৭৭।

২. জিতেন ঘোষ রচনাসমগ্র– সম্পাদনা আব্দুল হালিম খান ও দিলওয়ার হোসেন, প্রকাশক: রাজন ইসলাম, প্রকাশকাল ২০১০।

৩. বৃটিশবিরোধী বিপ্লবীদের জীবনকথা– তপন কুমার দে, জাগৃতি প্রকাশনী, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

৪. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯।

অরবিন্দ ঘোষ



'স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কারণে ডাকাতি করায় কোনো নৈতিক অপরাধ হয় না।'–অরবিন্দ ঘোষ।

১৯০৬ সাল। বিপ্লবী অগ্নিযুগের যাত্রা বলা চলে। সরাসরি ব্রিটিশ শাসন-শোষণ ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যে প্রতিবাদের শুরুটা করেছিলেন বীর সৈনিক মঙ্গলপাণ্ডে, ১৮৫৭ সালে। তারপর এই উপমহাদেশের মানুষ নানা চড়াই-উৎরাই পার হয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সংঘবদ্ধভাবে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য লড়াই-সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হতে থাকে। অগ্নিযুগের শুরুতে ভারতমাতার অনেক অগ্নিসন্তান ব্রিটিশ শাসন অবসানের জন্য অগ্নিশপথ নিয়েছিলেন।

যার ধারাবাহিকতায় ভারতে বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম ও আন্দোলন গড়ে উঠে এবং যে আন্দোলনের কারণেই মূলত ভারতমাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়।

১৯০৫-০৬ সালের মধ্যে ভারতের সর্বত্র বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন গড়ে ওঠে। বয়কট আন্দোলন ধীরে ধীরে স্বরাজলাভের আন্দোলনে রূপ নিতে শুরু করে। ঠিক এমন সময় বরোদা থেকে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ কলকাতায় চলে আসেন। তিনি বারোদা'র রাজ কলেজে ভাইস-প্রিন্সিপাল হিসেবে চাকুরি করতেন। তখন তার মাইনে ছিল ১৫০০ (পনেরশত) টাকা। এত বড় অংকের মাইনে পরিত্যাগ করে তিনি কলকাতায় এসে অপেক্ষাকৃত কম মাইনেতে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে চাকুরি নেন। এখানে তার বেতন ছিল মাত্র ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা। এর পিছনে মূল কারণ ছিল বরোদা থেকে বিপ্লবী দল পরিচালনা করতে তার খুবই অসুবিধা হচ্ছিল। বারবার কলকাতায় আসা-যাওয়া করে বিপ্লবী কাজ যথা সময়ে সম্পাদন করা যেত না। যদিও অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থাকাকালীন সময় থেকেই কলকাতার বিপ্লবী কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্রাতা বারীন ঘোষকে প্রতিনিয়ত চিঠিপত্র লিখতেন। মাতৃভূমির বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে মেনে নিতে পারছিলেন না অরবিন্দ। তাই ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার জন্য এবং সুবিধামত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও সংগঠিত করার প্রয়োজনে তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

১৯০১ সালে অরবিন্দ ১৫ বছর বয়সী কলকাতার ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী মৃণালিনী দেবীকে হিন্দুশাস্ত্র মতে বিয়ে করেন। তাদের বিবাহিত জীবন ছিল প্রায় ১৭ বছরের। ১৭ বছরের বিবাহিত জীবনে মৃণালিনী দেবী খুব কম সময়ই স্বামীর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। বেশিরভাগ সময় দেশের কাজে ব্যস্ত থাকায় অরবিন্দ স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে।

অরবিন্দ দেশের কাজে কবে কোথায় থাকতেন, তার কোনও ঠিক ছিল না। স্ত্রী মৃণালিনী দেবী স্বামীর সান্নিধ্য না পাওয়ায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তেন। অরবিন্দ তার অবস্থা চিঠির মাধ্যমে পরিষ্কার করে দিয়ে লিখেছিলেন, 'আবার বলি, তুমি একজন সাধারণ লোকের স্ত্রী হও নাই, তোমার বিশেষ ধৈর্য ও শক্ততার দরকার। এমন সময়ও আসিতে পারে যখন একমাস কিংবা দেড়মাস নয়, ছমাস পর্যন্তও আমার কোন খবর পাইবে না। এখন থেকে একটু শক্ত হইতে শিখিতে হয়, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে।'

১৯০২ সালে বারীন্দ্র কুমার ঘোষ লন্ডন থেকে কলকাতায় আসেন। কলকাতার এসে তিনি ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহের বহ্নি ছড়াতে থাকেন। কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোকেরা মোটেই সাড়া দেয়নি। বিফল হয়ে তিনি বরোদায় বড়দাদা অরবিন্দ ঘোষের নিকট যান। বারীন্দ্র বরোদায় বসে অনুধাবন করেন, রাজনীতিতে ধর্মের সঙ্গে একীভূত না করলে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজ হবে না। এজন্য তিনি গীতা পাঠের সঙ্গে রাজনীতির পাঠ দেবার উদ্দেশ্যে অনুশীলন সমিতির পরিকল্পনা করেন ও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে থাকেন।

কলকাতায় আসার পর অরবিন্দের অনুপ্রেরণায় ও তার ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নেতৃত্বে কলকাতার ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরে তৈরি হয় সশস্ত্র বিপ্লবী অনুশীলন সমিতি (দল)। ৩২ নম্বর মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়িটি ছিল বারীন ঘোষদের পৈত্রিক সম্পত্তি। সশস্ত্র বিপ্লবী নেতা বারীন ঘোষ তার দলের আখড়া গড়েছিলেন এই মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িতে। এই বাগানবাড়ির মাঝখানে ছিল ছোট ধরনের একটি পাকাবাড়ি। বাড়িটির চতুর্দিকে ছিল গাছপালা। দাদা অরবিন্দ ঘোষ এবং অপর দুই ভাই মনোমোহন ঘোষ ও বিনয় ঘোষ এই বাগানবাড়িটিতে বসবাস করতেন। বারীন ঘোষের দাদা অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বিপ্লবীদের শ্রদ্ধেয় নেতা ও স্বদেশি কাগজ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক। তার সঙ্গে পরামর্শ করেই বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, হেমচন্দ্র ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য'র মতো বিপ্লবী নেতৃত্ব দলের নীতি নির্ধারণ করতেন। এক সময় ওই ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়িটি হয়ে উঠে সশস্ত্র বিপ্লবীদের মূল কেন্দ্র।

১৯০৩ সালে কলকাতায় প্রমথ মিত্র ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রথমে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রমথ মিত্র ১৯০৫ সালে বিপিন চন্দ্র পালের সঙ্গে ঢাকায় এসে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা স্থাপন করেন এবং ঢাকা অনুশীলন সমিতির দায়িত্ব পড়ে পুলীন বিহারী দাসের উপর। এই সমিতির কেন্দ্র ছিল ঢাকার ওয়ারিতে। বহু দেশপ্রেমিক যুবক স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন এই বিপ্লবী অনুশীলন দলে। দলের সদস্যরা বিদেশি শাসকের বুকে আঘাত হানতে লাঠি খেলা, ছোরা ও আগ্নেয়াস্ত্র চালানোর শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। সন্ত্রাসবাদীদের দ্বিতীয় দল 'যুগান্তর' সমিতির জন্ম হয় ১৯০৬ খৃস্টাব্দের দিকে কলকাতায়। অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র ঘোষ 'যুগান্তর' সমিতি পরিচালনা করেন।

১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল ছিল বাংলাদেশে বিপ্লবের বাণী প্রচারের অধ্যায়। এই সময়েই প্রকাশিত হতে থাকে সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম, যুগান্তর প্রভৃতি পত্রিকা। সখারাম গণেশ দেউস্কর,

পি মিত্র, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নানা তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বিপ্লবী যুবকদের শিক্ষাদান পর্ব চলে। ১৯০৪ সালে অরবিন্দ ঘোষ আবার বাংলাদেশে আসেন। তখন তার ভ্রাতা বারীন ঘোষ অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন।

১৯০৫ সালে কার্জন সাহেবের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা সমগ্র বঙ্গদেশকেই আলোড়িত করে তোলে। বিক্ষুব্ধ বঙ্গবাসীরা বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। ১৯০৬ সালে অরবিন্দ স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাসের জন্য আসেন এবং বঙ্গবাসীকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করার অভিযান শুরু করেন। এই সময়ে বারুইপুরে ও উত্তরপাড়ায় তার জ্বালাময়ী ভাষণ ইতিহাস হয়ে রয়েছে। ভগিনী নিবেদিতাও তখন বিপ্লববাদী যুবকদের সাহায্য করতে থাকেন। এই সময়ে বিপ্লববাদীদের প্রচারের ধারার নিদর্শন হিসাবে ১৯০৬ সালের একটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলার বিপ্লবীদের মুখপত্র 'যুগান্তর' ১৯০৬ সালে বরিশালে ব্রিটিশ শাসকদের নিষ্ঠুর দমনপীড়নের পর ২৬ এপ্রিল সম্পাদকীয়তে খোলাখুলি লিখল:

'দেশের ৩০ কোটি মানুষ যদি তাদের ৬০ কোটি হাত প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞায় তুলে ধরে তবেই বন্ধ হবে এ অত্যাচার। একমাত্র শক্তি দিয়েই শক্তির প্রকাশকে স্তব্ধ করা সম্ভব।'

ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য বাংলার যুবকেরা তখন জেগে উঠেছে। যেখানেই ইংরেজের অত্যাচার দেখছে সেখানেই তারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

এই প্রতিবাদের জন্য তারা নির্যাতিত হতে থাকে। নির্যাতনের প্রতিবাদে বাঙলার দিকে দিকে বিক্ষোভ দানা বেধে ওঠে। এই বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দেবার জন্য অরবিন্দের বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত যুবকরা সংঘবদ্ধ হন। ব্রিটিশ শাসকদের নির্যাতন যতই বাড়তে থাকল, বাংলাদেশে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের বিষয়টি ততই প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। ঝামাপুকুর ও মানিকতলায় বোমা তৈরির কেন্দ্র গড়ার প্রচেষ্টা চলল। বিপ্লবের এই গোপন আয়োজন ক্রমে ক্রমে মেদিনীপুর, চন্দননগর, কৃষ্ণনগর, শ্রীহট্ট, বগুড়া, রংপুর, বরিশাল, ঢাকাতেও ছড়িয়ে পড়ল। অনুশীলন সমিতির শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে উঠলো ঢাকায়।

১৯০৫ সালে অরবিন্দ বরোদা থেকে একটা চিঠি লিখেছিলেন স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে। চিঠির একাংশে লিখেছিলেন, 'তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না তার সঙ্গেই ছুটিবে, পাগলের উপযুক্ত পাগলি হইবার চেষ্টা করিবে? অন্ধ রাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পড়িয়া থাক, তবে তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই, শেষোক্ত পথই তুমি ধরিবে।'

এই চিঠিটিরই অপর অংশে তিনি লিখেছিলেন, 'আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তবোধে আহার করিতে বসে? স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে? না, মাকে উদ্ধার করিতে পৌরোহিত্য করে?'

অরবিন্দ ঘোষ জন্মেছিলেন ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট, কলকাতায়। তার পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ এবং মাতামহ রাজনারায়ন বসু। ছোটবেলায় অরবিন্দ ঘোষ সেন্টপলস্ স্কুলে পড়াশুনা করেন। সেন্টপলস্ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক লেখাপড়া শেষ করেন। তারপর তিনি পড়াশুনা করার জন্য ইংল্যান্ডে যান। ইংল্যান্ডে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ফার্স্ট-ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিলেন। আই. সি. এস'র সব পরীক্ষায় ভালো ফল করা সত্ত্বেও একটি

পরীক্ষায় ভালো ফল করতে না পারায় তিনি আই. সি. এস হতে পারেননি। চৌদ্দ বছর বয়স (১৮৮৬) থেকে তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে থাকেন এবং আঠারো বছর বয়সে পৌঁছানোর মধ্যেই তার মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়ে ওঠে যে, ব্রিটিশ শাসনের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তি বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হবে।

ছাত্র জীবন থেকে তিনি ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। ফরাসি বিপ্লবের নেতা দাঁন্তে এবং রোবসপিয়ার তার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, পিটিশনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না, বিপ্লবের মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। ইংল্যান্ডে থাকার সময় তিনি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

অরবিন্দ কলকাতায় ফিরে স্বদেশি ইংরেজি দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশ করতে লাগলেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বিপ্লবী যুবকদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। পত্রিকার শীর্ষে লেখা থাকত 'বন্দেমাতরম্'। 'বন্দেমাতরম্' দৈনিক পত্রিকাটির ১৯০৭ সালে দাম ছিল এক পয়সা।

অরবিন্দ ঘোষের সাথে যোগাযোগ ছিল 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের। এই স্বদেশি পত্রিকাগুলির মূলমন্ত্র ছিল, বিদেশিদের হাত থেকে যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া। সশস্ত্র বিপ্লবীরা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন এই স্বদেশি পত্রিকায় প্রকাশিত জ্বালাময়ী নিবন্ধ পড়ে। বিপ্লবী যুবকরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে বিভিন্ন জায়গায় তাদের বিপ্লবী আখড়া গড়ে তুলেছিলেন।

রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৯০৭ সালে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করল ইংরেজ প্রশাসন। আসামি করে, গ্রেফতার করা হল অরবিন্দ ঘোষ, হেমেচন্দ্রনাথ বাগচি ও অপূর্বকৃষ্ণ বোসকে। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন হেমেচন্দ্রনাথ বাগচি আর অপূর্বকৃষ্ণ বোস ছিলেন পত্রিকার মুদ্রাকর।

সে সময় কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মি. কিংসফোর্ড। অভিযুক্ত আসামি তিনজনকে তোলা হয়েছিল মি. কিংসফোর্ডের আদালতের আসামির কাঠগড়ায়। সাক্ষ্যসাবুদ নেওয়া হয়েছিল ১৯০৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। কীভাবে যেন মামলাটির নামকরণ হয়ে গিয়েছিল 'বন্দেমাতরম্ মামলা'। প্রমাণাভাবে মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল অরবিন্দ ঘোষ ও হেমেন্দ্রনাথ বাগচিকে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ধারায় দণ্ডিত করা হয়েছিল অপূর্বকৃষ্ণ বোসকে।

'বন্দেমাতরম্' মামলায় সরকার পক্ষ থেকে সাক্ষী মানা হয়েছিল বিপিনচন্দ্র পালকে। সে মতে চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রের কিংসফোর্ড সাহেব বিপিনচন্দ্র পালের নামে সমন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্র পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় আদালত অবমাননা করার জন্য তাকে ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

মি. কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে যখন 'বন্দেমাতরম্' মামলাটির শুনানি চলছিল তখন একদিন ১৪/১৫ বছরের বালক সুশীল সেন আদালত কক্ষে দাঁড়িয়ে আওয়াজ তুলেছিল, 'বন্দেমাতরম্! বন্দেমাতরম।'

'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে নির্দয় কিংসফোর্ড সাহেব বালক সুশীল সেনকে ১৫ ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এক দেশপ্রেমিক বালককে বেত্রদণ্ড দেওয়ায় বিপ্লবীরা ক্রোধে ফুঁসে উঠেছিলেন। এঘটনায় শুধু ভারতবাসী নয়, অনেক ইংরেজও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এই ঘটনায় বিপ্লবীরা ক্ষুব্ধ হয়ে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই হত্যার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী।

ব্রিটিশ প্রশাসকেরা বুঝেতে পারলেন মজফ্ফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে পাঠানো হয়েছিল কলকাতা থেকে। তাই কলকাতার পুলিশ প্রশাসন আর অপেক্ষা না করে বিপ্লবীদের ডেরাগুলিতে হানা দিল। তল্লাসী শুরু হল ব্যাপকভাবে। পুলিশের কাছে আগের থেকেই অনেক গুপ্ত খবর ছিল। গুপ্তচরদের মাধ্যমে সশস্ত্র বিপ্লবীদের গতিবিধি লক্ষ্য করে যাচ্ছিল ব্রিটিশ প্রশাসন।

১৯০৮ সাল। ২ মে কলকাতার ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিশ আটটি জায়গায় খানা-তল্লাশি চালায়। মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত ও নলিনীকান্ত গুপ্তসহ ১৪ জনকে। ৪৮ নম্বর গ্রে স্ট্রিট থেকে অরবিন্দসহ তিনজনকে, ১৩৪ নম্বর হ্যারিসন রোড থেকে ৫ জনকে, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট থেকে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে কানাইলাল দত্তসহ দুইজনকে। ১৩৪ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়ি থেকে পুলিশ প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈরির মাল-মশলা ও সাজসরঞ্জাম উদ্ধার করল। এ ছাড়াও পুলিশ ৩২ নম্বর মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ি থেকে মাটির তলায় পোঁতা কতিপয় ট্রাঙ্ক উদ্ধার করে। এই টাঙ্কগুলি থেকে পাওয়া যায় বেশ কিছু তাজা বোমা, কতকগুলি বোমা তৈরির খোল, বৈপ্লবিক পুস্তক-পুস্তিকা ও চিঠিপত্র। কিছু ডিনামাইট ও একটি রিভলবারও পাওয়া গিয়েছিল।

এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় বোমা ষড়যন্ত্রের ও রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা। এই মামলাটিরই নামকরণ হয়েছিল 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা'। মোট ৩৭ জন অভিযুক্ত আসামিকে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয়।

অচিরেই দেশের সাধারণ মানুষ জানতে পারলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, নির্মল রায়, কবিরাজ ধরণীধর গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অশোক নন্দী, কানাইলাল দত্ত, ইন্দুভূষণ সরকার, শচীন সেন, কুঞ্জলাল সাহা প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃত্ব রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। স্বাধীনতা-পিপাসু মানুষ এই সব দেশবরেণ্য মানুষের গ্রেফতারের কথা জেনে ক্ষেপে উঠলেন বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিরোষ আরও গভীর হল। দিকে দিকে আওয়াজ উঠল 'বন্দেমাতরম্'। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

আলিপুর জজ আদালতে জেলা ও দায়রা জজ মি. চার্লস পোর্টেন বিচক্রফট্-এর আদালতে মুরারীপুকুর বোমা মামলার সূচনা হয়েছিল। ১৯০৮ সালের ১৯ অক্টোবর।

মামলায় অরবিন্দ ঘোষের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। এই মামলা একমাত্র চিত্তরঞ্জন দাশ বিনা টাকায় লড়েন। তখন তার মাসিক আয় ছিল পাঁচ হাজার টাকা। আর এই মামলা পরিচালনা করতে তাকে চল্লিশ হাজার টাকা দেনা করতে হয়েছিল। অরবিন্দের বিরুদ্ধে এই মামলা চলে ১২৬ দিন। দু'শর বেশি সাক্ষীকে জেরা করা হয়। ৪০০০

কাগজপত্র এবং ৫০০ জিনিসপত্র প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয়। চিত্তরঞ্জন দাশ তার সওয়াল জওয়াবের পরিসমাপ্তি বক্তব্য দেন ৯ দিন ধরে। এই মামলায় তিনি যে সওয়াল করেছিলেন তা জ্ঞান ও দেশপ্রেমের অপূর্ব নিদর্শন। বিচারের রায়ে অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পান। আর এই পর্যন্তই তার বিপ্লবী জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিচার চলাকালীন সময়ে আরবিন্দ ঘোষ এক বছর ছিলেন নির্জন কারাগারে বন্দী। এই নির্জন বন্দীদশা তার জীবনকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছিল। যোগ আর তপস্যার একাগ্রতার মধ্য দিয়ে অরবিন্দ ঘোষ বন্দীদশায় সময় কাটছিল। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ রূপান্তরিত হলেন সাধক অরবিন্দ রূপে।

যদিও মুক্তি পেয়েও অরবিন্দ দেশসেবার ব্রত থেকে বিচ্যুত হননি। তবে ধর্মপথে দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করেন। তার লেখনীতে তখন শুধু জাতীয়তার বাণীই থাকত না, আধ্যাত্মিক তত্ত্বও থাকত। কিন্তু সে সময়ে হঠাৎ জানা গেল যে ব্রিটিশ সরকার তাকে পুনরায় গ্রেফতার করার চক্রান্ত করছে। কলকাতার নানা পরিচিত লোকের বাড়িতে অরবিন্দ আত্মগোপন করে থাকতে লাগলেন। ভগিনী নিবেদিতার বাড়িতেও রইলেন একদিন। শেষে নিবেদিতাই তাকে চন্দননগরে চলে যাবার সুযোগ করে দেবার জন্য গঙ্গায় একটি নৌকায় তুলে দিলেন। তখন চন্দননগর ছিল ফরাসী অধিকৃত এলাকা। সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন পণ্ডিচেরীতে। সেটাও ছিল ফরাসী অধিকৃত রাজ্য। ১৯১০ সালের ৪ এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে যান। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অরবিন্দ সেখানে ছিলেন।

অরবিন্দের পণ্ডিচেরী জীবন-যোগ সাধনার জীবন। সেখানে তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে দীর্ঘ চল্লিশ বছর সাধনা করে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন ও অমৃতময় জীবনের সন্ধান পান।

অরবিন্দের সাধনায় আকৃষ্ট হয়ে দেশি বিদেশি বহু ব্যক্তি তাকে দর্শন করতে ও তার আশ্রম পরিদর্শন করতে যেতেন। অনেকে স্থায়ীভাবে সেখানে বাসও করছেন। তাদের মধ্যে কেউ এখনো জীবিত কেউ বা মৃত। এদের মধ্যে মীরা রিচার্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিই শ্রীমা নামে পরিচিত হয়ে উঠেন।

অরবিন্দ পণ্ডিচেরী আশ্রমে সাধনায় বসার পর বাইরের কোন লোক তার দর্শন পেতেন না। শেষ দিকে বছরে তিন দিন মাত্র তিনি জনসাধারণকে দর্শন দিতেন। ১৯৫০ সালের ২৪ নভেম্বর তিনি তার ভক্তদের জীবনের শেষ দর্শন দিয়ে যান। তারপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

রচিত গ্রন্থ

অরবিন্দ ঘোষের রচিত ৩২ টি গ্রন্থের মধ্যে বাংলা গ্রন্থের সংখ্যা ৬টি। তার উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ:

The Life Divine
Essays on Gita
Savitri, Mother India
The Hero and the Nymph Urvasie
Song of Myrtilla and other Poems
The age of Kalidasa
A System of National Education

The Renaissance in India
Speeches of Aurobinda

বাংলা গ্রন্থ:
কারাকাহিনী
ধর্ম ও জাতীয়তা
অরবিন্দের পত্র

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:
১. অগ্নিযুগে বোমা ষড়যন্ত্রে অরবিন্দ– চিন্ময় চৌধুরী, পুনশ্চ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল ১৯৯৯।
২. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জীবন ও কর্ম– রচনা সম্পাদনা, অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারী, মনির হোসাইন মনি, নাসিমা খাতুন, জান্নাতুল ফেরদৌসি স্নিগ্ধা, প্রকাশক– দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গবেষণা পরিষদ, প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০০।
৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রকাশকাল ১৯৯০, কলকাতা।
৪. আমি সুভাষ বলছি– শ্রীশৈলেশ দে, রবীন্দ্র লাইব্রেরি, কলকাতা, প্রকাশকাল: রথযাত্রা-প্রথম খণ্ড ১৩৮১, রথযাত্রা- দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৮৪, রথযাত্রা- তৃতীয় খণ্ড ১৩৮৯।
৫. শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষীর কথা– সম্পাদনা-মাহফুজ উল্লাহ, প্রভাত প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশকাল ১৯৯৭।
৬. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি কলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৯।
ছবির তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া

গণেশ ঘোষ



বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, বিপ্লবী সূর্যসেনের অন্যতম সহযোদ্ধা। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের ফিল্ড মার্শাল কমান্ডার। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্যসেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিপ্লবী গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করার পর বিপ্লবীরা ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের পতাকা উত্তোলন করেন এবং মাস্টারদা সূর্যসেনকে রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করে অস্থায়ী গণতন্ত্রী বিপ্লবী সরকারের ঘোষণা দেন।

ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, সে ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের মাস্টারদা সূর্যসেনের বিপ্লবী দল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। চট্টগ্রামের যে সকল কিংবদন্তী বিপ্লবীর নাম সর্বজন স্বীকৃত তাদের মধ্যে গণেশ ঘোষ একজন অন্যতম বিপ্লবী।

বিপ্লবী গণেশ ঘোষ জন্মেছিলেন ১৯০০ সালের ২২ জুন। বাংলাদেশের যশোহর জেলার বিনোদপুর গ্রামে। বাবা বিপিনবিহারী ঘোষ ছিলেন চট্টগ্রামের রেলকর্মচারী। পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে তার বাবা তাকে চট্টগ্রামের মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। দুরন্ত চঞ্চল মেধাবী এই বালক পড়াশুনায় ভাল, খেলাধুলাতেও মন্দ না দেখে স্কুলের মাষ্টাররা বেশ পছন্দ করতেন। সহপাঠীরা তাকে ভালবাসতেন। এই স্কুলে পড়াশুনাকালে গণেশ ঘোষের সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনন্ত সিংহ। আর এই অনন্ত সিং এর মাধ্যমেই মাস্টারদা সূর্যসেনের সংস্পর্শে আসেন গণেশ ঘোষ। আরো পরিষ্কার করে বললে তার রাজনৈতিক জীবনের একেবারে শুরুর হাতেখড়ি মূলত বন্ধু অনন্ত সিংহ এর কাছে। যে বন্ধুটিকে স্বাধীনতার সশস্ত্র আন্দোলনে সবসময় পাশে পেয়েছেন। খুব অল্প বয়সে তিনি ভারতমাতাকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সেই সময় থেকে শুরু হয় তার বিপ্লবী দলের কঠোর নিয়মানুবর্তী জীবনযাপন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে বিপ্লবীদের সাংগঠনিক শক্তি মতাদর্শিক পার্থক্যের কারণে চারুবিকাশ দত্ত তার সঙ্গীদের নিয়ে 'অনুশীলন' দলে যোগ দেন। এর কিছুদিন পর সূর্যসেন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ 'যুগান্তর' দল গঠন করেন। এই বিপ্লবী দলের সভাপতি হন সূর্যসেন, সহ-সভাপতি অম্বিকা চক্রবর্তী, শহর সংগঠক গনেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ এবং গ্রাম সংগঠক হন নির্মল সেন। এদলে পরবর্তীতে লোকনাথ বলকে যুক্ত করা হয়।

১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেস নন-ভায়োলেন্স নন-কোঅপারেশন বা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করে। অন্যদিকে মুসলীম লীগ খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। গান্ধী ভারতের সশস্ত্র বিপ্লববাদী সংগঠনগুলোকে তাদের কর্মকাণ্ড এক বছরের জন্য স্থগিত রেখে অসহযোগ আন্দোলনে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানালেন। এ অসহযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি 'স্বরাজ' এনে দেওয়ারও আশ্বাস দিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করার উদ্দেশ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও গান্ধীর প্রস্তাব মেনে নিয়ে এই আবেদন সাড়া দিতে বলেন। যে কারণে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে শামিল হন। তিন বছর ধরে চলা এ গণআন্দোলনে যুক্ত ছিলেন গণেশ ঘোষ।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সমগ্র দেশ জুড়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বয়কটের ডাক দিলে গণেশ ঘোষ মিউনিসিপ্যাল স্কুলেও শিক্ষা বয়কটে উদ্যোগী হন। তার নেতৃত্বে ওই স্কুলের প্রায় সকল ছাত্রছাত্রী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বয়কট করেন। এছাড়াও তিনি চট্টগ্রামে বার্মা অয়েল কোম্পানির ধর্মঘট, স্টিমার কোম্পানির ধর্মঘট ও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট প্রভৃতিতেও নেতৃত্ব প্রদানে ভূমিকা রাখেন।

মেট্রিক পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতায় পড়তে যেতে রাজি ছিলেন না, কারণ বিপ্লবী দলের কার্যক্রমের প্রতি তার একনিষ্ঠতা। অবশেষে মাষ্টারদা সূর্যসেনের সিদ্ধান্তে ১৯২২ সালে তিনি কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে (যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ) ভর্তি হন। এখানে এসে তিনি বিপ্লবী দলের কাজে যুক্ত থাকার পাশাপাশি ছাত্রদের নিয়ে বিপ্লবী গ্রুপ গঠনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পড়াশুনাকালীন ১৯২৩ সালে মানিকতলা বোমার মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিছুদিন জেলে থাকার পর প্রমাণাভাবে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন প্রমুখের নেতৃত্বে বাটালি পাহাড় এলাকায় রেলের টাকা ডাকাতির সময় কোনো গুলি চালানো হয়নি। কারণ ডাকাতি করতে গিয়ে কাউকে আহত করা যাবে না– এমনটাই ছিল মাস্টারদার নির্দেশ। তার নির্দেশে অম্বিকা চক্রবর্তী ও দলিলুর রহমান রেল ডাকাতির সতের হাজার টাকা নিয়ে চলে গেলেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য অস্ত্র কেনা।

বেশ কয়েক দিন পর পুলিশ গোপন বৈঠকের খবর পেয়ে বিপ্লবীদের আস্তানায় হানা দেয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ নাগরখানা পাহাড়খণ্ড যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধের পর সূর্যসেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী ধরা পড়েন। কিন্তু মামলায় তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারায় তারা ছাড়া পান। এসমস্ত ঘটনার রেশ ধরে পুলিশ একের পর এক বিপ্লবীদের গ্রেফতার করে। গ্রেফতার করার পর বিপ্লবীদের উপর চালানো হয় চরম নির্যাতন। এই কারণে বিপ্লবীরা কলকাতা পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। পরিকল্পনার কথা পুলিশ জানতে পারে। এজন্য 'ভারত রক্ষা আইনে' ২৫ অক্টোবর ১৯২৪ সালে গ্রেফতার হন গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহসহ আরো কয়েকজন। এসময় গণেশ ঘোষ চার বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন কারাগারে কারারুদ্ধ থাকেন। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে মুক্তিলাভ করেন।

১৯২৪ সালে ভারত উপমহাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন। ভারত জুড়ে বিপ্লবীরা গড়ে তোলে সশস্ত্র সংগ্রাম। ধীরে ধীরে সর্বত্র সংগঠিত হতে থাকে

স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা। সংগঠিত হয় একের পর এক জায়গায় রাজনৈতিক ডাকাতি, চট্টগ্রামে রেলওয়ে ডাকাতি। বিপ্লববাদীদের এই ধরনের সশস্ত্র কার্যকলাপের কারণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদে ব্রিটিশ '১ নং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' নামে এক জরুরি আইন পাশ করে। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল– 'রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য সন্দেহভাজনদের বিনা বিচারে আটক রাখা'।

১৯২৮ সালে কলকাতায় সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গণেশ ঘোষ প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর চরিত্র ছিল সামরিক। 'হিন্দুস্থান সেবক দল' নামে আরেকটি বাহিনী সেসময় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে দলের সাথে এ দলের পার্থক্য হল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনীতে নারী ও পুরুষ বিপ্লবী ছিল। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনীকে সামরিক মানসিকতায় শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং স্বাধীনতার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা হয়। গণেশ ঘোষ বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বাহিনীর জি. ও. সি মনোনীত হন।

কলকাতা কংগ্রেসের পর গণেশ ঘোষ চট্টগ্রামে চলে আসেন। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে ছাত্র, যুব ও নারী সমন্বিত এক জনসংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হন। আর সূর্যসেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সূর্যসেন পাঁচজন বিপ্লবীকে (মাস্টারদা নিজে, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ) নিয়ে বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন। তাদের মধ্যে গণেশ ঘোষ ছিলেন অন্যতম। এই পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাস্টারদা সূর্যসেনের দলের নাম রাখা হয় 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চট্টগ্রাম শাখা'। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক স্বাধীন বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠনের দুঃসাহসী পরিকল্পনা নেয় এই বিপ্লবী পরিষদ। সেই পরিকল্পনা অনুসারে একটি বিপ্লবী বাহিনী গঠন করার কাজ শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে এই দলে যুক্ত হন নির্মল সেন, ধীরেন চক্রবর্তী, উপেন চক্রবর্তী, নগেন সেন, বিনয় সেন, মধু দত্ত, রাজেন দে, লোকনাথ বলসহ আরো অনেকে। ওই সময় পর্যন্ত দলে কোনো মেয়ে সদস্য ছিল না। সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান, সাহসী যুবক ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদেরই নেয়া হতো এই বিপ্লবী দলে। বিপ্লবীদের নানাভাবে যাচাই-বাছাইয়ের পর এই দলে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নিয়মিত প্যারেড ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা চলতে থাকে এবং অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ইত্যাদিও সংগৃহীত হতে থাকে। প্রায় ৫০ হাজার টাকাও সংগৃহীত হয়ে যায়। বিপ্লবীদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সূর্যসেনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আইরিশ বিপ্লবীদের 'ইস্টার বিদ্রোহের' স্মৃতি বিজড়িত 'গুডফ্রাইডের' দিনে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাত দশটায় চট্টগ্রামে বিপ্লবীদের অত্যন্ত সুপরিকল্পিত অভিযান শুরু হবে।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের বিভিন্ন অস্ত্রাগার দখলের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। গণেশ ঘোষ ছিলেন এই অভিযানের ফিল্ড মার্শাল। রাত দশটা পনের মিনিটে বিপ্লবী দল আঘাত হানে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করেন। বিপ্লবীরা একের পর এক অতর্কিত আক্রমণ করে সরকারি অস্ত্রাগার, টেলিফোন কেন্দ্র, টেলিগ্রাফ ভবনসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয়। যা ছিল দেড়শত বছরের ইতিহাসে ইংরেজদের জন্য খুবই অপমানজনক ঘটনা। সরাসরি ইংরেজ বাহিনীর প্রথম পরাজয়।

১৯ এপ্রিল সকাল বেলা অগ্নিদগ্ধ তরুণ বিপ্লবী হিমাংশু সেনকে নিয়ে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত শহরে আসেন। ওই দিন বিকেল বেলা গণেশ ঘোষের পিতার 'স্বদেশি বস্ত্রাভাণ্ডারে' তল্লাসী চালিয়ে অস্ত্রাগার দখলের কর্মসূচির 'মবিলাইজেশন' লিস্ট পায়। কিন্তু ওই তালিকায় বিপ্লবীদের ডাক নাম থাকাতে পুলিশ তেমন কাউকে চিনতে পারল না। তাই পুলিশ ওই অঞ্চলের প্রায় সকলের বাড়ি তল্লাসী চালায় এবং অনেক পরিবারের লোকজনকে ধরে মারধর করে। সারারাত অভিযানের ফলে সবাই ক্ষুধার্ত। তাই কিছু পেটে দেওয়ার জন্য আনন্দ গুপ্তের পেরেডের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে টিলার উপর বাসায় গিয়ে উঠার কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ অন্য দুই সাথীকে নিয়ে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে আনন্দ গুপ্তের বাসার পিছন থেকে দেবপাহাড়ের জঙ্গলে চলে যান। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর তারা শহরের দক্ষিণ দিকে ফিরিঙ্গিবাজারের কাছে বিপ্লবী রজত সেনের বাবার বাসায় গিয়ে উঠেন। রজতের মা তাদের আশ্রয় দেন। তিনি রজতের খোঁজ নিলে গণেশ ঘোষ জানান সে মাস্টারদা'র সঙ্গে আছেন। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার পর তারা বিশ্রাম নিচ্ছেন, এমন সময় ওই বড়িতে তল্লাসী চালানোর জন্য পুলিশ আসলো। রজতের মা নিজের ছেলের মতো এই বিপ্লবীদের বাঁচানোর জন্য ঘরের মাচার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। পুলিশ ঘরে প্রবেশ করল। বিপ্লবীরাও রিভলবার নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে। পুলিশ মাকড়শার জাল ও পুরনো ময়লা জড়ানো মাচার দিকে তাকিয়ে ভ্রুক্ষেপ না করে চলে গেল। তারপর বিপ্লবীরা গায়ে ধূলাবালি ও ময়লা মেখে পুরানো ছেঁড়া কাপড় পরে ওখান থেকে দক্ষিণ কাট্টলীতে পূর্ব-পরিচিত এক বিপ্লবীর বাড়িতে গিয়ে উঠেন। ২০ ও ২১ এপ্রিল গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ অনেক চেষ্টা করেও মাস্টারদাসহ অন্য বিপ্লবীদের সাথে মিলিত হতে পারলেন না। অবশেষে তারা সিদ্ধান্ত নেন ২২ এপ্রিল তারা গ্রাম্যচাষী ছদ্মবেশে চট্টগ্রামের বাইরে চলে যাবেন। ওই দিন তারা ট্রেনে করে কলকাতা যাওয়া উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। ফেনী স্টেশনে পৌছালে পুলিশ তাদেরকে ট্রেন থেকে নামিয়ে টিকিট মাষ্টারের ঘরে নিয়ে যায়। পুলিশ তাদের শরীর তল্লাশী করার জন্য হাত দিবেন এমন সময় অনন্ত সিংহের রিভলবার গর্জে উঠে। সেকেন্ডের মধ্যে এক পুলিশ লুটিয়ে পড়ে এবং অন্যদেরকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে গুলি ছুড়তে থাকেন। ততক্ষণে সবাই রিভলবার নিয়ে পুলিশের সাথে লড়তে শুরু করেন। এসময় প্রথমে অনন্ত সিংহ পরে গণেশ ঘোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। আনন্দ গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল মাথায় আঘাত নিয়ে দুই সহযোদ্ধাকে খুঁজতে থাকলেন। অনেক খোঁজাখুজির পর গভীর রাতে গণেশ ঘোষের সাথে দেখা মিলল। তারপর তারা অনন্ত সিংহকে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কোথাও পেলেন না। অবশেষে তারা কলকাতার যুগান্তর অফিসে চলে যেতে সক্ষম হন। অন্যদিকে অনন্ত সিংহ পাগল বেশ ধারণ করে বন্ধুদের খুঁজতে থাকেন। দু'দিন পার হয়ে যাওয়ার পর তিনি তার বাবার এক বন্ধুর সহযোগীতায় কলকাতায় চলে আসেন।

১৮ থেকে ২১ এপ্রিল এই চারদিন চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসন কার্যত অচল ছিল। পরাধীন জাতির ইতিহাসে বিপ্লবীদের এ বিজয় ছিল গৌরবগাঁথা। অন্যদিকে ২২ এপ্রিল ভোর সাড়ে ৪টার মধ্যে চট্টগ্রাম নাজিরহাট শাখা রেললাইনের ঝরঝরিয়া বটতলা স্টেশনে একটি সশস্ত্র ট্রেন এসে থামল। বিপ্লবীদের তখন বুঝতে বাকি রইল না যে তাদের সম্মুখযুদ্ধের ক্ষণ আসন্ন। সকাল বেলা বিপ্লবীরা যখন জালালাবাদ পাহাড়ে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন কয়েকজন কাঠুরিয়া ওই পাহাড়ে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহে যায়। তারা দেখল খাকি পোশাকে

রাইফেলধারী কিছু যুবক সেখানে অবস্থান করছে। তারা দ্রুত লোকালয়ে ফিরে গিয়ে লোকজনের কাছে চমকপ্রদ সংবাদ পরিবেশনের আনন্দে প্রকাশ করে দেয় যে স্বদেশিরা ওই পাহাড়ে আছে। ওই খবর পুলিশের কাছে পৌছলে ঠিক জালালাবাদ পাহাড়ের কাছে এসে মিলিটারি সশস্ত্র রেল গাড়ি (আর্মড ট্রেন) থামে। জালালাবাদ পাহাড়ে তখন বিপ্লবীরা কেউ রাইফেল পরিষ্কার করছে কেউ বা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। গাছের ডালে পাহারারত বিপ্লবীরা দেখতে পায় সামরিক ট্রেনটি কোন স্টেশন না থাকা সত্ত্বেও অদূরে রেল লাইনের উপর থেমে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ গুলির আগাতে সৈন্যদল বিভ্রান্ত হয়ে পিছিয়ে যেতে থাকে। সৈন্যরা এরপর জালালাবাদ পাহাড়ের পূর্ব দিকে ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর লুইসগান বসিয়ে বিপ্লবীদের দিকে গুলিবর্ষণ করে। দেশপ্রেম আর আত্মদানের গভীর আগ্রহে তরুণ বিপ্লবীরা পাহাড়ের বুকের উপর শুয়ে সৈন্যদের লুইসগানের গুলিবর্ষণের জবাব দিচ্ছিল। তিন প্রধান নেতা সূর্যসেন, নির্মল সেন এবং অম্বিকা চক্রবর্তী সঙ্গে থেকে ঘন ঘন তাদের উৎসাহিত করছেন, গুলি এগিয়ে দিচ্ছেন। জীবিত বিপ্লবীরা শহীদদের লাশ পাশাপাশি শুইয়ে রেখে সামরিক কায়দায় শেষ অভিবাদন জানায়। পাহাড়ে সূর্যসেনের নেতৃত্বে কয়েকশত পুলিশ-সেনা বাহিনীর সাথে বিপ্লবীদের সম্মুখযুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর ৮০ জন এবং বিপ্লবী বাহিনীর ১২ জন বিপ্লবী (কিশোর হরিগোপাল বল, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, মতি কানুনগো, পুলিন ঘোষ, জিতেন দাশগুপ্ত, অর্ধেন্দু দস্তিদার এবং মধুসূদন দত্ত) শহীদ হন।

গণেশ ঘোষ ও অপর তিনজন প্রধান বিপ্লবী কলকাতায় পৌঁছানোর পর 'যুগান্তর' দলের নেতাদের সহায়তায় ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা হয়। ১৯৩০ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাতে এক বৃহৎ পুলিশবাহিনী চন্দননগরের বাড়িটি ঘিরে ফেলে। গণেশ ঘোষের পরিচালনায় পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদের এক ভয়ঙ্কর খণ্ডযুদ্ধ হয়। সংঘর্ষে মাখন ঘোষাল নিহত হন। পুলিশ অন্যান্য কয়েকজন বিপ্লবীসহ গণেশ ঘোষকে গ্রেফতার করে। তাদের উপর চলে অসহনীয় নির্যাতন। অবশ্য এরপূর্বেই অনন্ত সিংহ স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দেন। কেন ধরা দেন এবিষয়ে তখন তিনি কাউকে কিছু বলেননি। এমনকি পুলিশকেও নাম পর্যন্ত বলেননি। পুলিশ তাকে সনাক্ত ও বিচার করার জন্য চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেয়। অন্যদিকে গণেশ ঘোষকে গ্রেফতার করার পর কোনো কিছুর স্বীকারোক্তি না করাতে পারায় তাকেও চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুজনে চট্টগাম জেলে দিন কাটাচ্ছেন। ততদিনে ব্রিটিশ 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' মামলার বিচার কার্য শুরু করে।

বিচারকালে গণেশ ঘোষ, কল্পনা দত্ত ও অনন্ত সিংহ জেল ভাঙার এক নতুন পরিকল্পনা করেন। আত্মগোপনকারী মাস্টারদা সূর্যসেনের সঙ্গেও তাদের গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবে পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যায়। স্পেশাল ট্রাইবুনাল গণেশ ঘোষকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করে। ১৯৩২ সালে তাকে আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

১৯৩২-১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি তার বিপ্লবী জীবনের হিসেব-নিকেশ করলেন। ভাবনা-চিন্তা করতে থাকলেন সকল স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের নিয়ে। বিপ্লববাদী পথ নিয়েও ভাবলেন। এ সময় তিনি রাজনৈতিক পড়াশুনাও বাড়ালেন। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে আন্দামান সেলুলার জেলে দুই কমিউনিস্ট নেতা কমরেড আব্দুল হালিম ও সরোজ মুখার্জী রাজবন্দী

হয়ে এলেন। এই দুই বিপ্লবী আন্দামানে বন্দীদের রাজনৈতিক পড়াশুনা ও সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ সম্পর্কে ধারণা দিলেন। বন্দীদের মধ্যে প্রতিদিন গোপনে গোপনে বৈঠক হতো। এভাবে তারা গঠন করলেন কমিউনিস্ট গ্রুপ। যে গ্রুপের মধ্যে যুক্ত হলেন গণেশ ঘোষ।
১৯৩৭ সালে বন্দীদের নূন্যতম বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম আর সেলুলার জেল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরণ অনশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৮ সালের ২৫ জুলাই আমরণ অনশন শুরু হয়। বার বার অনশন এবং প্রথম অনশনের জন্য ৩ জন বিপ্লবীর মৃত্যুর ফলে কিছু দাবিদাওয়া পূরণ হয়। অন্যদিকে অনশনকারীদের সমর্থনে ভারতব্যাপী উত্তাল আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল যুগান্তর, অনুশীলন ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। ফলে ১৯৩৮ সালের ১৯ জানুয়ারি ব্রিটিশ সরকার চাপের মুখে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। কিন্তু গণেশ ঘোষসহ ৩০ জনকে দেশে এনে মুক্তি না দিয়ে আলিপুর, দমদম, প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি কারাগারে পাঠানো হয়। অবশেষে ১৯৪৬ সালে তিনি মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পর তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। আন্দামান সেলুলার জেলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে যেসব বিখ্যাত বিপ্লবীরা বন্দী ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, উল্লাসকর দত্ত, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।
১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। পার্টি নিষিদ্ধ হলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। তিনি তিনবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন (১৯৫২, ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে)। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভাজনের পর তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) নামক নবগঠিত দলে যোগ দেন। এরপর তিনি ১৯৬৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তিনি মাস্টারদা সূর্যসেনের সহকর্মী ও অনুরাগীদের নিয়ে গঠিত 'বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা'র সভাপতিত্বের ভার গ্রহণ করেন।
গণেশ ঘোষ ১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম– পূর্ণেন্দু দস্তিদার, প্রকাশকাল ১৩৭৪ বাংলা, প্রকাশক: চট্টগ্রাম বই ঘর।

২. বাংলার মুক্তি সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টপাধ্যায় ও রাখী চট্টপাধ্যায়, প্রকাশকাল ২০০৫, কলকাতা।

৩. অগ্নিযুগের ইতিহাস– ব্রজেন্দ্রনাথ অর্জুন, প্রকাশক: মুক্তধারা, প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৭৯।

৪. উইকিপিডিয়া।

রাসবিহারী বসু



১৯১১ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লির দরবারে ঘোষণা করেন, ১৯১২ সালে ভারতের সমস্ত প্রভাবশালী ও বিত্তবান ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি শোভাযাত্রা করবেন। ঘোষণা অনুযায়ী ১৯১২ সালের শীত কালে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি কুইন্স গার্ডেন হয়ে চাঁদনীচক দিয়ে দেওয়ান-ই-আমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। রাজ্যের সকল মানুষ এই শোভাযাত্রা দেখছেন। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সস্ত্রীক হাতির পিঠে বসে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পাঠানো ষোড়শী ছদ্মবেশী একটি বালিকা লীলাবতী বড়লাটকে মারার জন্য মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ভবনে বোমা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। অসংখ্য মহিলা সূরম্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ভবনের তৃতীয় তলায় শোভাযাত্রা দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। লীলাবতী চাদর গায়ে মহিলাদের মাঝে মিশে গেলেন। ইতিমধ্যে শোভাযাত্রাটি ভবনের প্রায় নিকটে চলে আসে।

ন্যাশনাল ব্যাংক ভবনের সম্মুখের আরেকটি ভবনে রাসবিহারী বসু সবকিছু সর্তকতার সাথে তীক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং লীলাবতীকে বোমা মারার ইঙ্গিত প্রদানের অপেক্ষায় রয়েছেন। লীলাবতীও রাসবিহারী বসুর ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করছেন। এমন সময় এক মহিলা লীলাবতীকে জিজ্ঞেস করে 'তেরি নাম ক্যা বহিনী?' লীলাবতী রাসবিহারীর দিকে দৃষ্টি রেখে বলেন, 'মেরী নাম লীলাবতী'। ততক্ষণে শোভাযাত্রাটি ভবনের একেবারে নিকটে চলে আসে। রাসবিহারী মহিলাদের দৃষ্টি শোভাযাত্রা অথবা তার দিকে ফেরানোর জন্য জোরে বলে উঠেন, বড় আজব, সামনে দেখ বাহিনী। মহিলারা অন্যদিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি লীলাবতীকে ইঙ্গিত দেন। লীলাবতী তৎক্ষণাৎ বড়লাটকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। প্রচণ্ড শব্দে সবাই এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। পুলিশ আততায়ীকে ধরার জন্য খোঁজ শুরু করে। রাসবিহারী বসু বসন্তকুমার বিশ্বাসকে লীলাবতীর বেশ পরিবর্তন করিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ডেরাডুনে চলে যান। ভাগ্যক্রমে বড়লাট বেঁচে গেলেন, মারা গেল তার একজন চৌকিদার (রাজদরবারের পেয়াদা)।

এই ঘটনার পর ব্রিটিশ পুলিশ এলোপাথাড়ি গ্রেফতার অভিযান চালায়। পুলিশ যাতে রাসবিহারীকে সন্দেহ না করে সে জন্য তিনি ডেরাডুনে গিয়ে বড়লাটের উপর বোমা হামলার নিন্দা জানিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করেন।

রাসবিহারী বসু। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লবীদের একজন অন্যতম বিপ্লবী। ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য তিনি সারা জীবন বিভিন্ন দেশ হতে অস্ত্র, অর্থ সরবরাহ ও বিপ্লবী কর্মী তৈরীর কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিপ্লবী আদর্শ ও কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন।

রাসবিহারী বসুর জন্ম ১৮৮০ সালের ২৫ মে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানের সুবলদহ গ্রামে। বাবা বিনোদবিহারী বসু। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের প্রেসে একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী। তিনি চন্দননগরে বসবাস করতেন আর চাকরি করতেন সিমলায়। এজন্য তাঁকে ছয় মাস কলকাতায় ও ছয় মাস সিমলায় থাকতে হতো। তিনি ছিলেন মানবদরদী ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীদের নানাভাবে তিনি সহযোগিতা করতেন।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর পাঠশালায়। প্রাথমিক পাঠ শেষ করে চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু শৈশবে রাসবিহারী বসুর পড়াশুনার প্রতি তেমন মনোযোগ ছিল না। তবে ইংরেজি-ফার্সী ভাষার প্রতি তার অনুরাগ ছিল। ভারতবর্ষে শুধু ফার্সী ভাষা শিখলে চলবে না, তাই তার বাবা তাঁকে কলিকাতা মটন স্কুলে ভর্তি করান। এই স্কুলে পড়াশুনার সময় তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, খেলাধুলা ও ব্যায়ামের প্রতি আগ্রহী হন। বাল্যকাল থেকে তিনি ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করতেন যা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হত। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে পারেননি। কিন্তু সুন্দরভাবে ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারতেন। স্কুলে পড়াশুনার সময় চন্দননগরের মতিলাল রায়ের সাথে রাসবিহারী বসুর সৌহার্দ্য গড়ে উঠে। বন্ধু মতিলাল রায়ের মাধ্যমে তিনি অরবিন্দ ঘোষের সাথে পরিচিত হন। শ্রী অরবিন্দের সংস্পর্শে তিনি যোগতন্ত্রের (দেশমাতৃকার তরে জীবন উৎসর্গ করা) সন্ধান পান। তখন থেকেই রাসবিহারী বসু দেশমাতৃকার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯০৮ সালে বড়লাটকে মারার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী বোমা নিক্ষেপ করে। এই ঘটনার পর পুলিশ মানিকতলা মুরারীপুকুর উদ্যানে তল্লাশি চালায়। এসময় পুলিশ রাসবিহারীর হাতে লেখা দু'টি চিঠি পায়। ওই বছর রাসবিহারী বসুকে 'আলিপুর বোমা বিস্ফোরণ মামলা'য় গ্রেফতার করে বেশ কিছুদিন কারাগারে রাখা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় তিনি মুক্তি পান। ওই সময় শশীভূষণ রায় চৌধুরী নামে এক দেশপ্রেমিক ডেরাডুনে শিক্ষকতা করতেন। তিনি রাসবিহারীর বিপদ দেখে নিজের চাকরিটি তাঁকে দিয়ে ডেরাডুনে পাঠিয়ে দেন। ডেরাডুনে শিক্ষকতা করার সময় রাসবিহারী বসু বাংলা, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তবে ছুটি পেলেই তিনি চন্দনগরে চলে আসতেন। এই চন্দননগরেই বাল্য বয়সে তার সশস্ত্র বিপ্লববাদী রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল।

বছর দেড়েক শিক্ষকতা করার পর তিনি ডেরাডুনে বন বিভাগের গবেষণাগারে কেরানির চাকরি নেন। ১৯১০ সালে তিনি বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের হেডক্লার্ক হয়েছিলেন। এসময় তিনি গোপনে বিপ্লবীদের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করেন।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা এবং হুগলি জেলার চন্দননগর। চন্দননগরকে গুপ্ত সশস্ত্র কর্মকাণ্ড, আগ্নেয়াস্ত্রের লেনদেন এবং বোমা তৈরির কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। বাইরে তার বেশবাস সরকারি চাকরিজীবী ভদ্রলোকের মতো হলেও গোপনে তিনি ব্রিটিশদের নিদ্রাহরণকারী ভয়ানক বিপ্লবী ছিলেন।

১৯১২ সালে রাসবিহারী বসু দিল্লীতে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যার বর্ণনা শুরুতেই দেয়া হয়েছে। রাসবিহারী বসুর একান্ত অনুগত শিষ্য কিশোর বসন্তকুমার বিশ্বাস লীলাবতীর বেশ ধরে বোমা নিক্ষেপকারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কয়েক মাস পর বসন্ত কুমার বিশ্বাসসহ ১০ জন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। ১৯১৫ সালের ১১ মে ব্রিটিশ সরকার এই মামলায় বসন্ত কুমার বিশ্বাসসহ ৩ জনকে অবৈধভাবে গোলাবারুদ বহনের অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে।

এই ষড়যন্ত্রের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার কারণে মূল পরিকল্পক রাসবিহারী বসুর ওপর ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারিসহ তার মাথার মূল্য ১২ হাজার রুপী পুরস্কার স্বরূপ ঘোষণা করে। অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ তাঁকে ধরতে ব্যর্থ হলে পরে পুরস্কারের অর্থের সঙ্গে আরও ৫ হাজার রুপী যোগ করা হয়। কিন্তু বিপ্লবী রাসবিহারীকে কেউ ধরিয়ে দিতে পারেনি। তিনি এই ঘটনার পর বারাণসী (বেনারস) শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে গুপ্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি বাইরে বেরুতে পারতেন না। কেননা তার ছবিসহ পোস্টার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সর্বত্র।

দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জ-হত্যা পরিকল্পনা ছিল বিপ্লবীদের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের পদক্ষেপ কিন্তু সেটা ব্যর্থ হওয়ার পর দ্বিতীয় সুযোগ তারা খুঁজে পেলেন লাহোরে। বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের গুপ্তদলের সঙ্গে যৌথভাবে ১৯১৩ সালে রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবের ক্যাপ্টেন গর্ডনকে হত্যা করার পরিকল্পনা নেন। এজন্য চন্দননগর হতে কয়েকটি বোমা আনেন। ১৩ মে লাহোরের লরেন্স পার্কে গর্ডন সাহেবের আসার কথা ছিল। রাসবিহারী বসন্তগুপ্ত নামক এক বালককে এই হত্যায় নিয়োজিত করেন। ওই দিন সন্ধ্যার সময় বসন্তগুপ্ত লরেন্স পার্কে সভামঞ্চস্থলের কাছের রাস্তায় একটি বোমা রেখে আসেন। কিন্তু বোমাটি গর্ডন সাহেব চলে যাওয়ার পর বিস্ফোরিত হওয়ার কারণে তিনি বেঁচে যান। এতে মারা যান রাম নামক এক ব্যক্তি।

লাহোরে এই ঘটনার পর পুলিশের নজরদারী আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। বারাণসীও অনিরাপদ হয়ে ওঠে। ওই বছর রাসবিহারী সন্ন্যাসীর বেশে তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে কাশী চলে যান। সেই সময় শচীন্দ্রনাথ সান্যাল কাশীতে ঢাকা 'অনুশীলন সমিতি'র একটি শাখা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু দিল্লী ও লাহোর ষড়যন্ত্রের পর ব্রিটিশ সরকার 'অনুশীলন সমিতি'কে নিষিদ্ধ করে। যার কারণে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 'অনুশীলন সমিতি'র নাম পরিবর্তন করে 'ছাত্র-যুব সঙ্ঘ' নামকরণ করেন। রাসবিহারী কাশীতে এসে এই 'ছাত্র-যুব সঙ্ঘ'-এর সাথে যুক্ত হন এবং এক পর্যায়ে এই সঙ্ঘের নেতৃত্বের দায়িত্ব নেন। তিনি এই সঙ্ঘের সদস্যদের অস্ত্র চালানো ও বোমা নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ দিতেন। তিনি কাশীতে থাকাকালীন দিনের বেলা বের হতেন না। তিনি নানা নামে নানা পরিচয়ে চলাফেরা করতেন। এসময় তিনি সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ও নরেন্দ্র সেন নামে অমৃতবাজার পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন।

কাশীতে বিষ্ণু গনেশ পিঙ্গলু নামে মুম্বাই প্রদেশের দুই মারাঠী দেশপ্রেমিক ও বিনায়ক রাও কাপলের সাথে রাসবিহারীর পরিচয় ঘটে। যারা আমেরিকায় ছিলেন দীর্ঘদিন। তারা রাসবিহারী বসুকে জানান, গদার পার্টির চার হাজার সদস্য আমেরিকা থেকে বিদ্রোহের জন্য ভারতে এসেছেন। বিদ্রোহ শুরু হলে আরো ২০ হাজার সদস্য ভারতে আসবে। আমরাও দেশের জন্য, মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ভারতে এসে তার সাথে যোগাযোগ করেন।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় বংশোদ্ভূত সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের জাগরণ সৃষ্টি করতে অবিরত কাজ করেন রাসবিহারী বসুসহ অন্যান্য বিপ্লবীরা। গোপনে গোপনে সেনাবাহিনী এইসব সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন রাসবিহারী বসু। দেশ-বিদেশ থেকে বিপ্লবী গদার পার্টির হাজার হাজার সশস্ত্র সদস্যের অংশগ্রহণও নিশ্চিত হয়। সংগ্রহ করা হয় বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী 'ছাত্র-যুব সঙ্ঘে'র একটি সভা করে দলের সভ্যদেরকে 'দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করার প্রস্তুতি নিতে বলেন'। তিনি সমগ্র ভারত নিয়ে একটি বিপ্লবের চিন্তা করেন। তিনি শচীন্দ্রণাথ সান্যালের সহযোগিতায় বেনারস, দানাপুর, সিকোল, এলাহাবাদ, জব্বলপুর, মীরাট, দিল্লী, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোর, আম্বালা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের সৈন্যদের 'জাতীয় অভ্যুত্থানের' জন্য অনুপ্রাণিত করে তাঁদেরকে প্রস্তুতি নিতে বলেন।

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। বিদ্রোহ ঘটানোর দিন ধার্য করা হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি। প্রধান লক্ষ্যস্থল পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর। সেই সঙ্গে বারাণসী ও জব্বলপুর সেনা ঘাঁটিও প্রস্তুতি নিয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করে। রাসবিহারী বসু লাহোর শহরের ৪টি গুপ্তস্থানে এই সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনীর প্রধান গুপ্ত দপ্তর স্থাপন করেন। অবাঙালি বিপ্লবী রামশরণ দাসের বাড়িতে বিদ্রোহের আদেশ প্রদানের সময়টুকুর প্রতীক্ষায় ছিলেন তারা। কিন্তু বিদ্রোহের ঠিক ৪ দিন পূর্বে এই ষড়যন্ত্রের খবর ফাঁস করে দেয় রামশরণ দাস। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সৈন্য পাঠিয়ে যেখানে যেখানে সম্ভব ভারতীয় সৈন্যদেরকে অস্ত্রহীন করে এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ৪ প্রধান দপ্তরের একটিতে অকস্মাৎ হামলা চালায়। বিপ্লবীদের একটি দল ১৯ তারিখ সন্ধ্যেবেলায় লাহোরে নিযুক্ত ব্রিটিশ সেনানিবাসে হামলা চালিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই সশস্ত্র হামলায় দু'পক্ষের অনেক লোক মারা যায়। দ্রুত সমস্ত লাহোরব্যাপী এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসন সমস্ত শক্তি দিয়ে এই সশস্ত্র বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র দমন করতে সক্ষম হয়।

এটাই ঐতিহাসিক 'লাহোর ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত। এই ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতায় অনেক বিপ্লবী গ্রেপ্তার এবং মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময় তিনি কাশী থেকে চলে আসেন কলকাতায়। তারপর চন্দননগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে খুব সর্তকতার সাথে ঘুরে ঘুরে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিতে তিনি কখনো নারী বেশে, কখনো দারোয়ান, কাজের লোক, সন্ন্যাসি বেশে চলাফেরা করতেন। তিনি এমনভাবে চলতেন যাতে কেউ কোন ধরনের সন্দেহ না করতে পারে। এরপর সশস্ত্র বিপ্লবকে সফল করার উদ্দেশ্যে বেছে নেন জাপান দেশটিকে।

১৯১৫ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে সন্ন্যাসীর বেশে কলকাতাগামী ট্রেনে জাপানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। স্টেশনে স্টেশনে তার ছবিসহ পোস্টার লাগানো থাকায় রাসবিহারী বসু নানা কৌশল অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে জাপানে পৌঁছেন। ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের পত্রপত্রিকায় এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান ভ্রমণে যাচ্ছেন এরকম সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সেটা দেখে রাসবিহারী বসু জাপানে থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং রবীন্দ্রনাথের সচিব হিসেবে (মতান্তরে আত্মীয়) পি. এন ঠাকুর (প্রিয়নাথ ঠাকুর) নাম ধরে জাপানে বসবাস শুরু করেন।

জাপানে এসে তিনি জানতে পারেন চীনা জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী-নেতা ড. সান-ইয়াৎ সেন জাপানে অবস্থান করছেন। তিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ড. সান-ইয়াৎ সেন এবং প্যান্-

এশিয়ানিজমের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা তোয়ামা মিৎসুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরু তোয়ামা এই বিপ্লবীকে জাপানে আশ্রয় এবং সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তোয়ামা এসময় গুপ্ত সমিতি 'কোকুরিউকাই' এর প্রধান পরিচালক কুজো য়োশিহিসা ও প্রধান কর্মকর্তা উচিদাকে রিয়োহেইকে-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁদের ওপর এই বিপ্লবীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। সেদিন থেকে জাপান তথা বিদেশে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নতুন রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়।

জাপানে রাসবিহারী বসু তোয়ামা মিৎসুরুর তত্ত্বাবধানে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিকের বড় কন্যা সোমা তোশিকোকে বিয়ে করেন। তাঁদের পরিবারে এক ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। তার স্ত্রী তোশিকো বসু দীর্ঘদিন রোগে ভোগার পর ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ মাত্র ২৬ বছর বয়সে মারা যান। ওই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের দেখভাল করা আর সেইসঙ্গে অক্লান্তভাবে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন তিনি।

ভারতীয়দেরকে সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে রাসবিহারী বসু জাপানে সর্বপ্রথম 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংঘের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯২৬ সালের ১ আগস্ট রাজনৈতিক দল 'সেইয়ুকাই' এর প্রধান সাংসদ ইমাজাতো জুনতারো এর উদ্যোগে নাগাসাকি শহরে প্রথম এশিয়া জাতিগোষ্ঠী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে রাসবিহারী বসু উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলন জাপানে এশিয়ার শীর্ষনেতাদের প্রথম সম্মেলন হিসেবে পরিচিত।

১৯৩২ সালে ইংরেজ-বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন ব্রিটিশদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠে। কাজেই তারা সুযোগ খুঁজছিল কিভাবে পলাতক বিপ্লবীদেরকে গ্রেপ্তার করা যায়। রাসবিহারী বসু জাপানে বিয়ে করে জাপানি নাগরিকত্ব গ্রহণ করার ফলে সে সুযোগ নস্যাৎ হয়।

১৯৪১ সালে বহু বছরের পরাধীন ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষের মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাসবিহারী বসু বিশ্বস্ত এম. এন. রায়কে মাঞ্চুরিয়াতে দূত হিসেবে পাঠিয়ে ভারতীয়দেরকে সংগঠিত করার দায়িত্ব দেন। ওই বছর রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে টোকিও, য়োকোহামা, ওসাকা, কোবে, নাগাসাকি প্রভৃতি জায়গায় বসবাসরত ৭০ জনেরও বেশি ভারতীয় জড়ো হয়ে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'র মহাসভা আহ্বান করেন এবং লীগের পতাকা উত্তোলন করেন।

১৯৪২ সালের জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখে রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে টোকিওতে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'র আয়োজনে একটি মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শিরোনাম ছিল, 'আমেরিকা-বৃটেন ধ্বংস করো।' সম্মেলনের পর রাসবিহারী বসু রাজকীয় সেনা বাহিনীর দপ্তরে উপস্থিত হয়ে কর্তৃপক্ষকে ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উপায় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ জানান।

১৯৪৩ সালের ৪-৭ জুলাই সিঙ্গাপুরস্থ মহাএশিয়া মিলনায়তনে 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'র প্রধান নেতৃবৃন্দের মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শারীরিক অসুস্থতা এবং বার্ধক্যজনিত কারণে এই মহাসভায় রাসবিহারী বসু 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ'র নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসুকে স্থলাভিষিক্ত করেন।

এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠিত হয়। বস্তুত 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনে রাসবিহারী বসুর অবদান অপরিসীম। পরে তিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে

মিলিত হন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখে সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে 'স্বাধীন ভারত সরকার' গঠিত হলে সেই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হন রাসবিহারী বসু।
১৯৪৪ সালের ২১ মার্চ 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' ভারত ভূমির মনিপুরে প্রবেশ করে। এই ফৌজের কার্যাবলী খুব দ্রুত ভারতব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাসবিহারী বসু খুবই আনন্দিত হন। কিন্তু যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত অসুস্থ রাসবিহারী বসু ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি টোকিওর নিজগৃহে মারা যান।
১৯৪৫ সালে ১৫ আগস্ট দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তখনও চূড়ান্ত পর্যায়ে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু হিন্দ ফৌজকে ভেঙ্গে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। কেউ জানে না কোথায় আছেন তিনি। তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তাঁকে ব্রিটিশ সরকার (কিছুদিন পর জানা যায় নেতাজি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান)। এ সময় কর্নেল ভোঁসলে ঘোষণা করেন, নেতাজি না থাকলেও, জাপানিরা হেরে গেলেও আজাদ হিন্দ ফৌজ শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। কয়েক হাজার ভারতীয় সেনা নিহত হওয়ার পরও কোহিমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল আজাদ হিন্দ বাহিনীর কোনো কোনো দল। ব্রিটিশদের আর কোনো শক্তি ছিল না ভারতীয়দেরকে দাবিয়ে রাখার। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসক পাক-ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে লেজ গুটায়। অর্জিত হয় বহুকাঙ্খিত ভারতের স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতার জন্য রাসবিহারী বসুসহ অসংখ্য বিপ্লবী জীবন বিপন্ন করে লড়াই-সংগ্রাম করেছেন।
কিন্তু বহুকাঙ্খিত স্বাধীন ভারতকে দেখার সৌভাগ্য না হলেও রাসবিহারী বসুর আজন্মলালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে একথা ভেবেই সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণ শান্তি লাভ করে।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. বাংলার পাচ স্মরণীয় বিপ্লবী– সম্পাদনা: দেবপ্রসাদ জানা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, প্রকাশকাল ৫ জানুয়ারি ২০০৮।

২. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি কলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৯।

৩. বাংলার মুক্তি সন্ধানী– সব্যসাচী চট্টপাধ্যায় ও রাখী চট্টপাধ্যায়, কলকাতা, প্রকাশকাল মে ২০০৫।

৪. অগ্নিবিপ্লবী হেরাম্বলাল গুপ্ত এবং ভারতের স্বাধীনতা– প্রবীর বিকাশ সরকার, উইকলি বেঙ্গলী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, প্রকাশকাল ২০০৯-২০১০।

রেবতী মোহন বর্মণ



বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নির্মাতা ছিলেন আজন্ম বিপ্লবী রেবতী মোহন বর্মণ। তিনি ১৯৫২ সালের ৬ মে মারা যান। জন্মেছিলেন ১৯০৩ সালে। বেঁচে ছিলেন মাত্র ৪৭ বছর।

রেবতী বর্মণ। যার পুরো নাম রেবতী মোহন বর্মণ। প্রায় অধিকাংশ মানুষ রেবতী বর্মণ নামেই জানে। তবে তার নিজ গ্রামের মানুষদের কাছে রেবতীবাবু বলে পরিচিত ছিলেন। আর আমাদের কাছে সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ বইয়ের লেখক হিসেবে পরিচিত।

রেবতী বর্মণ, যে নামটির সাথে জড়িত রয়েছে একটি বই 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ'। আবার সেই বইটির নাম শুনলে চেতনার আয়নায় যার নাম ভেসে উঠে, তিনি হলেন রেবতী বর্মণ। বইটি আর নামটি যেন অবিচ্ছেদ্য। যে বইটি ১৯৫২ সাল থেকে এ উপমহাদেশের বামপন্থী রাজনীতিবিদ ও কর্মীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় বই। সেই অমর গ্রন্থের নাম হল 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ'। ব্রিটিশ-ভারতের জেলে থাকাকালীন সময়ে ব্রিটিশ সরকার রেবতী বর্মণের ওপর অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন করে। যে কারণে তিনি ঘাতকব্যাধি কুষ্ঠে আক্রান্ত হন। ১৯৪৯ সালে নিজ জন্মভূমি ভৈরবে বসে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পঁচন ধরা আঙুলে রশি দিয়ে হাতের সাথে কলম বেঁধে রচনা করেন 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ'। 'সমাজ-ইতিহাসের গ্রন্থকার হিসেবে খ্যাত গর্ডন চাইল্ড সমাজ নির্মাণের ইতিহাস মেলে ধরার চেষ্টায় লিখেছিলেন, 'ম্যান মেকস হিমসেল্ফ' এবং নতুন আলোকে ইতিহাসের আকর্ষণীয় উপস্থাপনা ঘটান বহু তথ্য ও বিবরণের সম্পর্কসূত্র উন্মোচন করে, সেই একই কাজ বাংলায় করেছেন রেবতী বর্মণ'।

'রেবতী বর্মণ বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন নির্মাতাদের একজন, প্রগতিশীল রাজনীতির চর্চায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। নীহার সরকারের 'ছোটদের রাজনীতি' এবং 'ছোটদের অর্থনীতি'র পাশাপাশি রেবতী বর্মণের বইয়ের পাঠগ্রহণ একদা ছিল প্রগতি রাজনীতি-বরণের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সাহচর্য সত্ত্বেও রেবতী বর্মণ সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু জেনেছি বলে মনে পড়ে না। কোনো এক সময়ে কীভাবে যেন শুনেছিলাম তিনি ছিলেন ভৈরবের সন্তান, এর বাইরে আর কিছু জানতে পারি নি। তবে 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ' পাঠককে নিশ্চিতভাবে মুগ্ধ করে। সভ্যতার

ইতিহাসের এমন প্রাঞ্জল উপস্থাপনা সমাজতন্ত্রকে ইতিহাসের অমোঘ রায় হিসেবে গণ্য করার প্রবণতাকে দৃঢ়বদ্ধ করে। ১৯৫২ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থ মার্কসবাদ চর্চায় যেমন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তেমনি সমাজ-ইতিহাস অধ্যয়নে নিবিষ্ট ছাত্রদের কাছেও এর চাহিদা কখনো কমেনি। এমন গ্রন্থ রচনা নিছক রাজনৈতিক কর্মীর তাগিদ থেকে সম্পন্ন হতে পারে না, সেই সঙ্গে চাই সমাজবিশ্লেষকের গভীর দৃষ্টি, ইতিহাসের সমগ্রচেতনা। রেবতী বর্মণ সেই বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন বলে রাজনীতির অমন ক্লাসিক্যাল বই উপহার দিতে পেরেছিলেন এবং একটি বইয়ের সূত্রেই তিনি অমর হয়ে উঠতে পারলেন।

তবে যতো যুগান্তকারী হোক তার গ্রন্থ, ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন, নতুন ইতিহাস-তত্ত্বের উদ্গাতা তিনি নন, তবু কেন সেই গ্রন্থ কিছুতেই সাবেকী হয়ে উঠলো না। তার একটি কারণ রেবতী বর্মণ কেবল ব্যাখ্যাকারীর ভূমিকা পালন করেন নি, তিনি ইতিহাসের বিপুল তথ্যভাণ্ডার ঘেটে সারসত্য উপস্থাপনে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।'– মফিদুল হক।

মানুষের ইতিহাস মূলতঃ শ্রেণী সংগ্রাম আর শ্রমের ইতিহাস। শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বই সমাজ বিবর্তণের মূলসূত্র-এ তত্ত্বে বিশ্বাসী, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আজীবন বিপ্লবী রেবতী মোহন বর্মণ কারাগারে বসে বি. এ পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

রেবতী মোহন বর্মণের জন্ম ১৯০৩ সালে। বঙ্গভঙ্গের সেই ঐতিহাসিকক্ষণে। ভৈরব উপজেলার শিমুলকান্দি গ্রামের বর্মণ পরিবারে। তবে তার জন্ম সাল অনেকে ১৯০৪ বা ১৯০৫ বলেও উল্লেখ করেছেন। তার বাবা হরনাথ বর্মণ। তিনি ছিলেন একজন নামকরা আইনজীবী। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্যের জন্য তিনি রায় উপাধি পেয়েছিলেন। শিমুলকান্দি গ্রামের নামকরা পরিবার ছিল এই বর্মণ পরিবার। শিক্ষা-দীক্ষা আর অর্থ-সম্পদের এক ঐতিহ্যবাহী পরিবার।

রেবতী মোহন বর্মণের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। বাবার কাছে। তারপর প্রাথমিক পড়াশুনা শেষে চুন্টা গ্রামের একটি স্কুলে তাকে ভর্তি করে দেয়া হয়। এখানে তিনি বেশি দিন পড়াশুনা করতে পারেননি। চুন্টা গ্রাম ছিল বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায়। রেবতী মোহন ছিলেন পাঁচ ভাইয়ের মাঝে চতুর্থ। শিমুলকান্দি গ্রামে জন্ম নেয়া রেবতী বর্মণ পড়াশোনা করেছিলেন ঢাকার পগোজ স্কুল এবং কুমিল্লার গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। স্কুল ছাত্রাবস্থায় ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসহযোগ ও স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হন।

অসহযোগ ও স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে ওই সময় অসংখ্য স্কুল ছাত্রদের উপর হুলিয়া জারি হয়। এই হুলিয়া থেকে রেবতী মোহন বাদ যাননি। হুলিয়ার কারণে তাকে কয়েকটি স্কুল পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ১৯২২ সালে তিনি কিশোরগঞ্জ আজিমুদ্দিন হাই স্কুলে ভর্তি হন। তখন আজিমুদ্দিন হাই স্কুল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনে ছিল। এই স্কুল থেকে (কলকাতার অধিনস্থ সমস্ত স্কুলের সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের মধ্যে) তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

তারপর রেবতী বর্মণ পড়াশুনার জন্য কলকাতায় যান। এখানে মূলত ছাত্র পড়িয়ে লেখাপড়ার খরচ চালাতেন। যে মেসবাড়ি ছিল তার ও সতীর্থদের আশ্রয় তা বিপ্লবীদের

একরকম ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এ এবং সেন্ট পলস কলেজ থেকে বি. এ পাস করেন। বি. এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পেলেন জগত্তারিণী পদক এবং পদক বিক্রির অর্থ দিয়ে সহপাঠীদের নিয়ে প্রকাশ শুরু করলেন কিশোরদের মাসিক পত্রিকা 'বেণু'। এই সহপাঠীদের মধ্যে ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের দুই সদস্য শোভনলাল ও মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদের সহযোগে বেণু'র প্রথম সংখ্যায় পত্রস্থ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদের পরিচয়বহ রচনা, 'মধ্যদিনে যবে গান/বন্ধ করে পাখি/হে রাখাল বেণু তব/বাজাও একাকী'।

এরপর ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। 'রেবতী বর্মণ যে পঠন-পাঠন ও লেখালেখিতে নিবেদিত ছিলেন, সেই সঙ্গে চরমপন্থার বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন তার প্রতিফলন পাওয়া যায় ১৯২৯ সালে তার প্রকাশিত 'তরুণ রুশ' গ্রন্থে।'– মফিদুল হক।

রেবতী বর্মণের রাজনীতি শুরু স্কুল জীবন থেকেই। বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজের জীবনাদর্শের প্রভাবে তিনি মার্কসীয় তত্ত্বে আকৃষ্ট হন। দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও মানুষের মুক্তির জন্য যুক্ত হন সশস্ত্র বিপ্লববাদী গ্রুপে। এ সময় তিনি ঢাকার শ্রী সংঘের সদস্য হন। এই শ্রী সংঘের সদস্য হিসেবে কলকাতা, বাকুড়া ও বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যান।

১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে কলকাতার ডালহৌসি স্কয়ারে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের ওপর প্রকাশ্যে হামলা হয়েছিল। হামলার দিন বিকেলেই পুলিশ কুখ্যাত বঙ্গীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি (সংশোধিত) আইন, ১৯২৫-এর আওতায় রেবতী মোহন বর্মণ রায়কে আটক করে। ওই বছরের ১ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর বিনা বিচারে ভারতের বিভিন্ন কারাগার ও বন্দীশিবিরে কেটে গেছে তার আটটি বছর। অবশেষে ১৯৩৮ সালের ২১ জুলাই তিনি নিঃশর্ত মুক্তি পান।

জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি সমাজ বিবর্তণমূলক অসংখ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। সেসব পাণ্ডুলিপি থেকে পরে ১৭টিকে বই আকারে প্রকাশ করা হয়। যা বর্তমানে অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়ে সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে।

১৯৩৮ সালে তার পরিবারের পক্ষ থেকে এলাকার শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্থাপন করা হয় একটি প্রাথমিক স্কুল। যা পরবর্তিতে শিমুলকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে পরিগণিত হয়। কুষ্ঠ আক্রান্ত রেবতী মোহন ভৈরবে আসার পর শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ঘরের বেড়ার (পার্টিশনের) আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে অপর পাশ থেকে ছাত্র পড়াতেন।

তিনি মার্কসবাদের ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন বিভিন্ন জেলখানায়। তবে দেউলী বন্দীশিবিরের দিনগুলোতে তিনি বেশি বই পড়েছেন। মুক্তিলাভের পর সশস্ত্র বিপ্লববাদের পথ বাদ দিয়ে তিনি সাম্যবাদের দর্শন গ্রহণ করেন। এরপর থেকে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন মার্কসবাদ-লেলিনবাদ প্রচারের কাজে। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে। কারামুক্তির পর ভারতের চব্বিশ পরগনার বেলঘরিয়ায় বসবাসকালে শ্রমিক

আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পুলিশ তার উপর হুলিয়া জারি করে। যে কারণে তাকে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে হয়। চলে আসেন পৈতৃক শিমুলকান্দি গ্রামে। বেলঘরিয়ায় থাকাকালেই তার গায়ে কুষ্ঠরোগের লক্ষণ দেখা দেয়। ফলে তার পক্ষে দলীয় কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৫১ সালে দেশত্যাগের আগ পর্যন্ত তিনি নিজ গ্রামের বাড়িতেই বসবাস করতেন।

১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক চেতনায় বিভক্ত ভারতবর্ষের পাকিস্তান অংশের বিপ্লবী রেবতী বর্মনের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধগোষ্ঠী এলাকাবাসীকে খেপিয়ে তোলে। তার বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা শুরু হলে ১৯৫১ সালে তিনি তার প্রিয় জন্মভূমি ভৈরব ছেঁড়ে ভারতের আগরতলায় চলে যেতে বাধ্য হন। সেখানে ১৯৫২ সালের ৬ মে তিনি মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. আজন্ম বিপ্লবী রেবতী বর্মণ– এম এ সাইয়ীদ, দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৬ মে ২০১০।

২. গণমানুষের মুক্তির আন্দোলনে– মাহফুজা খানম ও তপন কুমার দে, প্রকাশক: ডা. মাহফুজ শফিক, প্রকাশকাল ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

৩. www.biplobiderkotha.com

বিপিন চন্দ্র পাল



ভারত উপমহাদেশের কংগ্রেসীয় রাজনীতির প্রগতিশীল গ্রুপের তিন দিকপাল ছিলেন। তারা হলেন লালা রাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পাল। উপমহাদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিপিন চন্দ্র পালই একমাত্র বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, যিনি একাধারে রাজনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কারক। তার বাগ্মীতা ছিল অসাধারণ। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি যে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিতেন, তার আহ্বানে হাজার হাজার যুবক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হয় এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি ছিলেন চরমপন্থি রাজনীতির অন্যতম প্রধান প্রবক্তা।

একজন প্রবাদতুল্য রাজনৈতিক হিসেবে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেও তিনি তার অসাধারণ সৃষ্টিকর্মের জন্য আজও আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে বেঁচে রয়েছেন। উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ হয়েছিল একদল তরুণ লেখকের হাতে। তাদের মধ্যে বিপিন চন্দ্র পালের ভূমিকা অন্যতম। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরও বিপিন চন্দ্র পালের জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সাহিত্য সাধনা। জীবিকার জন্য কখনও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন আবার কখনও স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা করেছেন। উপমহাদেশের সাড়া জাগানো বহু সংবাদপত্রের সম্পাদনাও তিনি করেছেন।

সেকালের নিয়মানুসারে ইংরেজি শিক্ষিত তরুণরা সাহেবী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হতেন কিংবা সরকারি চাকুরি গ্রহণ করতেন। কিন্তু বিপিন চন্দ্র পাল তা করেননি বরং তার কাছে প্রথম ও প্রধান বিষয় ছিল 'স্বাধীনতা লাভ'। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মানুষের মুক্তির জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন। তার কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভোগ নয়, ত্যাগই মুখ্য। দারুণ অর্থ কষ্টের মধ্যেও 'দেশ মাতার' কথা ভেবে ভুলে গেছেন সকল যন্ত্রণা।

বিপিন চন্দ্র পাল জন্মেছিলেন সিপাহী বিপ্লবের এক বছর পরে ১৮৫৮ সালের ৭ নভেম্বর। বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার সদর থানার পইল গ্রামে। তার পিতা রামচন্দ্র পাল। তিনি ছিলেন পইল গ্রামের এক মাঝারি জমিদার। জমিদার হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। কর্মজীবনে রামচন্দ্র পাল ঢাকার সাব-জজ কোর্টের পেশকারের চাকুরি করেন।

রামচন্দ্র পাল কোর্টে কয়েক বছর চাকুরি করে নিজ জেলা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ চলে আসেন। তারপর সিলেট বারে আইনজীবী হিসেবে যুক্ত হন। একসময় তিনি সিলেটের একজন খ্যাতনামা উকিল হিসেবে সম্মান ও সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি ছিলেন

শিক্ষানুরাগী। তার বাসায় মফঃস্বলের বহু ছাত্র দীর্ঘদিন থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে। বিপিন চন্দ্র পালের মাও ছিলেন উদার ও মানবিক গুণের অধিকারী। তার বাসায় থেকে যেসব ছাত্ররা পড়াশোনা করতো তিনি তাদেরকে স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। পারিবারিকভাবেই বিপিন চন্দ্র পালের মধ্যে সাম্য ও মানবতা বোধের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পিতার কাছে। পাঁচ বছর বয়সে বাংলা বর্ণমালা শিক্ষা শুরু হয়। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের শ্লোক শুনে তার বাল্য শিক্ষা শুরু হয়। ১৮৬৬ বিপিন চন্দ্র পালকে তার বাবা নয়া সড়ক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তারপর ১৮৬৯ সালে তাকে সিলেট গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি করানো হয়। এই স্কুল থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পেয়ে পাশ করেন। ১৮৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় যান। ১৮৭৫ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে এফ. এ কোর্স ফাইনাল পরীক্ষা দেয়ার কিছুদিন আগে তিনি জল বসন্তে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এরপর তিনি ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে ১৮৭৭ সালে পুনরায় এফ. এ পরীক্ষা দেন।

১৮৮১ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি শ্রীমতী নৃত্যকালীকে বিয়ে করেন। নৃত্যকালী ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর এক পালিতা বিধবা কন্যা। তাদের সংসারে দুই ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম হয়।

সংসার জীবনের পূর্বেই বিপিন চন্দ্র পাল রাজনীতিতে যুক্ত হন। ১৯৭৭ সালে তিনি সেকালের উদারপন্থি সমাজ সংস্কারক দার্শনিক শিবনাথ শাস্ত্রী দ্বারা প্রভাবিত হন। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর আদর্শে ও প্রেরণায় স্বাধীনতার সাধক দলের সদস্য হিসেবে বিপিন চন্দ্র পাল দীক্ষা গ্রহণ করেন। এসময় থেকে তিনি স্বদেশ-স্বজাতির মুক্তির লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার ব্রতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেন। 'প্রথমদিনে শরতচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর-সুকুল, তারাকিশোর চৌধুরী, সুন্দরীমোহন দাস আর আমি, আমরা ছয়জনে এই দীক্ষা গ্রহণ করি।'

তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্য সিলেটে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন করেন। 'শ্রীহট্ট শহরের এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৭৯ সালে পরিচালনার অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই সংবাদে কলিকাতাস্থ শ্রীহট্ট সম্মেলনীর সদস্যগণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বিপিন চন্দ্র পাল ও রাজেন্দ্র চৌধুরীকে শ্রীহট্টে প্রেরণ করেন। বিপিন চন্দ্র পাল ১৮৮০ সালের ৫ জানুয়ারি এই স্কুলকে 'শ্রীহট্ট জাতীয় বিদ্যালয়' হিসেবে রূপান্তর করেন। ইহাই ভারতের প্রথম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। তখনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়নি। বিপিন চন্দ্র পাল এই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ব্রজেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শিক্ষক এবং রাজেন্দ্র চৌধুরী তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই জাতীয় বিদ্যালয়টি ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত শিক্ষা নীতিমালাকে অগ্রাহ্য করে নিজস্ব ধারায় চলে।

বিপিন চন্দ্র পাল জীবনের প্রথম ১৮৭৯ উড়িষ্যার কটক একাডেমিতে প্রথমে সাধারণ শিক্ষক এবং পরে প্রধান শিক্ষক হিসাবে শিক্ষকতা করেন। তবে খুব বেশিদিন তিনি কটক থাকেন নি। বিপিন চন্দ্র পাল ১৮৮০ সালের জুলাই মাসের শেষে কলকাতায় ফিরে যান। ১৮৮১ সালের আগস্ট মাসে রায়বাহাদুর নারায়ণ স্বামী মুদালিয়ারের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন।

এরপর তিনি বাঙ্গালোরে কিছুদিন একটি হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। বিপিন চন্দ্র পাল ১৮৮০ দশকের কোনো এক সময় নিজ জেলা সিলেটের হবিগঞ্জের বর্তমান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়েও কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন।

বিপিন চন্দ্র পাল বেশিদিন কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারেন নি। যখনই দেখেছেন আত্মমর্যাদা বোধ, স্বাধীন চিন্তায় একটু ব্যাঘাত ঘটেছে তখনই সে কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। প্রথম জীবনে নিজ জেলা সিলেটে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কিছুদিন এই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন।

১৮৮৫ সালে বোম্বে সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল 'জাতীয় কংগ্রেসের' জন্ম হয়। 'ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচনা হইল। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করেন এবং আত্মত্যাগের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে আহ্বান জানান।'

কংগ্রেসের জন্মের পর থেকে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যে বিপিন চন্দ্র পাল সর্ব ভারতীয় পর্যায়ের একজন নেতা হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। বিপিন চন্দ্র পাল অসাধারণ বক্তা হওয়ার কারণে বিভিন্ন সভা-সমাবেশের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের জনগণকে জাগ্রত করেন। কিন্তু গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মধ্যপন্থি ও চরমপন্থি অংশের মধ্যে এক সাময়িক ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে বিপিন চন্দ্র পাল মতাদর্শগতভাবে গান্ধীবাদী ধারার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন এবং চরমপন্থি অংশের নেতৃত্বে চলে আসেন। এসময় তিনি গান্ধী-নেহেরুর রাজনৈতিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ান। ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক লড়াই-সংগ্রামে যুক্ত হন।

১৮৯০-৯২ সালে বিপিন চন্দ্র পাল কলকাতায় পাবলিক লাইব্রেরি ও পৌরকর্পোরেশনে কিছুদিন কাজ করেন। ১৮৯২-৯৩ তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্সপেক্টর হন। ১৮৯৯ সালে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তি নিয়ে গবেষণার জন্য অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার কলেজে যোগদান করেন। সেখানকার পাঠ শেষ করে সারা ইংল্যান্ড ও আমেরিকা ভ্রমণ করে হিন্দুধর্ম, ভারতীয় রাজনীতি ও মাদকদ্রব্য নিবারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিপিন চন্দ্র পাল প্রাণশক্তি দিয়ে জাগিয়ে তোলেন ঘুমন্ত জাতিকে। তিনি আহ্বান জানান পরাধীনতার শেকল ভাঙ্গতে। ক্রমেই লালা লাজপতরায়, বাল গঙ্গাধর তিলকের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন। তিনি শুধু কলাকতায় বসে থাকেননি, সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। সমগ্র দেশে অল্পদিনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে ঘুমন্ত ভারতকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করতেন। লালা লাজপতরায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পাল তখনকার ভারতে রাজনৈতিক অঙ্গনে তিন দিক পাল ছিলেন। তাদেরকে সংক্ষেপে 'লাল-বাল-পাল' বলা হত। ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের চিন্তা ও মতবাদকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার কারণে তিনি 'চরমপন্থী' নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি সব সময়ই বিপ্লবী-পন্থাকে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ বলে মনে করতেন। কংগ্রেস রাজনীতির সময়ও তিনি 'চরম' পন্থার দিকে ছিলেন। গান্ধীজীর অহিংসবাদ দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন এবং তা অকুণ্ঠ চিত্তে সভা-সমাবেশে বলতেন।

বিপিন চন্দ্র পাল ১৯০৪ সালে বোম্বাইতে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৬ সালে শ্রীহট্ট সুরমা উপত্যকার প্রথম রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। ১৯০৮ সালে করিমগঞ্জে সুরমা উপত্যকার দ্বিতীয় সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। তাছাড়া ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করনে।

এ প্রসঙ্গে শ্রী নরেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুরী লিখেছেন 'বিপিন চন্দ্রের কম্বুকণ্ঠে যখন স্বাধীনতার বাণী কলিকাতার স্কোয়ারে স্কোয়ারে ধ্বনিত হতে লাগিল, ইংরাজি ভাষার পরিবর্তে মাতৃভাষার সুললিত রচনা-বিন্যাস ও উম্মাদিনী শক্তিতে বিপুল জনসংঘ যখন মেতে উঠল, তখন শ্রীহট্টবাসী ছাত্রগণ সে উম্মাদনা ও উত্তেজনার স্রোতে ভাসিয়া চলিল, প্রতিদিন নানাস্থানে ২/৩টি করে সভা। কোথায় কোন দলের মত গৃহীত হয়, তা নিয়ে মহাব্যস্ততা। 'কোথাকার একটা বাঙ্গাল' এসে কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত নেতাদের বিরুদ্ধে গলাবাজী করছে, তা অসহ্য। ইহাকে জব্দ করা দরকার। কিছুদিন বিপিন চন্দ্র বক্তৃতা দিতে উঠিলেই একদল লোক গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বাঙ্গাল বিপিন চন্দ্র বাধা পাইয়া দমিবার পাত্র ছিলেন না। জনতা যত বেশিই উৎক্ষিপ্ত ও সংক্ষুব্ধ হইক না কেন, তিনি সিংহ বিক্রমে গণ্ডগোলকারীদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া যখন তাহার দিগন্ত বিদারী কণ্ঠনিনাদে স্বীয় মত ও পথের ব্যাখ্যা করিতেন, তখন সব গণ্ডগোল কোথায় মিলাইয়া যাইত। বিশাল জনরাশির মধ্যে আর 'টু' শব্দটা পর্যন্ত থাকিত না। তাহার কণ্ঠ যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়া বিমুগ্ধ জনমণ্ডলীকে অকাট্য যুক্তি ও প্রাণ-উম্মাদিনী ভাষা ও ভাবের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া চলিত, চতুর্দ্দিকে ততই ঘন করতালি ও সাধুবাদে ধ্বনিত হইয়া উঠিত।'

সোচ্চার মত ও পথের স্বচ্ছতা তুলে ধরেছেন সংগ্রামের গতি পথে, ভারতে স্বাধীনতা ও মুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। এই স্বপ্নকে রূপায়িত করার জন্য তিনি আমরণ সংগ্রাম করেছেন। ব্রিটিশদের চোখে তিনি ছিলেন একজন দুঃসাহসী নেতা। এজন্য তাকে দীর্ঘদিন কারাবরণ করতে হয়েছে।

১৯০৫-১৯০৮ সালে তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ব্রিটিশের ভিত নড়ে যায়। ১৯০৭ সালে মাদ্রাজে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাতে সারাদেশে এক জাগরণ সৃষ্টি হয়। সেক্রেটারি অব স্টেট ও বড়লাট বিপিন চন্দ্রকে শৃঙ্খলিত করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন।

১৯০৬ সালে তিনি বন্দেমাতরম পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর বিপিন চন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি লিখলেন 'আমরা যদি সরকারকে কোনরূপে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হই তাহলে একদিনেই শাসনতন্ত্র অচল হয়ে পড়বে'। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপিন চন্দ্র পাল তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে দেশবাসীকে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করে জাগিয়ে তুলেন।

বিপিন চন্দ্র পাল বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগঠনের সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি তার পত্রিকার লেখার জন্য তরুণ সাহিত্যসেবীদের অনুপ্রেরণা যোগাতেন। তিনি সাহিত্য বিষয়ে মত বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে যেমন এসেছিলেন, তেমনি পত্রিকা সম্পাদনা সূত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলেন। আবার দর্শন চিন্তার জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সাথে সখ্যতা গড়ে উঠে।

বিখ্যাত জননেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাহাকে শ্রী অরবিন্দের বিরুদ্ধে আনিত মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে বলা হয়। তিনি সাক্ষ্য দিলে

ও সত্য কথা বলিলে অরবিন্দের জেল নিশ্চিত, তাই বিপিন চন্দ্র পাল সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেন। এবার কোর্ট অবমাননার দায়ে বিপিন চন্দ্র পালকে ৬ (ছয়) মাস সাধারণ কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অরবিন্দকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিজে কারাদণ্ড বরণ করেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিপিন চন্দ্র ১৯০৮ সালে ইংল্যান্ডে যান এবং সেখানে 'স্বরাজ' নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করেন। এ সময়ে তিনি ভারতীয় রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বিশদ বক্তৃতা প্রদান করেন। কিন্তু ১৯১১ সালে বোম্বাই পদার্পণ করামাত্র তাকে রাজদ্রোহের অপরাধে আবার জেলে নিক্ষেপ করা হয়।'

১৯১২ সালে বিপিন চন্দ্র পাল জেল থেকে মুক্তি পান। জেল খেটে তিনি যখন বের হয়ে এলেন তখন বিপিন চন্দ্র পালকে সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে কলকাতায় এক অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। অভ্যর্থনা সঙ্গীত রচনা করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার দেশ'- বাংলার লক্ষ লক্ষ নর-নারী কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো আবার 'আমরা মা তোর ঘুচাব কালিমা-মানুষ আমরা নহিতো মেঘ'।

১৮৮০ সালে তিনি প্রকাশ করেন সিলেটের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র পরিদর্শন। এছাড়া তিনি বেঙ্গল পাবলিক অপিনিয়ন (১৮৮৩), নিউ ইন্ডিয়া (১৯০১), বন্দেমাতরম (১৯০৬), স্বরাজ (১৯০৮), হিন্দু রিভিউ (১৯১২), আলোচনা (১৯১৩), ট্রিবিউন (-), সোনার বাংলা (১৩৩১ বাংল), ইনডিপেনডেন্ট, ডেমোক্রেট, ফ্রিডম ফেলোশিপ, ট্রিবুনি, জনশক্তিসহ (১৯১৯) অনেক পত্রিকায় সাংবাদিক ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

যৌবনের প্রথমদিকে কথাসাহিত্যের ভেতর দিয়ে তার সাহিত্য জীবনে সূচনা হয়েছিল। তার সৃষ্টির মধ্যে প্রবন্ধের সংখ্যা বেশি। তাছাড়া তিনি উপন্যাস, জীবনী, আত্মজীবনী, ইতিহাস রচনা করেছেন। তার 'সত্তর বছর' বইটি সেকালের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের দলিল হিসেবে স্বীকৃত।

বিপিন চন্দ্র পালের প্রথম উপন্যাস 'শোভনা' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। ঠিক এসময় বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়। 'শোভনা' উপন্যাসে তিনি ছদ্মনাম হরিদাস ভারতী ব্যবহার করেন। 'শোভনা' নারীসমাজের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য লিখিত একটি উপন্যাস। 'শোভনা'র আখ্যাপত্রে লেখা আছে:

জীবন সংগ্রামে ভারতের নামে
যত রক্তবিন্দু গড়িবে এবার,
শতপুত্র হবে বীর অবতার;
ভারত আধার ভারতের ভাব
ঘুচাই তারা
না জাগিলে সব ভারত ললনা।
এ ভারত আর জাগে জাগে না।

পূর্ববাংলার নাগরিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন প্রথম উপন্যাস লিখেছেন 'রত্নবতী'। সেই হিসেবে রত্নবতী (১৮৬৯) আমাদের প্রথম উপন্যাস। বিপিন চন্দ্র পালের 'শোভনা' (১৮৮৪ বাংলা) উপন্যাসের দ্বিতীয় উপন্যাস।

বিপিন চন্দ্র পাল বাংলায় ১৫টি এবং ইংরেজিতে ১৭টির বেশি বই লিখেছেন। বাংলা গ্রন্থের মধ্যে শোভনা (১৮৮৪), ভারত সীমান্তে রুশ (১৮৮৫), মহারানী ভিক্টোরিয়া (১৮৮৯),

জেলের খাতা (১৯০৮), চরিত কথা (১৯১৬), সত্য ও মিথ্যা (১৯১৭), প্রবর্তক বিজয় কৃষ্ণ (১৯৩৩), সুবোধিনী, সত্তর বছর (১৯৫৪), নবযুগের বাংলা (১৯৫৫), মার্কিনে চার মাস (১৯৫৫), রাষ্ট্রনীতি (১৯৫৬), চরিত্রচিত্র (১৯৫৪), শতবর্ষের বাংলা, সাহিত্য সাধনা, কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে The New Spirit, The Soul of India, The Battle of Swaraj, Memories of My Life and Times, Beginning of Freedom, Movemen: in India ইত্যাদিসহ ১৮/১৯ টি বই প্রকাশিত হয়। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত তার ২৫টিরও বেশি বই বিশ্বের প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ানো হয়।

সত্যিকার অর্থে বিপিন চন্দ্র পাল ছিলেন নারীমুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা। ছাত্রাবস্থায় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করে তরুণ বয়স থেকেই বিধবা বিবাহের পক্ষে ছিলেন। তার বলিষ্ঠ অঙ্গীকার ছিল বিধবা-বিবাহ প্রচলন করা। বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহরোধ এবং নারীশিক্ষার প্রচলনে ভারতীয় সমাজে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করা। এ ধরনের নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিপিন চন্দ্র পাল আমৃত্যু লড়েছেন। রাজা রামমোহন প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ তিনি মনে প্রাণে সমর্থন করতেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছেন যে সমস্ত বক্তব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল নারী জাগরণের প্রসঙ্গটি। এ জন্য ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজে একজন বিধবাকে-বিবাহ করেন। ফলে সমাজচ্যুত হয়ে নিজ বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। নারীর অধিকার বাস্তবায়নে ব্যক্তিজীবনে একাধিক উদাহরণ রেখে গেছেন। বিপিন চন্দ্র পাল তার এক বিধবা মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী উল্লাস কর দত্তের কাছে। বিপিন চন্দ্র পালের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টা শুধু বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বহু বিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখা-লেখি, সভা-সমিতিতে বক্তব্যের মাধ্যমে জনমত গঠন করেন। নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট অবদান ছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রাকমুহূর্তে গান্ধীজীর দেশময় অ-সহযোগ আন্দোলন চালাবার প্রস্তাব জাতীয় মহাসমিতিতে পাশ হয়েছে– বাংলা তখনও এই প্রস্তাবে মত দেয় নি। সমগ্র ভারত বাংলার নেতা দেশ-বন্ধুর মহিগতির উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি। এমন সময় বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীতে দেশ-বন্ধু অসহযোগের স্ব-পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। সেই সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করার সময় বিপিন চন্দ্র এর বিরোধিতা করলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন বিলাতে এক দল লোক পাঠিয়ে এক চরমপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট উপস্থিত করা হোক।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিতে মহাত্মা গান্ধীর সাথে মতের মিল না হলে তিনি গান্ধীর মতাদর্শের বিরোধীতা করে বলেছিলেন, 'You wanted magic, I tried to give you logic. But logic is in bad odour when the popular mind is excited. I have never spoken a half-true when I know the true ... ... I have never tried to lead people in faith blindfolded."

গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংগ্রামের কৌশল নিয়ে হতাশ হয়ে কংগ্রেসের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ নেতৃবর্গ এক নতুন কর্মসূচি নিয়ে স্বরাজ্যদল বা স্বরাজ পার্টি নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। স্বরাজ দলের প্রধান কর্মসূচি ছিল:

১. আইন সভায় প্রবেশ করিয়া সরকারের কার্যের বিরোধিতা করা।

২. সরকারি বাজেট প্রত্যাখ্যান করা।

৩. নানাবিধ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া জাতীয়তাবাদের অগ্রগতিতে সহায়তা করা।
৪. সুনির্দিষ্ট অর্থনীতি গ্রহণ করিয়া বিদেশি শোষণ বন্ধ করা।

ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসন সংস্কারের জন্য ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনে কোন ভারতীয়কে গ্রহণ না করায় সাইমন কমিশন 'বর্জন' করার দাবিতে দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। বিপিন চন্দ্র পাল সাইমন কমিশন বর্জনের জন্য জ্বালাময়ী ভাষায় বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রাখেন। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জে সাইমন কমিশন বয়কটের দাবিতে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি সাইমন কমিশন বয়কট অন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানান।

১৯২৮ সালে 'সুরমা উপত্যকা রাজনৈতিক সম্মেলন' এবং 'সুরমা উপত্যকা যুব সম্মেলন' একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ডা. সুন্দরীমোহন দাস। সম্মেলনের অতিথি ছিলেন বিপিন পাল ও গদর পার্টির নেতা বাবা গুরুদিং সিং। বিপিন চন্দ্র পালের ভাষণে ত্রিশ দশকে শ্রীহট্টবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে। বিপ্লবী ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলনে শ্রীহট্টে আইন অমান্য আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিল। বিপিন চন্দ্র পাল সুরমা উপত্যকার প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজেকে ছায়ার মত জড়িত রেখেছিলেন। চা শ্রমিক ও শিল্প-শ্রমিকদের বিভিন্ন আন্দোলনে ভারতবর্ষের জাতীয় নেতাদের মধ্য যারা সোচ্চার হয়ে উঠেন তাদের মধ্যে বিপিন চন্দ্র পাল অন্যতম।

১৯২৯ সালে সুরমা ও বরাক উপত্যকা ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হলে শ্রীহট্ট সম্মেলনীর পক্ষ থেকে তিনি ও ডা. সুন্দরীমোহন দাস বন্যা পীড়িত জনগণের সেবার জন্য শ্রীহট্ট কাছাড়ে আসেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর ষোড়শ বার্ষিক কার্যবিবরণ (১২৯৮-৯৯) থেকে জানা যায় ১৩০৮-১৩০৯ বাংলা সাল পর্যন্ত শ্রীহট্ট সম্মিলনীর সম্মেলনে বিপিন চন্দ্র পাল সভাপতি নির্বাচিত হন।

বিপিন চন্দ্র পাল স্বাধীন-সুন্দর-মুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ কারণে ধৈর্য সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে তার সুদীর্ঘ জীবনের রাজনৈতিক সংগ্রামে অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তা স্মরণাতীতকালের ইতিহাসে দুর্লভ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নে মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস গান্ধীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বিপিন চন্দ্র পাল শেষ জীবনে রাজনীতি থেকে দূরে সরে চলে আসেন। জীবনের শেষাংশে সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ১৯৩২ সালের ২০ মে মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

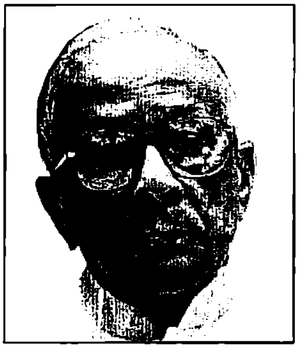
১. বিপিন চন্দ্র পাল– মাহাফুজুর রহমান, প্রকাশক বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল জুন ১৯৯৯।

২. চরিতাভিধান– সম্পাদনা: সামসুজ্জামান খান ও সেলিনা হোসেন, প্রকাশক বাংলা একাডেমী, প্রকাশকাল জুন ১৯৮৫।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, প্রকাশকাল ১৯৯০ কলকাতা।

৪. www.biplobiderkotha.com

জ্যোতি বসু



লড়াই-সংগ্রাম আর ভালোবাসার নাম জ্যোতি বসু। আমৃত্যু লড়াই করেছেন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। মার্কসবাদী রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সর্বভারতীয় রাজনীতিতেই অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব জ্যোতি বসু। তার বাবা নিশিকান্ত বসু লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন ব্যারিস্টার হবার জন্য। কিন্তু ছেলে জ্যোতি ফিরেছিলেন কমিউনিস্ট হয়ে।

দেশে ফিরে শুরু হয় রাজনৈতিক জীবন। মিশে যান হতদরিদ্র মানুষের জীবনের সঙ্গে। তাদের অধিকার আদায়ে অব্যাহত রাখেন সমাজ বদলের সংগ্রামকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি রাজনীতির হাতেখড়ি নেন। ফ্যাসিবাদের উত্থান, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সোভিয়েত রাশিয়ার পতন, চীন-ভারত যুদ্ধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ভারতের জরুরি অবস্থাসহ ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনার প্রত্যক্ষ লড়াকু সাক্ষী তিনি। কমিউনিস্ট পার্টির শৃংখলা ও তত্ত্বের অনুসারী হয়েও একনিষ্ঠভাবে সকল প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তিনি ছিলেন অগ্রসৈনিক। তিনি ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত একটানা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি সিপিআই (এম) দলের পলিটব্যুরো সদস্য হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তিনিই একমাত্র রাজনীতিবিদ যার নাম ভারতের প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য বার বার আহ্বান করা সত্বেও যিনি দলের সিদ্ধান্তে তা প্রত্যাখান করেছেন অকপটে। তার ইমেজের ওপর ভর করেই পশ্চিম বাংলায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থেকেছে বামফ্রন্ট। পশ্চিম বাংলার জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশ দেবতা আর জ্যোতি বসুকে আলাদা করে দেখেনি।

এই কিংবদন্তির জন্ম ১৯১৪ সালের ৮ জুলাই। কলকাতার হ্যারিসন রোডের ৪৩/১ নম্বর একটি বাড়িতে। এখন নাম বদলে মহাত্মা গান্ধী রোড করা হয়েছে। তাদের আদি বাসস্থান বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার বারোদি গ্রামে। জন্মের পর তার নাম রাখা হয় জ্যোতিকিরণ বসু। স্কুলে ভর্তির সময় 'কিরণ' ছেঁটে দেওয়া হয়। কিন্তু মেধা ও কৃতিত্বের কারণে কিরণ শব্দটি তার জীবনেরই সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আদর করে তাকে ডাকা হতো 'গনা'। বাবা নিশিকান্ত বসু। মা হেমলতা বসু। নিশিকান্ত বসু ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চতর শিক্ষালাভ করে তিনি কলকাতায় এসে প্রাকটিস শুরু করেন। এই সময়ে তাদের পরিবার বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন ধর্মতলায়

হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর ভাড়া বাড়িতে। ১৯২৪ সালে নিশিকান্ত বসু হিন্দুস্থান পার্কে নিজে বাড়ি তৈরি করে সেখানে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন।

পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। প্রাথমিক পাঠ শেষে তার বাবা তাকে ১৯২০ সালে কলকাতার লরেটো স্কুলে ভর্তি করে দেন। তখন তার বয়স ছিল ৬ বছর। লরেটো কিন্ডার গার্টেনে পাঠ্যক্রম ছিল চার বছর মেয়াদী। পড়াশুনা ভালো করার কারণে 'ডাবল প্রমোশন' পাওয়ায় তিন বছরে কিন্ডার গার্টেন পাঠ্যক্রম সমাপ্ত হয়।

১৯২৪ সালে তাকে সেন্ট জেভিয়ার্সে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে ভর্তি করানো হয়। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াকালীন ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ওই বিদ্রোহের বিরোধিতা করে স্কুলে লিফলেট বিতরণ করা হয়। জ্যোতি বসু তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, বিপ্লবীরা তো দেশের স্বার্থেই বিদ্রোহ করেছেন। তাহলে তারা অন্যায়টা কী করেছেন? এই স্কুল থেকেই তিনি সিনিয়র ক্যামব্রিজ (নাইনথ্ স্ট্যান্ডার্ড) পাসের স্বীকৃতি পান। ইন্টারমিডিয়েটেও পড়েছেন ওই কলেজে। তারপর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে। ১৯৩৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ অনার্স পাস করেন।

১৯৩৫ সালে ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য বিলেত যান। ১৯৩৬ সালে তিনি পিতার ইচ্ছানুযায়ী সরকারি চাকুরির যোগ্যতা অর্জনের জন্য আই. সি. এস পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন। ব্যারিস্টারি পড়া অব্যাহত রাখলেন। লন্ডনে এ সময় ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে গড়ে ওঠে লন্ডন মজলিস। জ্যোতি বসু মজলিসের প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষে মত গঠন করা এবং চাঁদা সংগ্রহ ছিল তার মুখ্য কাজ। ১৯৪০ সালে তিনি ব্যারিস্টার হয় দেশে ফেরেন।

রাজনীতির সঙ্গে তার পরিবারের তেমন সংযোগ ছিল না। তবে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহমর্মিতা ছিল তাদের পক্ষ থেকে সব সময়।

'১৯১৩-১৪ সালে বিপ্লবী মদনমোহন ভৌমিক নিশিকান্ত বসুর বাড়িতে বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। এখানে অস্ত্রও লুকিয়ে রাখতেন। পুলিশের খানাতল্লাশীর সময় জ্যোতি বসুর মা তার শাড়ির ভাঁজে অস্ত্রটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। তার বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার ডুমনিতে। ১৯০৫ সালে তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১৩ সালে প্রথম গ্রেফতার। তখন তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। সাক্ষ্য সাবুদ যোগাড় করতে না পেরে পুলিশ শেষ পর্যন্ত মামলা তুলে নেয়। এরপর তিনি আত্মগোপন করলেন। ১৯১৪ সালে অসুস্থ অবস্থায় আবার গ্রেফতার হলেন। দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় তার দশ বছর সাজা হয়। আন্দামানে দ্বীপান্তরে থাকার সময় তার ওপর অকথ্য অত্যাচার হয়। জেল থেকে ছাড়া পেয়েও তিনি বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে কাটান। ১৯৫৫ সালে তার জীবনাবসান হয়।'

এই ঘটনা জ্যোতি বসু ছোট বেলা থেকে মা-বাবার কাছে প্রায়ই শুনতেন। এই বিপ্লবীর জীবন কাহিনীই জ্যোতি বসুর মানস-চেতনায় দেশপ্রেমের বীজ বুনে। সেই স্কুল জীবন থেকে ভাবতে থাকেন দেশ ও দেশের মানুষের কথা। চিন্তা করতে থাকেন কি করে মানুষের কল্যাণ করা যায়! ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় শরৎ চন্দ্রের 'পথের দাবি'। ওই বছরই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এ সময় তিনি পথের দাবি গোপনে সংগ্রহ করে পড়েন।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধির অনশনের সময় একদিন তিনি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে ওই অনশনে যুক্ত হন। এ সময়ই তিনি অক্টরলোনি মনুমেন্টে (শহীদ মিনার ময়দান) সুভাষ বসুর ভাষণ শুনতে গেলেন খদ্দর পরে। সেদিন পুলিশ লাঠিপেটা শুরু করলে তার মনে পলায়নের পরিবর্তে মোকাবেলার অনুভূতি জেগে উঠেছিল। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'সেটাই বোধহয় রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমার প্রথম প্রকাশ্য প্রতিবাদ'। কলকাতার সিনিয়র ক্যামব্রিজ কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়াশুনাকালীন তিনি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। শৈশবকাল থেকে তিনি বিপ্লবীদের জীবনী পড়া পছন্দ করতেন। একনাগাড়ে জানতে শুরু করেন ভারতের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের সংগ্রামী জীবনের কথা। এক্ষেত্রে তার কলেজ শিক্ষক অজিত রায় সহযোগিতা করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য পড়াশুনাকালীন তিনি ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বিষয়ে পড়াশুনা অব্যহত রাখেন।

জ্যোতি বসুর আত্মীয়া ইন্দুসুধা ঘোষ ছিলেন শান্তিনিকেতনে আচার্য নন্দলাল বসুর ছাত্রী। তিনি প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসতেন। নারীশিক্ষা মন্দিরে অধ্যক্ষ ছিলেন বহুদিন। জ্যোতি বসুর তরুণ বয়সে ইন্দুসুধা ঘোষ ছিলেন এক আদর্শবান মানুষ। তার রাজনীতি ও আদর্শের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন।

ব্রিটিশ-ভারতে বিলেতি শিক্ষার সামাজিক ও পেশাগত মূল্য ছিল অসীম। জ্যোতি বসুর বাবা সেই কারণেই উচ্চ শিক্ষার জন্য ছেলেকে বিলেত পাঠান। তাই ১৯৩৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে তিনি লন্ডন চলে যান আইন শিক্ষার জন্য। লন্ডনে এসে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ১৯৩৬-এ ভূপেশ গুপ্ত পড়তে এলেন লন্ডনে। লন্ডনের একটি বাড়িতে ভূপেশের সঙ্গে জ্যোতি বসুর প্রথম পরিচয়। দেশ থেকে ভূপেশ গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি চিঠি সঙ্গে করে নিয়ে যান। প্রায় একই সময়ে স্নেহাংশু আচার্য এসে উপস্থিত হন লন্ডনে। ভূপেশের সঙ্গে জ্যোতি বসুও দেখা করলেন ব্রিটেনের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা হ্যারি পলিট, রজনী পাম দত্ত, বেন ব্র্যাডলে প্রমুখের সঙ্গে। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ ইন্ডিয়া লীগ এবং ভারতীয় ছাত্রদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা করতেন।

মূলত এ সময় থেকেই জ্যোতি বসু কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। লন্ডনে ভারত লীগ ও ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস ইন গ্রেট ব্রিটেনের সদস্য ও ভারত মজলিসের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে পালন করেন। ১৯৩৭ সালেই তিনি ইন্ডিয়া লীগের সদস্য হন। ১৯৩৮ সালে জ্যোতি বসু ও তার সহকর্মীদের উদ্যোগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ব্রিটেন সফরের সময় এক সভার আয়োজন করা হয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের লন্ডন সফরকালেও একই ধরনের উদ্যোগ নেন জ্যোতি বসু। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গঠনই ছিল ইন্ডিয়া লীগের কার্যক্রম। এই সময়ে লন্ডন, ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ডে তৈরি হয় কমিউনিস্ট গ্রুপ। তখন প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি করা যেত না, কারণ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল।

বিশ্বরাজনীতি তখন তিনটি ধারায় প্রবাহিত। একদিকে নাৎসি ও ফ্যাসিবাদী শক্তির প্রসার, অন্যদিকে কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব বৃদ্ধি। একই সময় পুঁজিবাদি গণতান্ত্রিক শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে। পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠে। ওই সময় সোভিয়েত রাশিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে

সাহায্য করে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ১৯৪০ সালে জ্যোতি বসু দেশে ফিরে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে সদস্য পদ নিলেন। একপর্যায়ে পার্টি থেকে তাকে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দায়িত্ব দেয়া হল। শুরু করেন শ্রমিক আন্দোলন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি শ্রমিক নেতা হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেন।

এই সময়ে বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন হয়। হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধের চরিত্র গ্রহণ করে। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘ। জ্যোতি বসু হন তার সম্পাদক।

১৯৪১ সালে তিনি বিয়ে করেন বাসন্তী (ছবি) ঘোষকে। বিবাহের অল্পদিন পরে ওই বছর টাইফয়েডে মারা যান বাসন্তী ঘোষ। কিছুদিন পর তার মায়ের মৃত্যু হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি গড়ে তোলেন বেঙ্গল আসাম রেল রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। তিনি এই ইউনিয়নের সম্পাদক নির্বাচিত হন। জ্যোতি বসু ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় কংগ্রেসের হুমায়ুন কবীরকে আট হাজার ভোটে পরাজিত করে বিধায়ক নির্বাচিত হন তিনি। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি মোট তিনটি আসন পেয়েছিল। জ্যোতি বসুর সঙ্গে দার্জিলিং কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন অপর কমিউনিস্ট নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়।

নৌ-বিদ্রোহ, ডাক ধর্মঘট, বন্দী মুক্তি আন্দোলন, রশিদ আলি দিবস সব মিলিয়ে উত্তপ্ত বাতাবরণ। এহেন পরিবেশে ১৯৪৬ সালের ১৪ মে নবগঠিত প্রাদেশিক আইনসভার প্রথম বৈঠক বসে। এই দিন রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয়ে জ্যোতি বসু একটি মূলতবি প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়। পরে সেই মূলতবি প্রস্তাব পুনর্বিচারের জন্য অস্থায়ী অধ্যক্ষ ডি গ্ল্যাডিং-এর নিকট আবেদন জানান, কিন্তু গ্ল্যাডিং এই প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানান। জুলাই মাসে বাজেট অধিবেশন বসলে প্রথমেই বন্দী মুক্তির প্রসঙ্গে আইনসভা সোচ্চার হয়। জ্যোতি বসু পুনরায় মূলতবি প্রস্তাব উত্থাপন করলে অধ্যক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ জানতে চাইলে, মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কিছু বলতে যান। জ্যোতি বসু উত্তরে বলেন যে, তিনি অধ্যক্ষের রুলিং মেনে চলবেন, মুখ্যমন্ত্রীর নয়। কংগ্রেসের কিরণশঙ্কর রায়, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সদস্য জ্যোতি বসুকে সমর্থন করেন এবং বাইরে অপেক্ষমান হিন্দু-মুসলমান ছাত্র শোভাযাত্রার কাছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ জানান। এই নিয়ে বিধানসভায় বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ২৯ জুলাইয়ের ডাকা ধর্মঘটে অচল সারা বাংলাদেশ। অচল বিধানসভাও। কুখ্যাত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সামসুদ্দোহা গ্রেফতার করলেন জ্যোতি বসুকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বসুর কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেন। জ্যোতি বসু, রূপনারায়ণ রায়, রতনলাল ব্রাহ্মণরা বিধানসভায় তুলছেন জমিদারী প্রথা বিলোপের দাবি, চটকল জাতীয়করণের দাবি, কৃষকদের বিনামূল্যে জমি বিতরণের দাবি। প্রতিটি বিষয়েই নতুন কথা যা আগে কেউ কখনও শোনেনি। প্রতিটি বিষয়ে বিকল্প বক্তব্য। জ্যোতি বসু উপস্থিত করছেন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী।

সোহ্‌রাওয়ার্দী এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ১৫ আগস্টের মধ্যে রাজবন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেন। বন্দীরাও মুক্তি পান। উল্লেখ্য, এই বন্দীমুক্তির ব্যাপারে জ্যোতি বসু ও কমিউনিস্ট পার্টিই মূলত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং আইনসভায় তারা কংগ্রেসের সহায়তাও পেয়েছিলেন।

জ্যোতি বসু ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিধানসভায় ভাষণ দেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণে কাজ করেন। স্নেহাংশু আচার্যের সঙ্গে ছুটে যাচ্ছেন ময়মনসিংহে হাজং যোদ্ধারের পাশে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জ্যোতি বসু দ্বিতীয় বিয়ে করেন কমলা বসুকে।

স্বাধীন দেশে বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনেই জনসাধারণের উপর কংগ্রেসী সরকারের পুলিশী দমন-পীড়নের সমালোচনা করেন। কিছু দিন পর কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে গ্রেফতার করা হয় জ্যোতি বসুকে। বিনাবিচারে ৩ মাস আটক থাকার পর মুক্তি পান। এরপর তিনি পার্টির পরামর্শে আত্মগোপনে চলে যান। 'বকুল' ছদ্মনামে গোপনে পার্টি সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছেন নেতৃত্বের কাছে। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে রান্না করা, ঝাঁট দেওয়া, বাসন ধোয়া ইত্যাদি কাজও করেছেন তিনি। তেলেঙ্গানার সংগ্রামীদের মুক্তির দাবিতে ছুটে গিয়েছেন জওহরলাল নেহরুর কাছে। বিধায়ক হিসাবে প্রাপ্য অর্থ তুলে দিচ্ছেন পার্টি তহবিলে এবং পার্টির ভাতায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করছেন শৃঙ্খলার সঙ্গে।

১৯৫১ সালে দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকার যাত্রা শুরু হলে জ্যোতি বসু হন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। জ্যোতি বসুর একমাত্র ছেলে চন্দন বসু জন্ম নেন ১৯৫২ সালে। স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচনে ১৯৫২ সালে বরানগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ডা. বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে পরাস্ত করে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে কমিউনিস্টদের আসন সংখ্যা বেড়ে হল ২৮টি।

১৯৫৩ সালের ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের সময় সময় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। ওই সময় শিল্পে শান্তিরক্ষার নামে কালাকানুন আনার কঠোর বিরোধিতা করে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়কে বলেছিলেন 'আইনের শাসন কাকে বলে আপনি জানেন না। আপনি একজন স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছাচারী শাসন বন্ধ করুন। ১৯৫৪ সালে বিধানসভায় বসে শিক্ষক আন্দোলনের উপর দমন-পীড়নের নিন্দা জানিয়ে জ্যোতি বসু শিক্ষকদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারপক্ষকে আহবান জানান। বিধানসভা থেকে বেরোতেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে দু'দিন জেলে আটকে রাখে। ১৯৫৩-৫৪ সালে ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলনে তিনি পশ্চিমবঙ্গ পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বরানগরে কংগ্রেস প্রার্থী কানাইলাল ঢোলকে পরাস্ত করে তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হলেন জ্যোতি বসু। ১৯৫৮ সালে তিনি প্রথম কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবিতে বিধানসভায় আলোচনা করেছিলেন। খাদ্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সরকারের নৃশংস বর্বরতা ও ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দেন। ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসী গুণ্ডারা বরানগরে তার উপর হামলা করে। সহকর্মীরা তাকে হামলা থেকে রক্ষা করতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন।

ষাটের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে স্ট্যালিনের ভাবমূর্তি নষ্ট করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত শুরু হয়। এ অবস্থায় ১৯৬১ সালে ভারতবর্ষের অবিভক্ত পার্টির তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। এ দলে জ্যোতি বসু ছিলেন। তারা সুশলভ ও পনোমারিয়েভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জ্যোতি বসু সোভিয়েত নেতাদের কাছে জানতে চান, স্ট্যালিনের সময় আপনারাই তো নেতা ছিলেন। তখন সমালোচনা করেননি কেন?

১৯৬১ সালে অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াদাতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ডাঙ্গের নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে বত্রিশ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য ওয়াকআউট করেছিলেন জ্যোতি বসু তাদের মধ্যে ছিলেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে জ্যোতি বসু চতুর্থবারের জন্য নির্বাচিত হন।

১৯৬৩ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে পার্টির বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবেই দু'দেশের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে নিতে হবে। এজন্য কংগ্রেস সরকার তাকে গ্রেফতার করে। প্রায় এক বছর পর তিনি মুক্তি পান। জেলে থাকাকালীন সময় তার বাবা মারা যায়।

১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত তেনালী কনভেনশনেরও অন্যতম শীর্ষ সংগঠক ছিলেন জ্যোতি বসু। ওই কলকাতায় পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন তিনি। এই কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি তথা পলিট ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে সি. পি. আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র পিপলস ডেমোক্র্যাসি আত্মপ্রকাশ করলে জ্যোতি বসু হন তার প্রথম সম্পাদক। ১৯৬৭ সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে বাম হঠকারিতার বিরুদ্ধে যে লড়াই সংগঠিত হয়েছিল বসু ছিলেন তার সামনের সারিতে। ১৯৬৭ সালে বরানগর কেন্দ্রে কংগ্রেসের অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে হারিয়ে তিনি নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে বরানগরে কংগ্রেসের অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে জনগণ জ্যোতি বসুকেই আবারো জয়ের মালা পরান। তার জনপ্রিয়তার কারণে ১৯৭০ সালে পাটনা স্টেশনে আনন্দমার্গীরা তাকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অল্পের জন্য বেঁচে যান তিনি।

১৯৭১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্যামপুকুরে হত্যা করা হয় শ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্ত বসুকে। ওই বছর অজয় মুখার্জিকে পরাজিত করে আবারো জ্যোতি বসু নির্বাচিত হলেন। কিন্তু সর্বাধিক আসন পাওয়া সত্ত্বেও সি. পি. আই (এম)-কে সরকার গঠনের জন্য ডাকলেন না রাজ্যপাল। ১৯৭২ সালে কংগ্রেস নির্বাচনের নামে পুরোপুরি প্রহসন শুরু করে। জ্যোতি বসু ওই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেন। পরে তিনিই নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের আবির্ভাব। সাতগাছিয়া কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিধানসভায় ফিরে এলেন জ্যোতি বসু। এবার তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তখন তার বয়স ৬৩ বছর।

জ্যোতি বসু মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার। নকশালপন্থীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১৭,০০০ রাজনৈতিক বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়। ১০,০০০ মামলা প্রত্যাহার করা হয়। রাজনৈতিক কারণে কর্মচ্যুত প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীর চাকুরি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

অগ্রাধিকার পেয়েছিল ভূমি সংস্কারের কাজ। চালু হয় অপারেশন বর্গা। ফিরিয়ে দেওয়া হয় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। বসু ঘোষণা করেন, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে পুলিশী হস্তক্ষেপ ঘটবে না। তারই মন্ত্রিসভা নিয়মিত পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন।

১৯৭৮ সালেই পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়। এই বন্যার মোকাবিলায় আশ্চর্য সাফল্য দেখিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পুনরায় দিল্লিতে ক্ষমতায় যায়। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতি বসুর বিরাট ভূমিকা ছিল কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটি সর্বভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে তুলে নিয়ে আসা। বৃহৎ শিল্প স্থাপনে কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রথা, মাসুল সমীকরণ নীতি, রাজ্যগুলির আর্থিক সামর্থ্যকে শুকিয়ে

মারার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বসু ছিলেন সরব। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৩ সালে সারকারিয়া কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। ১৯৮৫ সালেই বামফ্রন্ট সরকার যৌথ উদ্যোগে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে হলদিয়া প্রকল্পও রূপায়িত হয় কেন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়াই।

১৯৮৬ সালে দার্জিলিং জেলায় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ নেয়। এই সময়ে জ্যোতি বসুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় রাজ্যভাগ প্রতিহত করা যায় এবং গঠিত হয় দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ। তিনবিঘা চুক্তি সম্পাদন ও ফারাক্কা জল চুক্তির বিষয়ে জ্যোতি বসুর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

১৯৯৬ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে জ্যোতি বসুকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব উঠলেও তাতে তার দল সায় দেয়নি। পরে তাকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তাতেও সায় দেয়নি তার দল।

২০০০ সালের নভেম্বরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নেন। তখনই তিনি বলেছিলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নিচ্ছি তবে রাজনীতি থেকে নয়। কমিউনিস্টরা অবসর নেয় না। যতদিন শরীর অনুমতি দেবে ততদিন মানুষের মুক্তির সংগ্রামে কাজ করে যাবো।'

বাইরে থেকে বামপন্থীদের সমর্থনের ভিত্তিতে ২০০৪ সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন 'ইউ. পি. এ' সরকার গঠিত হয়। এই সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জ্যোতি বসু ও হরকিষাণ সিং সুরজিতের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ২০০৫ সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-র অষ্টাদশ কংগ্রেসে জ্যোতি বসু পলিটব্যুরোয় পুনঃনির্বাচিত হন। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি প্রচারাভিযানে অংশ নেন। ২০০৮ সালে কোয়েম্বাটোরে অনুষ্ঠিত সি. পি. আই (এম) উনবিংশ কংগ্রেসে তিনি পলিটব্যুরোর স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকে তার শরীর ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। ২০০৯ সালে ইন্দিরা ভবনের বাইরে বেরোনোর মতো অবস্থা থাকলো না। তবুও সেখানে বসেই পার্টির তথা সরকার পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, নানা ধরনের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিতে তিনি অংশ নিয়েছেন। সারা জীবনে জ্যোতি বসু অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'যত দূর মনে পড়ে'। কমরেড জ্যোতি বসু ২০১০ সালে ৯৭ বছর বয়সে ১৭ জানুয়ারি সকাল ১১.৪৭ মিনিটে সল্ট লেকের AMRI Hospital'এ মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. জ্যোতি বসু– যতদূর মনে পড়ে, রাজনৈতিক আত্মকথন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৬ সাল।

২. রাজনীতির জ্যোতি বসু– রেহমান শামস, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০০৪ সাল।

৩. বাংলার বিধানসভা ও সংসদীয় রাজনীতি (১৮৬২ থেকে ১৯৫১), সত্যব্রত দত্ত, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫ সাল।

৪. দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি ২০১০ সংখ্যা।

৫. সাপ্তাহিক একতা, ২৩ জানুয়ারি ২০১০ সংখ্যা।

মনোরমা বসু মাসিমা



চন্দ্রদ্বীপ। বরিশালের পূর্বনাম। এটি ছিল তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী অঞ্চল। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগ্রামে বরিশালের অবদান নানাদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতম। বরিশালের বানরীপাড়া ছিল সশস্ত্র বিপ্লববাদীদের তীর্থস্থান। বানরীপাড়ার পরে স্বরূপকাঠীর নাম উল্লেখযোগ্য। মূলত বরিশালের বানরীপাড়াই বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি ছিল। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে বানরীপাড়া ও স্বরূপকাঠী সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে। নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী কমিউনিস্টরা। তাদের মধ্যে মনোরমা বসু মাসিমা অন্যতম।

বানারীপাড়া ও স্বরূপকাঠীর বুক চিঁড়ে বয়ে গেছে বিখ্যাত সন্ধ্যা নদী। নদীর দুই কূল ঘেঁষে রয়েছে অসংখ্য গ্রাম। নরোত্তমপুর তার মধ্যে একটি। বানারীপাড়া থানার নরোত্তমপুর গ্রামে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন-সংগ্রামের বহু নেতা-কর্মী ও সংগঠকের জন্ম। এ গ্রাম বানারীপাড়া থানার দেশপ্রেমিকদের তীর্থস্থান।

উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, নারীমুক্তি আন্দোলন ও মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম পথিকৃৎ মনোরমা বসু মাসিমার জন্ম ১৮৯৭ সালের ১৮ নভেম্বর। বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার নরোত্তমপুর গ্রামে। মা প্রমোদ সুন্দরী। বাবা নীলকণ্ঠ রায়। তার জন্মের ১১ বছর পর নীলকণ্ঠ রায় মারা যান। মনোরমার একটি ছোট ভাই ছিল। বিধবা মা দুই সন্তানকে তাই বেশি লেখাপড়া করাতে সক্ষম হননি। পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। তারপর পাঠশালা ও প্রাইমারি স্কুল। এরপর তার আর স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। মাত্র ১৪ বছর বয়সে গৌরনদীর বাঁকাই গ্রামের জমিদারপুত্র চিন্তাহরণ বসুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। চিন্তাহরণ বসু ছিলেন উদারমনা ও প্রগতিবাদী। স্বামীর সহযোগিতায় ও সমর্থনে মনোরমা বসু স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। সংসারধর্ম পালনের পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজেও যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯০৫-১১ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তিনি অংশ নেন। মিছিলের মধ্যে তিনি মানুষের হাতে হলদে সূতার রাখী বেঁধে দেশমাতৃকার জন্য বিপ্লবী কাজে উৎসাহ যোগাতেন। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরামের ফাঁসি তাকে প্রচণ্ডভাবে দুঃখ দেয় এবং আলোড়িত করে। মনে মনে শপথ নেন, এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তিনি ভবিষ্যতে রাজনীতি করবেন।

Monoroma Basu did not get any institutional education, she was very liberal in her thoughts and activities. Considering the conservative zamindar family as detrimental for proper upbringing of her children and for her active involvement in political activities, she left the village and started living in Barisal town.

১৯২১-২২ সালের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলের কর্মকাণ্ডে মাসিমা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ১৯২৪ সালে মহাত্মা গান্ধী বরিশালে আসেন। এ সময় মনোরমা বসু মহাত্মা গান্ধী'কে দেখার জন্য বরিশালে আসেন। মহাত্মা গান্ধী'র প্রাণবন্ত বক্তব্য শুনেন। আরো শুনেন মুকুন্দদাসের 'মাতৃপুঁজা' যাত্রাপালার সেই মরণজয়ী 'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে' জাগরণী সঙ্গীত। এরপর থেকে মাসিমা মুকুন্দদাসের কাশিপুরের কালী মন্দিরে যাওয়া আসা শুরু করেন। সেখানে পেয়ে যান– শতদলবাসিনীকে। শতদলবাসিনী মুকুন্দদাসের সহধর্মিনী ছিলেন। তিনি মাসিমা'কে আদর-স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে যুক্ত হয়ে পড়লেন নারী সমাজকে সচেতন করে গড়ে তোলার কাজে। তখন থেকে মাসিমা কংগ্রেসের কর্মকাণ্ডে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হতে থাকেন। এ সময় মাসিমা বরিশাল শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

১৯৩০ সাল। তখন সারা ভারত জুড়ে চলছিল আইন অমান্য আন্দোলন। বঙ্গ প্রদেশেও এর উত্তাল ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। এই আন্দোলনে মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ব্রিটিশ পুলিশ মনোরমা বসুকে গ্রেফতার করে। জীবনের প্রথমবারের মতো কারাবন্দী হন তিনি। এ সময় তার ৬ মাস জেল ও ১৫০ টাকা জরিমানা ধার্য করে ব্রিটিশ বিচারক। প্রায় ছয় মাস পর মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আরও সক্রিয়ভাবে শুরু করেন রাজনীতি। গড়ে তুলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। সেই সঙ্গে পূর্ণোদ্যমে শুরু করেন মহিলাদের সংগঠিত করার কাজ। এই জন্য তিনি গড়ে তোলেন মহিলা সমিতি। এই সমিতি পরিচালনাকালে তিনি বিপ্লবী গ্রুপের সাথে পরিচিত হন। ১৯৩৩-৩৪ সালে তিনি পাশাপাশি নিজ বাড়ির বারান্দায় চালু করেন মেয়েদের বিদ্যালয়। নিজের মেয়েসহ আরো ৫ জন মেয়েকে নিয়ে শুরু করেন স্কুলের কার্যক্রম। নিজের ব্যবহৃত ৫ ভরি সোনা ও মুষ্ঠি চাল বিক্রি করে এই স্কুলটি নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই বিদ্যালয়ই বিখ্যাত 'মাতৃমন্দির' হিসেবে পরিচিতি পায়।

চল্লিশ দশকের আন্দোলনমুখর দিনগুলোতে মনোরমা বসু ভীষণভাবেই কর্মব্যস্ত থাকেন। এ সময় তিনি ব্রিটিশ বিরোধী জনমত গঠনে, কংগ্রেসের কাজে, মহিলাদের সংগঠিত করার কাজে, মেয়েদের শিক্ষাদানে ও মানুষের অধিকার স্বাধীনতার আন্দোলনে যুক্ত থাকেন। তার প্রাণপণ চেষ্টায় বরিশালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও তিনি এ দশকে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের কাজেও যুক্ত ছিলেন।

১৯৪৩-৪৪ সাল। ব্রিটিশ শাসকদের অবহেলার কারণে সারা বাঙলায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাম-বাংলার আনাহারী মানুষ খাবারের জন্য ছুটছে কলকাতার দিকে। ওলিতে-গলিতে, রাজপথে-ফুটপথে অগণিত মানুষ ক্ষুধার তাড়নায়-যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কাক ও কুকুরের সঙ্গে বুভুক্ষু মানুষ অখাদ্য-কুখাদ্য খুঁজে ফিরছে ডাস্টবিনে-নর্দমায়। এ সময় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজেও তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে দাঁড়ান আর্তমানুষের পাশে। সমগ্র বরিশাল জুড়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে শত শত মহিলাদের নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ান।

সারা বাঙলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন বরিশালের দুই কৃতি নেত্রী– মণিকুন্তলা সেন ও যুঁইফুল বসু। তাদের সহযোগিতায় মাসিমা বরিশালের গ্রামাঞ্চলেও এই সমিতির কাজ ও সংগঠন বিস্তৃত করেন। মূলত বরিশালে মাসিমার নেতৃত্বে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে ওঠে। তিনি বরিশাল জেলার সম্পাদক ও সংগঠক ছিলেন।

১৯৪৪ সালের মে মাসে বরিশালে নিখিলবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সকল কাজ তার নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের সম্মেলনেও মাসিমা একজন সংগঠকের ভূমিকা রাখেন। এই সম্মেলনের পর তিনি ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুধু বরিশালে নয়, বরিশালের বানারীপাড়া, স্বরূপকাঠি, নাজিরপুর, কাউখালী, ঝালকাঠী, পিরোজপুর, মাটিভাঙ্গার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন।

১৯৪৭ সাল। দেশভাগ হল। জন্ম নিল সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান। এ সময় পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও হামলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। মাসিমাকে দেশ ত্যাগের জন্য অনেকেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু দেশমাতৃকাকে ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না বলে মনস্থির করলেন। নিজ মা-মাটিতে অবস্থানের জন্য অনড় থাকেন মনোরমা বসু।

১৯৪৮ সালের ৫ জুন হঠাৎ চালের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এর প্রতিবাদে বরিশালে আন্দোলন গড়ে তোলেন তিনি। হাজার হাজার মানুষ এ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশও সমবেত হয়। ব্রজমোহন কলেজের ছাত্ররা যোগ দেয় বিক্ষোভে। অচিরেই শুরু হয় লাঠিচার্জ। গ্রেফতার করা হয় মনোরমা বসু মাসিমাকে। রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের ফলে ভেঙ্গে দেওয়া হয় মাতৃমন্দির। চার বছর কারাভোগ শেষে ১৯৫২ সালের ২৫ এপ্রিল মুক্তি পান।

১৯৫০ সালে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধালো। দাঙ্গা বিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তুললো কমিউনিস্ট পার্টি। এ সময় বরিশালের প্রায় সকল কমিউনিস্ট নেতাকে সরকার গ্রেফতার করে। মুকুল সেন ও জগদীশ আইচকে গ্রেফতার করতে সরকার ব্যর্থ হয়।

মুক্তিলাভের পর মনোরমা বসু মাসিমা ৫২'র মে মাসে ইস্পাত দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ভেঙ্গে ফেলা মাতৃমন্দিরকে পুনরায় গড়ে তোলেন। এ সময় বিপ্লবী সত্যেন সেন গানের মাধ্যমে বরিশালে মনোরমা বসু মাসিমার 'মাতৃমন্দির'র জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিও তাকে এ কাজে সহযোগিতা করে।

সাথে সাথে শুরু করেন পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নানা কার্যক্রম। যুক্ত হন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কাজে। ১৯৫৪ সালে তার স্বামী চিন্তাহরণ বসু মারা যায়। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর পরই মনোরমা বসু মাসিমাকে ঘিরে আবার শুরু হয় পুলিশি হয়রানি ও ষড়যন্ত্র। কৌশলে গ্রেফতার এড়ান তিনি। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন তিনি আত্মগোপনে থাকেন। ইতোমধ্যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে সদস্য পদ পান। আত্মগোপনে থাকাকালীন সময়ে বরিশালের বিভিন্ন জায়গায় পার্টির কাজে নিজেকে

নিয়োজিত করেন। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তার ওপর থেকে গ্রেফতারী পরোয়ানা উঠে যায়। এরপর তিনি নিজ বাড়িতে মাতৃমন্দির আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়, পল্লী কল্যাণ অমৃত পাঠাগার ও মুকুল মিলন খেলাঘর গড়ে তুলেন।

স্বৈরশাসক আইয়ুব খান, ক্ষমতা দখলের মাত্র ২ মাস পর ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। এই কমিশন ১৯৫৯ সালে আগস্ট মাসের মধ্যে একটি শিক্ষা রিপোর্ট প্রণয়ন করে। ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত এই রিপোর্টে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সাধারণ, পেশামূলক শিক্ষা, শিক্ষক প্রসঙ্গ, শিক্ষার মাধ্যম, পাঠ্যপুস্তক, হরফ সমস্যা, প্রশাসন, অর্থ বরাদ্দ, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। এতে আইয়ুব খানের ধর্মান্ধ, ধনবাদী, রক্ষণশীল, সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাসংকোচন নীতির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছিল। ছাত্র ইউনিয়ন আইয়ুবের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে একুশ উদযাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে এ ধরণের উদ্যোগ অব্যাহত থাকে। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র ইউনিয়নই ছিল আন্দোলনের মূল পরিচালক। আইয়ুব সরকার এই রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণ করে এবং তা ১৯৬২ সাল থেকে বাস্তবায়ন করতে শুরু করে। এ সময় বরিশালে মাসিমা শত শত ছাত্রীদেরকে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করে দেন। তিনি ছাত্র ইউনিয়নকে এবং শিক্ষা আন্দোলনকে সংগঠিত করার ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। ১৯৬২-৬৮ সাল পর্যন্ত স্বৈরাচার আইয়ুব খান বিরোধী সকল আন্দোলনে তিনি ছাত্র-যুব ও পার্টির সাথে যুক্ত হয়ে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। এ সকল আন্দোলনে তিনিই একমাত্র মহিলাদেরকে সংগঠিত করণে আবদান রাখেন।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গাবিরোধী কর্মকাণ্ডে মাসিমা জোরদার দায়িত্ব গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে পালন করেন। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে তার ভূমিকা চিরস্মরণীয়। তিনি সমগ্র বরিশাল জুড়ে এ সময় আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করেন। ১৯৭০ সালে তিনি ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় মহিলাদের সংগঠিত করে ত্রাণকার্য বিতরণ ও আর্তমানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ৭০-এর নির্বাচনে তিনি পার্টির প্রার্থীর পক্ষ্যে নির্বাচনী প্রচারণা চালান। এ সময় তিনি পিরোজপুরের নিরোদ নাগের সাথেও পার্টির কাজ করেন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের দিনগুলোতে মহিলাদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মনোরমা বসু। স্বাধীনতার পর বরিশালেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মনোরমা বসু মাসিমার দেশপ্রেম, সমাজসেবা, মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার কারণে ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে সব মানুষের কাছে তিনি মাসিমা হিসেবে পরিচিত হন। মূলত শত শত মেয়েরা যাদেরকে মাসিমা আদর-স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, তারাই তাকে মায়ের মত আপন ভেবে 'মাসিমা' বলে ডাকতো।

স্বাধীনতার পর মাসিমা পাকবাহিনীদের ভেঙ্গে দেয়া মন্দির ও স্কুল পুনরায় পুনর্গঠন করেন। ৭২ সালে তিনি বরিশালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের শাখা তৈরি করেন। মহিলা পরিষদের

সহ-সভাপতি হিসেবে তিনি বরিশালে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন। ৭৩-এর নির্বাচনে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেন। ৭৪-এর দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় আসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। ওই বছর ৮ মে তিনি মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে রাশিয়া সফর করেন। ৭৫-এর বাকশালে যোগদানের বিরোধীতা করেন। ১৫ আগস্টের পর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ও অস্থিরতার জন্য পার্টির সিদ্ধান্তে আত্মগোপনে যান। আত্মগোপনে থেকে তিনি খেলাঘর, ছাত্র ইউনিয়ন, মহিলা সমিতি ও উদীচীসহ আরো অনেক গণসংগঠনের কাজে যুক্ত থেকে ওই সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি সরাসরি যুক্ত থাকতে না পারলেও নেতা-কর্মীদের উৎসাহ যোগাতেন প্রতিনিয়ত। ১৯৮৬ সালের ১৬ অক্টোবর তিনি মারা যান। লাল সালাম মাসিমাকে।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. মনোরমা মাসিমা– সত্যেন সেন, প্রকাশক: কে এম ফারুক খান, ৬৭, প্যারিদাস রোড, ঢাকা, প্রকাশকাল ১৪ আগস্ট ১৯৭০।

২. মনোরমা বসু মাসিমা– বদিউর রহমান, প্রকাশক: আগামী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৩।

৩. মনোরমা বসু স্মৃতি ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা 'এক আলোর শিখা', প্রথম প্রকাশ ২০০৭।

৪. সাপ্তাহিক একতা, ১০ অক্টোবর ২০০৪।

৫. www.biplobiderkotha.com

মানবেন্দ্রনাথ রায়



পাখিরা যেমন বিস্তৃত সীমাহীন আকাশে পাখা মেলে স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়ায়, ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে মানুষও পাখির মতই বাঁচবে। সেখানে থাকবে না কোনো শোষণ, বৈষম্য অন্যায়-অবিচার, থাকবে না কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা। সব মানুষের একটি দেশ থাকবে, যার নাম হবে সাম্য-ভালবাসার পৃথিবী। এমন একটি মতাদর্শ যে মানুষটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার জন্য কখনো ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া কখনো বা এশিয়ার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই বিপ্লবীর নাম মানবেন্দ্রনাথ রায়।

ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবীর নাম সর্বজন স্বীকৃত, তাদের মধ্যে এম এন রায় প্রথমসারির একজন অন্যতম বিপ্লবী। তিনি একজন বিপ্লবী তাত্বিক ও দার্শনিক ছিলেন। শুধু সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতেই নয়, আর্ন্তজাতিক কমিউনিস্ট রাজনীতিতে তার অবদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমৃত্যু লড়াই করেছেন মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য। মাকর্সবাদী রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে গড়ে তুলেছিলেন নিজেকে।

এম এন রায়ের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৮৭ সালের ২২ মার্চ, পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বেলিয়া গ্রামে। পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান তিনি। কাদা মাটি দিয়ে যেমন সুন্দর করে কুমার মাটির পাত্র তৈরি করে, তেমনি উপযুক্ত পরিবেশও মানুষকে সঠিকভাবে বিকশিত করে। এম এন রায়ও ঠিক বড় হয়েছিল একটি কুসংষ্কার মুক্ত পরিবারে। যা তার চিন্তা-প্রজ্ঞাকে বিকাশিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এম এন রায়ের পড়াশুনা হাতেখড়ি পরিবারে। বাবার কাছে। তারপর প্রাইমারি পাঠ শেষে ১৮৯৭ সালে তার স্কুল জীবন শুরু হয়। স্কুলে পড়াশুনাকালীন সময় থেকেই তিনি রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি নানা বিষয়ে গভীরভাবে পড়াশোনা করতেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন সারা ভারতবর্ষকে আলোড়িত করল, তখন দেশ, মা, মাটির প্রতি তীব্র ভালোবাসা নরেন্দ্রনাথকে আঁকড়ে ধরলো। তাই পড়াশোনা ত্যাগ করে তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের বিপ্লবী অনুশীলন দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি বিপ্লবী দলের তুখোড় সংগঠক হয়ে উঠেন।

পরিবারের অনুরোধে তিনি ১৯০৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর আর তিনি প্রতিষ্ঠানিক পড়াশুনা করেননি। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তিনি সার্বক্ষণিকভাবে

বিপ্লববাদী অনুশীলন সমিতির কাজে যুক্ত হন। এই সময় তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করতে হলে অস্ত্রের প্রয়োজন। তার জন্য লাগবে অর্থ। এজন্য বিপ্লবীরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি পদক্ষেপ ছিল– ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি অর্থ লুট করা। আর এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন এম এন রায়। তাই তারই নেতৃত্বে ১৯০৭ সালে চিড়িং পোতা রেলস্টেশনে লুট করা হয়। যা ছিল ভারত উপমহাদেশে প্রথম কোনো রাজনৈতিক ডাকাতি।

১৯১০ সালে তিনি গ্রেফতার হন। তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারায় তিনি মুক্তি পান। জেল থেকে বের হয়ে কঠিন সংকটময় পথ পাড়ি দিয়ে ডাচ-ইস্ট-ইন্দোচীন প্রভৃতি বহু অঞ্চলে গিয়েছেন। সেখানে পৌঁছে বৈপ্লবিক সংগঠনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতেন।

তিনি ১৯১৩ সালে ইন্ডিয়া ইকুইটেবল ইনসুরেন্স কোম্পানিতে চাকুরি নেন। পরে চাকুরি ছেড়ে হোটেল খোলেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সৈন্যদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা। তখন তিনি পৃথিবীর নানা স্থান থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে দক্ষিণ এশিয়ায় মজুত করেন। এ সময়ে নরেন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন যে, দেশের মেহনতি কৃষক-শ্রমিকদের সুসংগঠিত না করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করা হবে ভুল।

১৯১৫ সালে নরেন্দ্রনাথ সি. মার্টিন ছদ্মনামে দেশ ত্যাগ করেন। নরেন্দ্রনাথ জার্মান হয়ে আমেরিকা আসেন। সেখানে এসে তিনি অতীতের সকল নাম মুছে নতুন আর একটি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। সে নামটি হচ্ছে এম এন রায় (মানববেন্দ্রনাথ রায়)। আর এ নামেই তিনি অদ্যবদি বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে পরিচিত। 'এই নাম তাকে ব্যর্থ অতীত থেকে রোমান্টিক ও কৃতিত্বপূর্ণ ভবিষ্যতে দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার ভাবনার জগতে এক নতুন দিক উন্মোচন হয়। তিনি যুক্তিবাদ ও বুদ্ধির ওপর সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করে তার জীবনকে বিকশিত করতে লাগলেন। এ সময় তিনি আমেরিকা ও মেক্সিকোতে ঘুড়ে বেড়িয়েছেন। ঠিক তখন স্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইভলিন ট্রেন্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। পরে তাকে বিয়ে করেন।

১৯১৬ সালে নিউইয়র্ক চলে আসেন। সেখানে তার সাথে দেখা হয় লালা লাজপত রায়ের। লালাজি ছিলেন একজন মার্কসপন্থী রাজনীতিক। এখানেই রায় মার্কসবাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং মার্কসবাদ চর্চা করতে লাগলেন। এভাবেই তিনি পেয়ে যান মানবমুক্তির এক আলোকিত দিক-নির্দেশনা। মার্কসবাদ খুব সহজেই আত্মস্থ করেন। লালাজির সাথে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তব্য দেন। একদিন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা শেষ করে ফিরার পথে গ্রেফতার হন। জামিনে ছাড়া পাবার পর মার্কিন গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে মেক্সিকোতে পালিয়ে যান। এখানেও কিছু দিনের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি পান। তিনি যেখানে গিয়েছেন সেখানকার ভাষা, সংস্কৃতি সহজেই রপ্ত করে নিতে পারতেন। এটা তার একটা অসাধারণ গুণ। তিনি স্পেনিশ ভাষা শিখে মেক্সিকোর পত্রিকায় লেখা লেখি করতেন। ফলে মেক্সিকোর বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদদের মধ্যে তার নাম ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে এবং কিছুদিরে মধ্যে সেখানকার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

১৯১৭ সালে মার্কিন আগ্রাসন মোকাবেলা করতে সোস্যালিস্ট পার্টি গড়ে তোলেন। তার একটি উদ্দেশ্যই ছিল সোসালিস্ট পার্টিকে শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের পার্টিতে রূপান্তর করা। এজন্য তিনি একটি ম্যানিফেস্টো রচনা করেন। এই ম্যানিফেস্টো সারা মেক্সিকোতে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। এদিকে রাশিয়াতে ঠিক ওই সময় লেলিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র কায়েম হয়।

সমাজতন্ত্র যে কেবলই স্বপ্ন নয়, বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব এটা পৃথিবীর সকল মানব জাতির কাছে প্রমাণিত হল। ফলে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন পাওয়া গেল।

১৯১৮ সালে মেক্সিকোর সোস্যালিস্ট পার্টির প্রথম সম্মোলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বসম্মতি ক্রমে রায় পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। ওই সম্মেলনে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ল্যাটিন আমেরিকান লীগ গঠন করা হয়। সেখানে আহ্বায়ক কমিটির সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন তিনি। একই সালে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির একজন নেতা মাইকেল বারোর সঙ্গে রায়ের পরিচয় হয়। রায় মাইকেল বারোর কাছ থেকে মার্কসবাদ, ইউরোপীয় দর্শন, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানার সুযোগ পান। ১৯১৯ সালে রায় বারোর সহযোগিতা নিয়ে সর্বসম্মতি ক্রমে সোস্যালিস্ট পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপদান করেন। এটাই ছিল রাশিয়ার বাইরে পৃথিবীর সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টি।

১৯২০ সালে রায় লেনিনের আমন্ত্রণে মস্কো আসেন। সেখানে রায়ের সঙ্গে লেনিন, ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ ও পরবর্তীতে জে. স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। রায় ও লেনিনের সাক্ষাত একটি উল্লেখ্যযোগ্য ঘটনা। স্বদেশ রঞ্জন দাস লেনিন ও রায়ের সাক্ষাত সম্পর্কে লিখেছেন, 'লেনিন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে রায়কে সম্বর্ধনা জানিয়ে ছিলেন প্রথম সম্ভাষণ হল- রায়ের ভয়মিশ্রিত বিস্ময় কেটে গেল। লেনিনের চোখে দেখলেন দুষ্টুমিভরা হাসির আভাস। এতদিন রায় লেনিনের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে শুনে এসেছিলেন মস্তিস্কের গুরুভারে লেনিনের হৃদয় মরে গিয়েছে। লেনিনের মানবিক কামনা-বাসনা ভাবাবেগ বলতে আর কিছুই নেই। লেনিন একটি যন্ত্র বিশেষ। কিন্তু এই ধারণা নিমেষেই দূর হয়ে গেল। যে হাসির আভাস লেনিনের মুখে ফুটে উঠল তাতে রায় স্পষ্ট বুঝলেন, এ হাসি উপহাসের হাসি নয়- এটি নিশ্চয়ই আশাবাদীর হাসি, মার্কসবাদ যে সর্বশেষ সত্য, কেবল তাই নয়- এর 'অবশ্যম্ভবী জয় সম্বন্ধেও স্থির বিশ্বাস'। লেনিন তার ঔপনিবেশিক সংক্রান্ত থিসিসটি রায়কে দেন এবং সমালোচনা ও পরামর্শ চান। উপনিবেশগুলোর বৈপ্লবিক কৌশল সম্পর্কে লেনিন যে থিসিস লেখেন তার সাথে রায় একমত পোষণ করেন নি।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতাবাদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে রায় আলাদাভাবে লিখিত বক্তব্য কংগ্রেসে পাঠ করেন এবং এ থিসিসটি কংগ্রেস লেনিনের থিসিসটির পরিশিষ্ট হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু লেনিন কংগ্রেসকে রায়ের থিসিসটিকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। এরপর তিনি ভারতে ফিরে আসেন।

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাশখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা হয়। যার সেক্রেটারি ছিলেন এম এন রায়। ১৯২২ সালে তৃতীয় বিশ্ব আন্তর্জাতিকের অধিবেশন বসেছিল মস্কোতে। সেখানে গান্ধীকে নিয়ে লেনিনের ও রায়ের মধ্যে মতপার্থক্য হয়। কারণ লেনিন গান্ধীকে বিপ্লবী ভাবতেন। লেনিনের ধারণা ছিল ইউরোপের মধ্যযুগের বিপ্লবীদের মতো গান্ধীও একজন বিপ্লবী। আর রায় গান্ধী সম্পর্কে বলেন 'গান্ধীর ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শ নিতান্তই-প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং লেনিনের এ ধারণা যুক্তি সংগত নয়।'

১৯২১ সালে এ পার্টি কমিউনিস্ট ইন্টান্যাশনাল এর অনুমোদন পায়। এই প্রবাসী পার্টির কাজ জার্মানিতেও সম্প্রসারিত হয়। এক্ষেত্রে এম এন রায় ভূমিকা রাখেন। জার্মানি থেকে ১৯২২ সালের ১৫ মে পার্টির পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকা ডাকযোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে পাঠানো হত। এক সময় এ পত্রিকা পুলিশের হাতে পড়ে। মুজফ্ফর আহ্মদ তখন পত্রিকার নাম পরিবর্তনের জন্যে এম এন রায়কে লেখেন। এম এন রায় পত্রিকাটির নতুন নামকরণ করেন।

একই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় আরো কয়েকজন মার্কসবাদে আকৃষ্ট হন। তাদের সাথেও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যোগাযোগ হয়। তারা হলেন, মুম্বাই-এর শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে, মস্কো থেকে কাবুলে আগত মোহাম্মদ আলি, পেশোয়ার ইসলামীক কলেজের অধ্যাপক গোলাম হোসেন প্রমুখ।

১৯২২ সালের ১৫ মে পার্টির প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নাম ছিল 'দি ভ্যানগার্ড অব দি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স'। পুলিশের নজর পড়ায় নাম বদলে হয় 'অ্যাডভান্স গার্ড'। তারপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসেবে 'দি ভ্যানগার্ড' প্রকাশিত হয়।

তিনি ১৯২৪ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সভাপতিমণ্ডলীর সম্পাদকও হন। ১৯২৪-১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিম ইউরোপে ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি জার্মান, ফ্রান্সে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পরিচালনার কাজ করেন। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে কার্যকরী সমিতির এক সভা বসে। এ অধিবেশনে এম এন রায় সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯২৭ সালের মে মাসে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে তার পরামর্শ গৃহীত হয়। চীন থেকে তিনি বার্লিন ও মস্কোতে যান। সেখানে এক বছর কাটান। এ সময় ইভলিন ট্রেন্টের সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তিনি মস্কোতে ফিরে আসেন। সেখানে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থার কার্যকরী সমিতির নবম সভাতে যোগদান করেন। সভা চলাকালীন সময়ে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে তিনি ভারতে চলে আসেন। আত্মগোপন অবস্থায় তিনি শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। রায় ১৯৩১ সালের ২১ জুলাই বোম্বাইয়ের এক হোটেল থেকে গ্রেফতার হন। পুলিশ রায়ের বিরুদ্ধে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪) দায়ের করেন। তাকে ১২ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে আপিল করা হলে ৬ বছর মেয়াদ যথাযথ ব্যবহার করেন। এ সময় তিনি জেলখানায় প্রচুর অধ্যয়ন এবং লেখালেখি করতেন। তিনি জেলখানাতে বসে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও বই রচনা করেন। রায় জেলে বসেই কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করার কথা ভেবেছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বোম্বাই থেকে Independent India নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকায় তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে লিখতেন।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন। রায় এ সম্পর্কে বলেন, 'বুদ্ধিজীবী ও ধনীদের হাতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থাকলেও জনগণ কংগ্রেসকে সমর্থন করে। কংগ্রেস হল ভারতীয়দের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কমিউনিস্টদের উচিত কংগ্রেসের মধ্য থেকেই কাজ করা এবং ধীরে ধীরে কংগ্রেসেকে মার্কসবাদী রাজনীতি গ্রহণ করানো। কিন্তু তার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল তা পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়। রায়ের সাথে গান্ধীর শুরু থেকেই মতপার্থক্য দেখা যায়। ফলে কংগ্রেসের মত একটি বুর্জোয়া শ্রেণীর দল মার্কসবাদকে প্রত্যাখান করেন।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গান্ধীকে সমস্ত ক্ষমতা অর্পন করা হয়। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষ বসু সভাপতি হয়। গান্ধীবাদীরা সুভাষ বসুকে বিরোধিতা করেন। পরে সুভাষ বসু কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৯ সালের ২৬ মার্চ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন নামে এক সংহতি গঠন করা হয়।

১৯৪০ সালে অক্টোবরেই রায় কংগ্রেসকে ত্যাগ করেন। এ বছরেই লীগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেস-এর সিদ্ধান্ত হল যে, লীগের সমস্ত সভ্য কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করবে এবং সংগঠনের নতুন নাম হবে 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পিপলস পার্টি'। ১৯৪০ সালে রুশ

জনগণকে আহ্বান জানান এবং বলেন, 'ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হোক, ইংল্যান্ড ও ভারতের ফ্যাসিস্ট এজেন্টরা নিপাত যাক, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে সমর্থন কর, দুনিয়ার গণতন্ত্রী এক হও, এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত কর, সোভিয়েত ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী বিশ্ব সংঘ গড়ে তোল।'

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিরোধীতা করার জন্য রায় ও র‍্যাডিক্যালদের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে র‍্যাডিক্যাল পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলনে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতে যে পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর হয় সে আশংঙ্কার কথা তিনি তার খসড়া সংবিধানের ভূমিকায় উল্লেখ করেছিলেন। তিনি মানবমুক্তির জন্য সারাজীবন কাজ করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন রক্তে মাংসে জাত বিপ্লবী।

১৯৪৭ সালের আগস্টে নতুন দার্শনিক মতবাদ রচনা করেন। যা নব্য মানবতাবাদ নামে পরিচিত। রায় নব্য মানবতাবাদের ২২টি সূত্র দেন। এ দর্শনের মূল কথা হল বিকশিত ব্যক্তিত্ববাদ। ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রে যে সকল বাধা রয়েছে তা এ দর্শন দূর করে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, নিজেকে শিক্ষিত, সংস্কৃত, অনুশীলিত করে বিকশিত করে গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে মানুষ মুক্ত হবে। কিন্তু তার এ চাওয়া আজও সফল হয় নি।

তিনি ১৯৫২ সালের জুন মাসে সকালে হাঁটতে গিয়ে পাহাড় থেকে ৫০ ফুট নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। মাসের পর মাস চিকিৎসা চলে। পরে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হন। আবার লেখার কাজে মন দেন। নেহেরু তার সঙ্গে দেখা করেন এবং রাষ্ট্রপতির তহবিল থেকে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এম এন রায়ের জীবনদর্শন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় তিনি কারও দ্বারা জীবনের সংকটময় পরিস্থিতেও প্রভাবিত হন নি। তিনি স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতেন। তিনি ছিলেন অসীম সাহসী। কোনো বাধা বিপত্তি তাকে কখনও দমিয়ে রাখতে পারেনি। রায় মানবজীবনকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে দর্শনের এক নতুন দিক উন্মোচন করছেন। যদিও আমাদের দেশে তার সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। আমরা আশা করবো তার সম্পর্কে এবং তার প্রকাশিত বইসমূহ সর্বসাধারণ জানার ও পড়ার সুযোগ পাবে। তার জীবনে একমাত্র ব্রত ছিল মানুষের সার্বিক মুক্তি। তার দেশ প্রেম ও বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা সমস্ত মানবজাতির কাছে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে।

১৯৫৪ সালের ২৫ জানুয়ারি হঠাৎ তার বুকের ব্যথা ওঠে। ঐদিন রাত ১১.৩০ কিংবদন্তী বিপ্লবী এম এন রায় মারা যান।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. ভারতের অস্ত্র বিপ্লব (১৯০২-১৯১৬)– ডা. তাজুল হোসেন, মানবতাবাদী প্রকাশন, আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা, প্রকাশকাল ২০০০।

২. এম এন রায়: শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ– সম্পাদনায় বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা, পরিবর্তন প্রকাশন সংস্থা, নয়া পল্টন, ঢাকা, প্রকাশকাল ১৯৮৭।

৩. স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের ভূমিকা– সুধাংশু দাশগুপ্ত, ন্যাশনাল বুকস এজেন্সি কলকাতা, প্রকাশকাল ২০০৯।

নলিনী দাস



ব্রিটিশ তাকে কালাপানি, আন্দামান, দ্বীপান্তর পাঠিয়েছে– এই কথাগুলো এক সময় মানুষের মনে প্রচণ্ড ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতো। কারণ এখানে গেলে কেউ আর কোনো দিন তার প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে আসতে পারতো না। কালাপানি, আন্দামান, দ্বীপান্তর এই তিনটি শব্দ দিয়ে মূলত: 'আন্দামান সেলুলার জেলকে' বুঝানো হয়েছে। এটা ছিল ব্রিটিশদের তৈরি করা দ্বিতীয় মৃত্যুকূপ। খোপ খোপ করা বিশাল এক কারাগার। দুর্ধর্ষ, সশস্ত্র বিপ্লববাদী বন্দীদের পিষে মারার জন্য এখানে পাঠানো হতো।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ভারত উপমহাদেশের মানুষকে শাসন করার জন্য শুরু থেকেই নানারকমের দমননীতির আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে জেলখানাগুলো ছিল তাদের এই দমননীতির প্রধান হাতিয়ার। আর আন্দামান সেলুলার জেল ছিল সবচেয়ে ভয়ংকর জেল। এক কথায় বলা যায়, মৃত্যু ফাঁদ।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, যারা সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ-শাসনকে উচ্ছেদ করতে চাইবে, তাদের মধ্য যারা ফাঁসিরকাষ্ঠ থেকে রেহাই পাবে তাদের সকলকে আন্দামানে পাঠানো হবে। বিংশ শতাব্দীতেও তাদের এই সিদ্ধান্ত বহাল ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে চল্লিশের দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ফাঁসিরকাষ্ঠ থেকে রেহাই পাওয়া প্রায় সকল সশস্ত্র বিপ্লবীকে আন্দামানে পাঠায়। এ সমস্ত বিপ্লবীদের মধ্যে বরিশালের নলিনী দাস অন্যতম।

নলিনী দাস, একটি নাম। বিপ্লব ও সংগ্রামের। যে নামটি শুনলে চেতনা মুহূর্তের মধ্যে স্তমিত হয়ে যায়। চেতনার কল্পনায় ভেসে ওঠে বিপ্লবী জীবনের প্রতিচ্ছবি, ফাঁসির দৃশ্য ও আন্দামান সেলুলার জেলের নিষ্ঠুর-নির্মম নির্যাতন এবং মৃত্যু। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই চেতনা তার তন্দ্রা ভেঙ্গে বিদ্রোহ করে বলে, মানুষের জন্য দেশের জন্য কিছু একটা করতে হবে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। অবশ্য অনুভূতি উপলব্ধি করার মত চেতনা থাকতে হবে। যে মানুষের চেতনায় দেশপ্রেম নেই, মানবতা-মনুষ্যত্ববোধ নেই, সে নলিনী দাস কেন কোনো সংগ্রামী ও বিপ্লবীকে বুঝতে পারবে না! চট্টগ্রামের সূর্যসেন, বরিশালের নলিনী দাস ছিলেন ব্রিটিশরাজের আতঙ্ক। এই দু'জনকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দেয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সশস্ত্র বিপ্লববাদী লড়াই-সংগ্রাম সংগঠিত হয় এবং যার ধারাবাহিকতায় ভারত স্বাধীন হয়, তার মূলে যে সকল বিপ্লবীর নাম সর্বজন স্বীকৃত তাদের মধ্যে নলিনী দাস প্রথম সারির একজন অন্যতম বিপ্লবী।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা থেকেই অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলের সঙ্গে তিনি শৈশবে যুক্ত হয়ে পড়েন। অগ্নিযুগের ভগৎ সিং, সূর্যসেন, বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, তারেকশ্বর দস্তিদার, দীনেশ মজুমদার, বিনয় কৃষ্ণ বসু, বাদলগুপ্ত, সুশীল লাহিড়ী, বসন্ত বিশ্বাস, রাম প্রসাদ, গোপীনাথ সাহা, আসফাক উল্লা, ভবানী ভট্টাচার্য, কালাচাদ সাহা, অবোধ বিহারী, হনুমন্ত সহায়, হরেন্দ্র চক্রবর্তী, বালমুকন্দ, রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎ ভট্টচার্য, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়সহ আরো অনেকের মতো ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নলিনী দাসকে হত্যা করার চেষ্টা করে ব্রিটিশ সরকার ব্যর্থ হয়। নলিনী দাসের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন হত্যামামলার তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ার কারণে ব্রিটিশ সরকার তাকে আন্দামান দ্বীপান্তর সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেয়।

আন্দামান দ্বীপান্তর গিয়ে তিনি জেলখানার মধ্যে সকল বন্দীকে সংঘবদ্ধ করে জেল প্রশাসন ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন করেন। আন্দামান বন্দীরা প্রথম অনশন শুরু করে ১৯৩৩ সালের ১১ মে। এই অনশন দীর্ঘ ৩৭ দিন ব্যাপী চলেছিল। তখন এই অনশনের মূল দাবি ছিল খাদ্যের মান-উন্নয়নসহ বন্দীদের মর্যাদা দেয়া।

৩৭ দিনের এ অনশনে ৩ জন বিপ্লবীর মৃত্যু হয়। ১৯৩৩ সালের কথা। এ অনশনের ৭ দিনের দিন ১৭ মে মহাবীর সিং (লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা) প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়েন। তবুও কোনো খাবার গ্রহণ করলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে কারা কতৃপক্ষ জোর করে হাত-পা বেঁধে নাকে নল ঢুকিয়ে দুধ খাইয়ে দেয়। ওই দুধ ফুসফুসে চলে যাওয়ার কারণে তিনি মারা যান। একইভাবে একই কারণে ১২ দিনের দিন ২৩ মে মোহিত মিত্র (অস্ত্র আইন মামলা) ও ১৩ দিনের দিন ২৪ মে সকাল বেলা মোহন দাস (ময়মনসিংহ ষড়যন্ত্র মামলা) মারা যান। ৩৭ দিনের শেষে এক পর্যায়ে ব্রিটিশ বাধ্য হয়ে জেল কোড আইন অনুসারে নূন্যতম বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশ নিশ্চিত করে।

ইস্পাত দৃঢ় সংকল্প ও অফুরন্ত কর্মশক্তির অধিকারী, আমৃত্যু ত্যাগী এই বিপ্লবী যোদ্ধা তার সারাটি জীবন মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। মানব সভ্যতাকে সাম্যবাদে উত্তরণের ক্ষেত্রে বিপ্লবী সংগ্রামে তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত। মার্কসবাদের মতবাদকে গ্রহণ করে কমিউনিজমের মহান ব্রত নিয়ে নিবেদিত করেছেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। নলিনী দাস তার ৭২ বছরের ২৩ বছর আন্দামান, ব্রিটিশ-ভারতের জেলে ও পাকিস্তানের জেলে ছিলেন। এছাড়া আরো ২০ বছর ৯ মাস তার কাটে পলাতক জীবনের বিপ্লবী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায়।

নলিনী দাসের জন্ম ১৯১০ সালের ১ জানুয়ারি। বরিশাল জেলার উত্তর শাহাবাজপুরে (বর্তমান ভোলায়)। তার বাবা দূর্গামোহন দাস। তিনি ছিলেন ভোলার স্থানীয় জমিদারী এস্টেটের নায়েব। নলিনী দাসের পড়াশুনার হাতেখড়ি পরিবারে। শৈশবে তার শিক্ষা জীবন ভোলাতেই শুরু হয়। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। দুরন্ত চঞ্চল মেধাবী এই বালক ১৯২১ সালে কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির আহ্বানে হরতাল ধর্মঘটের সময় ৫ম শ্রেণির ছাত্র অবস্থায় গ্রেফতার হন। এক দিনের সাজা দিয়ে

পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। এ কারণে কিশোর নলিনী দাস প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। আর মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন ব্রিটিশকে দেশ থেকে তাড়ানোর। এ সময় থেকেই তিনি ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতমাতাকে মুক্ত করার জন্য অগ্নিশপথ নেন। ১৯২৪ সালে তিনি যুক্ত হন বিপ্লববাদী যুগান্তর দলে। পড়াশুনা আর দেশের স্বাধীনতার জন্য দৃঢ়চিত্তে শুরু হয় অক্লান্ত পরিশ্রম। ১৯২৮ সালে সশস্ত্র বিপ্লববাদী দলের সাথে যুক্ত অবস্থায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর বরিশালের বি. এম কলেজে আইএসসি'তে ভর্তি হন। আইএসসি পরীক্ষার পূর্বে কলকাতা মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরয়ানা জারী হয়। শুরু হয় পলাতক জীবন। ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় পুলিশ কমিশনার টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ না পাওয়ায় তিনি মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়া সত্বেও ব্রিটিশ সরকার তাকে ডেটিনিউ করে প্রেসিডেন্সি জেলে প্রেরণ করে। তারপর ১৯৩১ সালে তাকে হিজলী ক্যাম্পে পাঠানো হয়।

১৯৩১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী ক্যাম্পে ব্রিটিশ পুলিশ রাজবন্দীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এ সময় কলকাতার সন্তোষ মিত্র ও বরিশালের তারেকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হন। আহত অবস্থায় নলিনী দাস ও ফনী দাসগুপ্ত হিজলী জেল থেকে পলায়ন করেন। আবার শুরু হয় পলাতক জীবন। ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলেন নলিনী দাস, বীরেন রায় ও দিনেশ মজুমদার। (দিনেশ মজুমদার, টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ও মেদেনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগার হতে পলাতক এবং বীরেন রায়, ওয়াটসন হত্যা প্রচেষ্টা মামলার আসামী)।

১৯৩২ সালে দিনের বেলায় চন্দননগরের ওই বাড়িতে পুলিশ ঘেরাও করে। বিপ্লবীরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। ৫/৬ মাইল রাস্তায় ও বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়িতে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ ৪ ঘন্টাব্যাপী চন্দননগর রাস্তায় পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ চালিয়ে যান মাত্র ৩ জন বিপ্লবী। এতে পুলিশ কমিশনার কিউ নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত বীরেন রায় গ্রেফতার হন। চন্দননগরের ঘটনার পর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে বিপ্লবী কর্মী নারায়ণ ব্যানার্জীর তত্ত্বাবধানে নলিনী দাস, দিনেশ মজুমদার ও জগদানন্দ মূখার্জী আশ্রয় নিলেন।

১৯৩৩ সালের ২২ মে পুলিশ ওই বাড়ি ঘেরাও করে। শুরু হয় বিপ্লবীদের সাথে খণ্ডযুদ্ধ। এক পর্যায় আহত অবস্থায় ধরা পড়েন তিন বিপ্লবী। বিচারে দিনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয়। এ সময় নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জীর বিরুদ্ধে ফাঁসি দেয়ার মত কোনো অভিযোগ না পাওয়ায় তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে ১৯৩৪ সালের মে মাসে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। তৎকালীন সময়ে তার সহযোদ্ধারা তাকে দুর্ধর্ষ বিপ্লবী খেতাব দেন। তার বিপ্লবী জীবনে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন।

আন্দামান সেলুলার জেল। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর তৈরি করা নিকৃষ্টতম জেল। যেখানে স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদেরকে অসভ্য বর্বর মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হত। যার পরিণতি মৃত্যু। সেখানেও নলিনী দাস অন্যান্য বিপ্লবীকে নিয়ে এক প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৩৪ সালের শেষের দিকে তিনি তার বিপ্লবী জীবনের হিসেব-নিকেশ শুরু করলেন। ভাবনা-চিন্তা করতে থাকলেন সকল স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের নিয়ে। বিপ্লববাদী পথ নিয়েও ভাবলেন। এ সময় তিনি রাজনৈতিক পড়াশুনাও বাড়ালেন।

১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে আন্দামান সেলুলার জেলে দুই কমিউনিস্ট নেতা কমরেড আব্দুল হালিম ও সরোজ মুখার্জী রাজবন্দী হয়ে এলেন। এই দুই বিপ্লবী আন্দামানে বন্দীদের রাজনৈতিক পড়াশুনা ও সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ সম্পর্কে ধারণা দিলেন। বন্দীদের মধ্যে প্রতিদিন গোপনে গোপনে বৈঠক হতো। এভাবে তারা গঠন করলেন কমিউনিস্ট গ্রুপ। যে গ্রুপের মধ্যে নলিনী দাস ছিল সবচেয়ে বেশি আন্তরিক। অন্যদিকে বন্দীদের মধ্যেও নলিনী দাস ছিল সবার শ্রদ্ধার পাত্র। তাই সবকিছু বিবেচনা করে নলিনী দাসই বন্দীদের মাঝে পার্টি গড়ে তোলার দায়িত্ব নেন। ওই বছর সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ও সুনির্মল সেন আন্দমান সেলুলার জেল থেকে দেশে চলে এলেন।

১৯৩৫ সালের ২৬ এপ্রিল সেলুলার জেলে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গঠন করা হয়। পহেলা মে, মে দিবসের কর্মসূচিতে ওই কনসলিডেশনে ৩৫ জন যুক্ত হয়। ১৯৩৬ সালে সুধীন্দ্র রায় (খোকাদা), রবি নিয়োগীসহ আরো কয়েক জন দেশে ফিরে যান।

কমিউনিস্ট কনসলিডেশন আন্দামান সেলুলার জেলে রাজবন্দীদের নিয়ে বিপ্লবী নিকেতন গড়ে তোলে। সেলুলার জেলকে বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য শুরু হয় পড়াশুনা। সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত এবং বেলা ১টা থেকে ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পড়াশুনার নিয়মিত ক্লাস শুরু হল। সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হত। কমরেড কার্লমার্কসের সাম্যবাদের ইশতেহার, লেনিনের পার্টিতত্ত্ব, স্ট্যালিনের লেখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিপ্লবীরা জ্ঞান অর্জন করেন। স্ট্যালিনের লেখা 'লেনিনবাদের ভিত্তি'র উপর ক্লাস নিতেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। ১৩৯৬ সালে কমিউনিস্ট কনসলিডেশন মে দিবস পালন করে। নলিনী দাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই আন্দামান সেলুলার জেলে কমিউনিস্ট পার্টির গ্রুপ গঠিত হয়। ওই সময় কমিউনিস্ট কনসলিডেশন দুটি হাতে লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করে, 'দুনিয়ার খবর' ও 'দি কল'। এর দায়িত্বে ছিলেন নলিনী দাস।

ওই বছর শেষের দিকে আন্দামানে রাজবন্দীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার তার সাম্রাজ্য ও আধিপত্য রক্ষার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবীদের ধরে আন্দামানে পাঠায়। নতুন রাজবন্দীরাও এই কমিউনিস্ট কনসলিডেশনে যুক্ত হতে থাকেন। ১৯৩৭ সাল কাটে পড়াশুনা, সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুতি, বন্দীদের নূন্যতম বেঁচে থাকার অধিকার আদায়ের সংগ্রাম আর সেলুলার জেল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমরণ অনশনের পরিকল্পনার মাধ্যমে। এছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের সাথে, বাহিরের বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন যাতে তারা এই অনশনে সমর্থন দেয়। এক পর্যায় নলিনী দাসের প্রচেষ্টায় আন্দামানের প্রায় সকল বন্দী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়।

১৯৩৮ সালের ২৫ জুলাই আমরণ অনশন শুরু হয়। বার বার অনশন এবং প্রথম অনশনের জন্য ৩ জন বিপ্লবীর মৃত্যুর ফলে কিছু দাবিদওয়া পূরণ হয়েছিল। বন্দীরা পড়াশুনার সুযোগ পেলেন। 'বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করে তারা পড়াশুনায় গভীর মনোযোগ দিলেন। গোপনে গঠিত হল কমিউনিস্ট কনসলিডেশন। আবার আমরণ অনশন শুরু করেন কমিউনিস্ট মতাদর্শের বিপ্লবীরা। এ অনশনের নেতৃত্বের অন্যতম একজন হলেন বিপ্লবী নলিনী দাস। এই অনশনের মূল দাবি ছিল আন্দামান সেলুলার জেলের সকল বন্দীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সকলকে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিতে হবে। এক পর্যায়ে এই অনশনে সকল বন্দীরা যোগ দেন।

অন্যদিকে অনশনকারীদের সমর্থনে ভারতব্যাপী উত্তাল আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল যুগান্তর, অনুশীলন ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। ফলে ১৯৩৮ সালের ১৯ জানুয়ারি ব্রিটিশ সরকার চাপের মুখে আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। এই মৃত্যু ফাঁদের সকল সহযাত্রীকে নিয়ে নলিনী দাস একদিন দেশে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু নলিনী দাসসহ ৩০ জনকে দেশে এনে মুক্তি না দিয়ে আলিপুর, দমদম, প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি কারাগারে পাঠানো হয়। এ সমস্ত জেলে নলিনী দাস রাজবন্দীদের নিয়ে পার্টির গ্রুপ গঠন করেন। ব্রিটিশ সরকার এক পর্যায়ে তাকে কোনো বন্দীদের সাথে যোগাযোগ করতে দিত না। তখন তিনি আন্দামান সেলুলার জেলের এক অনবদ্য ইতিহাস 'দ্বীপান্তরের বন্দী' একটি বই রচনা করেন। যে বইটি ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়। এটিই একমাত্র তথ্যবহুল আন্দামানের নির্মম ইতিহাস বহন করে।

অবশেষে ১৯৪৬ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর নলিনী দাস মুক্তি পান। দেশে ফিরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে কৃষক সমিতিকে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গোটা পাকিস্তান আমলটাই তার কেটেছে জেলে আর আত্মগোপনে।

মুসলিম লীগের শাসন আমলের কথা। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বরিশালের রাকুদিয়া গ্রামে কৃষক সমিতির এক বৈঠক থেকে নলিনী দাসসহ আরো কয়েক জন বিপ্লবীকে পাকিস্তান পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশ তাদের নামে বিভিন্ন মিথ্য মামলা দায়ের করে। সে মামলায় নিম্ন আদালতে বেআইনী অস্ত্র রাখার অভিযোগে নলিনী দাসকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এই মামলায় তিনি হাইকোর্টের আদেশে বেকসুর খালাস পেলেও মুসলিম লীগ সরকার তাকে মুক্তি দেয়নি। নানা অযুহাতে বিনা বিচারে আটকে রাখে। এ সময়েও তিনি বন্দীদের নিয়ে পার্টির গ্রুপ করেন। যারা মুক্তি লাভের পর কমিউনিস্ট পার্টিতে শামিল হয়েছিলেন।

অবশেষে ১৯৫৫ সালে আবু হোসেন সররকারের মন্ত্রিসভা যখন সমস্ত কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীদের প্রতি জেল-জুলুম-হুলিয়া তুলে নেয় তখন তিনি মুক্তি পান। ঠিক এক মাস পরে পুলিশ ধর্মঘটে উস্কানি দেয়ার অভিযোগে আবু হোসেন সরকার ঢালাওভাবে সকল বিপ্লবী ও কমিউনস্টি নেতৃত্বকে গ্রেফতার করে। তখন নলিনী দাসকে গ্রেফতার করা হয়। কিছু দিন পরে কে. এস. পি মন্ত্রিসভা গঠিত হলে সমস্ত কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীদেরকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বরিশাল জেলা পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব শাহীর শাসন আমল থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এক দশক ধরে আন্ডারগ্রাউন্ড ছিলেন। তিনি বৃহত্তর বরিশালে কমিউনিস্ট পার্টি এবং মেহনতি মানুষের আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। অবশ্য এ কাজে তাকে মুকুল সেন, খোকা রায়, জগদীশ আইচ, নূরুল ইসলাম মুনিসহ আরো অনেকে সহয়তা করেন। আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন ওই অঞ্চলের আতঙ্ক।

১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনে তিনি বরিশালের ছাত্রদেরকে সংগঠিত করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে তিনি বৃহওর বরিশালের ছাত্র-যুবকদের সংগঠিত করে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। ৭০'এ স্বরূপকাঠীর ব্যাসকাঠীর কৃষক সম্মেলনে কৃষকদের সংগঠিত করণে তার ভূমিকা অনন্য। এই সম্মেলনে প্রখ্যাত কৃষক নেতা জিতেন ঘোষ, হাতেম আলী খান ও মহিউদ্দিন আহম্মেদ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে নলিনী দাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বৃহত্তর বরিশালের অন্যতম সংগঠক তিনি। তরুণ ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক ও কৃষকদের রিক্রুট, ট্রেনিং, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি এবং কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর যোদ্ধাদের অন্যতম পরিচালক ও সংগঠকও ছিলেন তিনি। যে বাহিনীই মূলত যুদ্ধের কৌশলী বাহিনী ছিল।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর স্বাধীন বাংলাদেশে নবউদ্যমে আমৃত্যু নলিনী দাস বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির রক্ত পতাকা হাতে নিয়ে অগ্রসেনানী হিসেবে শোষণ মুক্তির লড়াই-সংগ্রামকে অগ্রসর করতে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে কমরেড নলিনী দাস এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার বিপ্লবী জীবন থেকে নতুন প্রজন্মের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। কমিউনিস্ট কর্মীরা তো অবশ্যই।

'বিপ্লবের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা শিখতে হবে, করতে হবে– এই তো লেনিনের শিক্ষা। লেনিনবাদী প্রত্যেক কর্মীকে একথা মনে রেখে শোষণমুক্ত-বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার জন্য পার্টির দায়িত্ব পালন করতে হবে'– নলিনীদাস।

শুধু অগ্নিযুগের সশস্ত্র বিপ্লববাদী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনই নয়, ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের পরে ৭১'র ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির সংগঠকদের মধ্যেও তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২-৮২ সাল পর্যন্ত দেশ গড়ার কাজে গণমানুষের মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন আমৃত্যু।

দেশমাতৃকা ও দেশের মানুষের সার্বিক মুক্তির আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ কমরেড নলিনী দাস লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের পৈত্রিক সম্পত্তি পিতা দুর্গামোহন দাসের নামকরণে একটি জনকল্যাণ ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তর করে যান।

এই কিংবদন্তী বিপ্লবীর লড়াই-সংগ্রাম ব্যতীত তার জীবনে সময়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তিনি মানুষের স্বাধীনতা, অধিকার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করেছেন। লাল সালাম বিপ্লবী কমরেড নলিনী দাস।

লেখক: শেখ রফিক

তথ্যসূত্র:

১. স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তরের বন্দী– নলিনী দাস।

২. বিপ্লবী নলিনী দাস স্মারকগ্রন্থ– সম্পাদক: সুবোধ দাশগুপ্ত।

৩. মুক্তির সংগ্রামে বিপ্লবী– ড. তাইবুল হাসান।

৪. অগ্নিযুগের কথা– সতীশ পাকড়াশী।